ঈর্ষার সবুজ চোখ

ঈর্ষার সবুজ চোখ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরা প্রকাশনী
এ, ১০ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
শ্রীঅঘোরনাথ রায়
রাজারামপুর
মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ— ১৯৬৫

প্রিন্টার্স—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
নিউ প্রিন্টার্স
২০৯, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

আশাপূর্ণা দেবীকে
শ্রদ্ধার সঙ্গে

ঠিক চারদিন পর হাজতঘর থেকে মুক্তি পেতে একটা বড় করে শ্বাস নিতে চাইল সায়ন। কিন্তু পারল না। লোহার গরাদ দেওয়া দরজা, চার দেওয়ালের জানালাহীন বদ্ধ পরিবেশের ভেতর চার-চারটে দিন কাটিয়ে তার ফুসফুস যেন জমাট বেঁধে গেছে। তাতে হাওয়া ঢোকার মতো কোনও রন্ধ্রপথ নেই। মনে হচ্ছে চারদিন নয়, চার বছর কিংবা চার লক্ষ বছর পার হয়ে গেছে তার জীবনে। চারদিন চাররাতে ঠিক কত ঘণ্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড হয় তা সায়ন জানে না, কিন্তু এই দম-বন্ধ করা ঘরের ভেতর প্রতিটি মুহূর্তই তার জীবনে দীর্ঘতম হয়ে দেখা দিয়েছে। সে ভেবেছিল, হয়তো আর কোনও দিনও এই গরাদের বাইরে যাওয়ার ছাড়পত্র পাবে না। কিন্তু কাল সন্ধের পর থানার দারোগা যখন জানালেন, আপনার জামিন হয়েছে, কাল সকালেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন থেকেই প্রতিটি সেকেন্ডের কুড়াক্রান্তি হিসেব করেছে সে। আর মনে মনে শিউরে উঠে ভেবেছে, উঃ কী ভীষণ এই হাজতবাস। চারপাশে অন্ধকার, দুর্গন্ধ, বীভৎস পরিবেশ। এই নরকের মধ্যে সায়নের মতো ভদ্র, শিক্ষিত, সুবেশ যুবক কীভাবে সময় কাটাতে পারে তা চারদিন আগেও তার বিশ্বাসের জগতে ছিল না।

অথচ নিয়তি হয়তো এরকমই ছিল। চারদিন আগে, কাকও ডাকেনি এমন ভোরবেলায় সে যখন মারুতিগাড়ি থেকে নেমেছিল তাদের বাড়ি 'ব্লু ওয়ান্ডার'-এর সামনে, অবাক হয়ে দেখেছিল, পুলিশের একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে গেটের পাশে। গেটটা খোলা, ভেতরে-বাইরে লোকজন, পুলিশের লোকই বেশি। তাকে দেখেই একজন কনস্টেবল চেঁচিয়ে উঠেছিল, এই তো, কালপ্রিট এখানেই। বোধহয় পালাচ্ছিল —

সায়নের পরনে তখন সদ্য ট্যুর-থেকে ফিরে-আসা আধময়লা জামাপ্যান্ট, হাতে ব্রিফকেস। মাথার চুল কিছু উসকোখুসকো। চোখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। সে একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিল, কী হয়েছে!

একজন সাদা পোশাকের লোক, পুলিশই হবে সম্ভবত, বলে উঠেছিল, আহা ন্যাকা, কিছু জানেন না যেন। বলেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, বড়বাবু, এই যে, নাম্বার ওয়ান কালপ্রিট।

বাড়ির ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে পোড়া গন্ধ ভেসে আসতে চমকে উঠেছিল সায়ন। গন্ধটা কী বিশ্রী। গন্ধটা আসছে বাড়ির সেই দিক থেকে যেদিকে সায়নদের ফ্ল্যাট। তাহলে কি তাদেরই ফ্ল্যাটে কোনও কিছু — !

শরৎ বোস রোডের উপর সায়নদের বিশাল দোতলা বাড়ির সামনে তখন এক ভীষণ থমথমা। কিছু লোকজনও আশপাশের বাড়ি থেকে জেগে উঠে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির চত্বরে। চোখ তুলতেই দেখতে পেয়েছিল, সিঁড়ির কাছে অদ্ভুত ভয়ার্ত চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মা চন্দ্রাদেবী, ভাই হিমন, দুজনেই।

এমন থমথমার ভেতর পৌঁছে আসলে ঠিক কী ঘটেছে তা বুঝতেই পারছিল না সায়ন। শুধু পোড়া গন্ধটা হঠাৎ চলকে এসে ঠোনা দিচ্ছিল তার নাকের লতিতে। নিশ্চয়ই কোনও দুঃসংবাদ, ভাবতেই সে আশেপাশে তাকাল। এ বাড়িতে তো আরও একজন সদস্য আছে। ঐন্দ্রিলা, সায়নের স্ত্রী। ঐন্দ্রিলা কোথায়? মাত্র দু বছর আগে যাকে সায়ন অগ্নিসাক্ষী করে নিয়ে এসেছিল, যে তরুণী এ বাড়িতে আসার পরই প্রতিবেশীরা বলেছিল, এ তো দেবীপ্রতিমার মতো মুখ। বন্ধুরা বলেছিল, প্যারাগন অব বিউটি। এমনকি তার খুঁতখুঁতে মাও বলেছিলেন, ও মা, এ যে রূপের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সেই ঐন্দ্রিলা, যাকে প্রথম দেখার মুহূর্তে ঝলসে গিয়েছিল সায়নের ছাব্বিশ বছরের চোখ। সাধারণ বাঙালি মেয়ের তুলনায় একটু দীর্ঘাঙ্গীই, মাথায় কোঁকড়া চুলের ঢল আধখানা চাঁদের মতো লাল ফর্সা কপাল, প্রায় শিল্পীর হাতে আঁকা নিখুঁত চোখ নাক-ঠোঁট। যে মেয়েটি লজ্জায় চোখ নিচু করে থাকলে মনে হত, টলটলে দিঘির জলে একটি ফুটি-ফুটি রক্তপদ্মই যেনবা, সেই মেয়ে তার আয়ত চোখ মেলে তাকালে মনে হত, হঠাৎ পাপড়ি ছড়িয়ে ফুটে উঠল সেই রক্তপদ্মটি। অমনই রক্তবরন তার গায়ের রং, অমনই টলটলে দিঘির মতো চোখ। সে বিছানায় শুয়ে থাকলে সায়ন ভাবত, কে সেই ঈশ্বর, যিনি এমন সৌন্দর্য রচনা করতে পারেন তাঁর নিখুঁত তুলিতে!

যে পোড়া গন্ধটা সেদিন ভোরে চাউর হয়ে গিয়েছিল বাতাসে, তা ঐন্দ্রিলার শরীর থেকেই। কখন যেন পরনের শাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল ঐন্দ্রিলার! তার ফলেই এই ভয়াবহ পরিণতি। কিন্তু কী করে শেষ রাতে তার শাড়িতে আগুন ধরল, তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য জবাব কেউ দিতে পারেনি পুলিশের কাছে। পুলিশ যখন দোতলায় সায়নদের অংশে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল, তার ফ্ল্যাটের দরজা নাকি খোলাই ছিল। ভেতরে বেডরুমের মেঝেয় পড়েছিল ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীর। তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেই পোড়া স্তূপের ভেতর থেকে। সেখানে আর কেউ ছিল না। এ বাড়ির দোতলায় অন্য ফ্ল্যাটটিতে তার মা ও ভাই থাকে। তার দরজা অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পুলিশ বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর সে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন চন্দ্রাদেবী আর হিমন। তারা দুজনেই পুলিশ দেখে যেন আকাশ থেকে পড়েছিল।

সেই মুহূর্তে বাড়ির কোথাও সায়নকে দেখা যায়নি। তার একটু পরেই ব্রিফকেস হাতে এসে পৌঁছেছিল সে। তাকে তখন ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীরটার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে শরীরের বীভৎসতায় চিৎকার করে উঠেছিল সায়ন। দু চোখ দু হাতের তালুতে ঢেকে আর্তনাদ করে বলেছিল, কেন ঐন্দ্রিলা, কেন, কেন! শুধু তার শাড়ির দু-একটা না-পোড়া অংশ, পোড়া আঙুলে তুঁতে রঙের পাথর-বসানো রুইতন আকারের আংটি, কানের ঝলসে যাওয়া দুল — এগুলো ছাড়া ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীরটি চেনার আর কোনও উপায়ই ছিল না। সে দৃশ্যে সায়ন বিমূঢ়, স্তম্ভিত, আতঙ্কিত। ঘটনার আকস্মিকতায় হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল। কেন ঐন্দ্রিলা, কেন —!

পুলিস অফিসারটি সে কথা বিশ্বাস করেনি। গোটা বাড়ির সবখানেই তখন পুলিশে পুলিশ। এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য চোখে তারা ঘিরে রয়েছে সায়নকে।

সায়ন তখন অবাক হয়ে ভাববার চেষ্টা করছিল, কী করে এমন বীভৎস কাণ্ড নিঃশব্দে ঘটে গেল! কেন হঠাৎ এভাবে মরতে হল ঐন্দ্রিলাকে! কী করে ভোর হওয়ার আগেই,

পড়শিরা জেগে ওঠার আগেই পুলিশের কাছে পৌঁছে গেল এ খবর, সেটাও তার কাছে রহস্য। কেউ আত্মহত্যা করলে সে কি পুলিশে খবর জানিয়ে দেয় আগেভাগে!

আত্মহত্যা নয়, হত্যা। পুলিশ অফিসারটি দাঁত কিড়মিড় করে উচ্চারণ করেছিলেন, আপনারা তিনজনে মিলে একটি নিরপরাধ বধূকে হত্যা করেছেন। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়, নির্ভুল গাণিতিক পদ্ধতিতে সময় হিসেব করে। ভোর হওয়ার আগেই যাতে ডেডবডি ডিজপোজ অফ করে দিতে পারেন —

ততক্ষণে আরও বিস্ময় চারিয়ে গেছে সায়নের ভেতর, ইউ মিন, মার্ডার!

— ইয়েস, এ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। টেলিফোনটা ঠিক সময় না পৌঁছলে আপনারা সমস্ত প্রমাণ হাপিস করে ফেলতেন।

স্তম্ভিত চোখে তাকিয়েছিল সায়ন, কখন টেলিফোনটা গিয়েছিল আপনাদের কাছে?

— ভোর সাড়ে তিনটেয়। তার বোধ হয় ঘণ্টাখানেক আগেই আপনাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

আর ভাবতে পারেনি সায়ন। তার হতভম্ব ভাব কাটার আগেই পুলিশ অফিসারটি গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

সায়নের তখন বলার ক্ষমতাও নেই, কেন। সে অসহায়ভাবে তার হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছিল, যেন হাতকড়া পরতেই হবে এমন নিয়তি তার। শুধু সে একাই নয়, এ বাড়ির আরও দুজন, তার মা চন্দ্রাদেবী, ভাই হিমন, তাদেরও উঠতে হয়েছিল পুলিশের গাড়িতে।

আশেপাশের বাড়ির আরও অনেকের চোখের সামনে দিয়ে, বহু চেনা ও অচেনা পড়শির বিস্ময়, আতঙ্ক আর কৌতুকের ভেতর তাদের তিনজনকে যেতে হয়েছিল থানায়, হাজতঘরের ভেতর।

ততক্ষণে সে বুঝে গিয়েছিল, শুধু পুলিশ অফিসার বা তার বাহিনীই নয়, সমস্ত পৃথিবী সেদিন সকাল থেকে তাদের দিকে লক্ষ তর্জনী ছুড়ে দেবে, ইউ আর দ্য মার্ডারার। তাদের বাড়ির চারপাশে ঘিরে থাকা সমস্ত পুলিশরা সেভাবেই তাকাচ্ছিল তাদের দিকে। প্রতিবেশীদের দৃষ্টির ধরনও ছিল সেরকমই। গাড়িতে উঠেও সে উদভ্রান্তের মতো ভেবে চলেছিল, আত্মহত্যা, না হত্যা! আত্মহত্যা হলে কেনই বা আত্মহত্যা! হত্যা হলে কে বা কারা! ঝিমধরা মাথায় চোখ বুজে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করেছিল, তার সঙ্গে ঐন্দ্রিলার এমন কোনও বাদানুবাদ বা কলহ হয়নি, যার জন্যে ঐন্দ্রিলাকে বেছে নিতে হবে আত্মহত্যার পথ। আর যদি একটি নিরপরাধ চব্বিশ বছরের তরুণীকে হত্যাই করা হয়ে থাকবে, তাহলে কেন! আর কারাই-বা! নিজের অজান্তেই পুলিশের গাড়িতে তার পাশে বসা দুজনের দিকে হঠাৎই তাকিয়ে দেখেছিল সে। গত দেড়-দু বছর মা বা ভাইয়ের সঙ্গে তার তেমন সম্পর্ক নেই-ই বলতে গেলে। তার আগেও যে ছিল তা-ও নয়। বলা যায়, পরিস্থিতির বিচারে তার সঙ্গে তার মা ও ভাইয়ের সম্পর্ক এক ধরনের বিরক্তির, ঘৃণার বা অসহ্যের। তাহলে কি তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার মা, কিংবা ভাই! অথবা দুজনে মিলে!

পুলিশ অফিসারটি বলেছেন, আপনারা তিনজনেই। ঘটনার দিন সন্ধেবেলা তাদের বাড়ির দরোয়ান মোহন ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিল তার মোতিবাগানের বস্তিবাড়িতে।

অতএব ঐন্দ্রিলা ছাড়া আর মাত্র তাদের তিনজনেরই সে রাতে বাড়িতে থাকার কথা। অতএব পৃথিবীর সমস্ত তর্জনী তো তাদের তিনজনের দিকেই ধাবিত হবে।

তা-ই হয়েছে। তারপর থেকে সন্দেহের সমস্ত তীর ক্রমশ তাদের তিনজনের দিকেই আছড়ে পড়েছে। পরদিন একসঙ্গে তিনজনকে যখন কোর্টে আসামির কাঠগড়ায় তোলা হল, তখন সায়নের চারপাশে একরাশ অপমানের অন্ধকার। তার চোখ দুটো ঝাপসা, কান, গলা দিয়ে ঝাঁ-ঝাঁ করে আগুন বেরুচ্ছে, পায়ের নখ থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত একটা গরম হলকা। তার মধ্যেই সে অনুভব করল, বিচারক-উকিল-পেশকার থেকে শুরু করে উপস্থিত সমস্ত দর্শকই তাদের দিকে তাকিয়ে আছে এক অদ্ভুত কৌতূহল আর ঘৃণা নিয়ে। কোর্টরুম পেরিয়ে বাইরেও উপচে পড়ছে ভিড়। এহেন ভিড়, কেননা সেদিনই সকালে সমস্ত সংবাদপত্রের হেডলাইনে ছাপা হয়েছে এক অভিজাত পরিবারের গৃহবধূ হত্যার খবর।

সংবাদপত্র তখনও দেখেনি সায়ন। তবু অনুমান করতে পেরেছিল, এসব খবর যতটা সম্ভব রসালো করে, নিখুঁত বর্ণনায় পরিবেশন করে রিপোর্টাররা। সমস্ত মানুষের ভাবনার, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় এই খবরটিই। তারপর দিনের পর দিন ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো প্রকাশিত হতে থাকবে প্রতিদিনকার ঘটনাবলি।

আদালতে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ফোটোগ্রাফাররা। গাড়ি থেকে নামতেই কয়েকঝলক আলো জ্বলে ওঠার আগেই দেখেছিল, তার মা চন্দ্রাদেবী দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছেন। হিমন এমনিতেই ঠাণ্ডা স্বভাবের, তবু কীভাবে যেন সেও তার দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল সেই মুহূর্তে। কিন্তু সায়ন তার মুখ ঢাকতে চায়নি। এই ভয়ঙ্কর বীভৎস ঘটনার সমস্ত দায় যেন সে নিজের উপরই ন্যস্ত করতে চেয়েছিল।

পরদিনই ছবিটি সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছে। তার সঙ্গে চৌধুরিবাড়ির সমস্ত অতীত ইতিহাস। সায়নের বাবার কথা, চন্দ্রাদেবীর কথা, তাঁর অসংখ্য পুরুষ-বন্ধুর কথা, বিশেষ করে রবার্ট ও'নীলের প্রসঙ্গ, তার ভাই হিমনের স্ত্রী দীয়াও যে এখন আর চৌধুরিবাড়িতে থাকে না, এই সমস্ত ঘটনার কারণ ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ছেপেছে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ধরে।

পুলিশ হাজতে থাকার সময় একদিন সংবাদপত্রের চেহারা একঝলক দেখে নিয়েছে সায়ন। তার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতেই অপমানের সুচ। সেই তীক্ষ্ম ফলা তার চামড়ার গভীরে গিয়ে ফুটেছে।

তার পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল সায়নের সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি 'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'-এর খুঁটিনাটি। সেখানেও নানান কেচ্ছার খবর খুঁজে পেয়েছে সাংবাদিকরা। অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক নারীঘটিত ব্যাপার। তিন-চারদিনের খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ার পর সে উপলব্ধি করেছে, শৈশব-কৈশোর থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা তার কেরিয়ার একমুহূর্তে, একটি রাতের আকস্মিকতায় — তার বীভৎসতায় ধুয়েমুছে শেষ হয়ে গেছে। ঐন্দ্রিলার সুন্দর শরীরটার সঙ্গে তার জীবন, যৌবন, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব পুড়ে ছারখার।

সরকারি পক্ষের উকিল সেদিনই আদালতে সওয়াল করে বলেছিলেন, ইয়োর অনার, এই ভদ্রবেশী মানুষগুলো যে কী ধরনের পাশবিক অত্যাচার করে তাদের ঘরের বউয়ের

উপর, দিনে দিনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, তা ভাবা যায় না। এক নম্বর আসামি সায়ন চৌধুরী একজন যুবক, অফিসের কাজের নাম করে মাসে অন্তত দশদিন বাইরে রাত কাটায়, কলকাতার বাইরে জেলা-শহরে কিংবা অন্য রাজ্যে ট্যুরে যায়, দামি হোটেলে রাত্রিবাস করে অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে। ঘরের বউকে সঙ্গ দেয় না, টরচার করে, মাত্র দু বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে তাদের ভেতর চরম অবনিবনা। আরও আশ্চর্যের ঘটনা এই যে, হত্যাকাণ্ডের মাত্র চারদিন আগে, দোসরা এপ্রিল, এই আসামি ট্যুরের নাম করে গিয়েছিল মধ্যপ্রদেশে। সঙ্গে ছিল আলো বোস নামের এক মহিলা, একই ট্রেনে একই ক্যুপে দুজনে ট্রাভেল করেছে, তেসরা এপ্রিল রাত কাটিয়েছে বিলাসপুর স্টেশনের কাছে এক হোটেলে, এই দেখুন হুজুর, 'হোটেল মীনাক্ষী' থেকে আমরা রেজিস্টার ও বিলের ফোটোকপি আনিয়েছি। সেখানে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করেছে, অথচ তার দুদিন পর পাঁচ তারিখ সকালে বাড়ি ফিরে এসে চরম উৎপীড়ন করেছে তার স্ত্রীর উপর — এই দেখুন তার ট্রেনের ফেরার টিকিটের কপি, আর সেই অত্যাচারের পরিণতিতে সেদিন শেষ রাতে, অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডার মতে ছ তারিখ ভোরবেলা এই হত্যাকাণ্ড। দু নম্বর আসামি চন্দ্রাদেবীও একজন দুশ্চরিত্রা, দুঁদে মহিলা। তাঁর অত্যাচারে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে এই মামলার তিন নম্বর আসামি হিমন চৌধুরীর স্ত্রী। একইভাবে তাঁর বড় ছেলে সায়ন চৌধুরির স্ত্রীকেও তিনি তাড়াতে চেয়েছিলেন। পারেননি বলেই শেষপর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে এই হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছেন, তিন নম্বর আসামি হিমন চৌধুরিও — ।

সওয়াল শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিল সায়ন। বিস্ময় এই কারণেই যে, জবরদস্ত উকিলবাবুরা কী চমৎকারভাবে সাজাতে পারেন এ ধরনের মামলা। শুধুমাত্র উপস্থাপনার গুণে, কথার কারসাজিতে হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে পারেন।

সরকারি উকিলের সওয়ালের বয়ান, অবশ্য অনেকাংশেই সত্যি। সে গত সপ্তাহে বিলাসপুরে ট্যুর করতে গিয়েছিল ঠিকই। একই ক্যুপে ছিলেন আলো বোস, তাও ঠিক, বিলাসপুরে এক রাত্রি হোটেলে বাস করেছে সেটাও মিথ্যে নয়, তার মা সত্যিই একজন জাঁহাবাজ মহিলা, তার ভাই হিমনের স্ত্রী দীয়াও যে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে — এ সবই সত্যি। তবু সব মিলিয়ে উকিলবাবু যেভাবে উপস্থিত করলেন ঘটনাগুলো, সেটা মিথ্যে। বিশেষ করে আলো বোসের সঙ্গে তার ব্যভিচারের ঘটনাটা। অনেক ভেবেচিন্তে উকিলবাবুকে এভাবেই সাজাতে হয়েছে কেসটাকে। এতসব তথ্যের সঙ্গে সায়নকে যেভাবে জড়ানো হয়েছে খুনের সঙ্গে, তাতে যে-কোনও মানুষেরই মনে হবে, এ খুবই বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা। কিন্তু ঐন্দ্রিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক তো ঠিক এরকম ছিল না।

ঘটনার পারম্পর্য, আদালতের সওয়াল অনুযায়ী সায়নকেই হত্যাকারী ভাবা স্বাভাবিক। সায়নের কলকাতায় ফেরার ট্রেনের টিকিটের তারিখ মেলালে তার যে পাঁচ তারিখ রাতে তাদের শরৎ বোস রোডের বাড়িতে উপস্থিত থাকার কথা, এ বিষয়ে কারও দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নেই। তাই সায়ন কাউকে বিশ্বাস করাতে পারেনি — পাঁচ তারিখ ভোরে তার কলকাতা ফেরার কথা থাকলেও সে আসলে ফিরেছিল ছ তারিখ ভোররাত্রে, সেদিন বাড়িতে তার পা দেওয়ার কিছুক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে ঐন্দ্রিলার। কিন্তু কেউ সে কথা বিশ্বাস করেনি। করেনি বলেই সম্ভাব্য হত্যাকারীদের তালিকায় তারই নাম সবার প্রথমে।

সায়ন নিজেও অবাক হয়ে ভেবেছে, তার ফিরতে যে একদিন দেরি হল, সেও কি নিয়তির অমোঘ টানে!

হাজত থেকে বেরুবার মুখে একজন কনস্টেবল জানাল,তাকে একবার বড়বাবুর কাছে যেতে হবে।

যেতে হল, কারণ কয়েকটা খাতায়, কাগজপত্রে সইসাবুদ করার ব্যাপার আছে। এ সব কেসে এত সহজে জামিন পাওয়া যায় না। জামিনের শর্ত হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে একদিন করে আই ও অর্থাৎ ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের কাছে হাজিরা দিতে হবে। এর আগে এমন অভিজাতবাড়ির যে ক'টি কেলেঙ্কারি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা আলোকিত করেছে, সেসব কেসের অভিযুক্তদের কারোরই এভাবে জামিন হয়নি। দু মাস তিন মাস পর্যন্ত জেলে-হাজতে পচতে হয়েছে। একটা কেসে তো প্রথমে ফাঁসির হুকুম, পরে তা রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। প্রথমদিন অ্যারেস্ট হয়ে হাজতে ঢোকার পর জেলের বাইরেই আর বেরুতে পারেননি তাঁরা। সায়নদের পক্ষের উকিল তাঁর সওয়ালে এমন কিছু জোরালো বক্তব্য রেখেছেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনদিনের মাথায় তার মা ও ভাই, চারদিনের মাথায় তাকে জামিন দিয়েছেন বিচারক।

চারদিন পর হাজতের বাইরে বেরিয়ে সায়নের মনে হল, তার বয়স বেড়ে গিয়েছে আরও অন্তত কুড়ি বছর। তার মুখে এখন খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় রুক্ষ চুল, আয়নায় না দেখেও মনে হচ্ছে তাতে পাক ধরে গিয়েছে। চেহারায় এক অকালবৃদ্ধের ছাপ। কেমন জীর্ণ, ন্যুব্জ হয়ে গিয়েছে শরীরটা।

তাকে দেখে পুলিশ অফিসার কয়েকটা খাতা এগিয়ে দিলেন, নিন, এইখানে সই করুন —

যন্ত্রচালিতের মতো এখানে-ওখানে সই করল সায়ন।

— এই কাগজটাতেও।

আবারও কাঁপা-কাঁপা হাতে সে তার স্বাক্ষর মুদ্রিত করল। এখন আর কোনও কিছু পড়ার সময় নেই, ভাবারও সময় নেই। অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এসেও মনে হচ্ছিল, কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে চারপাশ। সে এখন একদম একা। বাইরের পৃথিবীতে এখন তার জন্য কেউ আর অপেক্ষায় নেই। পুলিশের গাড়িতে প্রথমদিন ওঠার সময় সে যেমন তার মা ও ভাইকে মনে মনে সম্ভাব্য খুনি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, তেমনই তার প্রবল প্রতাপান্বিত মায়ের একঝলক দৃষ্টি দেখে তারও মনে হয়েছিল, তিনিও সায়নকে সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসেবে ভাবছেন। হিমনের কথা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি সে। সেদিন শুধু নয়, কোনও দিনই। হিমন বরাবরই হিমশীতল। ওর বউ দীয়াই বলত —

গাড়িতে যেতে যেতে সে আরও বুঝেছিল, তার সঙ্গে তার মা ও ভাইয়ের যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছে গত কয়েক বছরে, তার প্রকাশ আরও প্রবলভাবে ঘটে গেল গাড়িতে পাশাপাশি বসে থাকার সময়। আরও হিংস্রভাবে।

— আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন বাইরে, ইনস্পেক্টরের গলার স্বরে চমকে উঠল সায়ন, কে?

— একজন যুবতী, বলেই একচিলতে বাঁকা হাসি ভদ্রলোকের পুরু ঠোঁটে খেলে

গেল। যুবতী বলেই এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

সায়ন হতবাক হয়। একজন খুনি আসামির জন্য কে অপেক্ষা করছে বাইরে! তার অফিসের পি.এ. কঙ্কা রায়? নাকি তার কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায় মজুমদার?
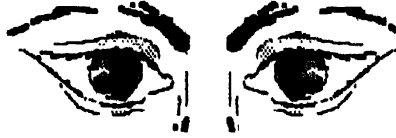
পুলিশের খাতায় সই-স্বাক্ষর শেষ হওয়ার পর সায়ন যখন চোখ তুলে তাকাল, তার চারপাশে বিদ্যুতের মতো ঝকমকাচ্ছে অজস্র বাঁকা-হাসির ছুরি। সে এখন এমন একজন খুনি আসামি যে ধরা পড়েছে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে, তারপর গত চার দিন হাজতবাস করার পর এখন জামিনে ছাড়া পেয়ে বেরুচ্ছে, আর তারই জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে একজন যুবতী — সংবাদটি তার চরিত্র উন্মোচনের পক্ষে যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ।

কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল তার। অবশ, নিথর পায়ে বাইরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, তখনই কেউ যেন বলল, এই নিন, আপনার কিছু বিলঙ্গিংস্।

কিছু কাগজপত্র, কয়েকটা টাকা — হাজতে ঢোকানোর সময় সায়নের পকেটে যা পাওয়া গিয়েছিল, তা পুলিশ রেখে দিয়েছিল ওদের জিম্মায়। সায়ন তাও মাথা নিচু করে নিল। চারপাশে সবাই তখন কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। শুধু একদিকে বেঞ্চির উপর বসে খাকি পোশাক পরা একজন দারোগা-চেহারার লোক মন দিয়ে সেদিনকার সংবাদপত্রে চোখ বুলোচ্ছে। লোকটি কাগজের সেই অংশেই চোখ রেখেছে, যেখানে ফলাও করে ছাপা হয়েছে সেদিনকার ঐন্দ্রিলা-হত্যার ধারাবিবরণী। নিশ্চয় সে বর্ণনা এমন রসালো যে লোকটি ঘটনার নায়ককে চোখের সামনে দেখার সুযোগ পেয়েও সেদিকে না তাকিয়ে খবরের কাগজ পড়ে চলেছে একমনে।

সায়ন অবাক হয় না। স্ক্যান্ডালের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা মানুষের স্বভাব। সে কেচ্ছা যদি কোনও অভিজাত বাড়ির হয়ে থাকে, তবে তা আরও মুখরোচক হয়। তা তারিয়ে তারিয়ে পড়ার ভেতর এক ধরনের নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ থাকে। সায়ন এখন এই স্ক্যান্ডালের নায়ক। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তাকে বর্ণনা করা হয়েছে এক অসাধারণ নারীশিকারি হিসেবে। তার সঙ্গে তার পারিবারিক নানান কেচ্ছার গল্প জড়িয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার নারীলোলুপ চরিত্র। হাজতবাস করে বেরুচ্ছে যে উসকোখুসকো চেহারার সায়ন, তার চেয়ে রিপোর্টিং অনেক উত্তেজক। তাই-ই দারোগা-চেহারার লোকটি —

অথচ এই সায়ন আশৈশব ব্রিলিয়ান্ট, চৌখস ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল তার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন। তার প্রতিটি রেজাল্টশিটই ছিল সম্ভ্রম করার মতো, অন্য যে-কোনও ছাত্রের কাছে ঈর্ষণীয়, প্রেরণার আধারও বটে। জন্মসূত্রে সে এই মেধা লাভ করেছিল তার বাবা নিশীথ চৌধুরীর কাছ থেকে।

নিশীথ চৌধুরী ছিলেন দক্ষিণের এই অভিজাত এলাকার এক খ্যাতনামা ডাক্তার। শরৎ বোস রোডের ওপর বিশাল দোতলা বাড়িটি তিনিই তৈরি করেছিলেন অনেককাল আগে, উনিশশো আটান্নয়। তাঁরও ছিল স্কুল-কলেজে নজর কাড়ার মতো ঝকঝকে কেরিয়ার। ডাক্তার হিসেবে খুবই নাম করেছিলেন প্রথম জীবনে, তারপর বিলেত ঘুরে আসার পর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁর পশার বেড়ে গিয়েছিল হু-হু করে। বাড়ির একতলায় বিশাল চেম্বার ছিল, তাতে সর্বক্ষণ অপেক্ষা করত অজস্র রুগি। তার সঙ্গে বাইরের 'কল'ও ছিল অহরহ। চেম্বারের পিছনে বিশাল একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করে তাতে গবেষণা করতেন চেম্বারের রুগী দেখা থেকে ফুরসত খুঁজে নিয়ে, এ ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কম নয়, বড় বড় ইনস্টিটিউটে সেমিনার, মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকতেন।

এতসব কর্মকাণ্ড নিয়ে তিনি এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে নিজের বাড়িতে সময় দেওয়ার অবসরই জুটত না। এমনকি বিয়ের পর চন্দ্রাদেবীর সঙ্গেও সময় দিতে পারতেন না তেমন। চন্দ্রাদেবীর তাতে অবশ্য খুব একটা যায় আসেনি, কারণ তাঁর রূপ, সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রভাবে তিনি ইতিমধ্যে জুটিয়ে ফেলেছিলেন অনেক পুরুষ বন্ধু। তাঁরা পালা করে ব্লু ওয়ান্ডারে এসে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে যেতেন। বিশেষ করে রর্বাট ও নীল নামের বিদেশি যুবকের সঙ্গেচন্দ্রাদেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল চোখে পড়ার মতো। নিশীথ চৌধুরী তাঁর প্রফেসন নিয়ে এতই ব্যাপৃত থাকতেন যে স্ত্রীর এই পদস্খলনকে তেমন আমল দেননি। কেন না তার আগেই চন্দ্রার কোলে এসে গেছে সায়ন। নিশীথ চেয়েছিলেন, তাঁর এই ফুটফুটে ছেলেটি তাঁরই মতো নাম-ডাকঅলা ডাক্তার হোক।

সায়ন যখন দু'বছরের, তখন চন্দ্রাদেবী জন্ম দিলেন আর এক পুত্রের, সে হিমন। যে নিশীথ চৌধুরী রাতদিন ব্যস্ত থাকতেন ডাক্তারি নিয়ে, দক্ষিণ কলকাতার মানুষ যে ডাক্তারের নাম ধন্বন্তরির মতো জপ করত, সেই তিনিই হঠাৎ হিমনকে দেখে কেমন চমকে উঠলেন। বিড়বিড় করে বললেন, এর চুল এমন লালচে কেন! এমন কোঁকড়া-কোঁকড়াই বা কেন!

সায়নের মুখচোখের সঙ্গে হিমনের এতটাই তফাত যে তাকে দেখে কেমন পাগলের মতো হয়ে গেলেন নিশীথ চৌধুরি। তাঁর ডাক্তারিতে ভাটা পড়ল, সারাক্ষণ তাঁকে দেখাত উদ্ভ্রান্ত, অন্যমনস্ক। কেবলই বলতেন, ওর চুল অমন লাল্‌চে কেন! অমন সাহেবি-চেহারার কেন আমার ছেলে! এই আঘাত এতটাই তীব্র হয়ে উঠল যে এরপর আর খুব বেশিদিন বাঁচেননি নিশীথ চৌধুরী। তখন সায়ন বেশ ছোটই। সে কিন্তু বড় হয়ে কেন কে জানে ডাক্তার হতে চায়নি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন স্কলারশিপ নিয়ে বেরুল, তখন একটা কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হল, অন্তত বাবার চোখের সামনে তাকে অবাধ্য হতে হবে না। সে ইতিমধ্যে স্থির করে নিয়েছে, বড় হয়ে স্বাধীনভাবে অন্য কেরিয়ার গড়বে। ডাক্তার নয়, ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি, এমন ধরনের একটা কিছু।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রিতে ডিগ্রি নেওয়ার পর সে ঠিক করল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে আমেরিকা পাড়ি দেবে। যখন জিনিসপত্র গোছগাছ করছে, ঘোরাঘুরি করছে পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য, ঠিক সেসময় তার নজরে পড়ল সংবাদপত্রে

প্রকাশিত একটি ছোট্ট ফিচার। ফিচারটি ভারি অভিনব, আর সায়নের মনে হল, জীবনে বড় হয়ে ওঠার অ্যাম্বিশন যাদের আছে, তাদেব পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদেশের পটভূমিকায় রচিত এই ফিচারটি বেশ কয়েক দশক আগের এক দরিদ্র কিশোরকে নিয়ে, যে সামান্য অবস্থা থেকে শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায় আর কঠোর পরিশ্রমে উন্নীত হয়েছিল সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায়। নীল চোখ, লাল্‌চে গায়ের রং আর সোনালি চুলের এই কিশোর প্রথমে জীবনে মাথায় সাবানেব কেক নিয়ে ফেরি করে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়, দোকানে দোকানে। সেই ছিল ত 'দেব পবিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ, যার ওপর নির্ভর করত তার একদা-পবিশ্র ' কিন্তু এখন পঙ্গু বাবা, স্নেহশীলা মা ও একদঙ্গল ভাইবোন। যে সাবান সে মাথায় নি সারাদিন ঘুরে বেড়াত, তার না ছিল কোনও নাম, না ছিল রঙিন মোড়কে জড়ানো। সাবান মানে তখন শুধুই সাবান।

সেই কিশোর একদিন সাবাক্ষণ ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, হঠাৎ তাব মগজে উদয় হল এক অদ্ভুত ভাবনা। তার মনে হল, সাবানের কেকগুলো যদি কোনও ঝকমকে, রঙিন, মোলায়েম কাগজে মুড়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় ক্রেতার সামনে, তা হলে সাবানটি তার কাছে নিশ্চয়ই আরও লোভনীয় হয়ে উঠবে। বলাবাহুল্য, তার এই ভাবনাটি সাবান বিক্রির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ঝকঝকে প্যাকেটে ভবে সাবান বিক্রি করতে শুরু কবায় অন্যান্য বিক্রেতাদের চেয়ে তার সাবানের চাহিদা বেড়ে গেল অনেক বেশি। তার পরের ভাবনাটি আরও চমকপ্রদ। সে ভাবল, মোড়কের ওপর সাবানের একটা জুতসই নাম লিখে দিলে হয়তো আবও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। যেসব মানুষ এখন দোকানে গিয়ে 'একটা সাবান দাও তো' বলে, সে এব পর বলতে শিখবে 'অমুক সাবান দাও'। তাতে তার সাবানের কাটতি নিঃসন্দেহে ঊর্ধ্বমুখী হবে দিনে-দিনে।

মাথায় সাবান নিয়ে ফেরি করে বেড়াত যে সোনালিচুলের কিশোর, সে পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়ে ওঠে সাবানের একচেটিয়া ব্যবসায়ী হিসেবে। এর পর নিজেই সাবান তৈরি করবে বলে শুরু করল একটি ছোট্ট কারখানা। নিজস্ব ব্র্যান্ডনেমের সেই ছোট্ট কারখানা ক্রমশ রূপান্তরিত হয় এক বিশাল কারখানায়। তার পরের ঘটনা এক ইতিহাস। সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি-কোটি টাকার ব্যবসা করে সেই কিশোর পরবর্তী কালে সাবান-ব্যবসায়ের অন্যতম পথিকৃৎ বলে গণ্য হয়েছে।

সেই কিশোরের দৃষ্টান্ত অনুসবণ করে সায়নও চেয়েছিল, এমনই কোনও একটি ব্যবসা শুরু করতে, যে পণ্যদ্রব্য মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে। সাবানের কারখানার উদাহরণটি মাথায় রেখে সায়ন চলে গিয়েছিল আমেরিকায — তার কেরিয়ার তৈরির জন্য। বাবার রেখে যাওয়া টাকা নিয়ে সেখানে দু'বছর পড়াশুনা করে আবার ফিরে এল কলকাতায়। এসেই শুরু করেছিল তাব 'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড', তাতে নতুন ও অভিনব ধরনের সব সাবান তৈরি করে সে-ও এ দেশে সাবান তৈরির জগতে আনতে চেয়েছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এ দেশে সাবান তৈরির তখন অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানি — প্রত্যেকেই চুটিয়ে ব্যবসা করছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, এমনকি দেশের বাইরেও। তারা খবরেব কাগজে, টি.ভি-তে কোটি-কোটি টাকার বিজ্ঞাপন কবে মার্কেটে একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে বিরাজ

করছে।

তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভাবাই যায় না। সায়নও এত সব বড়-বড় কোম্পানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠবে এমন ভরসা করেনি প্রথমে। কিন্তু তার চোখে পড়েছিল, খাস কলকাতায় আর একটি বড় কোম্পানি 'দি লাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' বেশ রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে। 'লাইম ইন্ডিয়া'র চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় এক প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। চেহারা ছোটখাটো, কিন্তু তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রখর। মাত্র দু'লাখ টাকা ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে সাবানের ব্যবসা শুরু করে ক্রমে তাঁর কেম্পানিতে কয়েক কোটি টাকার টার্নওভার। ভিন রাজ্যের নামীদামি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে দিব্যি টক্কর দিয়ে জমিয়ে ফেলেছেন তাঁর কোম্পানির ব্যবসা। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের এককোণে একটা বিশাল ন'তলা বাড়ির গোটা সাততলাটা নিয়ে তাঁদের অফিস। গায়ে-মাখা সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরির জগতে ঈর্ষণীয় বাজার তৈরির মুখে এসে পৌঁছেছে মাত্র পনের-ষোল বছরের মধ্যে। কোম্পানির প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণতোষ বটব্যাল পর পর তিন-চার ধরনের সাবান তৈরি করে এমন চমক দিয়ে বাজারে ছেড়েছিলেন যে অন্তত তার পরের দশ-পনেরো বছর কোম্পানির টার্নওভার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। কলকাতাব বাজারে, এমনকি মফস্বলেও তাদের রেডরিবন বিউটিবাথ ব্লু জুয়েলের তখন ভীষণ কাটতি। অন্য ছোটখাটো কোনও বাঙালি কোম্পানি লাইম ইন্ডিয়ার প্রোডাক্টের ধারে কাছে পৌঁছতে পারছিল না। কোম্পানির সর্বশেষ উৎপাদন ছিল লেমন্ টাচ যা গায়ে মাখলেই চমৎকার গন্ধরাজ লেবুর গন্ধে ভুরভুর করত শরীর। লাইম ইন্ডিয়াকে দেখে সায়নের মনে হল, তা হলে বাঙালি কোম্পানিও ইচ্ছে করলে বড় হতে পারে।

হঠাৎ একদিন কলকাতার সব কাগজেই বড়-বড় করে নতুন একটি সাবানের বিজ্ঞাপন বেরুল। একটি বাঙালি কোম্পানি 'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ লিমিটেড' বার করেছে 'রোজবেরি' নামে একটি সাবান, যার মোড়ক থেকে সাবানের শেষ বিন্দু পর্যন্ত চমৎকার গোলাপের সুবাসে ভরা। স্নানের ঘরে রাখলে গোটা বাথরুম গোলাপের গন্ধে ভরে ওঠে। পর পর দু-তিনটি এমন চমক দেওয়া বিজ্ঞাপনও বেরিয়ে গেল সংবাদপত্রে যে, বাসে-ট্রামে, রেস্তোরাঁয়, বাড়িতে-বাড়িতে শুরু হয়ে গেল 'রোজবেরি' নিয়ে আলোচনা।

'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'-এর ধারাবাহিক সাফল্যের সেই শুরু। সায়ন ততদিনে তার ফ্ল্যাটের পেছনের অংশে একটা ঘরে ছোট্ট ল্যাবরেটরি-রুম তৈরি করে নিয়েছে। তার বাবা নিশীথ চৌধুরী একতলায় যেমন গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন, ঠিক সেই ধাঁচে। বিদেশ থেকে শিখে আসা অধীত বিষয়ের সঙ্গে নিজের জ্ঞান মেধা মিশেল দিয়ে সেই ছোট্ট ঘরটিতে সায়ন গবেষণা করে চলল অবিরাম। তারপর একের পর এক নতুন ফর্মুলা বার করেছে গায়ে মাখা সাবান তৈরির অভিনব সব রহস্য! তার তৈরি প্রতিটি প্রোডাক্টই তখন স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের প্রতিটি বর্ণময় সৃষ্টিই তখন আলোড়ন তুলছে গেরস্থ-ঘরে।

সায়ন চৌধুরীর জীবনে তখন একটাই মূলমন্ত্র, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক হার্ড। বড় হওয়ার পথে কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। সে ততদিনে নতুন করে সাজাচ্ছে তার অফিস। ভাল-ভাল অফিসার রিক্রুট করছে তার এসপ্লানেড ইস্টের নতুন অফিসে। পূর্ব কলকাতার

উপকণ্ঠে অনেকখানি জায়গা নিয়ে তৈরি করেছে ফ্যাক্টরি। প্রতিটি কর্মীকে উৎসাহ দিচ্ছে কাজে। শেখাচ্ছে তার জীবনের মন্ত্র, ওয়ার্ক হার্ড। অনেককাল আগে রদ্যাঁর শিল্পকর্ম দেখতে গিয়ে সায়ন জেনে ফেলেছিল এই বিখ্যাত ভাস্করটির জীবনী। বিশালদেহী অসুরের মতো চেহারার মানুষটির জীবনেও এই একটিই বাণী কাজ করত তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। তাঁর কাছে সেক্রেটারির কাজ করতে এসেছিলেন তরুণ কবি রাইনার মারিয়া রিলকে, যিনি পরবর্তীকালে জার্মান কবিদের অন্যতম পুরোধা হিসেবে খ্যাত। রদ্যাঁ তাকে বলেছিলেন, পরিশ্রম করো, নিরন্তর পরিশ্রম করো। শুধু মেধা থাকলেই কেউ বড় হতে পারে না, মেধার সঙ্গে পরিশ্রম মিশিয়েই --

সায়নও জানত, পৃথিবীর সমস্ত কৃতী মানুষ জীবনে কঠোর পরিশ্রম করেই বড় হয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানীই হোন, লেখক, কবি বা শিল্পীই হোন, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা ব্যবসায়ী যিনিই হোন না কেন, কেউই জাদুবলে রাতারাতি বড় হননি। প্রত্যেক বড়মাপের মানুষের সাফল্যের ইতিহাস খুঁজলে প্রমাণিত হবে তাঁব জীবন কতখানি পরিশ্রম দিয়ে তৈবি।

আর আশ্চর্য, সায়নের মেধায়, পরিশ্রমে, উদ্যোগে কয়েক বছরের মধ্যেই তার কোম্পানি ছাড়িয়ে গিয়েছিল বাজারের অন্য সব কোম্পানিকে। অনেক দিনের পুরনো কোম্পানি 'লাইম ইন্ডিয়ার'ও নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে ততদিনে।

লাইম ইন্ডিয়ার ছোট্টখাট্ট গোলগাল চেহারার চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় তখন রাগে চুল ছিঁড়ছেন। হঠাৎ কোথেকে উড়ে এসে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস জুড়ে বসেছে কলকাতার মার্কেটে, ছড়িয়ে পড়ছে জেলায়-জেলায়। তাতে ভিন রাজ্যের নামী কোম্পানির প্রোডাক্টও যেমন মার খাচ্ছে, তেমনি সেল ফল করছে লাইম ইন্ডিয়ারও।

হেমজ্যোতি সিংহরায় তখন ঘন ঘন মিটিং করছেন অফিসে, অনবরত ধমকাচ্ছেন অফিসারদের। চেঁচাচ্ছেন, লাইম ইন্ডিয়ার অবস্থা এখন ভয়ঙ্কর খাদের মুখোমুখি, গত তিন বছরে কোম্পানির টার্নওভার প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। প্রতি বছরই দশ-পনের লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে, ব্যাঙ্কের ক্রেডিট-লিমিট ছাড়িয়ে আরও বারো কোটি টাকা ওভার-ড্রাফ্‌ট্‌ চলছে। এই মুহূর্তে মির‍্যাকল্‌ কিছু না করতে পারলে কোম্পানির ক্লোজার ঘোষণা করা ছাড়া কোনও উপায়ই থাকবে না। আর তার অর্থ, এই কয়েক হাজার কর্মচারীর বেকারত্ব।

সায়নও তার কোম্পানির কর্মচারীদের মিটিং করে বলছে, লাইম ইন্ডিয়া কিন্তু ঢেলে সাজাচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠান। আমাদের কোম্পানিতে সাফল্য এসেছে বলে একটুও রিল্যাক্স করার সময় নেই। আমাদের কাজে সামান্য গাফিলতি হলেই কিন্তু লাইম ইন্ডিয়া আবাব জাঁকিয়ে বসবে বাজারে, এখনও পর্যন্ত আমরা তৈরি করেছি শুধু স্নান করার সাবান। এরপব তৈরি করতে চলেছি নতুন এক ধরনের মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার।

পাশাপাশি দুটো কোম্পানি থাকলে তাদের মধ্যে এহেন প্রতিযোগিতা লেগেই থাকবে। সায়নের ধারণা, তাতে কর্মীদের ভেতর প্রেরণা জোগাতে সুবিধে হয়। তাব কোম্পানি যখন মার্কেট ধরে ফেলেছে, তখন একমাত্র উপায় হল, এই বাজারটা ধরে রাখা, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা। মধ্যবিত্ত-মানসিকতাও ততদিনে ভালই পড়ে ফেলেছে সায়ন। মধ্যবিত্ত মানুষ যা চায় তা হল কম দাম ভাল প্রোডাক্ট, তবেই বেশি বিক্রি। বেশি বিক্রি মানে বেশি লাভ। বেশি লাভ মানে কোম্পানির বাড়বাড়ন্ত।

'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টের' এমন ভরা সাফল্যের দিনেই সায়নের জীবনে এসেছিল ঐন্দ্রিলার মতো একটি চমৎকার মিষ্টি মেয়ে, প্রায় অলৌকিকের মতো। সে সব প্রায় স্বপ্নের মতো দিন। বিয়ের পর একটা ঘোরের ভেতর দিন কাটত তাদের। কখনও দু'জনে রাতের দিকে চলে যেত চৌরঙ্গি পাড়ায়, সিনেমা দেখতে। সায়নের আবার পছন্দ কোনও বিদেশি ক্লাসিক ছবি। হলের সব চেয়ে দামি দুটো টিকিট কিনে নিয়ে একান্তে বসত দু'জনে। ঐন্দ্রিলার উষ্ণ সান্নিধ্যের সঙ্গে ক্লাসিক ছবি দেখার চার্মই আলাদা।

আবার কখনও তারা গাড়ি নিয়ে চলে যেত ছোটখাটো আউটিঙে। ব্যান্ডেল চার্চ কিংবা ডায়মন্ডহারবার। কখনও কোলাঘাটের নওপালা কিংবা বনগাঁর পারমাদন ডাকবাংলোয় একরাত। কখনও আরও অখ্যাত সব জায়গায়। নতুন স্পট খুঁজে বেড়ানোতেই ছিল তার আনন্দ। কাকদ্বীপে যাওয়ার পথে নিশ্চিন্তপুর থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে গঙ্গার চর, কিংবা ক্যানিং হয়ে ডাব্বু ডাকবাংলো — এমন অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় চলে যাওয়াই ছিল তার এক ভারী প্রিয় বিলাসিতা।

ঐন্দ্রিলা যতটা পারত, তার কথায়, সেবায়, সাহচর্যে ভরিয়ে তুলতে চাইত সায়নের অবসর সময়টুকু।

ঐন্দ্রিলাও খুব খুশি হয়েছিল সায়নের মতো যুবককে স্বামী হিসেবে পেয়ে। কখনও তার মনে হত, সায়ন এক বড় মাপের মানুষ, তার নাগাল পাওয়াই ভার। সে পাগলের মতো কাজ করতে ভালবাসে। নানারকম বিদেশি বই পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তা থেকে হঠাৎ-হঠাৎ নতুন সব প্ল্যান পেয়ে যায়। তা হঠাৎ নিবিষ্ট মনে বোঝাতে বসে ঐন্দ্রিলাকে। ঐন্দ্রিলা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে কিছুক্ষণ পর নিজেই হেসে বলে, দূর তোমাকে আমি কী বোঝাতে বসেছি। কাল অফিসে গিয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজারকে বোঝাতে হবে এগুলো। এই নতুন ফর্মুলাটা বাজারে ছাড়লে যা হই-রই শুরু হয়ে যাবে না —

স্কাই ইজ দ্য লিমিট — মনে মনে স্বপ্নের ঘোরে আওড়াত সে। আকাশ লক্ষ করেই দৌড়চ্ছিল সে। তারপর যখন সাফল্যের চূড়া তার প্রায় হাতের মুঠোয় তখনই ঘটে গেল এই বিরাট অঘটন। হয়তো সেদিন ট্যুরে বিলাসপুরে যাওয়াটাই কাল হয়ে গেল তার জীবনে।

বিলাসপুরে যাওয়ার আগের দিন হঠাৎ ঐন্দ্রিলা বলেছিল, খুব যেতে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে —

সায়ন অবাক হয়ে বলেছিল, বিলাসপুরে! আউটিঙের পক্ষে মোটেই তেমন সুখপ্রদ নয়। তা ছাড়া এ যাত্রা আমার একেবারে হারিকেন-ট্যুর। তিন তারিখ সকালে পৌঁছব, চার তারিখ কাজ সেরে বিকেলের ট্রেনেই রওনা দেব। মাঝের কয়েকঘণ্টা ঝড়ের মতো ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে শুধু মিটিং আর মিটিং। বরং তার চেয়ে পরের মাসে নেপাল যাওয়ার কথা আছে। তখন হাতে একটু সময় নিয়ে যাব। ওখানে আমার সঙ্গে যেয়ো। নেপাল ইজ বিউটিফুল।

ঐন্দ্রিলা হেসে বলেছিল, ঠিক তো?

— পজিটিভলি. সায়ন ঐন্দ্রিলাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরেছিল, বিলাসপুরে গিয়ে শুধু-শুধু বোর হওয়ার কোনও মানে হয় না।

বিলাসপুরে ভাগ্যিস নিয়ে যায়নি ঐন্দ্রিলাকে। পৌঁছে দেখেছিল, সেখানে হই-হই কাণ্ড। রেলওয়ে মিনিস্টার পরদিন বিলাসপুরে মিটিং করতে আসবেন বলে কোনও হোটেল, গেস্টহাউস ফাঁকা ছিল না। নিরাপত্তাকর্মী থেকে শুরু করে একরাশ ভি.আই.পি-তে ভরে গিয়েছে শহর। সবার জন্যে থাকার ব্যবস্থা করতে আগেভাগে সমস্ত জায়গা বুক করে ফেলেছিল প্রশাসন। সায়নকে উঠতে হয়েছিল একটি তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে। বেশি রাতের দিকে জল পাওয়া যায় না এমন অব্যবস্থা হোটেলটায়।

তখন মনে হয়েছিল, ভাগ্যিস নিয়ে যায়নি ঐন্দ্রিলাকে। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো নিয়ে গেলেই ভাল হত। তাতে সাময়িকভাবে ঐন্দ্রিলাব কিছু অসুবিধে হত ঠিকই, কিন্তু তার জীবনটা শেষ হয়ে যেত না এভাবে।

আর সায়নের জীবনেও নেমে আসত না এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এখন চোখ তুললেই দেখতে পাচ্ছে চারপাশে বিদ্রূপের শানিত ছুরি, অভিযোগের উদ্যত আঙুল।

আজ ইনস্পেক্টরের ঘর থেকে বেরোতেই সেই তর্জনী আরও তীক্ষ্ণ হল। বাইরে অপেক্ষা করে আছে আরও কয়েকজন লোক, বোধহয় সাংবাদিক হবে। সায়ন বেরোতেই তারা প্রায় হামলে পড়ল তার উপব। তবু যা-হোক কোনও ফোটোগ্রাফার নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়। তার এই কালচে-ধরা খোঁচা-খোঁচা দাড়িসুদ্ধ বুড়োটে মুখ সভ্য জগতের মানুষ আর দেখুক সে চায় না। সাংবাদিকদের কোনওক্রমে এড়িয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু কে বাইরে অপেক্ষা করে আছে তার জন্য? একজন যুবতী!

নিশ্চয় এ নিয়ে কালকের সংবাদপত্রে আবাবও অনেক খবর লেখা হবে রসালো করে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ মিশিয়ে।

কিন্তু কোনও যুবতী কেনই বা আসবে তার জন্য! খুনি বলে অভিহিত হওয়া একজন মানুষের কাছে!

বাইরে বেরিয়ে যাকে দেখল, তাকে দেখার জন্য কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না সায়ন। যে হাহাকার, শূন্যতা গত চারদিন ধরে তারভেতর তীব্র হয়ে সূচ ফোটাচ্ছিল তা তীব্রতর হয়ে ঘিরে ধরল তার শরীর। অসহায় কণ্ঠে বলল, গার্গী, তুমি!.

বাইরে অপেক্ষারত গার্গীর চোখে তখন এক তীক্ষ্ণ, ক্রুদ্ধ চাউনি। তার খরদৃষ্টি দিয়ে সে যেন সেই মুহূর্তে ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলবে সায়নকে।

সে দৃষ্টির সামনে পড়ে সায়ন কেঁপে উঠল। এক বিদুষী, বুদ্ধিমতী, শানিত চেহারার যুবতীর বিদ্রূপ মেশানো ঘৃণা ও আক্রোশের মুখোমুখি হলে আত্মগ্লানি কী তীব্র হয়ে দেখা দেয় তা এই মুহূর্তে সায়ন ছাড়া আর কেউ জানল না।

গার্গী, তুমি! এই শব্দ দুটো ছাড়া আর কিছুই বেরোল না সায়নের মুখ থেকে।

তার উত্তরে গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল, সে হাসি প্রায় কান্নারই মতো। বলল, কখনও কোনও খুনিকে নিজেব চোখে দেখিনি কিনা, তাই দেখতে এলাম, খুব পরিচিত আর প্রিয় এককজনকে, যে কিনা মার্ডারার। নিজের বউকে খুন করেছে —

সায়ন স্তম্ভিত, ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকে গার্গীর দিকে।

গার্গী তখনও তার হুল ফুটিয়ে চলেছে, সত্যি, এমন ভান করছেন যেন আপনি কিছুই জানেন না। যেন আপনাকে শুধু শুধু ধরে এনেছে পুলিশ।

সায়নের কান দুটো তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে। একটু সময় নিল নিজেকে সামলাতে, তারপর বলতে পারল, গার্গী, তুমিও! তুমিও তাই বললে?

—শুধু আমি কেন, গার্গী মুখ বাঁকিয়ে হাসল। সে হাসির ঝাঁঝ সায়নের গোটা ভেতরটা পুড়িয়ে দিয়ে গেল, শুধু আমি কেন, গোটা দেশের মানুষ তাই বলছে। আপনি বোধহয় এই ক'দিনের খবরের কাগজ পড়েননি। পড়লেই বুঝতে পারতেন —

তারপর আবার শব্দ করে হাসল গার্গী, বোধহয় পাগলের মতোই, বলল, এমন অনেক কথাও লিখেছে যা আমিও আপনার সম্পর্কে জানতাম না। ছি ছি —

—শুধু খবরের কাগজ পড়েই এমন ধারণা করলে? সায়ন দু' হাতে মুখ ঢাকে।

—না ভাবার মতো কিছু নেই। সব ইন-টো-টো মিলে যাচ্ছে। দুই আর দুই চারের মতো, ব্যাপারটা আমি আর ভাবতেই পারছি না। এতদিন মিশছি আপনার সঙ্গে, কখনও বুঝতে পারিনি আপনি এরকম! এত নিষ্ঠুর? এমন ভয়ঙ্কর!

গার্গীকে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখেনি সায়ন। বিদুষী গার্গী বরাবরই ভারি ঠাণ্ডা স্বভাবের, যে কোনও বিষয়ের গভীরে ঢুকে যেতে পারে দ্রুত, যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তার শানিত বুদ্ধি দিয়ে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার গার্গী মুখার্জি তার ঝকঝকে, শানিত চাউনি দিয়েই বুঝিয়ে দিত, সে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র।

আজ সেই গার্গীর দু'চোখে ক্ষোভের আগুন। আর সে আগুন, সায়ন মনে মনে ভাবল, তেমন অপ্রত্যাশিতও নয়। ঐন্দ্রিলাকে হারিয়ে সায়নের বুকের ভেতর যে হাহাকার, গার্গীর মনেও তেমনই শূন্যতা। ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ ঐন্দ্রিলা নাম্নী সুন্দর নিষ্পাপ তরুণীটিকে সায়নের জীবনে এনে দিয়েছিল এই গার্গীই। জুবিলি পার্কের গার্গী মুখার্জি।

সায়নকে দোষী সাব্যস্ত করে গার্গী যখন কথার চাবুকে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে, তার মুখের দিকে অসহায়, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সায়ন। যতবার সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইল, গার্গীর বিদ্রূপ, হিংস্র চাউনি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ছড়ানো ছিটোনো বোল্ডারে আছাড় মারতে মারতে। তার কোনও কথাই গার্গীর কাছে আজ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অথচ কী আশ্চর্য, গার্গীর সঙ্গে সায়নের এতকালের সম্পর্ক! ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক হয়েই কবে যেন একদিন সে এসেছিল তার জীবনে। তারপর প্রধানত তারই উদ্যোগে দিনে-দিনে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে দু'জনের মধ্যে, ঐন্দ্রিলা আসার পর আরও। ঐন্দ্রিলাকে এ ক'বছরে যতটুকু চিনেছে সায়ন, গার্গীকেও জেনেছে ক্রমশ।

কিন্তু এতদিনের সেই গার্গী আর আজকের গার্গী এক নয়। শিক্ষিত বুদ্ধিমতী মেয়েটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে আজ এক অন্য ভূমিকায়।

তার প্রবল ক্রোধের সামনে সহসা বিমূঢ় হয়ে গেল সায়ন। সমস্ত পৃথিবী যখন সায়নের বিরুদ্ধে, তখন একমাত্র গার্গীই তাকে বুঝতে পারবে, মনে মনে এমন আশা করেছিল। এহেন বহু জটিল পরিস্থিতি এর আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সহজ সরল করে তুলেছে গার্গী। তার তাৎক্ষণিক বুদ্ধি দেখে সায়ন নিজেই কতবার অবাক হয়েছে। গার্গীকে কনগ্রাট্‌স্ জানিয়ে বলেছে, হ্যাট্‌স অফ্ মিস্ ইনটেলিজেন্ট। তোমার অঙ্ক পড়া বুদ্ধিটা কতভাবেই

না কাজে লাগাচ্ছ। গার্গী অবশ্য জানে না, অঙ্ক পড়েই তার বুদ্ধি এমন শানিত হয়েছে কি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালে বিশুদ্ধ গণিতের ছাত্রী ছিল গার্গী। কিন্তু সেসময় নিজের পঠিত বিষয়ে নয়, সম্পূর্ণ অন্য এক এক্সট্রা-কারিকুলার মেধায় সে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। হঠাৎই অ্যাডভেঞ্চারিস্টের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেট-কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিল সেবার। ডিবেটের বিষয়বস্তু ছিল, ভারতীয় গণতন্ত্রই বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র। বিষয়টির পক্ষে এমন চমৎকার সব যুক্তিজাল বিস্তার করেছিল যে, বিচারকেরা একবাক্যে তাকেই প্রথম হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। গার্গী মুখার্জি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। তার কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে তার ক্লাসের বন্ধুবান্ধবীরা একদিন বিশুদ্ধ গণিতের ক্লাসে বেশ ঘটা করে সম্বর্ধনা দিয়েছিল তাকে। কিছু স্তুতি, সবাইকার উচ্ছ্বসিত চাউনি আর ফুলের তোড়ার ভেতর সে অভিভূত হয়ে ছিল সারাটা দিন। ডিবেটের মঞ্চে যা যা বলেছিল, আবার শোনাতে হল ক্লাসের সবাইকে।

গার্গীর চমৎকার বক্তৃতা শুনে ইউনিয়নের ছেলেরা তাকে ধরেছিল, তাদের দলের হয়ে ইউনিয়নের নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু রাজনীতি তার অভীষ্ট বিষয় নয়, তাই বেশ কায়দা করে এড়িয়ে গিয়েছিল নাছোড়বান্দাদের।

বরং তার প্রিয় বিষয় ছিল দেশ, কাল ও সময়। সে পড়তে ভালবাসে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান। বিশুদ্ধ গণিতের ক্লাসে আইনস্টাইনের টাইম অ্যান্ড স্পেস থিয়োরি নিয়ে আলোচনার সময় বান্ধবীদের বলত, দ্যাখ, কত বছর আগে জন্মে ভদ্রলোক আমাদের পৃথিবীকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে দিয়ে গেছেন। যদি তখন না জন্মে এই বিংশ শতাব্দীর শেষে জন্মাতেন, তাহলে হয়তো আরও কয়েকশো বছর এগিয়ে দিতে পারতেন আমাদের। এখন রিসার্চ করার কত বেশি সুযোগ, কত বেশি উপকরণ।

ভর্তি হওয়ার পর প্রথম প্রথম গার্গী ভাবত সে গণিতের অধ্যাপিকা বা শিক্ষিকা হবে। পরে হঠাৎ বদলে ফেলল তার মত। পরীক্ষান্তে যখন তার বন্ধুবান্ধবীরা কলেজে শিক্ষকতার চাকরি খুঁজছে, একটি ভেকেন্সির খবর কাগজে প্রকাশিত হলে সবাই মিলে একসঙ্গে দরখাস্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন গার্গী একেবারেই সেদিকে গেল না। সে তখন কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়, অলিতে-গলিতে, বস্তিতে, বড় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিচিত্র সব পরিবেশ, ঘটনা, চরিত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা কিছু তার চোখে অদ্ভুত ঠেকছে, কিংবা অভাবনীয়, অথবা অভিনব কিছু, অমনি তাই নিয়ে স্টোরি তৈরি করছে। তারপর হানা দিচ্ছে কোনও সংবাদপত্রের অফিসে।

খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে পরিচিত হয়ে উঠল একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে।

বাড়িতে তার দাদা-বউদি কেউই চায়নি গার্গী এরকম টো-টো করে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করুক। দাদা সুশোভন মুখার্জি বলেছিলেন, কোনও কলেজের অধ্যাপিকা হওয়া অনেক বেশি সম্মানের।

আর বউদি অনমিত্রা মুখ বাঁকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসেছিলেন. ও মা, শেষ পর্যন্ত রিপোর্টার। মেয়েদের এরকম মদ্দগিরি করা কি চলে?

—কেন নয়? গার্গী প্রতিবাদ করেছিল, সাংবাদিকতার মধ্যে যা রোমান্স আছে, ভাবতে

পারবে না, বউদি। প্রতিটি ঘটনাই নতুন আর অভিনব মনে হবে। সেসব সূত্র থেকে স্টোরি তৈরি করতে যা থ্রিল না! তার পাশে কলেজে পড়ানোটা আমার কাছে একঘেয়েমি মনে হয়। একই অঙ্ক বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে হবে। দু-তিন বছর পর সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি —

সংবাদের পেছনে দৌড়তে গিয়েই সে একবার আবিষ্কার করেছিল লেকটাউন এলাকায় এক অনাথ আশ্রম। এক ভদ্রলোক স্রেফ নিজের টাকায় জনা পনেরো অনাথ বালককে মানুষ করছেন। ইচ্ছে করেই কোনও সরকারি সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাননি। সরকারি অফিসে গেলেই সেখানকার কেরানিবাবুরা মনে করবে, লোকটা নির্ঘাত চোর। তাই একক প্রচেষ্টাতেই --- । ছেলেগুলোকে মানুষ করতে গিয়ে নিজে আর বিয়েই করে উঠতে পারেননি।

এইভাবেই খুঁজতে খুঁজতে সে একবার দেখা পেয়েছিল কেষ্টপুর এলাকায় এক বস্তির কিশোরকে, যে সকাল-বিকেল রিকশ চালিয়ে জোগাড় করে তার স্কুলের বেতন। তার পরিবারের ভরণপোষণও। সেই স্টোরিটিও দারুণ প্রশংসা পেয়েছিল।

ঠিক একইভাবে তার সঙ্গে একদিন আলাপ হয়ে গিয়েছিল ভি আই পি রোডের কাছাকাছি একটি ঝকঝকে ফ্যাক্টরির মালিক সায়ন চৌধুরীর। ফ্যাক্টরিটা ঘুরে ঘুরে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, স্ট্রেঞ্জ! একটি বাঙালি প্রতিষ্ঠানের এহেন অভাবনীয় বোলবোলাও! যেখানে শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় নয় ভাগ বাঙালি সন্তান ব্যবসায়ের নাম শুনলে আঁতকে ওঠে, সেখানে এরকম একটি লাভজনক সংস্থা করে ফেলাটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সংবাদপত্রে এ ধরনের খবরেরই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

সায়ন হেসে বলেছিল, মানুষ কিন্তু মৃত্যুর খবরে বেশি ইন্টারেস্টেড, জীবনের খবরে নয়। সংবাদপত্র মানুষের টেস্ট বুঝেই কোথায় প্লেন-ক্র্যাশ হল, কোথায় গোলমাল বা ফায়ারিং হল, কোথায় কটা খুন হল সেগুলিকেই লিড নিউজ করে।

তবে সায়নের ফ্যাক্টরির স্টোরিটা সংবাদপত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বেশ ভাল পজিশনেই ছাপাতে পেরেছিল গার্গী। বেশ প্রশংসাও জুটেছিল পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি থেকে। হয়তো এই কারণেই সায়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কখনও কাজের ফাঁকে ফুরসত পেলে চলে গেছে এসপ্লানেড ইস্টের একটা ছোট্ট গলিতে, নতুন ছ'তলা বাড়ির থার্ড ফ্লোরে সায়নের অফিসে। সায়নের পরিকল্পনা, তার উচ্চকাঙক্ষা, তার কর্মপদ্ধতি দেখে আশ্চর্য হয়েছে, বারবার মুগ্ধ হয়ে বলেছে, ফ্যান্টাস্টিক। কতরকম নতুন ডিজাইনের গন্ধওলা সাবান তৈরি হচ্ছে তার ফ্যাক্টরিতে, সবই সায়নের আবিষ্কৃত নিজস্ব ফর্মুলায়। সে সাবান চমৎকার প্যাকিঙে পৌঁছে যাচ্ছে কলকাতায়, জেলাগুলিতে, এমনকি ভিনরাজ্যের দোকানে দোকানে, সেখান থেকে গৃহস্থের বাড়িতে।

একদিন সায়নের চেম্বারে বসে কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ জেনে গেল সায়ন এখনও ব্যাচেলর। শুনে চমৎকৃত হয়ে বলেছে, তাই নাকি! তাহলে আপনার জন্যে একটা পাত্রী দেখতে হয়।

সায়ন হো হো করে হেসে বলেছে, তাই নাকি? তা পাত্রীটি কে? আপনিই নাকি?

গার্গী বিব্রত হয়ে বলেছে, আজ্ঞে, না, আমার আপাতত বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, সময়ও

নেই। তবে আরও ভাল পাত্রী। আমার চেয়ে ঢের ঢের ভাল।

সায়ন বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়েছে, সত্যিই অবাক করে দিলেন। তা কে সেই পাত্রী?

—ঐন্দ্রিলা। সম্পর্কে আমার মাসতুতো দিদি হলেও আমরা দু'জনে বন্ধুও বলতে পারেন। আমার মেসো — ব্যারিস্টার সমর ভট্টাচার্য তাঁর একমাত্র কন্যার জন্য ফ্র্যান্টিক্যালি পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। একজন সৎ চরিত্রবান সুপুরুষ যুবক।

—মাই গড। এত কোয়ালিফিকেশন তো আমার নেই। আপনাকে অন্য পাত্র দেখতে হবে।

—উঁহু, আমি কিন্তু ইয়ার্কি করছি না। দেখবেন, সে একদম রাজকন্যা। রুঙ্কা, মানে ঐন্দ্রিলা যদিও আমার থেকে সাত মাসেব বড়, তবু একই ইয়ারে পাস করেছি আমরা। কিন্তু পিওর ম্যাথ্স্ পড়ে আমার মতো সে ড্রাই হয়ে যায়নি, ফিলজফিতে এম এ করেছে। বেশ দার্শনিক দার্শনিক চোখ। আর ভীষণ রোমান্টিকও।

তারপর গার্গীই একদিন ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সায়নের। আলাপ-পর্বের শুরু ভবানীপুরের এক রেস্তোরাঁয়। ছোট্ট রেস্তোরাঁটির পর্দা-ঘেরা কেবিনের ভেতর বসে মোগলাই পরোটা আর চিকেনের অর্ডার দিয়েছিল গার্গী। তারপর সায়নের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, দেখুন তো, পছন্দ হয় কি না।

ঐন্দ্রিলা এ সব ষড়যন্ত্রের কিছুই জানত না।

হঠাৎই রেস্তোরাঁয় এসে একজন অপরিচিত যুবককে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার উপর গার্গীর 'দেখুন তো, পছন্দ হয় কি না' শুনে হতচকিত, লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলেছিল, যাঃ, মিতুন, এ সব কী!

আর সায়ন মনে মনে ঘাড় নেড়েছিল, হুঁ, রাজকন্যাই বটে। ঐন্দ্রিলা খুবই সুন্দরী। সুন্দরী নারী বলতে একজন পুরুষ ঠিক যেরকম কল্পনা করে নিতে পারে, ঐন্দ্রিলা ঠিক সেরকম। বার বার চোরাচোখে তাকিয়ে দেখছিলও — ঐন্দ্রিলার যেন তুলি দিয়ে আঁকা মুখখানা।

গার্গী পরে ফিসফিস করে বলেছিল, কী মশাই, মাথা ঘুরে গেল নাকি!

—তা একটু ঘুরেছে বইকি। তবে কোনও মেয়ে যে তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অন্য এক সুন্দরী মেয়ের আলাপ করিয়ে দেয়, তা এই প্রথম জানলাম। এটাই আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগছে।

— কিন্তু এখন আর শুধু বন্ধু নয়। জামাইবাবু হয়ে যাবেন খুব শিগগির।

তবু প্রায় একছর সময় নিয়েছিল সায়ন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। এই একবছরে সে ও ঐন্দ্রিলা পরস্পরকে আবিষ্কার করেছিল, চেনাজানার পরিধিকে একটু বাড়িয়ে নিয়েছিল। যতটুকু পর্যন্ত মিশলে শালীনতা বজায় থাকে, সে পর্যন্তই ঐন্দ্রিলা মিশেছিল সায়নের সঙ্গে। তার ভালবাসা ছিল বিশাল একটা সায়রের মতো, তার টলটলে জলে ডুবে মরতেও সাধ যায়।

বিয়ের পর সায়ন বুঝেছিল, সেই সায়র সত্যিই কত গভীর। তখন দিনগুলো ছিল যেন পাখা মেলে উড়ে যাওয়ার মতো।

তখন তাদের দু'জনের মধ্যে কখনও গার্গীও এসে জুটত, বলত, দিদি রাগ করিস নে, তোর কর্তার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

আসলে সায়ন সত্যিই এক সজীব প্রাণবন্ত টগবগে যুবক। তার মেধার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে যেত গার্গী। বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে বাস করেও তার ভাবনায়, শিক্ষায়, মেধায় তাকে প্রায় একবিংশ শতাব্দীর মানুষ বলে মনে হতো। তার মনে হাজারো স্বপ্ন, হাজারো পরিকল্পনা। কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বলত, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস দাঁড়িয়ে গেলে আরও ডাইভারসিফিকেশনের কথা ভাবতে হবে। নতুন নতুন প্রোজেক্টের কাজ হাতে নিতে হবে। একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে বিজনেস ফ্লারিশ করবে না।

গার্গী তাদের সঙ্গে শুধু আড্ডাই দিত না, তাদের সঙ্গী হয়ে চলে যেত আউটিঙে, চমৎকার ছবির মতো কত জায়গায়।

দু'দুটো বছর এমন আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা।

সেই গার্গীই যখন হঠাৎ টেলিফোন পেল, ঐন্দ্রিলা আর নেই, সে মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, ইম্‌পসিব্‌ল্‌। এ হতেই পারে না।

কিন্তু তাইই। আর সায়নই —

শুধু একা সায়ন নয়, তার মা-ভাই সবাই মিলে —

গার্গী বিস্ময়ে স্তব্ধ, বেবাক হয়ে গিয়েছিল। তার চেয়ে মাত্র সাতমাসের বড় এই দিদিটি যে তার ভারি আদরের, ভারি প্রিয় ছিল। ঐন্দ্রিলা যে শুধু তার দিদিই ছিল না। একই সঙ্গে বান্ধবীও, ছিল তার অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রেরণাও। যখনই গার্গী কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছে, নতুন কোনও স্টোরির গন্ধ পেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, প্রায়ই তা নিয়ে আলোচনায় বসত ঐন্দ্রিলার সঙ্গে। মাঝেমধ্যে এমন চমৎকার সব পয়েন্টস্‌ বেরিয়ে আসত সেই আলোচনার ভেতর থেকে যে গার্গী, কোনও অসুবিধেই হত না লেখাটাকে সাদা পৃষ্ঠার উপর নামিয়ে ফেলতে।

সেই ঐন্দ্রিলা আর নেই তা ভাবতে পারছিল না গার্গী। নিজেকে ভীষণ অপরাধী লেগেছিল ঐন্দ্রিলার বাবা-মায়ের কথা ভেবে। রুস্কা যে তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান! ঘটনাটা শোনার পর তাঁরা সুস্থ আছেন কি না তা ভাবতে গিয়ে শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল তার। রুস্কার বাবা সমর ভট্টাচার্যের হৃদযন্ত্রে অনেকদিন আগেই গোলযোগ ধরা পড়েছে। তার মাও কিছুদিন হল বাতের ব্যথায় প্রায় শয্যাশায়ী। এহেন অবস্থায় দু'জন মানুষের একমাত্র হৃৎপিণ্ড, তাঁদের একমাত্র আদরের কন্যার এহেন দুঃসংবাদে কাউকেও আর ধরে রাখা যাবে কি না সন্দেহ।

খবর পাওয়ার পর থেকেই দু'দিন বাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি গার্গী। শোকে, দুঃখে, ক্রোধে, আক্রোশে একা একা ফুঁসেছে নিজের ঘরের ভেতর, শক্তি সঞ্চয় করেছে সায়নের মুখোমুখি হওয়ার। কিন্তু প্রতিদিনকার খবরের কাগজে এমন সব বিশ্রী ইঙ্গিত করা হয়েছে সায়নের প্রতি, যে তা পড়ার পর প্রতিনিয়ত ঘৃণায় কুঁচকে উঠেছে তার মুখ। এই সায়নকে তাহলে সে এতদিন চিনতে পারেনি। সায়নের চরিত্র এত জঘন্য, এমন নীচ !

যে ক'দিন সায়ন হাজতে ছিল, তার কাছে যাওয়ার মতো মানসিকতাই ছিল না গার্গীর। কিন্তু যখন শুনল, আদালত থেকে তার জামিন হয়েছে , তখন মনে হল, সে যাবে, শুধু সায়নের মুখোমুখি হয়ে সে জানতে চাইবে, কেন, কেন সায়ন এমন একটা জঘন্য, নৃশংস, পৈশাচিক কাজ করেছে —

তাই অনেক শক্তি সঞ্চয় করে গিয়েছিল সে। রাগে নীল হয়ে অপেক্ষা করেছে দীর্ঘক্ষণ, কিন্তু সায়ন যখন তার চারদিনের ক্লান্তি, একমুখ দাড়ি আর বিপর্যস্ত ফালাফালা মন নিয়ে থানার বাইরে বেরিয়ে এল, তার চেহারা দেখে বেশ একটু অবাকই হল। সমস্ত সংবাদপত্র, তাবৎ প্রশাসন, লক্ষ লক্ষ শহরবাসীর আলোচনা ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যে পুরুষটি তার এমন ঝড়-খাওয়া চেহারা দেখে যেন চেনাই যায় না তাকে। সায়নের সেই স্মার্ট, তুখোড় চেহারার ব্যক্তিত্ব কয়েকদিনের মধ্যে কেউ যেন একপোঁচ কালি মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়েছে। যেন মানুষ নয়, একটি মৃতপ্রায় কাঠামো। চোখের সেই দীপ্তি কোথায় মিলিয়ে গেছে। কোথায় হারিয়ে গেছে হাঁটাচলার ঋজু ভঙ্গি, গার্গীকে যেন চিনতেই পারল না প্রথমটা এমন উদাসীন, ঝাপসা তার দু'চোখ।

পুলিশের নজর, সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদ পেরিয়ে দুজনে ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে অনেকখানি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে গার্গী জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবেন, বাড়িতেই তো—

—বাড়িতে, হুঁ, বাড়িতেই তো যেতে হবে। এই চেহারা নিয়ে কোথাও আর যাওয়া যাবে না, সায়ন অস্ফুটকণ্ঠে বিড়বিড় করে, কিন্তু ও বাড়িতে কীভাবে যে যাব তা-ও ভেবে পাচ্ছি না।

গার্গী ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, তা হলে একটা ট্যাক্সি ডাকি।

— ট্যাক্সি! সায়ন থমকে দাঁড়ায়। বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভেতর একসঙ্গে অনেকগুলো ছবি হুড়মুড় করে ভেসে উঠল। এ ক'দিন তবু বাড়ি থেকে অনেক দূরে, এক নরকের মধ্যে বাস করেছে।

এখন মনে হচ্ছে তা বুঝি বাড়ি ফেরার চেয়েও ভাল ছিল। গত দু'বছর যে ভরভরন্ত বাড়িতে বসবাস করেছে, সেখানে এই মুহূর্তে কীভাবে ফিরবে ভাবতেই তার মাথায় এক অসম্ভব শূন্যতা। দুরন্ত একটা হাহাকারবোধ তাকে দাপিয়ে তাড়া করে এল। এখন বাড়ি ফিরলে আগের মতো একমুখ হাসি নিয়ে তাকে দরজা খুলে দেওয়ার কেউ নেই। পরিবর্তে শূন্য ঘরের ভেতর একটা হতাশা, একটা আতঙ্ক, একরাশ হা-হা শূন্যতা।

—কী ভাবছেন। শিগগির ডিসিশন নিন। নইলে রাস্তায় ভিড় জমে যাবে। আপনি এখন কলকাতার একজন ভি আই পি। হঠাৎ এক রাত্রির ঘটনায় আপনি রাতারাতি এমন ইমপট্যান্টি পার্সোনালিটি হয়ে উঠেছেন, যা আরও তিরিশ বছর প্যারাডাইস প্রোডাকটস্ চালিয়েও হতে পারতেন না, গার্গী কেমন হিসহিস করে বলে উঠল, পিছনে কিছু সাংবাদিক ফলো করে আসছে বলে মনে হচ্ছে। কালকের কাগজে আমাকে জড়িয়েও কিছু রসালো খবর নিশ্চয় ছাপাবে ওরা। তবু এই রিস্কটুকু নিয়েছি, শুধু আপনার কথা ভেবেই —

গার্গীর কণ্ঠস্বর হঠাৎই যেন রুদ্ধ হয়ে এল। সায়নের দিক থেকে একলহমা ফিরিয়ে নিল মুখটা, বোধহয় মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে, তারপর বলল, ট্যাক্সি ডাকি?

—ডাকো।

মিনিট সাতেকের চেষ্টায় একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা। তার আগে অন্তত দুটো ট্যাক্সি রিফিউজ করেছে ওদের। প্রথমটি এত স্বল্প দূরত্বে যেতে চায়নি, দ্বিতীয়টি তখন ঠিক উল্টোদিকের প্যাসেঞ্জার খুঁজছে।

গার্গীও ট্যাক্সিতে উঠে বসল। উঠেই বলল, আমি আপনাকে গেটে নামিয়ে দিয়েই চলে আসব। ও বাড়িতে যাওয়ার মতো মানসিকতা আর নেই আমার ; যাবও না কোনও দিন।

সায়ন বললও না, চলো গার্গী, অথচ আগে হলে নিশ্চিত ছাড়ত না ওকে। বলত, চলো, বুঙ্কা দারুণ খুশি হবে তোমাকে দেখলে। আজকের মেনুতে নতুন একটা আইটেম করার কথা। নতুন কোনও আইটেম করলে প্রথমেই বলে, মিতুনকে খবর দিতে পারলে বেশ হত। মিতুন গাজরের হালুয়া খেতে দারুণ ভালবাসে। কিংবা তেল-কই খুব পছন্দ করে মিতুন। ফোন করো না ওকে।

আজ বলল না। বলবেই বা কী করে। মিতুনকে আজ কার কাছে নিয়ে যাবে সায়ন। সেই মানুষটাই যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে —

— আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমার কিছু বলার নেই গার্গী। তবু অন্তত তোমাকে বলি, সংবাদপত্র যাই লিখুক, পুলিশের লোক যাই বলুক, তুমি অন্তত আমাকে দোষারোপ কোরো না। আমি সত্যিই খুনি নই।

ট্যাক্সি ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে শরৎ বোস রোডের ব্লু ওয়ান্ডার-এর সামনে। বাড়ির গেটের কাছে সায়ন নেমে দাঁড়াতেই গার্গী আর তার দিকে তাকাল না। ট্যাক্সিওলাকে বলল, চলুন — বিমূঢ় সায়নকে থমথমে বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে হুস্ করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। একবার ভাবলও না, ঐন্দ্রিলাবিহীন এই ফ্ল্যাটের ভেতর কী করে ঢুকবে সায়ন!

ল্যান্সডাউন রোডের উপর 'ব্লু ওয়ান্ডার' বাড়িটি এককালে প্রায় বিস্ময়ের মতোই ছিল, লোকে বলত, ছবির মতো। এখন আর তত ছবির মতো বলা যায় না, তবু গেটের উপর আর্চ-ডিজাইনের শেড, তার উপর মাধবিলতার ঝুপসি লতানে ডালে এখনও ফুলের রাশ কারণে-অকারণে উপচে পড়ে। গেট পেরিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পথে নুড়ি পাথরের কিছু অবশেষ রয়ে গেছে আজও। পথের দু'পাশে দু'সার পামগাছের ভগ্নাবশেষ টিমটিম করছে। বাড়ির সামনে এককালে চমৎকার লন ছিল, কিছু ফুলের কেয়ারিও। আপাতত সে লনে ঘাসের চাপড়া উঠে গিয়ে মাটির হাড়গোড় দৃশ্যমান। যত্ন নেই বলে ফুলও ফোটে না আর।

এহেন বাড়ির সামনে তন্বীর নীল আঁচল উড়িয়ে আসার মতো পাক খেয়ে এসে দাঁড়াল একটা নীল মারুতি। অন্যদিন মারুতির শব্দে মোহন এসে গেট খুলে দেয়। মারুতিটা শোঁ করে ঢুকে যায় ভেতরে। আজ গেটের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে বলে বাইরের রাস্তায় রয়ে গেল গাড়িটা। তার স্টিয়ারিং ছেড়ে নামলেন ধূসর রঙের চুল, ততোধিক ধূসর চোখের অধিকারী একজন সাহেবি চেহারার মানুষ। তাঁর মুখময় দাড়ি-গোঁফে অবশ্য সামান্য পিঙ্গল রঙ।

রবার্ট ও'নীল এ বাড়িতে মাঝেমধ্যেই এসে থাকেন। তাঁর মুখে সর্বক্ষণ ধরা থাকে একটি দীর্ঘকায় চুরুট। পরনে বিস্কুট রঙের শার্ট, ডিপ কালো প্যান্ট। চুল অবশ্য খানিকটা উসকোখুসকোই, তাতে একটা দার্শনিক-দার্শনিক ছাপ এসেছে তাঁর চেহারায়।

অন্যদিন কোনও দিকে না তাকিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উদাসীন হেঁটে যান বাড়ির সিঁড়ির দিকে। আজ তাতে সামান্য জড়তা। কারণ গেটের সামনে দাঁড়ানো চারজন পুলিশ তাঁকে কড়া চোখে তাকিয়ে জরিপ করছে। যাবার পথে এক মুহূর্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশ নজর করলেন রর্বাট ও'নীল। মাত্র চারদিনেই বাড়িটার খোলনলচে যেন আমূল বদলে গেছে। আগে একটা নিবিবিলি বিস্ময় ঘিরে থাকত দোতলা বাড়িটায়, এখন সেখানে থম হয়ে রয়েছে একটা আতঙ্ক।

মোহনকে আশেপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে রবার্ট সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতলায়, বাঁদিকে ফ্ল্যাটের দিকে একঝলক নজর ছুড়ে দিলেন। তারপর ডানদিকে ফ্ল্যাটের দরজার ডোরবেলে মৃদু আঙুল রাখতেই ভেতরে চমৎকার সুরের মূর্ছনা। ডোরবেলটি অবশ্য রবার্টেরই পছন্দ করে কেনা।

রর্বাট ও'নীলের সঙ্গে 'ব্লু ওয়ান্ডার' এর সম্পর্ক বহুদিনের। পরিচয়ের সূত্র অবশ্য এ বাড়ির মালিকান্ চন্দ্রা দেবীকে ঘিরেই। আজ থেকে তিরিশ-একত্রিশ বছর আগে চন্দ্রা ছিলেন এক সদ্যবিবাহিতা তরুণী। তাঁর বাবা বিলেত-ফেরত ডাক্তার ছিলেন বলে মেয়েকেও তৈরি করেছিলেন মেমসাহেবদের মতো। বিয়ের আগেই তাঁর রূপ, সৌন্দর্য আর গুণপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার অভিজাত সমাজে। অনেক খুঁজেপেতে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার আর এক তরুণ প্রতিভাবান ডাক্তার নিশীথ চৌধুরীর সঙ্গে।

সবাই ভেবেছিল নিশীথ আর চন্দ্রা নিশ্চয় মেড ফর ইচ আদার হয়ে উঠবেন অচিরেই।

কিন্তু নিশীথ চৌধুরী ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর ডাক্তারি নিয়ে, আর চন্দ্রা তাঁর স্বামীর ব্যস্ততা দেখে নিজে জড়িয়ে পড়লেন তাঁর প্রিয় বিলাসব্যসন শিল্প-সঙ্গীত-সংস্কৃতি নিয়ে। রবার্ট ও'নীলের সঙ্গে সেই তখন থেকেই তাঁর আলাপ। অস্ট্রেলীয় এই যুবকটি তখন সদ্য কলকাতায় এসেছেন। দেশে থাকতেই তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পপ মিউজিসিয়ান হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। জনপ্রিয়তাও ছিল প্রবল। পপ গান গাইতে গাইতে তাঁর হঠাৎই কানে এসেছিল ভারতবর্ষের মার্গসঙ্গীতের কথা। তখনই একদিন বাউণ্ডুলের মতো দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশে।

সেই থেকে কলকাতাই তাঁর বাসস্থান। তাঁর শিরায়-শিরায় তখন সঙ্গীতের মূর্ছনা। এ দেশে যেমন ধ্রুপদী সঙ্গীত নিয়ে মেতে উঠলেন, তেমনই আলাপিত হলেন কলকাতার বহু সংস্কৃতিমনা যুবক-যুবতীর সঙ্গে। সেই সব যুবতীদের মধ্যে একজন ছিলেন পপ সঙের এক দারুণ ভক্ত চন্দ্রা। বিট্‌ল্‌সদের নিয়ে তখন মাতামাতি চলছে সারা বিশ্বে। জন লেনন তখন তাঁর প্রথম বই 'ইন হিজ ওন রাইট'-এ তিরিশটি ছন্নছাড়া গদ্য-পদ্য সংকলিত করে হই চই বাধিয়ে ফেলেছেন। সে বই নিয়ে আলোচনা চলছে কলকাতায়। সেই পাগলা হাওয়ার দিনে আর এক পপ্ সিঙ্গার রবার্টের গান শুনে হঠাৎ মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন তরুণী চন্দ্রা। তখন থেকেই তিনি রবার্টের এক অন্ধ ফ্যান। বোধহয় আজও সেরকমই। ঠিক তার আগেই

নিশীথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে না হলে হয়তো এই অস্ট্রেলীয় যুবককেই — । কিন্তু সেই থেকে রবার্ট ও'নীলের সঙ্গে তাঁর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েই গেছে। চন্দ্রা দেবীর দু-তিনজন পুরুষবন্ধুদের মধ্যে রবার্ট ও'নীল অবশ্যই ঘনিষ্ঠতম।

কিন্তু রবার্ট ও'নীলের ঘনিষ্ঠতমদের সংখ্যা বহু। চন্দ্রা ছাড়াও আরও অনেক —

বস্তুত এ শহরে বন্ধুর চেয়ে রবার্ট ও'নীলের বান্ধবীর সংখ্যাই বেশি। তাঁর ঠিক কতজন বান্ধবী তা হয়তো তাঁর নিজের পক্ষেই বলা শক্ত। ষোলো থেকে ছেষট্টি সব বয়সের বান্ধবীই তাঁর বর্তমান। এক আশ্চর্য পারঙ্গমতায় এই বিভিন্ন বয়সী বান্ধবীদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারেন। ষোলো বছরের ডোরার সঙ্গে রর্বাট যখন কথা বলেন তখন তাঁর মানসিক বয়স গিয়ে পৌঁছয় একুশে। যখন তেইশ বছরের অরুন্ধতীকে পপ-মিউজিকের তালিম দিতে থাকেন, তখন তাঁকে মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক যুবকই যেন বা। যখন তেত্রিশ বছরের মিসেস বাসুর সঙ্গে মার্গ সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা হয় তখন তাঁকে দেখায় অনতিচল্লিশ এক অভিজ্ঞ পুরুষের মতো। আবার পঞ্চাশ বছরের চন্দ্রা দেবীর সঙ্গেও তাঁর আশ্চর্য বন্ধুত্ব। বাষট্টি বছরের ও'নীল তখন বাষট্টি বছরেরই।

ডোরাকে হয়তো বলেন, বুঝলে ডোরা, মাইকেল জ্যাকসনের 'ব্যাড' যে কী দারুণ কম্পোজিশন, ভাবা যায় না। আয়্যাম সিম্পলি ম্যাড ফর জ্যাকসন। কী চমৎকার কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল বলো—

তার পর দিনই অরুন্ধতীকে হয়তো বলতে থাকেন, দেখেছ অরুন্ধতী, ম্যাডোনা এক 'পাপা ডোন্ট প্রিচ' গেয়ে কী ভীষণ হই হই ফেলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তুমিও পারবে। এই গানটা ধরো, 'আয়্যাম অ্যাভেইলেব্‌ল টু-নাইট — ' মনে করো, বিশাল এক শান্ত সরোবরে টুপটাপ শব্দে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা, সেই শব্দ সঞ্চারিত করতে হবে তোমার মনের গহনে, হ্যাঁ, আরও একটু চটুল করতে হবে তোমার গলার স্বর, হ্যাঁ, ঠিক এরকম, হচ্ছে, বাহ্‌, চমৎকার, এই জন্যেই তোমাকে আমার এত্ত ভাল লাগে —

অথবা মিসেস বাসুকে বলেন, খুব ইচ্ছে ছিল বড়ে গোলাম আলিকে আমার গান একবার শোনাই। কীরকম রপ্ত করতে পেরেছি এ দেশের সুর। আসল গুণী মানুষকে নিজের কম্পোজিশন শোনানো এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তবে একবার শুনিয়েছিলাম ভীমসেন যোশীকে। দ্যাট ওয়াজ অ্যা মেমোরেবল ডে অব মাই লাইফ।

চন্দ্রা দেবীর সঙ্গে আবার অন্যরকম বন্ধুত্ব। হয়তো পুরনো যুগের বান্ধবীদের মধ্যে এক চন্দ্রা দেবীই এখনও তাঁর উপর গভীরভাবে নির্ভর করে চলেন। সেই প্রথম জীবন থেকে রবার্ট ও'নীল তাঁকে এতটাই সময় দিয়ে আসছেন, যে, সে সময় হয়তো অন্য কোনও গূঢ় অর্থেও, নিশীথ চৌধুরী বলতেন, সত্যি, ভদ্রলোককে দেখলে আমার ঈর্ষা হয়। আমার একটিমাত্র স্ত্রী, অ্যান্ড নো বান্ধবী, তাকেও আমার ঠিকমতো দেখভাল করা হয়ে ওঠে না। অথচ ও'নীল এতজন বান্ধবীকে অ্যাটেন্ড করে যাচ্ছে ঠিক নিয়ম করে। অথচ তার প্রফেসনেও যে ফাঁকি দেয়, তা-ও নয়।

সত্যিই ঈর্ষণীয় চরিত্রের মানুষ এই রবার্ট ও'নীল। এত বছর পরেও চন্দ্রার জন্য এতখানি সময় দিয়ে যাচ্ছেন। গত চারদিন থানায় ছোটাছুটি, আদালতে হাজিরা দেওয়া,

উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ, সব তিনিই করেছেন একা হাতে। এখনও এ বাড়িতে এলে ডোরবেল টিপে অপেক্ষা করেন কয়েক মুহূর্ত, চন্দ্রা দরজা খুলতেই মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বলে ওঠেন, ইস্ চন্দ্রা, তোমার বাড়ির ডোরবেলের আওয়াজটা এমন মিষ্টি, এতকাল শুনেও যেন পুরনো হয় না। বাজছে তো বেজেই চলেছে। মনে হয়, দরজা খুলতে আরও একটু দেরি হলেও ক্ষতি নেই।

অথবা, এই শাড়িটা কবে কিনলে, চন্দ্রা, দারুণ কালারটা তো, কী দারুণ লাগছে যে আজ তোমাকে —

চন্দ্রা ঠোঁট টিপে হাসেন, থাক্, সে তোমার টিন-এজার কোনও বান্ধবীকে বোলো, আয়্যাভ গ্রোন এনাফ, চুলে কতটা পাক ধরেছে দেখো —

— ওটা কিছু নয়। বরং চুলে কিছু সিলভার লাইনিং থাকলে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব এনে দেয় মেয়েদের। ইন্দিরা গান্ধীকে তো এই একটুকরো সিলভার টাচেই কী রূপবতী দেখাত বলো।

চন্দ্রাদেবীও অবশ্য প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময়ী। কিন্তু তাঁর পার্সোনালিটি এতটাই বেশি যে তাকে ব্যক্তিত্ব-না বলে প্রতাপ বলাই ভাল। অন্তত হিমনের বউ দীয়া তাই বলত।

ডোরবেল টিপে এই মুহূর্তে অবশ্য সেই সুরের মূর্ছনা শুনতে ও'নীলের ঠিক ভাল লাগছিল না। একটু আগে চারজন পুলিশের কড়া নজর ঠাহর করে এসেছেন। গেট থেকে অদূরে দু'জন প্লেন-ড্রেসের লোক, পুলিশও হতে পারে, সাংবাদিক হওয়াও বিচিত্র নয়, তারাও পকেট থেকে নোটবুক বার করে নোট করে নিল কিছু। সম্ভবত গাড়ির নম্বর। আজ সকালের কাগজে তাঁকে জড়িয়ে কিছু মুখরোচক খবর প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকদিন ধরে তাঁর কোর্টে ঘোরাঘুরি, ব্যস্তসমস্ত চলাফেরা, সর্বোপরি তাঁর বিদেশি চেহারা ভারি নজর কেড়েছে সাংবাদিকদের। একজন প্রবীণ সাংবাদিক, সংযোজনা অংশে, তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা ও তাঁর বহুনারীপ্রিয়তা সম্পর্কে বেশ হিউমার-টিউমার দিয়ে চমৎকার একটি রচনা লিখেছেন। হয়তো তাঁর আজকের আগমনবার্তাটিও কিছু রং চড়িয়ে প্রকাশিত হবে আগামীকালের পাতায়।

মনে মনে হাসলেন ও'নীল। একটি তরুণীর আত্মহত্যা কিংবা হত্যাকে কেন্দ্র করে আরও বহু মানুষ হঠাৎ খবরের কাগজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সারাটা জীবনে অসংখ্য নারী এসেছে তাঁর সংস্পর্শে, বহু বিচিত্র তরুণী, যুবতী, প্রৌঢ়া এমনকি বৃদ্ধার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা বিভিন্ন পার্টিতে, ক্লাবে কিংবা কোনও বাড়ির মজলিসে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেও তা কখনও সংবাদপত্রের আলোচ্য হয়ে ওঠেনি। এখন হঠাৎ —

যথারীতি আজও দরজা খুললেন চন্দ্রা-ই, কিন্তু আজ তার মুখে কালবৈশাখীই যেন বা। উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই, শুধু বললেন, কাম ইন —

বড় হলঘরটার একপাশে ব্রাউন রঙের রেক্সিন-অলা মস্ত সোফা, তার উপর রাখা নীল ভেলভেটে মোড়া তিনটি তাকিয়ার একটি টেনে নিয়ে বসলেন ও'নীল, হাতের নিভে-যাওয়া চুরুটটির মুখে পুনর্বার আগুন লাগাতে লাগাতে বললেন, সায়ন ফিরেছে?

প্রায় গুলি-খাওয়া বাঘের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন চন্দ্রা দেবী, হুঁ।

ও'নীল চুপচাপ লক্ষ করতে লাগলেন চন্দ্রা দেবীর অভিব্যক্তি। মাত্র চারদিনে হঠাৎ যেন তাঁর বয়স বেড়ে গেছে অনেকখানি। মাথার চুলে সাদার ছোপ্ যেন খানিকটা বেশিই। মুখের চামড়ায় কেমন কালচে ভাব। কিছু এবড়ো-খেবড়ো কোঁচও, যা ও'নীলের চোখে আগে ধরা পড়েনি। অন্যদিন তাঁকে বেশ ফিটফাট, উজ্জ্বল চকচকে চেহারায় দেখা যায়, আজ একেবারে ঝড়বিধ্বস্ত রূপ।

রবার্ট চুরুটে টান দিতে দিতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হিমন কোথায়?

— পাশের ঘরে। তেমনই সংক্ষিপ্ত উত্তর। কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্যে কাটে। এই নৈঃশব্দ্যের রূপ ও'নীলের ভারি চেনা। তাঁর অনুমান মতো চন্দ্রাদেবীর স্বাভাবিক তেজীয়ান কণ্ঠস্বর হঠাৎই বদলে গেল, প্রায় কান্না-জড়ানো গলায় বললেন, আমার সব গেল, সোসাইটিতে আর মুখ দেখানোর জো রইল না। আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং। ডাইনিটা আমার সব শেষ করে দিয়েছে —

ও'নীল সোফা থেকে উঠে চন্দ্রার কাছে গেলেন। বুকের কাছে তাঁকে টেনে তাঁর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, ডোন্ট গেট নার্ভাস, ডার্লিং। সব ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে-মধ্যে জীবনে ওরকম ওঠাপড়া আসেই —

— নো, নো, অ্যাবসার্ড। আর কিছুই ফিরে পাওয়া যাবে না। আমি, আমার ফ্যামিলি, আমার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, সবই এখন সারা কলকাতার গসিপের বস্তু। আয়্যাম লস্ট, কমপ্লিটলি রুইন্ড্—

ও'নীল একইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরগুলি আরও উত্তেজিত করে তুলেছে চন্দ্রাকে। কয়েকদিনের স্টোরিগুলো পড়তে পড়তে বেশ অবাক হয়েছেন ও'নীলও। অভিজাত বাড়ির আদব-কায়দা, জীবনযাপন সাধারণ মানুষদের চোখে স্বভাবতই একটু অন্যরকম। বোধহয় তাই ইচ্ছে করলে কলকাতার যে-কোনও অভিজাত পরিবারকে নিয়েই এ ধরনের স্ক্যান্ডাল ছড়াতে পারে কাগজগুলো। এমনিতে জানা যায় না, হঠাৎ কোনওভাবে সংবাদ হয়ে উঠলে তখন কোনও সাধারণ ঘটনাও অসাধাবণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই নৈঃশব্দ্যের মুহূর্তে হঠাৎ বিশ্রী শব্দ করে বেজে উঠল ঘরের কোণে রাখা টেলিফোনটা। ও'নীল চন্দ্রার কাছ থেকে সরে এসে তুলতে যাচ্ছিলেন রিসিভার, তার আগে চন্দ্রা নিজেই ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললেন, হ্যালো —

ওপাশ থেকে ভেসে আসা কিছু কথা মন দিয়ে শুনলেন, দু-চারবার — ইয়েস, হ্যাঁ, হুঁ, ও.কে. বললেন, তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে প্রায় হতাশ ভঙ্গিতে এসে বসে পড়লেন, আতঙ্কের গলায় বললেন, আবার আসছে ওরা —

ও'নীল অবাক হয়ে বললেন, কারা!

— পুলিশ। এই নিয়ে কাল বাড়ি ফেরার পর থেকে তিনবার। প্রায় বুলডগের মতো লেগে আছে পিছনে। যতবার বলছি, আই নো নাথিং, আস্ক সায়ন, কিন্তু স্কাউন্ড্রেলগুলো কনটিউনিয়াসলি চেজ্ করে যাচ্ছে আমাকে। বোগাস্ —

ও'নীল বিড়বিড় করে বললেন, ওদেব কাজ তো ওরা করবেই। লেট দেম ডু দেয়ার জব।

হঠাৎ কী যেন নজরে পড়তে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন চন্দ্রা, ও হো — বলেই টেবিলের এককোণে পড়ে থাকা একটা মোটা লম্বা ব্রাউন রঙের খাম তুলে নিলেন দ্রুত, সেটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন পাশের ঘরে, মিনিট চার-পাঁচ পরে ফিরে এলেন উদ্বিগ্ন মুখে। ও'নীল জিজ্ঞাসা করলেন, কী ওটা?

— কী আবার। আমার পিণ্ডি। ডিভোর্সের নোটিস পাঠিয়েছে দীয়া। আমি তো যত ডাইনির পাল্লায় পড়েছি।

— কবে এল!

— এই তো একটু আগে। বাই রেজিস্টার্ড পোস্ট। পাঠিয়েছে সেই সাতদিন আগে।

— সাতদিন? তার পরে একবার এসে দীয়া ঘুরে গেল না!

— গেলই তো। এই তো সেদিন। এল, কী যেন খুঁজল ওদের আলমারিতে। হিমনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল। তারপর নিজেই এককাপ কফি করে খেল। বিছানায় গড়িয়ে খানিকক্ষণ ম্যাগাজিন দেখল উল্টেপাল্টে। তারপর সন্ধের দিকে চলে গেল গটগট করে। আমার সঙ্গে কথাই বলেনি।

— তাই নাকি! তখন একবারও ডিভোর্সের কথা বলেনি?

— না। অথচ পোস্টঅফিসের শীলমোহর থেকে দেখতে পাচ্ছি তার আগেই নোটিস ছাড়া হয়েছে।

— বাহ, ওয়ান্ডার গার্ল, বলে ও'নীল হো হো করে হেসে উঠলেন, বেশ পাগলি আছে তোমার ছোট বউটা। ওয়ান্ডার গার্ল, হা-হা-, বলে এ ক'দিনের বরফচাপা নৈঃশব্দ ভেঙে হঠাৎ বেশ অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকলেন।

— ওয়ান্ডার উইচ বলো, চন্দ্রা বিস্মিত হয়ে ও'নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, একে তো এক বউয়ের কীর্তিতে আমার সারাজীবনের অর্জিত সমস্ত সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে গেল, তার উপর এখন আর এক বউ — অল ননসেন্স। যদি এই চিঠিটা এখন পুলিশের নজরে পড়ে, তাহলে কাল পেপারে আর এক স্টোরি বেরুবে।

এতক্ষণ একনাগাড়ে বলে বেশ হাঁপাতে লাগলেন চন্দ্রাদেবী। খুবই উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে তাঁকে। ও'নীল আবারও সান্ত্বনা দিতে শুরু করেন, ডোন্ট গেট এক্সাইটেড্; ডার্লিং। মাঝেমধ্যে মানুষের জীবনে এক-একটা স্পেল এরকম আসে। দীয়ার সঙ্গে আমার দেখা হলে ওকে ব্যাপারটা আমিই বোঝাব। লাইফ ইজ নট অ্যা ম্যাটার অব জোক। হঠাৎ এভাবে একটা ডিভোর্স নিলে সারাজীবন কাটাবেই বা কী করে বেচারি! এখন অল্প বয়স, উত্তেজিত হয়ে একটা ডিসিশন নিলে পরে ও-ই পস্তাবে।

— না, তার আর দরকার নেই। হিসহিস করে উঠলেন চন্দ্রা, আমি আবার হিমনের বিয়ে দেব।

— ডোন্ট বি অ্যা ফুল, চন্দ্রা, ও'নীল এতক্ষণে ধমক লাগালেন, এখন সাংঘাতিক ক্রাইসিসের সময়, এ সময় এরকম একটা কথা কারও কানে যাওয়া মানে একেবারে বুমেরাং হয়ে আসবে। স্টপ ইট নাউ।

ও'নীলের ধমকে থমকে গেলেন চন্দ্রা, ব্যাপারটা বুঝলেন, তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে চেঁচিয়ে ডাকলেন, হিমন্, হিমন্ —

একটু পরেই দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল হিমন, ও'নীলকে সোফায় বসে থাকতে দেখে একমুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর ঘাড় নিচু করে বলল, কী বলছ?

— আবার একজন পুলিশ অফিসার আসছে। ইন্টারোগেট করবে মনে হয়। দীয়ার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ডিভোর্সের নোটিসের ব্যাপারটা একদম চেপে যাবে, বুঝলে?

ঘাড় নাড়ল হিমন, হুঁ।

হিমনের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। লম্বা ঋজু চেহারা, চুল উসকোখুসকো ধরনের। মুখে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি। চুল-দাড়ি-গোঁফ সবই সামান্য লালচে ধরনের। তার শরীরের গঠন যতটা মজবুত, তার গলার স্বর ততটা নয়। কণ্ঠস্বর একটু চাপা, মেয়েলি ধরনের। কণ্ঠস্বরের মতো তার ব্যক্তিত্বও কিছুটা কম বলে মনে হয়। লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গড়নের তুলনায় ব্যক্তিত্ব বেমানান। মায়ের সামনে এলে সে যেন আরও একটু কুঁকড়ে থাকে।

চন্দ্রা আবার বললেন, পুলিশের সামনে বেশি আমতা-আমতা করবে না, বুঝেছ?

হিমন একবার ঢোক গিলে তাকাল ও'নীলের দিকে, তারপর নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

— ঠিক আছে, এবার যাও —

বলতেই হিমন আবার পায়ে-পায়ে তার ঘরের দিকে চলে গেল। যাওয়ার আগে মনে হল তার মুখে জড়ো হল একরাশ শঙ্কার ছাপ।

রবার্ট ও'নীল সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসছিলেন। হিমন চলে যেতে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, চন্দ্রা, একজন গ্রোন-আপ বয়কে তোমার এভাবে গাইড করা ঠিক নয়। এতে তার পার্সোনালিটি গড়ে উঠতে পারে না। সবসময় নার্ভাস ফিল করবে। ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক জবাব দিতে পারবে না।

চন্দ্রা দেবী হিমনের ঘরের দিকে তাকিয়ে একটা অবজ্ঞার ভাব ফোটালেন মুখে, ও তো ছেলেবেলা থেকেই ইমম্যাচিওরড্। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, কিন্তু অন্তত বড়টার মতো দুর্বিনীত নয়। হিমন এখনও কথা শোনে, যা বলি মুখ বুজে মেনে চলে।

ও'নীল কোনও কথা না বলে টুকটুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। ধোঁয়ার আড়ালে তাঁর ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকে আলতো হাসি। সে অস্পষ্ট হাসিতে, চুরুটের ধোঁয়ায়, দাড়িগোঁফের জঙ্গলের রহস্যময়তায় ভারি অদ্ভুত দেখায় ও'নীলকে। তখন তাঁর মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিতে চমৎকার একটা স্বর্গীয় টাচ। কখনও লঘু মুহূর্তে চন্দ্রা দেবীই তাঁকে পরিহাস করে বলে ওঠেন, নাউ. ইউ লুক লাইক জেসাস ক্রাইস্ট। জাস্ট ফর দিস আই লাভ ইউ, রবার্ট। এখন আর সে কথা বললেন না। বলার মতো মনের অবস্থাও নেই। আগের প্রসঙ্গ ধরেই বললেন, এ তবু অনেক ভাল। অন্তত আমার মুখ ডুবিয়ে দেয়নি। কিন্তু যার পার্সোনালিটি গড়ে উঠেছে, সে তো আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। আর এখন তো আমাকে রুইন্ড করে দিয়েছে।

আবার চন্দ্রা দেবীর মুখ উত্তেজনায়, ক্রোধে লাল হয়ে এল। বোধহয় মনে পড়ল পর-পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। পরক্ষণেই দরজায় ডোরবেলের শব্দ শুরু হতেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন মুহূর্তে, চোখে ঘনিয়ে এল শঙ্কা। ও'নীলের দিকে তাকাতেই তিনি দ্রুত উঠে পড়লেন সোফা থেকে, ওয়েট, আমিই দরজা খুলছি। পুলিশ তো ইনভেস্টিগেট করতে

দু-দশবার প্লেস অব অকারেন্সে আসবেই, ইন্টারোগেট করবে, ক্লু খুঁজবে, তাতে নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই।

একটু পরে ও'নীলের পিছু-পিছু এসে ঢুকলেন একজন সুঠামদেহী পুলিশ-অফিসার। টানটান ইস্ত্রি করা খাকি পোশাকে বুক-পকেটে লাল-নীল অনেকগুলো তক্‌মা, বাহুতে রুপোলি ফলক। বেশ বোঝা যাচ্ছে একজন ওপরঅলা কেউ।

অফিসারটি ঢুকেই বললেন, আমি ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল। ইন্টারোগেট করতে চাই আর একবার —

চন্দ্রা দেবী ঘাড় নাড়তেই দেবাদ্রি সান্যাল আবার বললেন, মিঃ সায়ন চৌধুরী তো আজই জামিনে রিলিজ পেয়েছেন। বাড়ি আছেন তো?

— হ্যাঁ আছেন। ও থাকে পাশের ফ্ল্যাটে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে —

— জানি, বলে দেবাদ্রি সান্যাল এবার তাকালেন ও'নীলের দিকে, আপনিই নিশ্চয় রবার্ট ও'নীল। দি গ্রেট পপ-সিঙ্গার। ইজ্‌ন্ট ইট?

ও'নীল হাসলেন, থ্যাঙ্ক য়্যু ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট।

মিঃ সান্যালও হাসলেন, ঠিক আছে। আমি আপনাদের পর-পর কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। কাইন্ডলি একটু হেল্প করবেন আমাকে। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রমাণ হাতে এসেছে আমাদের —

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার আগে তাঁর হাতের ডায়েরিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ থানাটির পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল। পুরনো জটিলতর কেসগুলি একটি ঢাউস ডায়েরিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নোট করে রাখা তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস। কখনও চার্জশিটের কপি থেকে, কখনও আদালতের নথি থেকে, কখনও সিনিয়র পুলিশ-অফিসারদের স্মৃতি থেকে, এমনকি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করে তা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় লিখে রাখেন সযত্নে। যাতে পরবর্তীকালে তা থেকে তদন্তের সূত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

গত কয়েক বছরে অন্তত তিন-চারটি এ ধরনের বড়ঘরের কেলেঙ্কারি ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। তাতে জড়িয়ে পড়েছেন শিক্ষাবিদ্ থেকে অভিনেত্রী, বড় বিজনেসম্যান থেকে বিগ বস্, নামী সাঁতারু থেকে গায়িকা অনেকেই। তদন্তে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে অনেকানেক স্ক্যান্ডাল, হয়তো অনেক অভিজাত পরিবারেই এমন স্ক্যান্ডাল জড়িয়ে থাকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, তা তাদের জীবনে নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই তেমন নজরে আসে না কারও, হইচইও হয় না। হঠাৎ কখনও এমন বিপর্যয় ঘটে গেলে সহসা উন্মোচিত হয় তাদের জীবন-যাপনের ভেতরকার নানান গোপন রহস্য। তখনই জানা যায়, রূপসী গৃহবধূও কীভাবে অত্যাচারিত হয় এইসব অভিজাত বাড়িতে, শেষ পর্যন্ত খুনও হতে

হয়, কখনও ধরা পড়ে, কখনও পড়ে না।

ঐন্দ্রিলা-হত্যার খুঁটিনাটি বিবরণ মেরুন রঙের ঢাউস ডায়েরিতে নোট করে নিতে নিতে তাই মাঝেমধ্যেই ভুরুতে কোঁচ পড়ছিল তাঁর। যা মনে হয়েছিল ভারি সহজ, জলবৎ তরলং, তেমন জটিলতা নেই, তার চারপাশ ঘিরে এখন ঘন রহস্য। এক অসহায় গৃহবধূকে পরিকল্পনামাফিক খুন করে নিষ্কণ্টক হতে চেয়েছে স্বামী, শাশুড়ি ও দেওর, অতএব সেইমতো চার্জশিট দাখিল করে দিলেই তাঁর ইনভেস্টিগেশন শেষ এমনটা ভেবেছিলেন, কিন্তু কেসটির গভীরে ঢুকতে গিয়ে এখন প্রতিপদেই রীতিমতো হোঁচট : বিশেষ করে যে-মুহূর্তে জানতে পারলেন, সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর মা ও ভাইয়ের অবনিবনার শিকড় এতটাই গভীরে যে তাঁদের মধ্যে প্রায় কোনও সম্পর্কই নেই গত কয়েক বছর। সে সংকট এমনই তীব্র যে দুটি ফ্ল্যাটের মাঝখানে বয়ে চলেছে এক আমাজন জল। সে বৃহত্তম নদ পেরোনো দেবাদ্রি সান্যালের মতো এক দুঁদে, পোড়-খাওয়া পুলিশ ইনস্পেক্টরের পক্ষেও যেন অসম্ভব। তার উপর আরও ঠেক খেলেন আজ এই মুহূর্তে চন্দ্রাদেবীর ফ্ল্যাটে ঢুকে। বুঝতে পারলেন অনেক 'কিন্তু' এবং 'যদি' জড়িয়ে আছে ঘটনাটির অন্তরালে। রবার্ট ও'নীল নামের এই বিদেশি মানুষটিকে ক'দিন ধরেই ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছিল কখনও থানায়, কখনও কোর্টরুমে। কখনও পরামর্শ করছিলেন কালো জোব্বা পরা উকিলবাবুদের সঙ্গে। তাঁকে এই মুহূর্তে এ-বাড়িতেও দেখতে পাবেন তা ঠিক ভাবতে পারেননি যেন। বাইরের ঘরে কেবল তাঁরা দু'জনেই, নিশ্চয় একান্তে বসে এতক্ষণ কোনও গূঢ় পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন, পুলিশ ইন্সপেক্টরকে দেখে দু'জনেরই মুখ আপাতত বিব্রত, অসন্তুষ্ট, থমথমে।

তাঁর প্রশ্নে চন্দ্রা দেবী নয়, রবার্ট ও'নীলই জিজ্ঞাসু চোখ ছুড়ে দিলেন, হুঁ বলুন —

দেবাদ্রি খুঁটিয়ে দেখছিলেন দু'জনকেই।

ইতিমধ্যেই শুনেছেন, দুজনের ভেতর নিছক বন্ধুত্বই শুধু নয়, এক গভীরতর সম্পর্ক আছে যা নাকি খুবই জটিল ও কৌতূহল উদ্রেককারী। সে সম্পর্ক প্রায় আটাশ-উনত্রিশ বছরের পুরনো। পুরনো মদের মতোই দীর্ঘকালের এই অ-বিবাহিত সম্পর্ক নাকি ঢের ঢের মাদকগুণসম্পন্ন। তাই অ্যারাউন্ড-ফিফ্‌টি চন্দ্রা দেবীকে দেখে উপলব্ধি করছিলেন, এতকাল পরেও তাঁদের প্রণয়ে কতখানি গভীরতা। বিবাহই প্রেমের সমাধি — এ কথা যিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই যথার্থ, না হলে কেনই বা রবার্ট ও'নীল তাঁর এই ওল্ড ফ্লেমটির জন্য এখনও মাথা ঘামাবেন এত, পাগলের মতো ছোটাছুটি করবেন এভাবে! চৌধুরী পরিবারকে কীভাবে এই প্রবল বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত করে আনা যায় তা নিয়ে তো তাঁর ক'দিন ধরে চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই। প্রায় এলোপাথাড়ি ভাবে, এর আগে টুকরো টুকরো প্রশ্ন করে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন দেবাদ্রি। মেরুন রঙের ডায়েরিতে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুলিয়ে একটু সড়গড় হয়ে নিয়ে এতক্ষণে মাথা তুললেন, হ্যাঁ, হয়তো রিপিট করতে হচ্ছে, সেজন্য আমি দুঃখিতও, তবু পাঁচুই এপ্রিল রাতে আপনারা কে কোথায় ছিলেন সেটাই আর একবার ডিটেলসে বলতে হবে আপনাদের।

রবার্ট ও'নীল তাঁর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প ধোঁয়া ছাড়ছিলেন এতক্ষণ। দেবাদ্রির মনে হচ্ছিল কেমন নীলচে রঙের ধোঁয়াই যেন বা, অনেকটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ব্যাপার আছে সে-ধোঁয়ায়। সেই রহস্যময়তার ভেতর থেকেই সামান্য বিদেশি অ্যাক্‌সেন্ট-মেশানো পরিষ্কার

বাংলায় কণ্ঠস্বর শোনা গেল ও'নীলের, এর আগে তো আপনি শুনেছেন, মিঃ স্যানাল, সেদিন সন্ধেয় আমি আর চন্দ্রা দু'জনে গিয়েছিলাম পার্ক সার্কাসের এক মিউজিক কনফারেন্সে, ফিরেছিলাম একটু রাত করেই, তখন প্রায় একটা হবে রাত, চন্দ্রাকে এ বাড়িতে ড্রপ করে দিয়ে যখন আমি বাড়ি ফিরি তখন অন্তত রাত দেড়টা-পৌনে দুটো হবে।

— হুঁ, এবার চন্দ্রা দেবীর দিকে তাকলেন দেবাদ্রি, আর হিমন চৌধুরী?

বোধহয় একই প্রশ্ন বারবার করায় মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ছিল চন্দ্রা দেবীর, বললেন, হিমন সেদিন রাত নটা-সাড়ে নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিল। ডাইনিং টেবিলে ক্যাসারোলে তার খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমরা বড়ি ফেরার অনেক আগেই —

— আপনি কী করে জানলেন তিনি ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন তখন? আপনি কি তার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছিলেন?

— না, তা দেখিনি। তবে খাওয়ার পর তার এঁটো থালা-বাটি পড়ে ছিল টেবিলে। যেমন রোজই থাকে। ডিনারের পর রোজই তো তার ঘরে ঢুকে যায়।

— আর ইউ শিওর, সেদিন ডিনার সেরে উনি ঘুমোতেই গিয়েছিলেন?

চন্দ্রা দেবী ঈষৎ রেগে গিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই। ভোরবেলা পুলিশ এসে যখন কলিং বেল টিপেছিল, তখনও সে তার ঘর থেকেই বেরিয়েছিল।

দেবাদ্রি অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচকি হাসলেন এক লহমা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, খাওয়ার পব তিনি ঘরেই ছিলেন। হয়তো খেয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে গিয়েছিলেন, আপনি ফেরার অনেক পর চুপিচুপি ফিরে এসে শুয়েছেন আপনার অগোচরে।

চন্দ্রা দেবী প্রায় গর্জে উঠে বললেন, নেভার। ওর সে সাহসই হবে না —

— তাই নাকি? দেবাদ্রি হাসতে লাগলেন, ঠিক আছে, এবার বলুন তো, হিমন চৌধুরী সাধারণত ক'টার সময় বাড়ি ফেরেন রোজ?

চন্দ্রা দেবী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন, ও কোনও দিনই বেশি রাত করে না। রোজই রাত ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যেই ফিরে আসে।

— ও, দেবাদ্রি ডায়েরির পৃষ্ঠায় চোখ রাখলেন, ওঁর অফিস তো ছুটি হয় বিকেল ছ'টায়, সাধারণত তার পরই ফেরার কথা। তা হলে এত দেরি হয় কেন? অফিস-ছুটির পর নিশ্চয়ই কোথাও যান রোজ?

একটু ইতস্তত করে চন্দ্রা দেবী বললেন, আসলে ছোটবেলা থেকেই ও বেশ ইমম্যাচিওরড্ ধরনের। কথাবার্তায়, চলাফেরায় একধরনের জড়তা আছে। হয়তো ছোটবেলা থেকে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে দিইনি বলেই। তাই এখন বলেছি, অফিস-ছুটির পর রোজ ওদের কোম্পানির ক্লাবে খেলতে যেতে। সেখানে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে যদি ওর চলাফেরায় একটু স্মার্টনেস আসে —

— সেখানে কী খেলেন উনি?

— ক্যারাম, টেবিল টেনিস — সাধারণত এ গুলোই। শীতে কখনও সখনও ব্যাডমিন্টন।

— হুঁ, বলেই হঠাৎ আচমকা কথার মোড় ঘোরালেন দেবাদ্রি, আচ্ছা, সেদিন

বলেছিলেন, আপনারা রাত একটায় যখন বাড়ি ফিরেছিলেন, সায়ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলছিল।

— হ্যাঁ, ফ্ল্যাটের পেছনদিকে ল্যাবরেটরিতে আলো জ্বলছিল।

— আলো ছাড়া আর কোনও অস্বাভাবিক দৃশ্য চোখে পড়েনি আপনাদের?

— না।

— কিন্তু অত রাতে ওঁদের ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে কেন, সে প্রশ্নও তো মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

— রাত একটা আমাদের বাড়িতে এমন কিছু বেশি রাত নয়, মিঃ সান্যাল। তা ছাড়া, আমরা জানতাম, বেশি রাত পর্যন্ত জেগে ল্যাবরেটরিতে কাজ করা সায়নের বরাবরের অভ্যাস। অনেকসময় সারারাত কাটিয়ে দেয় সেখানে। এই তো কদিন আগেও—

দেবাদ্রির ঠোঁটে একটুকরো চোরা হাসি খেলা করে গেল সহসা, বললেন, আচ্ছা, সেদিন বলেছিলেন, সায়ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটের সঙ্গে আপনাদের দীর্ঘদিনের কোনও সম্পর্ক নেই, প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ, তা হলে তাঁর বিষয়ে এত সব কথা জানলেন কী করে?

একমুহূর্ত থতমত খেলেন চন্দ্রা দেবী, একনজর বিব্রতমুখে তাকালেন ও'নীলের দিকে, তারপর বললেন, বাড়িটা এমনভাবে তৈরি যে দুটো ফ্ল্যাট প্রায় মুখোমুখি, এ-ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে ও-ফ্ল্যাটের ব্যালকনি দেখা যায়।

—কাল কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আপনাদের মধ্যে যেহেতু খুবই খারাপ সম্পর্ক, বহুকাল ব্যালকনির দিকের দরজা খোলা হয়নি আপনাদের।

—ঠিকই বলেছিলাম মিঃ সান্যাল। ব্যালকনিতে না গিয়েও এ-ফ্ল্যাটের লিভিং রুমের জানলায় দাঁড়ালে ও-ফ্ল্যাটের আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তা বোঝা যায়। আমি লিভিং রুমের জানালায় দাঁড়িয়েই দেখেছিলাম—

হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আচম্কা প্রশ্ন ছুড়েছিলেন দেবাদ্রি, আপনি কি এ-ফ্ল্যাট থেকে ও-ফ্ল্যাটে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তার নিয়মিত নজরদারি করেন মিসেস চৌধুরী?

চন্দ্রা দেবী তাঁর নীচের ঠোঁটটা হঠাৎ কামড়ে ধরলেন, তাঁর ফর্সা মুখ একটু লাল হয়ে উঠল যেন বা, চোখদুটো সামান্য জ্বলেও উঠল, দ্রুত কেমন শক্ত হয়ে গিয়ে বললেন, এর নাম মোটেই নজরদারি নয়। রাতের বেলা কোনও প্রতিবেশীর বাড়িতেও আলো জ্বললে তার দিকে যে-কারও চোখ যাবে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে চন্দ্রা দেবীর এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ করলেন দেবাদ্রি, তার পর হেসে বললেন, সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হঠাৎ এত খারাপ হয়ে গেল কেন, মিসেস চৌধুরী?

সায়নের নাম শুনে সহসা মুখচোখ আরও খানিকটা শক্ত হয়ে গেল চন্দ্রা দেবীর। বোধহয় কিছুটা সময় নিলেন কী উত্তর দেবেন তা ভাবতে, আবার একবার চোখাচোখি করে নিলেন রবার্ট ও'নীলের সঙ্গে, তারপর বললেন, সে-সব আমাদের পারিবারিক ব্যাপার, সব কথা আপনাদের বলতে আমি বাধ্য নই।

—কিন্তু এ-কেসের ইনভেস্টিগেশনের জন্য সে সব কথা জানা আমাদের কাছে খুবই জরুরি, মিসেস চৌধুরী।

চন্দ্রা দেবীর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল আবও, যদি দরকার হয় তাহলে যা বলার কোর্টেই বলব, আপনার কাছে নয়।

দেবাদ্রির মুখও শক্ত হয়ে উঠেছিল, কিছুক্ষণ চন্দ্রা দেবীর জবাব ও তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে দ্রুত চলে এলেন প্রসঙ্গে, আচ্ছা বলুন তো, আপনার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ দীযা চৌধুরী হঠাৎ এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

চন্দ্রা দেবী তেমনই গম্ভীর স্বরে বললেন, চলে গেছে আপনাকে কে বলল? সে তো প্রাযই আসে।

—তাই নাকি? কিন্তু সে এ বাড়িতে রাত্রিবাস কবে না বলেই জেনেছি। গত তিন-চাব মাস ধরেই—

—কে আপনাকে এ-সব কথা বলেছে? দীয়াই নাকি?

দেবাদ্রি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, শুনলাম, আপনাদেব অত্যাচারেই নাকি সে এ বাডি থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে—

চন্দ্রা দেবী উত্তেজিত হয়ে বললেন, ইটস আ ড্যাম লাই। তার এ বাডিতে থাকতে ভাল লাগে না তাই সে হুটহাট করে চলে যায় মাঝেমধ্যে। ক'দিন পরেই আবাব আসে—

—আসে, কিন্তু রাতে থাকে না।

—থাকে না, তাঁর কারণ হিমনের সঙ্গে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না।

—শুধু কি তাই, মিসেস চৌধুবী? দেবাদ্রি মুখ-চোখ শক্ত করলেন ফের, নাকি আপনি পুত্রবধূব ওপর অসম্ভব ডমিনেট করেন বলেই—

চন্দ্রা দেবীব মুখ লাল হয়ে উঠল, গলাও একটু চড়ে গেল তাঁর, ঘরের বউ হুটহাট করে বাডি ছেড়ে চলে যাবে। তার প্রতিবাদ করলে যাদ ডমিনেট করা হয—

দেবাদ্রি হঠাৎ ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে বললেন, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য লাগছে মিসেস চৌধুরী। কোনও ঘরের বউ কি স্বেচ্ছায তার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়, যদি না তাকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়?

উত্তেজনায় চন্দ্রা দেবী তখন প্রায় থরথব করে কাঁপছেন। যেন কিছু একটা বলতে চাইছেন, অথচ কোনও জটিল কারণে তা বলতে পারছেন না বলেই তাঁব চোখেমুখে ফুটে উঠছে প্রবল ক্রোধ। তার সঙ্গে অসহায়তায়ও। দেবাদ্রি মুখে এক প্রচ্ছন্ন কৌতুক ফুটিয়ে লক্ষ করছিলেন এই অভিজাত বাড়ির মহিলাটিব রকমাবি প্রতিক্রিয়া। পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই অথবা সদ্য পেরিয়েছেন যে বমণী, তিনি এ-বয়সেও এতটাই সুন্দরী, তাঁর গায়ের চামডা এখনও এমনই মসৃণ যে অন্তত দশ বছর বয়স কমিয়ে বলতে পারেন অনায়াসে। বিশেষ করে তাঁর চোখের চাউনিতে জড়িয়ে আছে এমন একটি চোরাটান যে প্রকৃত বয়স না জানলে দেবাদ্রি নিজেই তাঁর প্রেমে পড়ে যেতে পারতেন হয়তো। তবে পারা সম্ভবও ছিল না, কারণ তাঁর দাপুটে স্বভাবের জন্য। অন্যের ওপর ডমিনেট করাটা তাঁর এতটাই সহজাত যে প্রতিমুহূর্তে তা বুঝিয়ে দেন তাঁর চাউনিতে, কথনভঙ্গিতে, চালচলনে।

তাঁর এই প্রবল ক্রোধ প্রশমন করতে এগিয়ে এলেন এতক্ষণ পাশে স্থির হয়ে বসে থাকা ববার্ট ও'নীল, দেবাদ্রিব দিকে তাকিয়ে বললেন, দীয়া একটু পাগলি ধরনের আছে, মিঃ সান্যাল। মোটে বছর দেড়েক বিয়ে হয়েছে ওদের। মানবজীবন সম্পর্কে আমার যা স্টাডি,

তাতে দেখেছি, বিয়ের দেড় দু'বছর পরে এরকম একটা ক্রাইসিস অনেক দম্পতির জীবনেই দেখা দেয়। কিছুদিন এরকম টালমাটাল অবস্থা চলে। তারপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যায়। দীয়াও ইদানীং তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে টুকটাক খুনসুটি, অবনিবনা হলেই রাগঝাগ করে চলে যাচ্ছে। মনে হয়, ক'দিন পরেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে—

দেবাদ্রি চমৎকৃত হওয়ার মতো মুখ করে বললেন, ইজ ইট! তাহলে এবার আমাকে বলুন তো, সায়ন চৌধুরীর জীবনেও কি এই ধরনের কোনও ক্রাইসিস দেখা দিয়েছিল ইদানীং?

আচমকা এহেন প্রশ্নে সামান্য থতমত খেয়ে গেলেন রবার্ট ও'নীল, তারপর সামলে নিয়ে হাসলেন, স্যরি ইনস্পেক্টর, এই প্রশ্নের জবাব আমি বোধহয় ঠিকঠাক দিতে পারব না—

দেবাদ্রি আশ্চর্য হওয়ার ভান করে বললেন, কেন?

সামান্য ইতস্তত করে ও'নীল বললেন, আসলে সায়ন বোধহয় কোনও দিনই আমাকে তেমন পছন্দ করত না। তাই ওদের কাছাকাছি হওয়ার সৌভাগ্যও আমার হয়নি তেমন ভাবে। ফলে ওদের দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে কিছু বলা আমার সাজে না।

—তাই? দেবাদ্রি ঘাড় নাড়লেন নিজের মনেই, যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে কেন আপনাকে পছন্দ করতেন না, তার কারণ কি জেনেছেন কখনও?

—নাহ, রবার্ট ও'নীল হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেলেন, সেটাই বোধহয় আমার জীবনের একটা দুর্ভাগ্য। তাই নিজেকে কখনও শোধরাতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেও। ইট'স মাই ব্যাড লাক—

দেবাদ্রি কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে এই বিদেশি মানুষটির অভিব্যক্তি লক্ষ করলেন। সায়ন চৌধুরীর উপেক্ষা যে তাঁকে খুবই ক্ষুণ্ণ করেছে, ক্ষুব্ধও, তা তাঁর কথার জড়ানো ভঙ্গি, ধূসর চাউনি এবং দীর্ঘশ্বাসে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটু পরেই হঠাৎ কথার মোড় বদলালেন ফের, আচ্ছা মিঃ ও'নীল, সায়ন চৌধুরীর ল্যাবরেটরি ঘরের আলো তো আপনিও দেখেছিলেন, তা অত রাতে আলো জ্বলছিল, এ দৃশ্য দেখাব পর আপনারও কিছু মনে হয়নি?

—কী আর মনে হবে। ভেবেছি, কাজ-পাগল ছেলেটা নতুন কোনও ফর্মুলা বার করার চেষ্টা করছে।

—ও, সেই মুহূর্তে হঠাৎ যেন একটা বোমা ফাটালেন দেবাদ্রি, কিন্তু মিঃ ও'নীল, অ্যারেস্ট হওয়ার দিন সায়ন চৌধুরী তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন, সে রাতে তিনি বাড়িতেই ছিলেন না। বিলাসপুর থেকে সেদিন তাঁর ফেরার কথা থাকলেও কোনও বিশেষ কারণে তিনি নাকি কলকাতায় পৌঁছুতে পারেননি। তাহলে ল্যাবরেটরিতে আলো জ্বলছিল কেন?

রবার্ট ও'নীল ও চন্দ্রা দেবী দু'জনেই ভীষণ থতমত খেয়ে গেলেন হঠাৎ। একে অপরের দিকে চোখাচোখিও করে নিলেন এক লহমা। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। এক অদ্ভুত সন্দেহে সমস্ত পরিবেশ সহসা ভীষণ থমথমে হয়ে উঠল। দেবাদ্রি আবার বললেন, আচ্ছা, মিঃ ও'নীল, আপনি একটু আগেই বলেছেন, চন্দ্রা দেবীকে এ-বাড়িতে ড্রপ করে আপনি নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন সে-রাতে, তা হলে ল্যাবরেটরি-রুমের আলো আপনার চোখে পড়ল কী করে? বাইরের গেট থেকে এ-আলো তো দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন ও'নীল, নিশ্চয় অত রাতে একজন মহিলাকে বাড়ির গেটে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায় না। তাকে ঘবে পৌঁছে দিযে তবেই—

দেবাদ্রি এবাব দুম করে বলে বসলেন, আর ইউ শিওর, আপনি সে-রাতে এ বাড়িতে থাকেননি, ফিরে গিয়েছিলেন নিজেব আস্তানায়?

ও'নীলের মুখে তখনও ছুঁয়ে আছে এক সকৌতুক ভঙ্গি, বললেন, না, মিঃ সান্যাল, শুধু সে-দিন কেন, এ বাড়িতে বাত কাটানোর সৌভাগ্য আমাব কোনও দিনই হযনি।

—তাই! দেবাদ্রির মুখে একধবনের চোরাহাসি ফুটে উঠল মুহূর্তেব জন্য। পরক্ষণেই হঠাৎ আর একখানা বোমা ফাটালেন, আচ্ছা, সেদিন পার্ক সার্কাসে মিউজিক কনফাবেন্স হযেছিল সাবা বাত ধবে। হঠাৎ মধ্যরাতে আপনারা দু'জন ফিবে এলেন কেন? শেষ বাতেই তো ভারত-বিখ্যাত শিল্পীরা গেয়েছিলেন সেদিন সে অনুষ্ঠান, ছেড়ে—

দেবাদ্রির সামনে বসা দু'জনই কিছুক্ষণের জন্য স্থাণু হযে গেলেন, একটু পবে চন্দ্রা দেবী বলে উঠলেন, আমার সেদিন ঠিক ভাল লাগছিল না প্রোগ্রামগুলো। বোধহয় মুডই অফ ছিল আমাব, তাই আমি বলেছিলাম, চলে যাব—

—ও, দেবাদ্রি হেসে বললেন, ঠিক আছে, এবার হিমন চৌধুরীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। ওঁকে যদি একবার এ-ঘরে পাঠিযে দেন—

হিমনের কথা উঠতেই চন্দ্রা দেবী আরও অস্বস্তি বোধ কবলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোফা থেকে উঠে সেঁধিয়ে গেলেন পাশের ঘরে, একটু পরেই জড়ভবতের মতো এক-পা এক-পা করে হেঁটে হিমন এসে দাঁড়াল সোফার সামনে। দেবাদ্রি 'বসুন' বলতেই সে সোফার এককোণে সিঁটিযে বসল। চোখমুখে অসম্ভব ত্রাস।

একটু আগে যে চোরাহাসি দেবাদ্রির মুখে খেলা কবছিল, লাল্‌চে বঙের চুল আর গোঁফদাড়িতে ঢাকা হিমনের মুখখানা দেখে তা আরও উচ্ছল হয়ে চল্‌কে উঠল মুহূর্তে। তাব দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে পরক্ষণেই তাকালেন ববার্ট ও'নীলের দিকে। ও'নীল একটু আগেই বলেছিলেন 'এ বাড়িতে রাত কাটানোর সৌভাগ্য আমার কোনও দিন হয়নি' সেই কথাগুলোকে যেন বিদ্রূপ করে উঠল হিমনের সাহেবি-ধাঁচেব মুখ, তাব চোখের ধূসব মণিটি পর্যন্ত।

চোরাহাসিটি কিছুক্ষণ চোরাঘূর্ণি হয়ে ঢেউ খেলল দেবাদ্রিব আপাত গম্ভীর মুখে, তারপর সবাসরি প্রসঙ্গে চলে গেলেন, হিমনবাবু, আপনি পাঁচ তাবিখ বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

একটু কঠিন গলায়ই জিজ্ঞাসা করেছিলেন দেবাদ্রি, তাতে হিমনের জিব আরও শুকিয়ে গেল যেন, জড়ানো গলায় বলল, অফিস-ক্লাবে ক্যারাম খেলতে।

—কতক্ষণ ছিলেন সেখানে?

—সাড়ে আটটা হবে তখন। না, না, বোধহয় পৌনে ন'টা — তখন বেরিয়ে এসেছিলাম।

—আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল বেরিয়ে আসার সময়?

হিমন ঢোক গিলল, আর? না, না, আর কেউ তো নয়। আমি একাই—

দেবাদ্রি হঠাৎ জোরে ধমক দিয়ে উঠলেন, আপনি প্রতিটি কথাই মিথ্যে বলছেন হিমনবাবু, আমি যদি বলি, অফিস থেকে বেরিয়ে আপনি বেল ক্লাব-এ গিয়েছিলেন, অফিস-

ক্লাবে নয়।

—বেল ক্লাব? হিমনও ঢোক গিলল ফের, না তো—

—আর ক্যারাম নয়, আপনি ক্যাসিনো খেলেছিলেন সেখানে।

—ক্যাসিনো? না, না, হিমন্ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, ভয়ার্ত চোখে তাকাল একটু দূরে প্রায় মিলিটারি চোখে তাকিয়ে থাকা চন্দ্রা দেবীর দিকে।

—হ্যাঁ, সেদিন বেশ কিছু টাকাও হেরেছিলেন আপনি। যখন ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আপনার সঙ্গে একজন বান্ধবী ছিল। অ্যান্ড সি ইজ আ চেন-স্মোকার।

প্রবল ভূঁইকাঁপে তাঁদের বাড়িটা উল্টে গেলেও বোধহয় চন্দ্রা দেবী বা ও'নীল এতখানি চমকে উঠতেন না। কয়েক মুহূর্ত টালমাটাল হওয়ার পর চন্দ্রা দেবী প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, উইল ইউ প্লিজ স্টপ. ইনস্পেক্টর? আমার ছেলেকে আপনি নতুন করে চেনাচ্ছেন আমাদের? যে কিনা ভাল করে চলাফেরা করতে পারে না, ইমম্যাচিওর্‌ড, প্রায় পঙ্গু, সে কিনা—

দেবাদ্রি হেসে বললেন, ঠিক আছে, হিমনবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন—

হিমন প্রায় বিস্ফারিত চোখে টলতে টলতে চলে গেল তার ঘরের দিকে। আর চন্দ্রা দেবী দাঁড়িয়ে রইলেন চন্দ্রাহত হয়ে।

রবার্ট ও'নীল এতক্ষণে বললেন, আপনি কি আমাদের সবাইকেই মার্ডারার ঠাউরেছেন, মিঃ সান্যাল? দেখতেই তো পাচ্ছেন, এই অঘটনের ফলে চৌধুরী পরিবার রুইন্‌ড্ হতে বসেছে, তাদের প্রেস্টিজ, সোস্যাল স্ট্যাটাস, আভিজাত্য সব শেষ। এমনকি সায়নের দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস-এব অস্তিত্বও নাউ অ্যাট স্টেক—

প্যারাডাউস প্রোডাক্টসের এ হেন দুর্দিনে সবচেয়ে উল্লসিত হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কনসার্ন 'লাইম ইন্ডিয়া'র চেয়ারম্যান থেকে নিচুতলার কর্মী, সব্বাই। একমাত্র রৌণকই তার ব্যতিক্রম।

হাইরাইজ বিল্ডিংটির সাততলার জানালা থেকে চিন্তিত, উদাস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল সে, মানে লাইম ইন্ডিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার রৌণক মুখার্জি। তার টেবিলের ওপর একটা সাদা প্যাড, হাতে সোনালি ক্যাপের পেন। কিছু একটা ভাবনা তার মাথায় চক্কর দিয়ে ঘুরতে থাকলেও সে একবর্ণও এখনও ন্যস্ত করতে পারেনি সাদা পৃষ্ঠার ওপর।

সিক্সথ ফ্লোরে অফিস হওয়ার সুবাদে তার চেম্বারের জানালা ফুঁড়ে চলে আসে কলকাতা শহরের অনেকখানি। বার্ডস্ আই ভিউ হলেও সে দেখতে পায়, চৌরঙ্গি পাড়ার একদিকে অজস্র ছোট-বড় মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, এক-একটার শুঁড় এমন উঁচু হয়ে উঠে গেছে যেন

ছুঁয়ে ফেলবে আকাশ। অন্যদিকে সবুজ মাঠ। তার একপাশে শহিদ-মিনারের গগনচুম্বিত অহঙ্কার — আজকাল সন্ধের পর আলোয় সেজেগুজে তা আরও রূপসী হয়ে ওঠে। এমনকি তাদের অফিসের পাশে রাজভবনটিকেও মনে হয় একটা বড়সড় খেলনা বাড়ি। সব মিলিয়ে কলকাতার এই অঞ্চলে একটা অ্যাফ্লুয়েন্স। ফরাসি কবিতার মতো এই চৌরঙ্গিপাড়া চিত্রকল্পে, ছন্দের ঐশ্বর্যে, রমণীয় সৌন্দর্যেব অহঙ্কারে যথেষ্ট ধনীই।

মাঝেমধ্যে উদাসীন হয়ে রৌণক কখনও একা-একা চাখতে বসে কলকাতার এই অদ্ভুত সৌন্দর্য। এভাবে কয়েক লহমা আনমনা হয়ে থাকাটা তার ভারি পছন্দের, শৌখিন বিলাসিতাও বটে। এর মধ্যে একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ব্যাপার আছে। রিল্‌কে-র কবিতায় যেমন এক-এক ঝলক রহস্যময়তা, তেমনি এই কলকাতা-প্রিয়তায়।

কিন্তু আপাতত রৌণকের মনে কোনও কবিতা নেই। মগজে ঘাই মারছে না কোনও মালার্মে বা পল এলুয়ার। কিছুক্ষণ আগেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহ রায়, তাঁর ঝকঝকে চেম্বারে বসে প্রায় হুঙ্কারের ভঙ্গিতে বললেন, খুব তো বিজ্ঞাপনের কপিতে কবিত্ব ফলান, এ বার একটা কিছু করুন, যাতে প্যাবাডাইসের স্বর্গ ভেঙে খানখান হয়ে যায়। নইলে লাইম ইন্ডিয়ার অস্তিত্ব আর থাকবে না। যে ভাবে টার্ন-ওভার নেমে আসছে দ্রুত, তাতে আর কিছুদিন পরে লালবাতি জ্বলবে কোম্পানিতে। সেই বাতি আপনাদের সবাইকে এক-একটা করে ধরিয়ে দেওয়া হবে। বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সবাই মিলে তার চারপাশ ঘিরে বসে শোকসভা করবেন।

চেয়ারম্যানের কথাগুলো প্রথমটা ঠিক মাথায় ঢোকেনি রৌণকের। তারপর একটু থিতু হতে বুঝতে পাবল, চেয়ারম্যান বলছেন এমন সব বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপতে, যাতে তাদের প্রতিযোগী কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ক্ষতি হয়, তাদের সেল পড়ে যায়। প্যাবাডাইসের সেল পড়ে গেলে নিশ্চয়ই লাইম ইন্ডিয়ার সেল বাড়বে।

বিষয়টি উপলব্ধি করে মুখ লাল করে তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছে রৌণক। নিজেব চেয়ারে থম হয়ে বসে সে ভাবতেই পারছে না তাব এখন কী করা উচিত। মাত্র ছ সাত বছর হল সে এই কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। তাদের কোম্পানির প্রোডাক্ট — তাব গুণ, উপকারিতা ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরাই তার কাজ। আজ ক'বছর তারই মধ্যে লীন হয়ে আছে তার ভাবনার অভিনবত্ব-সমেত।

বিজ্ঞাপনের জগতে রৌণকের যখন প্রথম প্রবেশ, তখন তার মনের ভেতর টায়টায় ভরে ছিল এক প্রবল উচ্চাশা। সে তখন বিজ্ঞাপনের নতুন চমকে, নতুন উদ্ভাবনায় লাইম ইন্ডিয়াকে খ্যাতি শিখরে পৌঁছে দিতে উৎসুক। নতুন নতুন আইডিয়া দিযে সে লে-আউট তৈরি কবাতে থাকে তাদের অ্যাড-এজেন্সিটিকে দিয়ে। ছবির সঙ্গে চমকপ্রদ সব ক্যাপশন দেয়। তখন লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন দেখলে মনে হত সাবানের ফ্লেবার ফুরফুর করে ভেসে আসছে খবরের কাগজের পাতা থেকে। দুধসাদা বাব্‌ল্‌ ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা পৃষ্ঠা ছাপিয়ে ঘরের ভেতর। এ ভাবেই বাণিজ্যিক পৃথিবীতে সে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে তার মনের রোমান্টিক সব ভাবনা।

ইতিমধ্যে তার ভাবনার চমৎকারিত্বে, কলমের কারুকাজে ভাল বিজ্ঞাপন তৈরি করে কোম্পানির ইমেজ অনেকখানি তুলে এনেছে সে। তার ভাবনার মধ্যে একটা পজিটিভ

ব্যাপার আছে, একটু অন্যরকম ইমাজিনেশনও। কিন্তু চেয়ারম্যান হঠাৎ আজ যা বললেন—

.পেনের সোনালি ক্যাপটা সে আরও একবার কামড়ে ধরল দাঁতে। গত তিনবছর ধরে কোম্পানির টার্নওভারে টান ধরার পর থেকেই এ হেন ঝড়ঝাপট চলছে ক্রমাগত। ততদিনই তার বিজ্ঞাপনের রমরমা ছিল, যতদিন 'দি' প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড' এমন হই-হই করে বাজারে উঠে আসেনি। প্যারাডাইসের 'রোজবেরি' হঠাৎ মার্কেট ধরে নিতেই টনক নড়েছিল লাইম ইন্ডিয়ার। রোজবেরির গোলাপ-গন্ধ, তার সঙ্গে তার বিজ্ঞাপনের চমৎকারিত্ব তখন গুনগুন করে ঘুরছে মানুষের মুখে-মুখে। সে আলোচনার রেশ তার সুবাস একদিন ধাক্কা মারল রৌণকের মনের গলিঘুঁজিতেও। বিজ্ঞাপনের সাফল্য সেখানেই যখন তা ঝাঁকুনি দিতে পারে মানুষকে, বিজ্ঞাপন পড়ার বা দেখার অনেক পরেও যা গুঞ্জন তুলে ঘুরে বেড়ায় মনের ভেতর। তার মানে প্যারাডাইসের বিজ্ঞাপন প্রভাবিত করেছে মানুষকে, সম্মোহিতও। কিন্তু পরে বুঝল, শুধু বিজ্ঞাপনই নয়, প্যারাডাইসের প্রোডাক্টও বেশ লোভনীয়। একদিন বাড়ি ফেরার পথে রৌণক নিজেই একটা রোজবেরি কিনে ফেলল আচমকা। দু-তিনবার মোড়কের ওপর থেকেই শুঁকল তার গন্ধ। মনে-মনে তারিফও করল, বাহ্ দারুণ তো! তারপর বাড়ি ফিরে ভাল করে সাবানটি মেখে উপুরঝুপুর স্নান করে ফেলল। নাহ্, সাবানটা সত্যিই অদ্ভুত। কী চমৎকার সেন্ট। বাথরুম থেকে বেরিয়ে স্ত্রী ঋতবৃতাকে বলল, দ্যাখো তো ঋতু, এ সাবানটায় স্নান করলে কেমন লাগে?

গোলাপের এ হেন চমৎকার গন্ধ ইতিমধ্যে ঠোনা দিয়েছিল ঋতবৃতার নাকেও। সে মুখ আলো করে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, চোখ বড় বড় করে বলল, বেশ ফ্যান্টাস্টিক গন্ধ তো! তোমাদের কোম্পানি থেকে নতুন বেরুল?

—উঁহু। আর একটা প্যারালাল কোম্পানি গজিয়েছে কলকাতায়। তাদেরই প্রোডাক্ট।

—তাই নাকি! তারাও তোমাদের ফ্রি-তে সাবান দিচ্ছে! বেশ মজা তো—

—না হে খুকি। দোকান থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনে আনলাম। সাবানটার মাহাত্ম্য বুঝতে। বাজারে খুব ধরেছে এটা।

রৌণক সাবান কোম্পানিতে চাকরি করায় গত ক'বছরে কখনও দোকান থেকে সাবান কিনতে হয়নি ঋতবৃতাকে। তাদের কোম্পনি ফি মাসে একডজন করে সাবান উপহার দেয় সব ম্যানেজারদের। বিয়ের পর ঋতবৃতা এত সাবান মেখেছে যে, রৌণক ইয়ার্কি করে প্রায়ই বলে, তার বউটা বিয়ের আগে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল, এখন লাইম ইন্ডিয়ার কল্যাণে বেশ ফর্সাই হয়ে গেছে বলা যায়।

তবে ঝামেলাও হয়েছে একটা। আগে তার গায়ে একটা প্রেমিকা-প্রেমিকা সুবাস ছিল। গত এক বছর লেমন-টাচ সাবান মেখে সে সুবাস উঠে গিয়ে এখন তার গায়ে ওতপ্রোত হয়ে থাকে গন্ধরাজ লেবুর গন্ধ। সে অভিজ্ঞতাও অবশ্য কম রোমাঞ্চকর নয়। রাতে বিছানায় ঋতবৃতার পাশে শুয়ে ঘুমোতে গেলে এ হেন গন্ধরাজের গন্ধে সে আজকাল প্রায়শ নস্টালজিক হয়ে পড়ছে।

রৌণক যে গাঁয়ে পড়াশুনো করেছে ছোটবেলায়, সেখানে গরমের দিনে মর্নিং স্কুল হত। স্কুলে যাওয়ার আগে তারা ভাইবোনেরা ভোরে লাইন দিয়ে বসে পান্তাভাতের সঙ্গে গন্ধরাজ

লেবু আর নুন মেখে জারিয়ে খেত। সে এক চমৎকার ব্রেকফাস্ট। কিন্তু গত বারো-চোদ্দবছর কলকাতায় বাস করার পর এখন সে ভাবতেই পারে না কী ভাবে পান্তাভাত খেত তখন। ঋতবৃতাকে সে কথা বলতে সে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

রৌণক পয়সা দিয়ে রোজবেরি সাবান কিনে এনেছে শুনে মোটেই খুশি হল না ঋতুবৃতা। কিন্তু সাবানের গন্ধটা তখনও লেগে আছে তার নাকের লতিতে, বলল, কেন, তোমাদের কোম্পানি এমন গোলাপের গন্ধঅলা সাবান তৈরি করতে পারে না?

রৌণক হাসল, সেইটেই তো সমস্যা। আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজার কোনও থই খুঁজে পাচ্ছে না। রাহুল রায়কে আমাদের চেয়ারম্যান গত সপ্তাহে খুব করে কড়কে দিয়েছেন।

তা সেই শুরু। তারপর গত তিনবছরে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ হু-হু করে উঠে গিয়েছে অনেক দূর। রোজবেরির পর ড্রিমবাথ। ড্রিমবাথ এমন চমৎকার নীলচে যে, বাথরুমের ভেতর আলো জ্বালিয়ে রাখলে মনে হয়, সত্যিই একটা গাঢ় নীল স্বপ্নের ভেতর ডুবে আছে। ঋতবৃতা তো ড্রিমবাথ মেখে বলেছিল, ধুর ধুর, তোমাদের কোম্পানির ওই ছাই বিউটিবাথ, ফেলে দাও ওগুলো। ড্রিমবাথের তুলনা হয় না।

সত্যিই কয়েকমাস পর বিউটিবাথের প্রোডাকশন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল লাইম ইন্ডিয়াকে।

লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহ রায় সে সময় ডেকে পাঠিয়েছিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজারকে, চোখ গরম করে বলেছিলেন, কী ব্যাপার, আপনিও তো কানাডা না মেক্সিকো কোথা থেকে ঘুরে এসেছিলেন, তা সেখানে কি কিছুই শিখে আসেননি?

সেই তখন থেকেই বেশ নার্ভাস, টেন্স হয়ে আছেন রাহুল রায়। তাঁদের কোম্পানির চেয়ারম্যান বলতে গেলে একটি ছোটখাটো নাদুসনুদুস রয়েল বেঙ্গল। হাইট বড়জোর পাঁচফুট, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, মুখে একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ খণ্ড-ত-এর মতো পাকিয়ে নেমে এসেছে ঠোঁটের দু পাশে। চশমার ভেতর দিয়ে দু চোখে আগুন ছেটাচ্ছেন সর্বক্ষণ। ছোট্টখাট্টো মানুষ, অথচ মুখ দিয়ে অনর্গল তুবড়ি।

এমন চেয়ারম্যানের মুখোমুখি হওয়া মানে অনবরত ছ্যাঁকছ্যাঁক করে ছ্যাঁকা লাগে গায়ে। তাঁর বিষদৃষ্টিতে পড়লে হেড-অপিসের দুঁদে বড়বাবুকেও ট্রান্সফার হয়ে চলে যেতে হয় ভোপাল-এরিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার হয়ে। শেষ বয়সে ভদ্রলোকের কী ভোগান্তি! দাবার ঘুঁটির মতো তিনি বালিগঞ্জের রিপ্রেজেন্টেটিভকে তুলে বসিয়ে দেন ব্যাঙ্গালোরে, ব্যাঙ্গালোরের লোককে পট করে তুলে আনেন ভবানীপুরে। দিল্লির সেলস ম্যানেজারকে বাজাভাতখাওয়ায়।

একবার হেড-অফিসের এক অ্যাসিস্ট্যান্টের ওপর রুষ্ট হয়ে তাকে বদলি করে পাঠালেন ভুবনেশ্বরে। সে আবার নেতা, ইউনিয়নের ট্রেজারার। ইউনিয়ন থেকে দল বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে গেলে চেয়ারম্যান চোখ লাল করে বলেছিলেন, যাবে না মানে? দরকার হলে সাততলা থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হবে।

এমন দাপুটে চেয়ারম্যানের ভয়ে গোটা কোম্পানি থরথর করে কাঁপে। সেল্‌স ম্যানেজার অনঙ্গ চক্রবর্তী একদিন রৌণকের ঘরে ঢুকে বললেন, আচ্ছা, ওইটুকু শরীরে অত তেজ থাকে কী করে বলুন তো?

রৌণক এদিকে-ওদিক তাকিয়ে বলেছিল, এ তো অ্যাটম বোম নয়, রীতিমত হাইড্রোজেন বোম। ওঁর জিনের ভেতর নিশ্চয় প্রচুর ইলেকট্রন-প্রোটন আছে, আর তা বোধ হয় ইদানীংকালের আর ডি এক্সের চেয়েও অনেক বেশি বিস্ফোরক।

এই হেমজ্যোতি সিংহ রায়ের হুকুমনামা পেয়ে যখন একগলা জলে ডুবে হাঁসফাঁস করছে তাঁর কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার রৌণক মুখার্জি, ঠিক সে সময় তার ঘরে এসে ঢুকলেন রাহুল রায়। রাহুল রায়ের বয়স রৌণকের চেয়ে কিছু বেশিই, বোধহয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি, মাঝামাঝি গড়ন, হাইট পাঁচ-সাতের মতো, সামনের চেয়ারে বসে বললেন, চেয়ারম্যান কিছু বললেন নাকি, মিঃ মুখার্জি।

রৌণক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হুঁ, প্যারাডাইসের স্বর্গ ভেঙে খানখান করতে বলেছেন—

রাহুল তৎক্ষণাৎ নড়েচড়ে বসে বললেন, একজ্যাক্টলি, আমিও তাই ভাবছিলাম। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন তো আপনি। একটা কিছু করতেই হবে আপনাকে। এটাই কোম্পানির শেষ সুযোগ। একটা সরু সুতোর উপর দাঁড়িয়ে আছে কোম্পানির ভাগ্য, আর তা রক্ষা করার ভার আপনার হাতেই। থিঙ্ক ওভার ইট—

রৌণক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রাহুলের দিকে। তাদের চেয়ারম্যান গত দু-তিনবছর ধরেই প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল রায়কে প্রায় ত্রিফলা বর্শার নীচে রেখে দিয়েছেন। প্রোডাকশনে কিছু নতুনত্ব কিংবা চমৎকারিত্ব না দেখাতে পারলে তাঁর বোধহয় আর নিস্তার নেই। এ হেন বিপর্যয়ের দিনে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের চেয়ারম্যান-কাম-এম ডি সায়ন চৌধুরীর পরিবারে হঠাৎ একটি অঘটন ঘটে যেতে ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন রাহুল রায়। রৌণককে হঠাৎ বললেন, দিস ইজ হাই টাইম, মিঃ মুখার্জি। ক্র্যাশ দেম, ক্র্যাশ—

রাহুল রায়ের কথাগুলো প্রায় চেয়ারম্যানের কথারই প্রতিধ্বনি। হয়তো রাহুল রায়ই ভাবনাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে চেয়ারম্যানের মাথায়। এখন নিজে এসে রৌণককে তাতাচ্ছে, ক্র্যাশ—

প্রতিযোগী কোনও কনসার্নকে কী করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে — তাকে সত্যিই গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত কি না এমন ভাবনায় ক্রমশ নিজের ভেতর তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে রৌণক। লাইম ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ এতদিন তার উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে যে কাজ পারেনি, এখন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের বিপর্যয়ের দিনে এক ক্ষতিকারক বিজ্ঞাপন দিয়ে তাই-ই করতে চাইছে।

রাহুল রায়ের মুখের দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে রৌণকের মনে হল, তার মাথা ঘুরছে, ঝিমঝিম করছে শরীর। সে এতকাল বিজ্ঞাপনের কপি লেখা নিয়ে কতরকম চিন্তা-ভাবনা করেছে, কত কবিত্বও। কী ভাবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাদের লাইম ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট। কী ভাবে আরও গ্রহণীয় করে তোলা যায় তাদের বিউটিবাথ, কিংবা রেড রিবন, অথবা ব্লু জুয়েল — সেই সব নানান ভাবনার আবর্তে ব্যস্ত থাকে সারাদিন। বোধহয় রাতে স্বপ্নের ভেতরও কাজ করে চলে তার মগজ। বলা বাহুল্য, তারই বিজ্ঞাপনের জোরে কোম্পানি গত ছ-সাত বছরে তাদের প্রোডাক্টের একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি করতে পেরেছে। কিন্তু শুধু ভাবমূর্তি বাড়ালেই তো প্রোডাক্ট বিক্রি হবে না, তার সঙ্গে প্রোডাক্টের

কায়ালিটিও ভাল হওয়া দরকার। প্যারাডাইসের ড্রিমবাথের পাশে লাইম ইন্ডিয়ার
াথ, রোজবেরির পাশে তাদের লেমনটাচ্ কিংবা রেডরিবন দাঁড়াতেই পারছে না
ার্কেটে। রৌণক কী করবে!

এ দিকে রাহুল রায় চোখমুখ লাল করে বলছেন, ক্র্যাশ দেম, ক্র্যাশ---

আর সেই ক্র্যাশ করার দায়িত্ব এসে পড়ল কি না রৌণকের উপর!

ব্যাপারটা সত্যিই অনৈতিক। বিজ্ঞাপনের এথিকসে এ ভাবে কোনও প্রতিযোগী
নসার্নকে আক্রমণ করার অধিকার দেয় না। তুমি তোমার নিজের প্রোডাক্টকে যত খুশি
াল বলো, 'ভাল'র মগডালে তুলে দাও। বলো যে, এমন জিনিস সারা পৃথিবীতে আর কেউ
্যানুফ্যাকচার করতে পারেনি। কিন্তু অন্য সংস্থার প্রোডাক্টকে খারাপ বলার অধিকার তোমার
নই। তাদের আক্রমণ করে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া তোমার নীতিবিরুদ্ধ।

সমস্ত ভাবনাটা নিজের মনে ঢালা-উপুড় করতে করতে দারুণ বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগল
রৌণক। আশ্চর্য, স্বয়ং চেয়ারম্যানও তাইই চাইছেন। ক্রুদ্ধ চেয়ারম্যান চোখ-মুখ গরম করে
ম দিয়েছেন রৌণককে, ডু ইট ইমিডিয়েটলি।

লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের হুকুম তামিল না করা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার তা রৌণকরা
াড়ে-হাড়ে জানে। কদিন আগেই খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরকেই ইউনিয়নের ছেলেরা
ঘরাও করেছিল। বেশ কিছু খারাপ খারাপ কথাও তারা প্রয়োগ করেছে এম ডি-র উপর।
ার দু-চারটে শব্দ কানে শুনলেও চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। এম ডি তাদের বিরুদ্ধে কোনও
্যাকশনই নিতে পারেননি। কারণ অফিসে অন্যরা বলাবলি করেছে, ঘেরাও-এর পেছনে
য়ং চেয়ারম্যানের মদত ছিল। ইদানীং চেয়ারম্যানের সঙ্গে এম ডি-র ঠিক বনিবনা হচ্ছে
া, সম্ভবত তারই জের—

এখন তার পেনের সোনালি ক্যাপে কামড় দিতে দিতে রৌণকের মনে হচ্ছে, সে
কাম্পানির হালচালের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না নিজেকে। বলা যায়, মিসফিট।
একাল যা পড়েছে তাতে বেশ ধুরন্ধর টাইপের না হলে বেঁচে বর্তে থাকাই মুশকিল। এ
হন কোম্পানি, যা এই মুহূর্তে সিঙ্কিং সিপ, তাতে কাজ করা আরও সংকটের।

আসলে রৌণক নিতান্তই এক আটপৌরে বাঙালি ঘরের সন্তান। বরাবরই এমন
রোমান্টিক স্বভাবের। বিয়ের আগে ঋতবৃতাকে নিয়ে সে বেশ কয়েকটা কবিতাও লিখে
ফলেছিল। পড়ে খুব হেসেছিল ঋতু, ধুর, প্রেমপর্বে সব ছেলেই অমন মেয়েদের হরিণীর
তো চোখ, কালো মেঘের মতো চুল দেখে থাকে। কিন্তু বিয়ের পর ভালোবাসি শব্দটা পর্যন্ত
লতে ভুলে যায়। তখন কেবল রাগারাগি, খিটিমিটি।

রৌণকের সারা চোখে তখন উমসুম হয়ে ছিল স্বপ্ন, উঁহু, দেখো, আমিও ফরাসি কবি
ই আরাগঁর মতো বিয়ের পরও তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখে যাব। এমন চমৎকার মিষ্টি
মিষ্টি মেয়েকে সারাক্ষণ চোখের সামনে দেখলে কলমের ডগায় অমনিই কবিতা এসে যাবে।

বিয়ের এতদিন পরও ঋতবৃতা তেমনই মিষ্টি, তেমনই সুন্দরী রয়ে গেছে। গত তিনবছরে
ার সঙ্গে রৌণকের কবার খিটিমিটি হয়েছে তা সে হাতে গুনে বলতে পারে। আসলে
তবৃতার শরীরে যেন রাগ বলতে নেই। সব ব্যাপারেই তার যেন একটা অদ্ভুত বিস্ময়, অপার
কৌতূহল, পরম প্রশান্তি। ঋতবৃতার দরকারি কোনও জিনিস আনতে রৌণক পর-পর

দু তিনদিন ভুলে গেলেও ঋতবৃতা রাগে না। বলে, দাঁড়াও কাল অফিস যাওয়ার সময় তোমার পিঠে একটা কাগজ সেঁটে দেব, তাতে রিমাইন্ডার থাকবে। এমনকি রৌণক যদি কোনও কারণে রেগে ওঠে, তাতেও ঋতবৃতা মিটমিট করে হাসে, বলে, বাহ্ বেশ পার্সোনালিটি আছে তো তোমার। পুরুষমানুষ একটু-আধটু না রাগলে কি মানায়!

শুধু লুই আরাগঁ আর হয়ে ওঠা হয়নি রৌণকের। চাকরির চাপে কবিতা লেখার ব্যাপারটা সে এখন প্রায় ভুলেই গেছে। আপাতত তার যতটুকু কবিত্ব সব তার কোম্পানির বিজ্ঞাপনের কপিতে।

কিন্তু নিজের আদর্শ, ধ্যানধারণা অনুযায়ী কাজে করতে চাইলেই কি কাজ করা যায়। দুটো বুলডোজারের মতো দুদিক দিয়ে এখন তাকে চেপে ধরেছেন দুজন। একদিকে চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায়, অন্যদিকে প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল রায়।

এখন তার সামনে চেয়ারে বসা সেই রাহুল রায় ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ ফিসফিস করে বললেন, এক রিপোর্টারের সঙ্গে এক-আধটু জানাশোনা ছিল। ব্যস্, তাকে কঙ্কা রায়ের ব্যাপারটা খাইয়ে দিলাম। সেদিন এক সেমিনারে দেখি, কঙ্কা রায় একেবারে পরীর মতো সেজে এসেছে। যেমনি তার মারকাটারি ফিগার, তেমনি দুর্দান্ত মুখের প্রোফাইল। দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। দেখি কি, একেবার ফেভিকলের মতো সেঁটে আছে তার এম ডি সায়ন চৌধুরীর গায়ে-গায়ে। আর কী হ্যা হ্যা করে হাসছে। দিলাম ঝুলিয়ে—

তারপর একটু থেমে আবার ফিসফিস করলেন, সাংবাদিকরা এখন খবরের জন্য হাঁ করে মুখিয়ে আছে। আপনিও খাইয়ে দিন না একটা গসিপ। ওদের মধুমন্তী, ওই যে অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার, খুবসুরত চেহারা, আপনাকে তো ক'বছর ধরে খুব নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে। আপনার এত ভাল বিজ্ঞাপনের হাত, কিন্তু ওই মধুমন্তী, শুধু সুন্দরী মহিলা বলে কাগজের লোকগুলোকে হাত করেছে, আর কী খারাপ লে-আউটের বিজ্ঞাপন কী ভাল জায়গায় প্লেস করে নাম কিনছে বলুন! ডিভোর্সি তো, ওর সঙ্গেও সায়ন চৌধুরীর খুব হবনবিং। কিছু কিছু আমিও জানি। দিন না ফাঁস করে সব—

সায়নকে ব্লু-ওয়ান্ডার-এর গেটে সেই যে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দিয়েছিল, তারপর তার আর কোনও খোঁজই নেয়নি গার্গী, নেবেও না এমনই ভেবেছিল, তবু দু-তিনদিন কেটে যাওয়ার পর কী এক অনিবার্য তাড়নায় মনে হল, একবার টেলিফোন করে খবর নেওয়া উচিত। কিন্তু বেশ কয়েকবার ডায়াল ঘুরিয়ে দেখে, বাড়ির টেলিফোনটা পুরোপুরি ডেড, যেন ঐন্দ্রিলাবিহীন ফ্ল্যাটে সেও স্থাণু, শোকবিহ্বল। কিছু দোনামোনা করে অগত্যা রিং করল সায়নের অফিসেই।

পর-পর দুদিনই অবশ্য সায়নের অফিস থেকে একই জবাব পেল, সরি, হি ইজ নট

অ্যাভেইলেব্‌ল্‌ টু-ডে।

—নট অ্যাভেইলেব্‌ল্‌! গার্গী বুঝি-বা একটু চিন্তায় পড়ল! দ্বিতীয়দিন পীড়াপীড়ি করেও এ ছাড়া অতিরিক্ত কোনও বাক্য আদায় করতে পারল না তার অফিস থেকে। যেন এর বেশি আর কিছু উচ্চারণ করাও তাদের নিষেধ।

টেলিফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসছিল এক নারীর কণ্ঠস্বর। সে স্বর মৃদু, সুরেলা, অথচ বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। নিশ্চয় সায়নের রিক্রুট করা তার নতুন পি.এ., কী যেন নাম মেয়েটার, কঙ্কা, হ্যাঁ কঙ্কাই। গার্গী এ মেয়েটাকে দেখেনি কখনও, কিন্তু শুনেছে অপূর্ব সুন্দরী। খুবই স্মার্ট, আর ইংরেজিতে তুখোড় কথা বলে।

বছর দুয়েক আগে সায়নের এসপ্লানেড ইস্টের অফিসে খুব যাতায়াত ছিল গার্গীর, তখন তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে কেউ ছিল না, বোধ হয় দবকারও হত না। বছরখানেক হল, তাব কাজের চাপ এত বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে এত চিঠিচাপাটি, ফোনাফোনি যে, তার একজন পি.এ. না হলেই নাকি আর চলছিল না। তাই এই কঙ্কা। কঙ্কা রায়।

কঙ্কা সম্পর্কে টুকটাক আরও কিছু তথ্য এর আগে কানে এসেছে গার্গীর, কিন্তু যাচাই করার সুযোগ ঘটেনি। ঘটবেই বা কী করে! ঐন্দ্রিলার সঙ্গে সায়নের বিয়ের পর তার অফিসে যাওয়ার আর প্রয়োজন হয়নি গার্গীর। কিছু দরকার পড়লেই তো হুটহাট গিয়ে পড়ত তাদের ফ্ল্যাটে। সেখানেই জমাটি, খুশিয়াল আড্ডার আসর বসাত তিনজনে। তাতে সায়নের সুন্দরী পি.এ.-র মুখোমুখি কোনও দিন হতে হয়নি বলে তার ভেতরে কিছু আফসোস না ছিল তা নয়, তবে কৌতূহল দেখায়নি কখনও।

তবে অন্য আফসোস ছিল। কখন যে সায়ন হঠাৎ তার অফিসে একজন পি.এ. অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ফেলল তা সে জানতেও পারেনি সে সময়। পরে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, ইস, কখন বিজ্ঞাপন দিলেন কাগজে, দেখতে পাইনি তো! তা হলে আমিও অ্যাপ্লাই করতাম।

সায়ন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল তার কথা, ধুর তুমি পি.এ. হবে কি!

— কেন? গার্গী কৃত্রিম বিস্ময়ে বলেছিল, আমি যথেষ্ট সুন্দরী নই বলে? শুনেছি আপনার পি.এ. নাকি একেবারে আগুনের শিখা?

'আগুনের শিখা' শব্দবন্ধটিকে এড়িয়ে গিয়ে সায়নের জবাব ছিল অন্যরকম, উহুঁ, পি.এ.-ব চাকরির যোগ্যতায় তুমি ওভার-কোয়ালিফায়েড। যদি চাও তো আমার কোম্পানিতে তোমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে দিতে পারি। আমি একইসঙ্গে চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজ করে আর পারছি না।

গার্গী চোখ কপালে তুলে বলেছিল, ও বাবা, একেবারে খোদ এম. ডি? না বাবা, ও চাকরিতে আমার দরকার নেই।

সায়ন আর গার্গীর এহেন কথোপকথনের ফাঁকে ফুলে ফুলে হাসত ঐন্দ্রিলা, উফ, তোমরা পারও বটে।

কঙ্কা রায়কে দেখেনি গার্গী, কিন্তু ফোনে তার সংযত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল, বেশ পার্সোনালিটি আছে মেয়েটার। আজই সংবাদপত্রে কঙ্কা রায় সম্পর্কে কিছু টিপ্‌স্‌ দিয়েছে বক্স করে। কঙ্কা রায় শুধু সুন্দরীই নয়, তার সঙ্গে সায়ন চৌধুরীর বেশ হবনবিং

ছিল, সে কথা জানিয়ে দিয়েছে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে। কোনও একটা বড়সড় সেমিনারে সায়ন চৌধুরী এসেছিলেন বক্তৃতা করতে, সেদিন তাঁর সঙ্গে নাকি আঠার মতো সেঁটে ছিলেন কঙ্ক রায়। বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো এই যুবতীর সঙ্গে খুব হাসিঠাট্টাও করতে দেখা গেছে সায়নকে।

গার্গী সে খবর পড়তে বিড়বিড় করেছে নিজের মনে, কী অদ্ভুত এই খবরের কাগজঅলারা। একজন পুরুষ আব একজন নারী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললেই তারা মনে করবে তাদের মধ্যে অ্যাফেয়ার আছে! আশ্চর্য এই যে, দুজন পুরুষ কিংবা দুই নারীর মধ্যে অবাধ হাসিঠাট্টা চলতে পারে, কিন্তু একজন পুরুষ আর একজন নারীর মধ্যে নৈব নৈব চ। তার ওপর এম.ডি. যদি সুন্দরী পি এ-র সঙ্গে একটু খোসগল্প করেন, তার হলে তো কথাই নেই। আরে বাবা, এম. ডি তার ঠাসবুনোট কাজকর্মের ফাঁকে পি.এ-র সঙ্গে যদি এক-আধটু জোক করে রিল্যাক্সড্ মুডে থাকে, তা নিয়েও তোরা স্টোরি বানাবি!

'সরি হি ইজ নট অ্যাভেইলেব্ল্ টু-ডে' শুনে ভুরুতে কোঁচ পড়ল গার্গীর। বাড়ি ফিরেছে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল, অথচ সায়ন আজ পর্যন্ত তার অফিসে আসছে না, কাজকর্ম করছে না, ফিরে আসছে না স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়, এটা ভেবে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে, কিছু দুর্ভাবনায়ও। সায়ন কি বাড়িতেই আছে, নাকি অন্য কোথাও! বাড়িতে থাকলে তার সুনসান ফ্ল্যাটে একা কী করছে, কীভাবে কাটাচ্ছে সেই প্রেতপুরীতে, কেমন আছে—এইসব সাতপাঁচ ভেবে ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করতে থাকে। সেদিন বাড়ির ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতো তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল বাড়ির গেটে এ-কথা ভেবে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছিল সে। সমস্ত পৃথিবী যখন সায়নকেই সম্ভাব্য খুনি হিসেবে চিহ্নিত করে উপভোগ করছে এক অদ্ভুত আরাম, তখন কী জানি কেন গার্গী সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সে অনেকবার 'যাই, গিয়ে দেখে আসি কী করছে', 'না থাক', 'উঁহু, যাই-ই না', ইত্যাদি নানান ভাবনায় আন্দোলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল তার জুবিলি পার্কের আস্তানা থেকে। দু-দুটো বাস পাড়ি দিয়ে একসময় পায়ে-পায়ে গিয়ে হাজির হল আপাতত কলকাতার তাবৎ মানুষের কৌতূহলের লক্ষ্যবস্তু 'ব্লু-ওয়ান্ডার'-এর গেটে। দুপাশে যথারীতি পুলিশ দণ্ডায়মান। তাকে দেখে তারা পরস্পর চোখাচোখি করল, কিছু ইঙ্গিতও। কিন্তু গার্গী ভ্রূক্ষেপ করল না। তার চেহারা নজরে পড়তে ছুটে এসে গেটের দরজা হাট করে খুলে দিল এ-বাড়ির মোহন নামের ভৃত্য-কাম-দরোয়ানটি। এর আগে এ বাড়িতে যতবার এসেছে গার্গী এভাবেই দরজা খুলে দিয়েছে মোহন। প্রতিবারের মতোই এবারও লোকটি কোনও শব্দ করল না মুখে। চেনা মানুষ হলে অবশ্য তার শব্দ না করারই নিয়ম।

অবলীলায় গেট পেরিয়ে গার্গী হনহন করে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়িটা প্রথম কয়েক ধাপ উঠে যাওয়ার পর দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ধাপের সিঁড়ি বেয়ে বাঁ দিকে উঠলে সায়নদের ফ্ল্যাট, ডান দিকে উঠলে চন্দ্রদেবী-হিমনদের। এটুকু ছাড়া দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে আর কোনও যোগসূত্র নেই। সায়নের বাবা নাকি এমনভাবে ডিজাইন করিয়েছিলেন তাঁর বাড়িটা, যাতে দুই ছেলে দুই স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হতে পারে। এও নাকি বলেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তিনি থাকবেন সায়নদের সংসারে, চন্দ্রাদেবী থাকবেন

মনের কাছে।

কেন এমনটা বলেছিলেন, তা নিয়ে কু-লোকে অবশ্য কু কথা বলে।

যাই হোক, সংসারের শেষটুকু আর নিশীথ চৌধুরীর কপালে দেখা হয়ে ওঠেনি, যেহেতু ছেলেদের বিয়ের অনেক আগেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল অন্য-লোকের ডাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে বেঁকে দোতলায় পৌঁছে কলিংবেলে আঙুল ছোঁয়াল গার্গী। দু তিনবার ভেতরে টুং-নানা শব্দ হওয়ার পরেও যখন দরজা খুলতে কেউ এগিয়ে এল না, গার্গী অবাক হল, গাঢ় হল তার দু ভুরুর কোঁচ, কী করব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুইং-ডোর ঠেলতেই চট করে খুলে গেল দরজাটা।

নিতান্ত বিস্মিত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়তেই তার শরীর জুড়ে প্রবল এক অস্বস্তি। কদিন আগেও সে ঘরে ঢোকামাত্র হইহই করে ছুটে আসত ঐন্দ্রিলা, আরে মিতুন, আয় আয় — তোকে কতদিন দেখিনি। এবার কেউ আর সেরকম বলল না, বরং লিভিং রুমে ঢুকে দেখল এক বিচিত্র দৃশ্য।

সায়ন বসে আছে সোফায়, গা এলিয়ে, প্রায় চিত্রার্পিতের মতো। চুল উসকোখুসকো, কতদিন স্নানঘরে যায়নি কে জানে, মুখে কালো ছোপ ধরা দাড়ি, কাস্টডি থেকে বেরুবার পরও কামানো হয়নি, পরনে আধ-নোংরা পাঞ্জাবি-পাতলুন। তার সামনে সেন্টারটেবিলে দু-তিনটে সিগারেটের খালি প্যাকেট, মেঝেতেও তিন-চারটে। অ্যাশট্রেতে উপচে পড়ছে আধপোড়া সিগারেটের টুকরো, ছাই —। এক পাশে খালি একটা রামের বোতল, খালি গেলাসও। পার্টিতে কিংবা আউটিং-এ না গেলে সায়ন ড্রিঙ্ক করে না এমনই জানত গার্গী অথচ এখন তার চেহারা, সেন্টার টেবিলের দশা, মদের বোতল, ঘরের পরিবেশ, সব দেখে আঁতকে উঠল।

সায়নের চোখে তখন এক অস্পষ্ট, ধূসর চাউনি। গার্গীর দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি যেন বহু যুগের ওপার থেকে। কিছুক্ষণ তার দিকে অদ্ভুত, আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে রইল গার্গী। তার কাছে এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। গত কয়েক বছরে যে সায়নকে সে তিলতিল করে চিনেছে, সে সায়ন আর এই সায়ন যেন এক নয়। এই সায়নকে সে চেনে না, আর সায়নও যেন চিনতে পারছে না তাকে।

অনেক, অনেকক্ষণ এমন অচেনার মতো তাকিয়ে থাকতে থাকতে গার্গী হঠাৎ ডেকে উঠল, সায়নদা—

ডাকতেই মনে হল, সায়নের চোখের কোণ দুটো চিকচিক করছে। সে দৃশ্যে গার্গীরও দু চোখ ভরে জল আসতে চাইল। তক্ষুনি চোখ ফিরিয়ে নিল সে, প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে তার চোখেও দুর্বলতা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। তবু এই কদিনে তার জমে থাকা অশ্রুর ঢল আছাড়িপিছাড়ি করছে ভেতরে। কান্না সামলে নিয়ে কোনও ক্রমে বলতে পারল, ছি সায়নদা, এভাবে কেউ নোংরা হয়ে থাকে!

পরমুহূর্তে সে আলমারি খুলে বার করল সায়নের কাচা ইস্ত্রি করা পাজামা-পাঞ্জাবি, দ্রুত তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, নিন, শেভ হয়ে এসে স্নান করে জামাকাপড় বদলে নিন। কুইক। তারপর সেন্টারটেবিলের ওপর পড়ে থাকা যাবতীয় আবর্জনা একটা-একটা করে তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখল ঘরের কোণে। অ্যাশট্রে খালি করে আবার সেটা রেখে দিল যথাস্থানে। মেঝের

ধুলো পরিষ্কার করে ফেলল একনিমেষে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, ডাইনিং টেবিলে অর্ধেক খাওয়া ভাত-তরকারির রাশ। সায়নকে খাবার পাঠাচ্ছে কেউ, হয়তো তার মা। কিংবা হয়তো মোহন এনে দিচ্ছে বাইরের হোটেল থেকে। কিন্তু সে ভাত তার মুখে রুচছে না। তার মানে, এ কদিন প্রায় অভুক্তই আছে সায়নদা।

ডাইনিং টেবিলের এঁটো পরিষ্কার করে এ ঘরটাও মুহূর্তে পরিষ্কার করে তুলল গার্গী। তারপর বেডরুম। কয়েক মিনিটের মধ্যে এতদিনকার অবহেলায় পড়ে থাকা সংসারটা আবার গুছিয়ে ফেলল ম্যাজিকের মতো। কেন করছে তা সে জানে না। যেন ঐন্দ্রিলার ফেলে যাওয়া সংসারটা গুছিয়ে রাখার দায় তারই। না হলে ঐন্দ্রিলা যেন বলবে, কি রে মিতুন, তুই থাকতেও তোর সায়নদা ওরকমভাবে নোংরার মধ্যে বাস করবে?

সায়ন তখনও চুপচাপ বসে আছে নিথর, ভাবলেশহীন হয়ে। হয়তো বিস্মিত হয়ে গার্গীর এই অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা দেখছে। গার্গী তো এ বাড়ির অতিথি হয়েই ছিল এতটা কাল। সে আসত, জাঁকিয়ে বসে হইহই করত, কফি কিংবা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঝড় তুলত কোনও আনকোরা আলোচনায়, তারপর আবার টা টা করে ফিরে যেত তার নিজের আস্তানায়। আর আজ হঠাৎ—

হঠাৎই গার্গী চলে গেল ঐন্দ্রিলার ফেলে যাওয়া কিচেনে। খুঁজে বার করল কফির পাত্র। তারপর গ্যাস জ্বালিয়ে কয়েক মুহূর্তে বানিয়ে ফেলল দু কাপ গরম কফি। প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এসে দুম করে রাখল সেন্টারটেবিলে, নিন তো, কফি খান। তারপর দ্রুত তৈরি হয়ে নিন। একটু বেরুব।

—কোথায়, শব্দটা সায়নের গলা থেকে না ফুটে বেরুলেও তার সম্বিত ফিরে পাওয়া চাউনি থেকে ছড়িয়ে পড়ল গার্গীর চোখেমুখে। সে কথার উত্তর না দিয়ে গার্গী আবারও বলল, নিন, খেয়ে নিন। বলে তার হাতে ধরিয়ে দিল কফির কাপ। তারপর বাকি কাপ-প্লেটটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বেশ আয়েস করে চুমুক দিয়ে বলে উঠল, বাহ্, ফার্স্ট ক্লাস।

মনে মনে হেসেও ফেলল সঙ্গে সঙ্গে, সে নিজের হাতে তৈরি কফি কিনা নিজেই তারিফ করছে মহানন্দে। কিন্তু এতক্ষণে দেখল সায়নও কফির কাপে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, তার দু চোখ ভরে জল। গার্গীরও চোখে আবার জল উপচিয়ে আসছে, কিন্তু তা দমন করে বলল, আপনার গাড়িতে তেল আছে? একটু বেরুব—

সায়ন বুঝতে পারছে না, গার্গী কী করতে চায়, কোথায়ই বা যেতে চায় হঠাৎ। গরম কফিতে তার শরীরে জড়তা ভেঙে উষ্ণ হয়ে উঠছে দ্রুত, দু চোখের অশ্রুর ভিতরেও উথলে উঠল তার বিস্ময়, কোথায়?

—আগে স্নান সেরে রেডি হয়ে নিন তো, তারপর জানতে পারবেন।

প্রায় হুকুম দিয়েই সায়নকে শেভ করিয়ে, স্নান করিয়ে, পরিষ্কার জামাকাপড়ে ঝকমকে করে তুলল গার্গী। সায়নের শরীরে জমে থাকা কতদিনের ক্লেদ, ক্লান্তি, জড়তা ঝরিয়ে ফেলে তাকে চাঙ্গা করে তোলা যে কী কঠিন কাজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল, অথচ সে যে সায়নকে চিনত, সে একেবারেই অন্যরকম ছিল। বরাবর দেখেছে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস-এর চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইন ফ্যাক্ট অল-ইন-অল সায়ন চৌধুরী কলকাতার অন্যতম স্মার্ট, ঝকঝকে, উদ্যমী, কর্মতৎপর, বুদ্ধিদীপ্ত যুবক। কয়েক বছরের মধ্যে এ

শহরের এক সফল ব্যক্তিত্বও বটে। আর ঐন্দ্রিলার সঙ্গে বিয়ের পর এ-কথাও প্রমাণিত হয়েছে, গার্হস্থ্য জীবনেও সে অন্য যে কোনও পুরুষের চেয়েও যথেষ্ট ঈর্ষণীয়।

আজও সাদা বেসের উপর হালকা নীল স্ট্রাইপ দেওয়া শার্টটি তার ডিপ ব্লু রঙের প্যান্টের ভেতর গুঁজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সেই সফল পুরুষের কিছুটা উদ্ভাসিত হল। কিন্তু তার চোখমুখে বিন্দু মাত্র উৎসাহ নেই। দুটি চোখ বরং সন্ত্রস্ত, উদভ্রান্ত।

গার্গী তাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে গ্যারেজের কাছে গিয়ে গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে বলল, এ যাত্রা না হয় আমার ভূমিকাটা একটু বদলে নিই। রোজ আমিই যাত্রীর সিটে বসি, আজ বসব চালকের সিটে। আপনাকে আজ সওয়ারি করে নিই।

গার্গীর একনাগাড় কাণ্ডেভাণ্ডে রীতিমতো বেবাক, বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল সায়ন। কয়েকদিন ধরেই তার মস্তিষ্ক ঠিকঠাক সচল, রীতিসম্মত নেই। আজও সে তার বোধ, চেতনা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হল। চুপচাপ বাধ্য ছেলের মতো গিয়ে বসল সামনের সিটে, চালকের পাশে। মেয়েরা এভাবেই বোধহয় প্রায়শ রেইন করে থাকে পুরুষদের ওপর। সে বসতেই তৎক্ষণাৎ গার্গী প্রায় বিদ্যুৎগতিতে চালিয়ে দিল সায়নের নতুন কেনা মারুতি ভ্যান। গাঢ় চকোলেট রঙের সেই বাহনটি। ঐন্দ্রিলা হেসে বলেছিল, এ আমার এক সতীন। সারাক্ষণ তুকতুক করে রেখেছে ওটাকে। যেন গাড়িটার গায়ে টোকা লাগলেও ফোস্কা পড়বে।

গার্গী প্রথমেই সায়নকে নিয়ে গেল পার্ক স্ট্রিটের একটা দামি রেস্তরাঁয়। ঝকঝকে নীল ঢেউ খেলানো সানমাইকার টেবিলে বসে বেয়ারাকে অর্ডার দিল বিরিয়ানি, চিকেন-চাঁপ। সঙ্গে রায়তা, আলু-মটর। আর ফ্রুট জুস। বলতে না বলতে চমৎকার খাবারের সুগন্ধে ভরে উঠল তাদের টেবিল। সায়ন খেতেই পারছিল না প্রায়, বার বার বলছিল, পারব না, গার্গী। একটুও খাবার ইচ্ছে নেই আমার। আমাকে ছেড়ে দাও, প্লিজ। গার্গী নিজেও কি পারছে খেতে! এতক্ষণ ঐন্দ্রিলা থাকলে সমস্ত পরিবেশটাই হয়ে উঠত অন্যরকম। সায়নকে কত স্মার্ট আর খুশি-খুশি লাগত। ঐন্দ্রিলা খুব বেশি হইচই করতে পারত তা নয়, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত এক অদ্ভুত মাদকতা মাখানো হাসির টুকরো। অথচ গার্গী বরাবরের চঞ্চল, দুষ্টু, একাই হইহই করে জমিয়ে রাখত গোটা টেবিল। সেই গার্গীই আজ কত শান্ত। স্তব্ধতার মধ্যেও প্রায় মৃদু ধমকের মতো বলছে, ঠিক আছে,আর একটু খেয়ে নিন। আর একটুকরো চিকেন।

প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো সায়ন খেয়ে উঠল রেস্তোরাঁ থেকে। গার্গী সবসময় খেয়াল রাখছে, তাদের দিকে কেউ কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে কি না। সংবাদপত্রের কল্যাণে সায়ন এখন প্রায় ভি আই পি-র মর্যাদা পাচ্ছে, অবশ্যই বেশ কদর্থে। তবু পারিপার্শ্বিক কোনও চাউনিকেই এখন আর ভ্রুক্ষেপ করছে না সে। আসার পথে একবার মনে হয়েছিল, একটা সাদা অ্যামবাসাডার যেন তাদের ফলো করছে। কিন্তু এত দ্রুত গার্গী স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এ গলি ও গলি পার হয়ে পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে পড়েছে যে সাদা অ্যামবাসাডার তাদের পাত্তাই করতে পারেনি। কি জানি, হয়তো কোনও প্লেন ড্রেসের পুলিশ—

পার্ক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এবার গার্গী চলল রেসকোর্স পার হয়ে দক্ষিণের দিকে। রবীন্দ্র সদন ক্রশ করে রেসকোর্স ডাইনে রেখে সে বাঁই করে ঢুকে পড়ল ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভিনিউ হয়ে একবালপুর, সেখান থেকে সোজা বেহালার

পাশে [illegible] স্পিডোমিটাবেব কাঁটা লাফিয়ে তুলে দিল [illegible] নাবকেলগাছেব সাবি ভ্যান প্রায় পক্ষিবাজ ঘোড়াব মতো উড়ে চলেছে ডায়মন্ডহাববাবেব বাস্তায়।

দুটি বাজ যেন সমান ভাবে নিজে পাল্লা দিচ্ছে না বব সংযুক্ত হই পৃথিবাজকে—

সায়ন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল গার্গীকে। এ তারা কোথায় চলেছে, কেনই বা চলেছে [illegible] ওর দিকে তাকাচ্ছেই না। সে স্তব্ধ নির্বাক শুধু মাঝেমাঝে স্পিডোমিটাবেব দিকে তাকিয়ে কখনও আবও স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছিল তার ওই এক্সিলাবেটবে চাপ দিয়ে। [illegible] কোথাও যাওয়াটা তাব লক্ষ্য নয়। যে সায়ন তাব সমস্ত প্রাণচাঞ্চল্য হাবিয়ে [illegible] জড়পদার্থ হতে চলেছে, তাব বক্তে পুনবাব ফিবিয়ে আনতে চাইছে প্রাণস্পন্দন। তাই এই গতি। আবও গতি, আবও। দ্রুত পাড়ি দিতে দিতে হঠাৎ এক একটা টার্ন নিচ্ছে স্পিড একটুও না কমিয়ে। কখনও ভাবী ট্রাক, কিংবা লং রুটেব বাস গাঁক গাঁক করে [illegible] একটুও না বদলে সামান্য কব্জিব মোচড়ে নিখুঁত কায়দায় তাদেব পাশ কাটিয়ে চলেছে। দুএকবাব সায়ন এক আধবাব বলাব চেষ্টা কবল, আস্তে গার্গী, আস্তে। এ সব গাড়ি [illegible] প্রায় দৈত্যেব মতো আসে। একটু ছোঁয়া লাগলেই—

কিন্তু গার্গী শুনছেই না কিছু। তাব বক্তে আজ যেন গতিব নেশা।

ডায়মন্ডহাববাব নয়। গার্গী হঠাৎ দস্তিপুব থেকে ডাইনে স্টিয়াবিং ঘুবিয়ে তাব পথ বদলে নিল ফলতাব পথে। হু হু কবে এসে পৌঁছুল গঙ্গাব ধাবে। কিছুক্ষণ ফাঁকা চত্বরে কাটিয়ে গঙ্গাব বিশুদ্ধ হাওয়ায় স্নান কবে চাপুবচুপুব পবিতৃপ্ত হয়ে নিজেই তাব খোলা বশ্মিতে ঝবঝক কবে ঘণ্টা দু তিন পব আবাব ফিবে চলল কলকাতাব দিকে। ফেবাব পথে কিছু কেক বিস্কুট ছাড়াও বাতেব খাবাব কিনে নিল। তাবপব ব্লু-ওয়ান্ডাব-এ পৌঁছে গাড়ি গ্যাবেজ কবে সমস্ত খাবাব সায়নেব জিম্মায় বেখে একসময় ফিবে গেল নিজেব ডেবায় যেন একটা যুদ্ধ জয় কবে ফিবল।

তাব পবদিন একই সময়ে গার্গী আবাব এল সায়নেব ঘবে। ঠিক একইভাবে সায়নকে হাইজ্যাক কবে নিয়ে গেল অন্য বাস্তায়। বাবাসত ডাকবাংলোব মোড় পাব হয়ে কল্যাণীব পথে এলোমেলো ঘুবে বেড়াল গাঁয়ে গঞ্জে, কল্যাণী টাউনশিপেও কিছুক্ষণ।

তাব পবদিন উলুবেড়িয়া পেবিয়ে গাদিয়াড়ায়। দুজনে অনেকক্ষণ ধবে রূপনাবায়ণেব তীব ধবে হাঁটল। দু চোখ ভবে দেখল, রূপনাবায়ণ আব হুগলি নদীব মেশামেশি — এক বিশাল জলবাশিব অপরূপ মন জুড়ানো দৃশ্য। সন্ধে হলে ফেব তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে ফিবে এল কলকাতায়। পবপব কয়েকদিন এমন নতুন সব দৃশ্যাবলিব ভেতব সায়নকে ঘুবিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাইল তাব ভেতবেব সব শোক। তাকে নিয়ে গেল এমন সব জায়গায়, যেখানে ঐন্দ্রিলাব সঙ্গে আসেনি সায়ন। তা হলেই ঐন্দ্রিলাব কথা ফেব মনে পড়ে যেত তাব। তাই ই একদিন কাকদ্বীপে, একদিন হাসনাবাদ।

গার্গীকেও যেন কয়েকদিনে এক অদ্ভুত গতিব নেশায় পেয়ে বসেছে। সেই তীব্র গতি সে সঞ্চাবিত করে দিতে চাইল সায়নেব শবীবেও। আব আশ্চর্য, গার্গীব থিয়োবি হুবহু কাজে লেগে গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্তব্ধ, শোকবিহ্বল সায়ন কয়েকদিনেব মধ্যে আবাব হয়ে উঠল গতিময়, প্রাণচঞ্চল, কিন্তু আগেব চেয়ে বেশ একটু গম্ভীব, সংযত, ঢেব বয়স্কও।

তারপর একদিন সায়ন নিজেই বলল, ভাবছি, কাল একটু অফিসে যাব।

গার্গী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল তাই,?

— একটা নতুন প্রোডাক্ট ছাড়া হবে বলে সমস্ত পরিকল্পনা করা ছিল। তার কী হল কে জানে। আমি কদিন অফিসে না থাকা মানে নিশ্চয়ই সব জট পাকিয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে সাজাতে হবে সব কিছু।

গার্গী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে শুধু এইটুকুই চেয়েছিল। ঐন্দ্রিলা নিশ্চয় কষ্ট পাচ্ছিল সায়নের অমন বিবর্ণ, হতশ্রী দশা দেখে। এখন আবার খুশি হয়ে উঠবে ঠিক।

বেশ খুশি মনেই সেদিন ঘরে ফিরেছিল গার্গী। হয়তো অনেকদিন পরে একটু ঘুমিয়েও ছিল ভাল করে। কিন্তু পরদিন খবরের কাগজ হাতে পেতে ভীষণ চমকে উঠল —

প্রথম পৃষ্ঠার নীচে বেশ বড় করে একটা সংবাদ ছাপা হয়েছে, তার মর্মার্থ ঃ

নাটকীয়ভাবে ঐন্দ্রিলা-হত্যা রহস্যে এক নতুন মোড়।

সেদিন সকালে খবরের কাগজ পড়ছিলেন সুশোভন মুখার্জিও। সুশোভন একটি কোম্পানির জুনিয়র এক্সিকিউটিভ। তাঁকে অফিসে বেরুতে হয় সকাল আটটার মধ্যেই। কোম্পানির গাড়ি তাঁদের ফ্ল্যাটের নীচে পাক্কা আটটা বাজতে একমিনিট আগে এসে হর্ন দেবে, আটটা এক পর্যন্ত দাঁড়াবে গাড়িটা, তার মধ্যে সুশোভন নীচে নেমে গাড়িতে না উঠতে পারলে ড্রাইভার হুস করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবে পরবর্তী অফিসারের বাড়িতে। গাড়িটা বড়সড় একটা স্টেশন ওয়াগনের মতো, জনা বারো অফিসারকে এভাবে পিক আপ করে ঠিক পৌনে নটার মধ্যে কোম্পানির অফিস-গেটের মধ্যে ঢুকে যায় রোজ। ফলে সকালের প্রতিটি মুহূর্তই সুশোভনের কাছে জরুরি। কোনও কারণে গাড়ি ফেল করলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তক্ষুনি অ্যাটাচি হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বড়রাস্তায় যেতে হবে। সকালের ওই পিক আওয়ারে ট্যাক্সি ধরাটা প্রায় লটারি পাওয়ার সমতুল। মিনি বাসে গেলে অন্তত বিশমিনিট লেটে ঢুকতে হবে অফিসে।

গাড়ি ফেল করার একটা অন্য অর্থও আছে তাদের কোম্পানিতে। অন্য অফিসারদের চোখে এটা তাঁর ইনএফিসিয়েন্সি। তা ছাড়াও, হয় বাইশ-চব্বিশ টাকা ট্যাক্সিতে গাঁটগচ্চা, অথবা মিনিবাসে কুড়ি মিনিট লেটে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাচ-ঘেরা ঘরের সামনে দিয়ে তাঁর সিটের দিকে যাওয়া — দুটোই তাঁর কাছে দু'রকম যন্ত্রণা।

হেডলাইন ছাড়া সকালের দিকে খবরের কাগজের আর একটি পঙ্‌ক্তিও প্রায় দেখা হয়ে ওঠে না তাঁর। কিন্তু সেদিন হঠাৎ প্রথম পৃষ্ঠায় একেবারে নীচের একটা খবরে চোখ আটকে গেল দুম করে। ঐন্দ্রিলা হত্যার ব্যাপারে যে খবরটি প্রতিদিন ধারাবাহিক বেরুচ্ছে, মাঝেমধ্যে কৌতূহলী হয়ে তার দু-চার লাইন পড়ে ফেলেন কখনও। আজও তার রসালো হেডিং,

তার সঙ্গে খবরের প্রথমেই গার্গীর নামটা দেখে বেশ একটা শক্ খেলেন সুশোভন।

সায়ন চৌধুরীর জীবনে আরও এক নতুন নারী এমন একটি টাইটেল দিয়ে বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছেন, ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর দশ-বারো দিনও যায়নি, এর মধ্যে সায়ন চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয়, দামি হোটেলে, এমনকি কোনও দিন ফলতা, কোনও দিন কল্যাণী, কোনও দিন কাকদ্বীপে। সঙ্গে ঐন্দ্রিলারই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী গার্গী মুখার্জি, যার সঙ্গে বিয়ের অনেক আগে থেকেই একটা মাখামাখি ছিল সায়নের। ঘটনাটি পুলিশমহলে আলোড়ন তুলেছে। ঐন্দ্রিলা-হত্যার ব্যাপারে যে অনুসন্ধান চলছে, তাতে এই ঘটনাটি এক নতুন আলোকপাত করবে বলে বিশেষজ্ঞমহল মনে করছেন।

পুরো লেখাটা পড়ে শেষ করতে পারলেন না সুশোভন। তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল থরথর করে। প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ হিসেবে তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে খবরটা, আরও প্রায় দু'কলম জুড়ে। দু এক জায়গায় চোখ বোলাতেই গলা শুকিয়ে এল তাঁর। ফ্যাসফেসে গলায় ডাকলেন অনু, অনু, অনমিত্রা—

অনমিত্রার তখন রান্নাঘর থেকে একসেকেন্ডও বেরিয়ে আসার সময় নেই। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে গ্যাসের ওপর পর-পর আইটেম চাপিয়ে যেতে হয় তাকে। ঠিক সাতটা চল্লিশের মধ্যে ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দিতে হবে সুশোভনের ভাত। নইলে অনর্থ। তাঁদের কোম্পানির অন্য সব অফিসাররা অবশ্য কেউই বাড়িতে লাঞ্চ খান না। সবাইই ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোন। লাঞ্চ খেয়ে নেন অফিসে। কিন্তু অফিসের রান্না সুশোভনের পছন্দ নয় বলে যত সকালেই হোক বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে যাওয়াটাই রপ্ত করে নিয়েছেন। অফিসে গিয়ে সবাই যখন লাঞ্চ-আওয়ারে চলে যান অফিসারদেব বিশেষ ক্যান্টিনে, সুশোভন তখন একটা হেভি টিফিন সেরে নেন নিজের চেম্বারে বসেই।

ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে সাতটা ছুঁই-ছুঁই, সুশোভনের ডাকেও তাই অনমিত্রার সাড়া দেওয়াব অবসর থাকে না। বার দুই-তিন অসহিষ্ণু ডাক শুনে বাধ্য হয়ে রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, মাছের ঝোল সবে চাপিয়েছি—

সুশোভনের তখন সে-কথা শোনার ধৈর্য নেই, বেশ তিরিক্ষি মেজাজেই বলে উঠলেন, বলছি একবার শুনে যাও—

মেজাজ শুনে, কিছু একটা গোলমাল আঁচ করে অনমিত্রা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল দ্রুতপায়ে, সুশোভনের মুখচোখ দেখে ভয় পেয়ে বলল, কী হয়েছে, কোনও খারাপ খবর নাকি।

খবরের কাগজটা অনমিত্রার মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে সুশোভন ঝাঁকিয়ে উঠলেন, দ্যাখো পড়ে, মিতুনের ব্যাপার-স্যাপার।

খবরের কাগজটা মাটিতে মুখ ঘসটে পড়ে রইল। সেদিকে একবার তাকিয়ে অনমিত্রা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সুশোভনের মুখের দিকে, কী হয়েছে, বলবে তো?

সুশোভনের মুখচোখ তখন রাগে লাল টকটকে হয়ে গিয়েছে, কাঁপছে আঙুলগুলোও, ফের ঝেঁকে উঠে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, সমাজে আর মুখ দেখানোর জো রইল না। শেষ পর্যন্ত আমার বোন কিনা একটা খুনি আসামির সঙ্গে কেচ্ছা করে বেড়াচ্ছে! তার সঙ্গে ঘুরছে এখেনে-সেখেনে! আর তাকে নিয়ে মজা লুটছে লম্পটটা!

কিছুক্ষণ চেঁচাতেই মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল সুশোভনের। এই ঘটনার পর সুশোভন আর কি অফিসের গেট পেরোতে পারবেন! চারদিকে আলোচনার ঝড় বয়ে যাবে এমন ভাবতে ভাবতে অসহায় চোখমুখ করে গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন সোফায়। অনমিত্রা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে, কী হয়েছে। গলা চড়িয়ে বলল, এবার তুমিই বোঝো। কতবার বলেছি, বাড়ির মেয়েকে অমন লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো ঘুরতে দেওয়া ভাল নয়। মেয়ে একেবারে স্বাধীন। কী না কী একটা অফিসে চাকরি করে, আর কী সব লেখেজোখে, তার জন্যে ভোর থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত তার টিকিটিও দেখা যায় না। ছি ছি, কী লজ্জা! আত্মীয়স্বজনদের কাছে মুখ দেখাবে কী করে। এখন ঘর থেকে বেরুলেই তো উষা মাসিমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। নিশ্চয় ওরাও এতক্ষণ পড়েছে সব।

সুশোভন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, দাও, বাড়ি থেকে দূর করে দাও। কোথায় গেলেন তিনি।

—কোথায় আবার যাবেন। ফিরছেন তো রাত সাড়ে দশটায়। এখন বেলা দুপুর পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন।

গার্গী অবশ্য তখন আর ঘুমিয়ে নেই। অনেকক্ষণ আগেই জেগেছে। জেগে জেগে ভোরঘুমের সুখ উপভোগ করছিল। হঠাৎ ড্রইংরুম থেকে ভেসে আসতে শুনল দাদা-বউদির চিল-চিৎকার। শুনে একটু অবাকই হল, কারণ সকালের এই দেড়-দু'ঘণ্টা সময় তাদের কিচেন ও ডাইনিং-এ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি চলে। এক রবিবার যা ব্যতিক্রম। কিন্তু আজ তো রবিবার নয়। গার্গীদের সোসিও ইকনমিক বিসার্চ আকাদেমিতে বুধ, শনি আর রবিবার ক্লাস থাকে, গতকাল তার ক্লাস ছিল না, আজও নেই। অতএব—

খানিকক্ষণ কান খাড়া করে সে বুঝতে পারল, কলহের বিষয়বস্তু মিতুন ওরফে গার্গীই। মাঝমধ্যে এরকম দু-চারবার হয়ে থাকে মাসের মধ্যে। দাদা-বউদির সংসারে আইবুড়ো ননদ থাকলে, সে ধর্মের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ালে এমন বিবাদ-বিসম্বাদ যে হবেই তাতে তার নিজেরও কোন সন্দেহ নেই। প্রতিমাসে সে ষোলোশো টাকা পায় তাদেব আকাদেমি থেকে। তার থেকে ছ'শো টাকা বউদির হাতে তুলে দেয় সংসার-খরচ হিসেবে। সেই ছ'শো টাকায় নাকি আজকাল একজন মেয়ের মাসের থাকা-খাওয়া চলে না একথা অনেকবার শুনেছে, বোধহয় আজও সেরকম কোনও তুফান উঠেছে চায়ের কাপে।

কিন্তু কান পেতে শুনে মনে হল, ব্যাপারটা তার চেয়েও সিরিয়াস।

দ্রুত মশারি-বিছানা গুছিয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখল, যা ভাবছিল, তার চেয়েও ডাব্‌ল-ডাব্‌ল জরুরি ব্যাপার ঘটে চলেছে ড্রইংরুমে। দাদা সুশোভন আড় হয়ে পড়ে আছে সোফায়। ও পাশে বউদি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাগ-রাগ মুখ করে। তাদের দু'জনের মাঝখানে হাইফেন হয়ে সকালের কাগজটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। তৎক্ষণাৎ কিছু একটা অনুমান করে সে দ্রুত কুড়িয়ে নিল কাগজটা। তেমনই দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে শুনল, নীচে দাদার গাড়ি হর্ন দিয়ে সুশোভনকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পেয়ে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল অন্য অফিসারের বাড়ি। তার মানে ব্যাপারটা রীতিমতো সিরিয়াস। ট্রিপ্‌ল-ট্রিপ্‌ল, কিংবা রি-ডাব্‌ল রি-ডাব্‌ল।

তখন হঠাৎ কাগজের নীচের দিকে চোখ পড়তে সে সমস্তই বুঝে ফেলল মুহূর্তে।

খবরটায় চোখ বোলাতে বোলাতে তার চোখের পাতা প্রায় পুড়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পড়ার পর সে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, গত কয়েকদিন এক ঘোরের মধে সে ঘুরে বেড়িয়েছে সায়নকে নিয়ে। একবারের জন্য অবশ্য তার মনে হয়েছিল কলকাতার পথে কেউ যেন অনুসরণ করছে তাদের। গোয়েন্দা, না সাংবাদিক, না পুলিশ — তা ঠিক অনুমান করতে পারেনি। তখন মনে করেছিল তাদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে। কিন্তু শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরে তারা যেখানে-যেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে, সব জায়গাতেই ফলো করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তো লিখেইছে, উপরন্তু তারা যা করেনি তাও রসালো করে লিখেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। পড়তে পড়তে রাগে-ঘেন্নায়-অপমানে কুঁচকে এল তার চোখমুখ। তার সঙ্গে ভীষণ একটা মন-খারাপ করার মতো ব্যাপারও। সারা পৃথিবী এখন সায়ন চৌধুরীর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলছে, সে একটা খুনি, খুনি, খুনি। তার ফ্ল্যাটে যাওয়া, তার সঙ্গে মেলামেশা করা, কথা বলা, বেড়ানো — সবকিছুই এখন সমাজের চোখে জঘন্য অপরাধ। প্রতিদিন তার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরীদের জড়িয়ে নানান কেচ্ছাকাহিনী ফাঁদার ষড়যন্ত্র চলেছে। শুধু সায়নকে নিয়েই নয়, সায়নের পরিবারের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে তাদের সবাইকে নিয়েই এখন ব্যস্ত মিডিয়ার লোকজন।

জঘন্য ইঙ্গিত মেশানো খবরটা পড়ে গার্গী এতই শক্‌ড, এতখানি স্তম্ভিত হয়ে গেল যে সুশোভনের প্রতিটি নির্মম বাক্যবাণই সহ্য করল মুখ বুজে। অনমিত্রার বাঁকা কথাগুলো তার কানে সিসে-পোড়ানো হল্‌কা ছড়ালেও মুখে রা-টি কাড়ল না। চুপচাপ নিজের ঘরে এসে গা এলিয়ে দিল তার বিছানায়। অসহ্য অপমানে চোখ বুজে পড়ে রইল একা-একা। নিঃস্পন্দ, শব্দহীন। দু-তিনদিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে আর বেরুলই না।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু টেলিফোন এসেছে তার খোঁজে, তার দু-একটি সংবাদপত্রের তরফ থেকে। একটা কল্ ছিল থানা থেকেও। গার্গী কোনও টেলিফোনই অ্যাটেন্ড করেনি। সাক্ষাৎ করতে এসেছিল কেউ কেউ। সবাইকে বলে দিয়েছে সে ভীষণভাবে অসুস্থ। দেখা করতেই পারবে না।

প্রায় দাঁতে দাঁত চেপে সে কয়েকদিন অন্তরীণ হয়ে রইল তার ঘরের মধ্যে।

চতুর্থদিনে শুনল, তার আর একটি টেলিফোন এসেছে, সেটি সায়নের। খবরটা দিয়ে অনমিত্রা তার দিকে একপশলা জ্বলন্ত চাউনি ছুড়ে দিয়ে পায়ে ধুপধাপ শব্দ তুলে চলে গেল তার নিজের ঘরে। এবার আর উদাসীন থাকা গেল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্গী উঠে গিয়ে রিসিভার কানে দিল, হ্যালো, গার্গী বলছি—

— গার্গী, তোমাকে দু-তিনদিন ধরে খুব এক্সপেক্ট করছিলাম। তোমার কি শরীর খারাপ?

— নাহ্, গার্গী নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব কণ্ঠস্বর সংযত করে বলল, ক'দিন বেরুইনি, এমনই—

সায়নের গলায় কোনও জড়তা নেই, যেন কিছুই হয়নি এমন কথাবার্তা, খুব একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি, গার্গী।

গার্গী তৎক্ষণাৎ ইন্‌ভল্‌ভড হয়ে পড়ল সায়নের সমস্যার মধ্যে, কী ব্যাপার, খুব সিরিয়াস কিছু?

— হ্যাঁ, আমাদের ফ্যাক্টরির ব্যাপার নিয়েই, তুমি একবার আসতে পারবে সন্ধের পর?

আমি সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরব

গার্গী একমুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর বলল, ঠিক আছে যাচ্ছি-

টেলিফোন রাখার পর সে বিমূঢ় হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। বুঝতেই পারছে, বাড়িতে এখন তার বিরুদ্ধে বয়ে যাচ্ছে একটা রোষ, চোরা চাউনি প্রতিবাদের ঝড়। সে নিজেও কয়েকমুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে রইল। দ্বিধাগ্রস্তও, কেন না এহেন সংকটের মুহূর্ত তার জীবনে খুব বেশি আসেনি। তারপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল, এই অহেতুক কুৎসায় ভয় পেয়ে পালিয়ে থাকাটা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। তারপর সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে গার্গী প্রস্তুত হয়ে নিল, বউদি অনমিত্রা কঠিন চোখে তার তৎপরতা লক্ষ করেছে জেনেও সে দ্রুতপায়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। তাদের গলি থেকে বাসরাস্তা মিনিট তিনেকের পথ। এই পথটুকু রোজই হেঁটে গিয়ে সে বাস ধরে। আজ কিন্তু হেঁটে যাওয়ার সময় তার সারাশরীর জুড়ে একটা অস্বস্তি। মনে হল, সমস্ত পাড়ার লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে সে এখন একটি দ্রষ্টব্যবস্তু। কোনও দিকে না তাকিয়ে সে হেঁটে চলল হনহন করে। সবে কিছুটা এগিয়েছে—তাদের গলিতে যে বিশাল নিমগাছটা দাঁড়িয়ে আছে আজ বহুবছর ধরে, হঠাৎ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল, কেউ তার পিছু নিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। সঞ্চারিত হল ক্রোধও। একবার আর-ফেরা হয়ে উপলব্ধি করল, হুঁ, ঠিক তাই। তা হলে--

মুহূর্তে মনস্থির করে নিল সে। গলিটা ঠিক যেখানে বড়রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, তার আগেই একটা শার্প রাইট টান। গার্গী ডানদিকে ঘুরেই পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল সহসা।

তার ঠিক পেছনে ইতি-উতি তাকাতে তাকাতে এসে পৌঁছল যে সে নিতান্তই একটি রোগা প্যাংলা তরুণ। চুলে একটা বাহারি টাচ আছে বটে, কিন্তু একেবারে গোবেচারা ছেলেমানুষ। বড় জোর বাইশ তেইশ। ডানদিকে ঘুরতেই ছেলেটি হঠাৎ গার্গীর মুখোমুখি হয়ে কেমন হতভম্ভ হয়ে গেল।

গার্গী তার হতভম্ব অবস্থাটা কেটে যাওয়ার সময় দিল না, মুহূর্তে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির কলারের কাছে জামাটা খামচে ধরল, চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার, খোকা? ফলো করছিলে কেন আমাকে?

ছেলেটি রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল এই ঝটিতি আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে।

গার্গী এক ধমক দিয়ে বলল, সাংবাদিক?

ধরা পড়ে গিয়ে ছেলেটি আমতা-আমতা করল, উ হ্যাঁ—

গার্গী আবার ধমক দিয়ে বলল, নিশ্চয় ওই কাগজটার যারা রোজ ধারাবাহিক গোয়েন্দা কাহিনী ছাপছে, তাই না?

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল, হুঁ—

—গত চারদিন আগে আমাকে নিয়ে যে স্টোরিটা বেরিয়েছে, সেটা তোমার লেখা?

একেবারে আপসেট হয়ে গিয়েছে ছেলেটি, তার কলারের কাছে গার্গীর হাতের মুঠি ক্রমশ শক্ত হচ্ছে, মেয়েটার চোখমুখ এমন লাল হয়ে উঠেছে রাগে যে হয়ত মেরেই বসবে তাকে। এই শেষ-বিকেলের দিকে গলিতে এই মুহূর্তে কেউ নেই বলে বাঁচোয়া। বলল, না ওটা মৌলিনাথদার লেখা—

গার্গী এবার তার কলার ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, আর তুমি তার সাগরেদ, তাই না? লজ্জা করে না আজগুবি স্টোরি বানিয়ে বানিয়ে লিখতে? ফলতায় গিয়ে আমরা নৌকাবিহার করেছি? জলকেলি করেছি! এই তোমাদের কাগজের জার্নালিজম্! বুঝলে, আমিও সাংবাদিকতা করি, তবে ফ্রি-ল্যান্স। ক'দিন আগে 'দেশমাতৃকা'র প্রথম পৃষ্ঠায় নেলসন ম্যান্ডেলার উপর একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছে, পড়েছিলে? ওটা আমারই লেখা। তোমার মৌলিনাথদাকে বোলো, কাকে যেমন কাকের মাংস খায় না, সাংবাদিকরা তেমনি সাংবাদিকদের মাংস খায় না। আমিও অনেক সাংবাদিকের হাঁড়ির খবর জানি। তোমাদের ওই মৌলিনাথদা সেদিন সন্ধেয় জিরো-জিরো সেভেনে কোন্ মেয়েকে নিয়ে হুইস্কি খেয়েছে, তারপর তাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে কোন হোটেলে গিয়ে উঠেছে, সব আমার জানা আছে। এই ঝামেলাটা কেটে যাওয়ার পর দেশমাতৃকায় সে রিপোর্ট আমি লিখে দেব, বুঝলে— ?

বলে এক ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে এমনভাবে ঠেলে দিল গার্গী, যে ছেলেটা হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল বোধহয়। গার্গী বুঝতেই পারল না প্রচণ্ড রাগের ফলে তার গায়েই জোর বেড়ে গেল, না কি ছেলেটাই অমন দুব্‌লা-প্যাংলা, কে জানে। ছেলেটাকে ছেড়ে দেওয়ার পর তাকে আবার হুমকি দিল গার্গী, ক্যারাটে জানো!

ছেলেটি তখনও হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে, ভয়ে-ভয়ে ঘাড় নাড়ল, না—

—আমার ও বিদ্যেটি ভালই জানা আছে, এরপর ফের যদি কাউকে ফলো করতে দেখি তাহলে কিন্তু একটা এসপার ওস্‌পার হয়ে যাবে। বুঝলে? এখন যাও—

ছাড়া পেতে ছেলেটি প্রায় ঊর্ধশ্বাসে ছুটে পালাল। তার এই ক্ষুদ্র সাংবাদিক জীবনে এ হেন জাঁহাবাজ মেয়েছেলে সে বোধহয় এখনও দেখেনি। জীবন নিয়ে ফিরতে পেরেছে মনে করে নিশ্চয় এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ভেবে স্বস্তির শ্বাস ফেলল গার্গী। হাসলও কিছুক্ষণ মনে মনে। ছেলেটাকে আরও একটু কড়কে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। নেহাত হঠাৎ চোখে পড়ল ওদিকে বাস থেকে নেমে তাদের গলির এক ভদ্রলোক হনহন করে হেঁটে আসছেন, তাইই—

তাঁকে দেখে গার্গীও মুখ নিচু করে তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে গেল দ্রুত।

টালিগঞ্জ থেকে শরৎ বসু রোডে সায়নদের বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দেখল, সায়ন আগেই এসে পৌঁছেছে ফ্ল্যাটে। সোফায় বসে আছে রীতিমতো ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে। অফিসের জামাপ্যান্ট তখনও ছাড়েনি। কিন্তু ঘরের চারপাশে তাকিয়ে, ঘরের ছন্নছাড়া অবস্থা দেখে তার দম বন্ধ হয়ে এল। অ্যাশট্রে ঠিক আগের মতোই ছাপাছাপি, ছাই উপছে পড়ে নোংরা হয়ে রয়েছে সেন্টার টেবিল। মেঝে, ঘরের কোণ, ডাইনিং টেবিল, বিছানা সবই অগোছালো। বিশ্রী হয়ে রয়েছে সমস্ত পরিবেশটাই। মাত্র দিনচারেক আসেনি সে, তার মধ্যেই আবার ঘরদোর সব যে-কে-সেই।

কাজের লোক কখনও রাখতে দেয়নি ঐন্দ্রিলা। অতএব ঐন্দ্রিলাবিহীন ঘরের এহেন দশা তো হবেই। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর চেপে গার্গী বলল, কী ব্যাপার, হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন? এনি মিস্‌হ্যাপ?

সায়ন উদাসীনভাবে ঘাড় নাড়ল, খুব সিরিয়াস ধরনের। যে মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট

পাউডার বাজারে ছাড়া হবে বলে আমাদেব দীর্ঘদিনের প্ল্যানিং. তাব প্রোডাকশন শুরু হয়েছিল গত পরশু। হঠাৎ আজ সকালে মেসিন স্টার্ট হওয়ামাত্র সেটা বার্স্ট করে যায়।

—তাই! গার্গীকে উদ্বিগ্ন দেখায়, কেউ উন্ডেড হয়েছে?

—না, ঠিক সেইমুহূর্তে কেউ কাছাকাছি ছিল না। যে সুপাবভাইজাব সুইচ অন করে, সে ভাগ্যক্রমে মেসিন চালু কবেই একটু বেবিয়েছিল কী একটা কাজে। প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত তখনও ফ্যাক্টবিতে পৌঁছাননি। তিনি থাকলে হয়তো ঘটনাটা ঘটত না। সুইচ অন করাব আগে একটু চেক-আপ কবা উচিত ছিল মেসিনটা।

—কিন্তু আগের দিন সন্ধেযও তো মেসিন চালু ছিল?

—তা ছিল। কিন্তু আজ ফার্স্ট আওয়াবেই কোনও একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

—তা হলে ওই সুপাবভাইজাব?

—তাকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু লোকটা সাবাদিন ধরে এমন কান্নাকাটি করছে যে মনে হয় না এটা তার কাজ। কৌশিক দত্তও বলল, এটা এমন মেকানিক্যাল ডিফেক্ট যেটা সকালে এসে সবাব সামনে ওই সুপারভাইজাবেব পক্ষে কবা সম্ভব নয়। কাল ওই লোকটির অবশ্য ডিউটি ছিল না।

—তাহলে গতকালের সুপারভাইজার?

সায়ন ক্লান্তভাবে হাসল, কৌশিক দত্ত বলছে, কাল বাতে সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মেসিন বন্ধ করে রেখে গেছে। নিশ্চয় মধ্যরাতে কেউ মেসিনে হাত দিয়েছিল।

গার্গী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কবল, স্যাবোটেজ?

—কৌশিক দত্ত তাইই সন্দেহ করছে।

—খুব সিরিয়াস ড্যামেজ? সারানো যাবে না?

—না, সায়ন মাথা নাড়ে, ফরেন মেসিনারিজ। এখানে সব পার্টস পাওয়া যায় না। বেশ কছুদিন লেগে যাবে ফরেন থেকে পার্টস আনিয়ে মেরামত করতে।

গার্গী চুপচাপ শুনল, তারপর ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ভাবলও। এর আগে সায়নদের ফ্যাক্টবির টুকটাক দুর্ঘটনা, লেবার-ট্রাব্‌ল সবই তার কানে আসত। তখন এ-সব ব্যাপারে তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি, এখনও করা উচিত কি না তা বুঝতে পারল একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, তা এ ব্যাপারে আমি কোন কাজে লাগব? আমাকে কি এক্সপার্ট ঠাওরালেন নাকি?

সায়ন গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে বইল, না, তবে ভীষণ আপসেট হয়ে গেছি। আজ থেকে কুড়ি-বাইশদিন আগেই প্রোডাকশন শুরু হওয়ার কথা। ঠিক সেইমুহূর্তে এক মিসহ্যাপ হল, আবার এখন প্রোডাকশন শুরু হতে-না-হতে ফের মিস্‌হ্যাপ। এত অসহায় লাগছে নিজেকে যে কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারছি না। মনে হচ্ছে কইনড হয়ে যাব একেবারে। নিজের বলতে এ পৃথিবীতে আমাব আর কেউই নেই যাকে এতসব কথা বলতে পারি। কঙ্কা চলে গিয়ে আমি এত একা হয়ে গেছি না—, তাইই তোমাকে—

বলতে বলতে সাযনের গলা ধরে এল যেন। তাব অসহায়, নিঃসঙ্গ মুখের দিকে তাকিয়ে গার্গী চমকে উঠল ফের। কয়েকদিনের প্রাণপণ চেষ্টায় সায়নকে তার জড় অবস্থা থেকে কিছুটা প্রাণচঞ্চল করে তুলেছিল, আবার এখন সন্ধেব এই আবছা আলোয় সে তাকিয়ে

দেখল, সায়নের চোখে সেই ধূসরভাব আবার ফিরে আসছে। সে বুঝতেই পারছে না, হঠাৎ কে বা কারা অলক্ষ্যে সায়নের ফ্ল্যাটে স্যাবোটেজ করতে আসবে। তার যে সর্বনাশ হওয়ার কথা তা তো হয়েই গেছে। আবারও কেন—

ভাবতে ভাবতে গার্গী আবার আগের দিনের মতো দ্রুতহাতে পরিষ্কার করতে শুরু করল সেন্টার টেবিল, মেঝের ধুলো, শোবার ঘরের বিছানা, আসবাবপত্র। মাত্র কয়েকদিনেই পুরুষমানুষেরা কীভাবে ঘরদোর নোংরা করে ছড়িয়েছিটিয়ে একশা করে রাখতে পারে, তা না দেখলে ভাবা যায় না। ঘর গুছোতে গুছোতেই জিজ্ঞাসা করল, খাওয়াদাওয়া করেছেন, না কি--

সায়ন অবাক হয়ে দেখছিল গার্গীর ঘরদোর পরিষ্কার করা। হেসে বলল, খাচ্ছি। দুপুরে অফিসে, রাতে ঘরে খাবার আনিয়ে নিচ্ছি। শুধু কালই কিছু খাওয়া হয়নি। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অফিস থেকে রাত করে ফিরে। যখন ঘুম ভাঙল, দেখি সাড়ে এগারোটা।

গার্গী হঠাৎ তার কাজের মধ্যে থেমে গিয়ে উদ্বিগ্নচোখে তাকাল সায়নের মুখের দিকে, বাহ্, বেশ মানুষ আপনি যা-হোক। তারপর তার কাজ শেষ করে বলল, চলুন, রাতে কোথাও গিয়ে খেয়ে নেবেন, রেডি হোন, কুইক কুইক--

তার ধমকে সায়ন দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিল, বাইরে বেরুতে বেরুতে বলল, কাল আবার কাগজে কিন্তু এই ডিনারের রিপোর্ট বেরুবে।। আবার বেশ ফলাও করে—

সেদিন রেস্তোরাঁ থেকে ফিরে সায়ন যখন গার্গীকে নামিয়ে দিল টালিগঞ্জে, জুবিলি পার্কে তাদের গলির মুখে, তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বাড়ি ফিরে ওপরে উঠতেই দেখল, দাদা-বউদি মুখ ফার্নেস করে আপেক্ষা করছে তার জন্য। সে তার ঘরের দিকে চুপচাপ পা বাড়াতেই শুনতে পেল সুশোভনের গর্জন, শোন্—

গার্গী এই গর্জনের জন্য প্রস্তুত ছিল, সে থমকে দাঁড়াতেই সুশোভন বললেন, এভাবে মিডনাইট পর্যন্ত বাড়ির বাইরে বেলেল্লাপনা করে বেড়ালে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। আমাদের ফ্যামিলির একটা প্রেস্টিজ বলে ব্যাপার আছে—

গার্গী শান্তভাবে এগিয়ে এল সুশোভনের সামনে। একবার অনমিত্রার দিকে তাকিয়ে নিয়ে দৃঢ় অথচ অবিচল ভঙ্গিতে বলে ফেলল, আমি সায়নদাকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি—

বেশ কয়েক দিন নিজের ভেতর চুরমুর, বিধ্বস্ত হওয়ার পর আজকাল অফিসে ঢুকে নিজের চেম্বারে আসীন হয়েও একলহমাও স্বস্তি বোধ করছে না সায়ন। এটা তার নিজেরই অফিস, এই অফিসের প্রতিটি কোনাই তার নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরি। তার নিজের বিশাল রাউন্ড-শেপড় অভিনব সানমাইকা-লাগানো টেবিল, কাঁধ-উঁচু রিভলভিং চেয়ার তো বটেই, এ অফিসের প্রতিটি দপ্তর, প্রতিটি চেয়ার-টেবিল, অফিসার, কর্মী তার বড়-চেনা। এতদিন

পর্যন্ত সব্বাই তার বড় আপনও ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে অফিসে ঢোকা ইস্তক মনে হচ্ছে, তার ও অফিসের বাকি সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে একটা মস্ত ফাটল। যে ফাটল এতই চওড়া যে সায়ন কিছুতেই যেন তা আর পেরুতে পারবে না। আজ সে অফিসে আসতেই সারা অফিস যেন ভীত, সন্ত্রস্ত, সবখানেই এক প্রবল নিঃস্তব্ধতা, একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব, যেন শ্মশানপুরীর শূন্যতাই। কোথাও এক এক মুহূর্ত ফিসফিস শোনা গেল হয়তো, পরক্ষণেই কেউ তা থামিয়ে দিল আর এক ফিসানিতে, অ্যাই, চুপ, চুপ।

সায়নও বসে রইল প্রবল আড়ষ্টভাবে। হাতও দিতে পারছে না কোনও ফাইলে, ডাকতেও পারছে না কোনও অফিসার কিংবা কর্মীকে, বেশ কিছুক্ষণ এভাবে স্থাণু, নিথর বসে থাকার পর তার মনে হল, সে হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মহেঞ্জোদারোর এক ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে।

সেই মুহূর্তে কেউ যেন তার চেম্বারের দরজার ওদিক থেকে টোকা দিল তিনবার। 'প্লিজ কাম ইন' কথাটা বলার আগেই যিনি দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন, তিনি পুলিশ ইনস্পেকটর দেবাদ্রি সান্যাল।

বোধহয় ওঁত পেতেই ছিলেন দেবাদ্রি, কখন সায়ন অফিসে জয়েন করে, তাই এর আগে আরও বার কয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও আজ ফার্স্ট আওয়ারেই তাঁর প্রথাসিদ্ধ উর্দিতে ওতপ্রোত হয়ে হঠাৎ আবির্ভাব। পুলিশি গাম্ভীর্য বজায় রেখেই সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ভারী কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, স্যরি, মিঃ চৌধুরী, আপনাকে আরও একবার ডিসটার্ব করছি।

সায়ন তখনও যেন এক ঘোরের ভেতর আছে। যতবার চেষ্টা করছে সেই অন্ধকারের জাল কেটে আলোয় ছিটকে বেরুবার, তার সমস্ত সত্তা এক নিদারুণ লজ্জায়, অপমানে, হাহাকারে তাকে চেপে রেখে দিচ্ছে সেই আচ্ছন্নতার ভেতর, তেমনই কুয়াশার ভেতর লীন হয়ে থেকে শুধু বলতে পারল, হুঁ, বলুন, আর কী জিজ্ঞাসা করার আছে।

দেবাদ্রি তীক্ষ্ণ নজরে তাকালেন সায়নের দিকে, যে প্রশ্নটা বার বার করেছি, আর কেবলই তা এড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি, সেটাই জানতে চাইছি আবারও। আপনার ট্রেনের টিকিটে লেখা আছে চৌঠা এপ্রিলে আপনি চেপেছিলেন বোম্বে মেলে, যে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছবার কথা পাঁচই এপ্রিল সকালে, অথচ আপনি বারবার একই উত্তর দিচ্ছেন যে, আপনি এসে পৌঁছেছেন পাঁচ তারিখ শেষ রাতে অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ভাষায় ছ'-তারিখ ভোর রাতে। এই সতের আঠার ঘণ্টার হিসেব কিন্তু আমাদের দিচ্ছেন না আপনি।

সায়ন ঝাপসা চোখে তাকাল সামনের দিকে, চুপচাপ রইল অনেকক্ষণ, যেন কী বলবে তা ভেবে উঠতে পারছে না, তারপর হঠাৎ বলল, বলেছি তো, কোনও একটি বিশেষ কাজে আটকে পড়েছিলাম খড়গপুরে।

—সে তো আগেও বলেছিলেন, কিন্তু কী সেই বিশেষ কাজ তা বলেননি। এতক্ষণই বা কেন লাগল তাও খোলসা করে বলছেন না।

—না-ই বা জানলেন অত কথা, ধরুন, একান্তই ব্যক্তিগত।

দেবাদ্রি হাসলেন, কিন্তু মিঃ চৌধুরী, কাজটা যত ব্যক্তিগতই হোক, পুলিশের কাছে তা বলতেই হবে আপনাকে।

সায়ন অস্পষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল, কিছু বললই না।

দেবাদ্রি গভীরভাবে লক্ষ করছিল সায়নের প্রতিক্রিয়া, সায়ন কী ভাবছে, কতটুকু বলছে চেপে যাচ্ছে কতটা এইসব নোট করছিল মনে মনে। একটু থেমে বলল, এই কয়েক ঘণ্ট সময়ই কিন্তু এই কেসের মেরিটের পক্ষে দারুণ ভাইট্যাল। আমাদের ধারণা, আপনি পাঁচই এপ্রিলে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন সন্ধের মধ্যেই। তারপর সে রাতে এমন কোনও ঘটন ঘটেছিল যার পরিণতিতেই আপনি ঐন্দ্রিলা দেবীকে হত্যা করতে বাধ্য হন।

সায়নের বুকের ভেতর তখন যেন ক্রমাগত হিম পতন হচ্ছে। শিরশির করে উঠছে তার শরীরের ভেতরটা। সে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করে উঠতে চাইল দেবাদ্রির অভিযোগের বিরুদ্ধে কিন্তু তার গলার স্বর জড়িয়ে গেল যেন, আশ্চর্য, কোনও কথাই ফুটল না তার মুখে।

—আপনাকে তাহলে আরও জিজ্ঞাসা করি, মিঃ চৌধুরী, সেদিন রাত একটার সময় আপনার ল্যাবরেটরিরুমে আলো জ্বলতে দেখা গিয়েছিল। বলতে পারেন, কে ছিল সেই ঘরে?

—রাত একটায়? সায়ন যেন বিস্মিত হল, আপনি কী করে জানলেন?

দেবাদ্রির মুখে মুচকি হাসি ঢেউ খেলে গেল। বললেন, তাহলে আপনিই ছিলেন? সায়ন অবাক হল, আমি কী করে থাকব? দেবাদ্রি হাসলেন, ঘটনার প্রেক্ষাপট বলছে, আপনার ল্যাবরেটরিরুমে নাকি আপনি ছাড়া আর কেউই ঢুকতেন না। তাহলে নিশ্চয় আপনিই ছিলেন সেখানে। কী করছিলেন আপনি অত রাতে ল্যাবরেটরিরুমে?

সায়ন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ, আমি ছিলাম সে ঘরে আপনাকে কে বলল?

—কে আবার বলবে, দুয়ে-দুয়ে যেমন চার হয়, এই হিসেবও তেমনই মিলে যাচ্ছে—. বলতে বলতে দেবাদ্রি দুম করে অন্য প্রশ্নে চলে গেল, এবার বলুন তো মিঃ চৌধুরী, আপনার অফিসে সিগারেট খান এমন মহিলা ক' জন আছেন?

সায়ন বোকার মতো তাকিয়ে থাকল আবারও, বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

দেবাদ্রি আগের মতো রহস্যেই মুড়ে রাখলেন নিজেকে, সব প্রশ্নেরই কোনও না কোনও কারণ থাকে, আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দিন—

—এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না, কারণ আমার সামনে কেউ সিগারেট খায় না।

—ও, দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ অন্য প্রশ্নে চলে গেলেন, তা হলে এবার বলুন আপনার স্ত্রী ঐন্দ্রিলা দেবীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী রকম ছিল?

—সম্পর্ক! সায়ন হঠাৎই কেঁপে উঠল নিজের ভেতর। এক মুহূর্তে তার দু বছরের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি হুড়মুড় করে পার হয়ে গেল ফ্ল্যাশব্যাকের মতোই। যেন একটা দীর্ঘ এক্সপ্রেস ট্রেন পার হয়ে গেল সপাটে, সশব্দে, সমস্ত প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে। সায়ন সেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তার দুর্দান্ত ঝোড়ো-ঝাপটে সহসা তছনছ হয়ে গেল একা-একা।

—কী হল, চুপ করে রইলেন কেন, বলুন?

সায়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝতে পারছি না, ভাল ছিল বলেই তো জানতাম। এখন মনে হচ্ছে, হয় তো ছিল না।

—হত্যাকাণ্ডের আগে আপনার সঙ্গে ঐন্দ্রিলা-দেবীর কোনও ঝগড়া হয়েছিল?

সায়ন অস্পষ্ট চোখে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল, না, ওর সঙ্গে কখনও ঝগড়া হয়েছে বলে

আমার মনে পড়ে না।

—আচ্ছা, আপনি জানেন, বিয়ের আগে ঐন্দ্রিলা দেবীর কোনও প্রেমিক ছিল কি না?

—প্রেমিক! সায়ন একগলা জলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎই এক ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেল যেন, কী বলছেন আপনি! ঐন্দ্রিলাব প্রেমিক! কই, না তো? ছিল না কি?

—সে তো আপনারই জানা উচিত, মিঃ চৌধুরী। এমনও তো হতে পারে, বিয়ের আগে কাউকে ভালবাসতেন ঐন্দ্রিলা দেবী, কোনও কারণে তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি, এও হতে পারে, বিয়ের পরেও তাঁর সঙ্গে ঐন্দ্রিলাদেবী যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন, আপনি তা জানতে পেরেই—

—উইল ইউ প্লিজ স্টপ, ইনস্পেকটর? সায়ন এতক্ষণে প্রায় গর্জে উঠল, যা জানেন না, তা নিয়ে অযথা অনুমান করে ঐন্দ্রিলার গায়ে কালি ছিটোবেন না। আমি তার সঙ্গে দু' বছর ঘর করেছি। তার অতীতের ঘটনা নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি বটে, কিন্তু দু বছরের মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি, যা আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। কিছু ঘটলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।

দেবাদ্রি হাসলেন, সবসময় অতীতের কথা কি জানা যায়, মিঃ চৌধুরী। কোনও স্ত্রীই চাইবেন না তাঁর এ ধরনের কোনও অতীত ইতিহাস তাঁর স্বামী জানুক। অনেক মেয়েরেই জীবনে এরকম প্রেমের ইতিহাস থাকে, কৈশোরে কিংবা প্রথম যৌবনে বহু মেয়েরেই হঠাৎ ভাল লেগে যায় কাউকে। সে বয়সটা এমনই যে তখন সেই প্রেমিক, সে যেরকমই হোক না কেন, তাকেই মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। তারপর কখনও তাদের বিয়ে হয়, কখনও হয় না। হয় না অনেক কারণেই। কিন্তু সেই প্রথম প্রেমের দাগ খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়। কোনও কোনও নারী সেই দাগ অনেক চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না। সেই প্রেমের স্মৃতি সারাজীবন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

সায়ন প্রায় পাগলের মতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে এতক্ষণে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আপনি যা ভাবছেন, তা ঠিক নয়, ইনস্পেকটর। তেমন কোনও ঘটনা থাকলে তা আমি অবশ্যই জানতাম। আমি না জানলে গার্গী অবশ্যই জানত—

—গার্গী মুখার্জি?

—হ্যাঁ। সে-ই ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্পর্ক করেছিল। ঐন্দ্রিলার জীবনে তেমন কোনও ঘটনা থাকলে নিশ্চয়ই সে যেচে এসে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করত না!

দেবাদ্রি মুচকি হাসলেন আবার, যাই হোক, মিঃ চৌধুরী, আপনি কি জানেন, ঐন্দ্রিলাদেবী কখনও সিগারেট খেতেন কি না?

—সিগারেট! সায়ন আবার ধমকে উঠল হঠাৎ, কী সব যা-তা বলছেন, মিঃ সান্যাল?

—অত উত্তেজিত হবেন না, মিঃ চৌধুরী। ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতে হয় আমাদের। এতে শুধু পুলিশের দরকারই জড়িয়ে আছে, তা নয়, সব প্রশ্নের জবাব ঠিক-ঠিক বলা আপনার নিজের স্বার্থেও প্রয়োজন। আপনি যদি ঠিক মতো গাইড করেন পুলিশের তদন্তের কাজ, তাহলে আপনি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করাও আপনার পক্ষে সহজ হয়ে পড়বে। নইলে এখন অভিযোগের আঙুল ক্রমশ আপনার উদ্দেশেই ধাবিত

হচ্ছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—

সায়ন এতক্ষণে একটু সহজ হয়ে বলল, কিন্তু মিঃ সান্যাল, আপনার প্রতিটি প্রশ্নই এত অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক, এতই অবাস্তব যে আমার বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার স্ত্রী সিগারেট খেতেন কি খেতেন না এটাও জানব না আমি?

দেবাদ্রি তাঁর একটি ঢাউস নোটবুকে পর-পর নোট করে নিচ্ছেলেন সায়নের প্রতিটি জবাব, দেবাদ্রির প্রশ্নে তার প্রতিক্রিয়া, কখন বিস্মিত হচ্ছে, কখন চমকে উঠছে, কখন মুখখানা অন্ধকার হয়ে আসছে তার।

নোট করা শেষ হলে এবার বললেন, আমি আপনার অফিসের কয়েকজনকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই—

—অফিসেব কেউও এর সঙ্গে জড়িত বলে আপনার মনে হচ্ছে?

—কে জড়িত, কে জড়িত নয়, তা অত চট করে বুঝে ওঠা যায় না, মিঃ চৌধুরী। তদন্তের স্বার্থে অনেককেই অনেক অসম্ভব সব প্রশ্নও আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হয়।

—হুঁ বলুন, কাকে কাকে জিজ্ঞাসা করবেন?

দেবাদ্রি তাঁর ডায়েরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, একে-একে ডেকে দিন, প্রথমে আপনার পি.এ. কঙ্কা রায়, তারপর অ্যাড্‌ভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায় মজুমদার, তারপর—

সায়ন অবাক হয়ে বলল, এদের সবাইকে সন্দেহ করছেন আপনি!

দেবাদ্রি একটু বিরক্ত হলেন এবার, দেখুন মিঃ চৌধুরী, খুন এমনই একটি ঘটনা, যা তদন্ত করতে গিয়ে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত দিকে বাঁক নেয় তার সূত্র, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একটি হত্যার পিছনে জড়িয়ে থাকে অনেক পরিকল্পনা, অনেক মোটিভ, অনেক অসম্ভব কারণও, তৎক্ষণিকভাবে কখনও কোনও হত্যা না হয় তাও নয়, তবে তার পেছনেও জড়িয়ে থাকে অনেক রহস্য, তার তদন্তেও উদঘাটিত হয় অদ্ভুত সব কাহিনী। হয় তো ঐন্দ্রিলা হত্যার পেছনেও নিহিত হয়ে আছে অভূতপূর্ব কোনও কারণ।
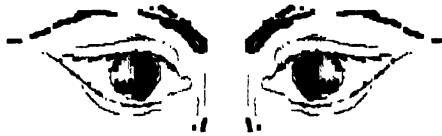
চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় বোর্ডরুমের বিশাল ঘরখানায় বসে প্রায় রয়েল বেঙ্গলের ভঙ্গিতে গর্জন করছিলেন।

লাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের আলাদা কোনও মিটিংরুম নেই। যা আছে তা হল এই পেল্লাই সাইজের বোর্ডরুমটি, যেখানে বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস মাসে একবার করে মিলিত হন তাঁদের মিটিঙে। বাকি দিনগুলো ঘরটা খালিই পড়ে থাকে বলে অফিসের অনান্য জরুরি মিটিংগুলো এই বোর্ডরুমেই হয়ে থাকে।

আজ সেই রকমই একটা জরুরি মিটিং।

পঁচিশ বাই কুড়ি মাপের এই বিশাল ঘরটির মাঝখান জুড়ে রয়েছে উড্ কালারের সানমাইকা লাগানো একটি প্রমাণ সাইজের টেবিল। টেবিলটি ডিম্বাকৃতি, তার চারপাশে পর পর সাজানো গোটা কুড়ি চেয়ার, তার মধ্যে একটি বিশাল সিংহাসনপ্রতিম, অন্যগুলি ফোমের নরম গদি-আঁটা, হাতলঅলা। চেয়ারম্যান সেই সিংহাসনে আসীন, ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ চোখে। তাঁর ঠিক বিপরীত মেরুর চেয়ারে বসে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মৈনাক বিশ্বাস। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চোখমুখ অবশ্য ভাবলেশহীন, তাঁর সামনে খোলা একটি ঝকমকে ইংরেজি জার্নাল, কখনও সেই জার্নালের পৃষ্ঠায় চোখ রাখছেন, কখনও উদাসীন হয়ে তাকাচ্ছেন খোলা জানালার ওপাশে। কী দেখছেন তিনিই জানেন। বাকি চেয়ারগুলিতে অবশ্য আসামির মতো রুদ্ধশ্বাস হয়ে কোম্পানির ম্যানেজারিয়াল র‍্যাঙ্কের অন্য অফিসাররা, তাঁরা সবাই যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পাংশুমুখে শুনছেন চেয়ারম্যানের একনাগাড় বোম্বার্ডিং। বোম্বার্ডিঙের তাপ এমনই প্রখর যে ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠছিল অফিসারদের। কিন্তু আজকের মিটিঙে চা পর্যন্ত আনার হুকুম হয়নি চেয়ারম্যানের।

চা তার সঙ্গে টা এলে মিটিঙের টাফনেস টাল খেয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আজকের এই ড্রাই অ্যারেঞ্জমেন্ট। রৌণকের তেষ্টা পেয়েছিল কিন্তু কাউকে জলও আনতে বলা যাচ্ছে না এমন টেন্‌স্ মুহূর্ত বয়ে চলেছে বোর্ডরুমের ভেতর।

ছোট্টখাট্ট গোলগাল চেহারার চেয়ারম্যান, যাকে রৌণকরা আড়ালে আবডালে প্রায়শ কুমড়ো-পটাশ বলে উল্লেখ করে থাকে, চোখ পাকিয়ে বলছিলেন, আপনারা নিশ্চয় জানেন, এখন লাইম ইন্ডিয়ার ভাগ্য ঝুলছে একটা সরু সুতোর ওপর। আমাদের প্রতিযোগী কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্ট এর আগে আমাদের সমস্ত বেদিং সোপগুলোকে মুখ থুবড়ে ফেলে দিয়েছে। মাত্র একটিই প্রোডাক্ট এখন বিক্রি হয় আমাদের, সেটি হল ডিটারজেন্ট পাউডার। তাও এই জন্যে যে, প্যারাডাইস এখনও পর্যন্ত তাদের নতুন ফর্মুলায় তৈরি মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার বাজারে ছাড়তে পারেনি বলে। আমি শুনেছি, তাদের এই প্রোডাক্টটিও নাকি খুবই উন্নতমানের হবে। অন্তত আমাদের পি. এম. রাহুল রায়ের তৈরি প্রোডাক্টের চেয়ে ফার, ফার বেটার। সুখের কথা এই যে, প্রোডাকশন শুরু হওয়ার আগেই ওদের মেশিন বার্স্ট করেছে এবং মেশিনটি অন্তত আরও এক মাসের আগে কাজ শুরু করতে পারবে না। আর ঠিক এই সুযোগটাই নিতে হবে আমাদের। এখন এই এক মাস কোম্পানির প্রত্যেকেরই কনসেনট্রেশন হবে. আমাদের ডিটারজেন্ট পাউডার 'হোয়াইট ওয়াশ'-এর বিক্রি বাড়ানো। একবার সেল বাড়াতে পারলে—

এই পর্যন্ত বলে কয়েক মুহূর্তের জন্য থামলেন চেয়ারম্যান। বোধহয় দম নিচ্ছেন। লোকটার বয়স তো আর কম হয়নি। এতখানি উত্তেজনার ধকল কী করে সইতে পারেন কে জানে! কিন্তু আজ যেরকম ডেসট্রাক্‌টিভ মুডে আছেন, তাতে এত তাড়াতাড়ি বক্তৃতায় ক্ষান্ত দেবেন তা মনে হয় না। মাস্টারমশাই যেমন ছাত্রদের পড়া ধরেন, সেই ভঙ্গিতে তাঁর দৃষ্টি একে-একে ন্যস্ত হচ্ছে অফিসারদের মুখের দিকে। ফলে রৌণকও কায়দা করে তার চোখ চেয়ারম্যানের দিক থেকে সরিয়ে রাখল সামনে বসে থাকা অনঙ্গ চক্রবর্তীর মুখে। একটু আগে কথা বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছে রাহুল রায়, আবার কার ওপর কোপ পড়বে কে জানে। আরও কতক্ষণ যে চলবে এই আগুন-ঝরানো মিটিং!

কিন্তু না, চেয়ারম্যান বললেন, আমরা ঠিক দুদিন পর আবার এই বোর্ডরুমে বসব, সন্ধের পর। তার মধ্যে আপনারা যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে লাইন অব্ অ্যাকশন ভেবে ফেলুন। আন্ডার দ্য গাইডেন্স অব এম. ডি। বিক্রি বাড়াতেই হবে আমাদের।

বলে আড়চোখে একবার এম. ডি.-র দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যানের গলা আবার গমগম করে উঠল, তবে মনে রাখবেন, একমাসের মধ্যে যদি প্রোডাক্টের সেল আশানুরূপ না বাড়ে, দেন সাম অব্ ইউ উইল হ্যাভ টু গো ফ্রম দিস কোম্পানি। ও. কে.?

শেষের মারাত্মক বাক্যটি বলে দুম্ করে চেয়ার ছাড়লেন হেমজ্যোতি সিংহরায়। উঠে দাঁড়িয়ে আরও একবার জ্বলন্ত চাউনি ছুড়ে দিলেন সামনে থম্ হয়ে বসে থাকা আসামিদের দিকে। তারপর ছোট ছোট পায়ে খুরখুর করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন বোর্ডরুমের দরজা খুলে।

চেয়ারম্যান বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই এম. ডি.-ও জার্নাল বন্ধ করে সবাইকে 'থ্যাঙ্ক য়ু' বলে চলে গেলেন নিজের চেম্বারে। বাকি অফিসাররা টেন্স্ হয়ে বসে রইল একে অপরের দিকে তাকিয়ে। প্রাইভেট কোম্পানিতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিচিত, কিছুটা বন্ধুও, কেননা রোজই পাশাপাশি ঘরে বসতে হয়, আলোচনা করতে হয়, সময় বিশেষে একজায়গায় চা খেতে খেতে আড্ডাও মারতে হয়। কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রুও। চেয়ারম্যানের শেষ কথাগুলো তখনও প্রত্যেকের বুকের ভেতর ঝনঝন করে ভাঙছে। 'সাম অব্ ইউ' বলতে ঠিক কে কে তা হয়তো চেয়ারম্যানের মনের ভেতর কিছুটা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, কিছুটা হয়তো ঠিক হবে আগামী এক মাসের পারফরমেন্সে। অতএব সবাই সবাইয়ের দিকে ঝাপসা চোখে তাকাচ্ছে, ভাবছে একটা প্রোডাক্ট যে সেল হচ্ছে না তার জন্যে দায়ী ঠিক কে। কোম্পানির যিনি প্রোডাকশনের দায়িত্বে আছেন সেই রাহুল রায়, নাকি সেলসের দায়িত্বে থাকা অনঙ্গ চক্রবর্তী অথবা অ্যাডভার্টাইজিঙের দফতর যিনি দেখছেন সেই রৌণক মুখার্জি। কিংবা সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভরা, যাদের কাজ বিভিন্ন এরিয়ায় ঘুরে ঘুরে সাপ্লাইয়ের তদারকি করা, সেলস্ প্রোমোশনের ব্যবস্থা করা, তা না করে যাদের অধিকাংশই ঘরে বসে ট্যুর দেখায়, তারা। অথবা এঁদের কেউই নন, খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরই, যিনি গত কয়েক মাস ইচ্ছাকৃতভাবে কোম্পানির কাজে ঢিল দিয়েছেন, চেয়ারম্যানের ব্যবহারে কাজে তিতিবিরক্ত হয়ে। হয়তো এখানে ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারছেন না, চলে যাবেন অন্য কোথাও—

কয়েক মুহূর্তের একটা স্থির নৈঃশব্দ্য বরফ-শীতল হয়ে বিরাজ করল সবার মধ্যে। তারপর দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে একসঙ্গে উঠে পড়ল সবাই। রাত অনেক হয়ে গেছে, ঘরে ফিরতে হবে তো!

বাড়ি ফেবার পথে সমস্ত ব্যাপারটা মনের ভেতর ঢালা-উপুড় করতে শুরু করল রৌণক। সে এই কোম্পানির বিজ্ঞাপন দফতর দেখাশুনো করছে গত কয়েক বছর। তার কাজে সাহায্য করাব জন্য আছে যে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিটি, তার কর্ণধার অমৃত মজুমদার ভারি চমৎকার স্বভাবের যুবক, খুব পরিশ্রমীও। আরও দু-তিনটি উৎসাহী তরুণকে নিয়ে সে খুলে বসেছে তার বি. পি. বি. অর্থাৎ বেঙ্গল পাবলিসিটি ব্যুরো, যাদের বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু এই লাইম ইন্ডিয়া দিয়েই। তারাই প্রতিদিন সযত্নে তৈরি করে লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন

লে-আউট, কপি। তৈরি করে নতুন নতুন ক্যাপশন দিয়ে, স্পেস বুক করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। তাদেরই চেষ্টায় বিজ্ঞাপনের জৌলুসও বেড়েছে কয়েক বছরে।

রৌণক এই কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার আগে এখানকার অন্য একজন অফিসার বিজ্ঞাপনের দায়িত্বে ছিলেন। কোম্পানি তখন প্রধানত নজর দিত প্রোডাকশনের ওপব, বিজ্ঞাপনের কোনও গুরুত্বই ছিল না, গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবেওনি কেউ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মৈনাক বিশ্বাস ব্যাপারটা খেয়াল করে রৌণককে নিয়ে এসেছিলেন লাইম ইন্ডিয়ায়, বলেছিলেন, ট্রাই ইয়োর বেস্ট। কোম্পানির একটা ভাল ইমেজ তৈরি করতে হবে।

জয়েন করেই বিজ্ঞাপনের দফতর ঢেলে সাজিয়েছিল রৌণক। দেবপ্রিয় রায় নামের একজন পরিশ্রমী অ্যাসিস্ট্যান্টকে দায়িত্ব দিয়েছিল ফাইলের, সঙ্গে সঙ্গে অমৃত মজুমদারকে তার নানান চিন্তা-ভাবনার হদিস দিয়েছিল লে-আউট তৈরি করার সময়। সেই সঙ্গে বাংলা ছবির গ্ল্যামারাস সব অভিনেত্রীদের মডেল হিসেবে ব্যবহার করায় কয়েক বছরেই বেশ চমক জাগিয়েছিল লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন। ছবির সঙ্গে চমৎকার লাগসই ক্যাপশন।

কিছুকালের মধ্যেই রৌণক উপলব্ধি করল, বিজ্ঞাপনের এই জগৎ শুধু বর্ণাঢ্যই নয়, তা যেমন কম্পিটিটিভ্ তেমনই চ্যালেঞ্জিং। বিজ্ঞাপনেই কোম্পানির ইমেজ বাড়ে, ক্রেজও। প্রথম থেকেই কাজটা ভারি উপভোগ্য মনে হয়েছিল তার। এত বছর পরে এখনও তেমনই সমান উৎসাহ বোধ করে নতুন নতুন লে-আউট নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে, অভিনব সব ক্যাপশন সাজেস্ট করতে। ভাল ক্যাপশন্ ভাবার মধ্যেও সে একটা মাদকতা খুঁজে পায় আজও। একবার একটা সাড়া জাগানো ক্যাপশন লিখে বেশ আলোড়ন জাগিয়েছিল বিজ্ঞাপন মহলে। ছবিতে সাবান মাখছে একটি তরুণী, বিউটিবাথের ফেনায় তার বুক থেকে পা অবধি শরীর ঢাকা, সাবানের বাবলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটির চারপাশের ফাঁকা স্পেসে, তার ঠিক পাশে ক্যাপশন 'হ্যাপি বাথ্‌ডে টু ইউ'। বার্থ-এর পরিবর্তে 'বাথ' শব্দটি ব্যবহার করায় বিজ্ঞাপনের মাত্রাটাই বদলে গিয়েছিল একেবারে। অনেক কাগজ আর বিজ্ঞাপন সংস্থার তরফ থেকে পেয়েছিল অজস্র অভিনন্দন আর প্রশংসা।

তার এমন সব উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে রৌণক এ যাবৎ জয় করেছে বিজ্ঞাপনের জগৎ, বাড়িয়েছে কোম্পানির ইমেজ। অথচ এই মুহূর্তে চেয়ারম্যানের ধমকানিতে সে অজস্র ভাবনার মুখোমুখি।

পরদিন অফিসে এসেও তার এই আচ্ছন্নতা গেল না। নতুন করে ভাবতে বসল বিজ্ঞাপনের লে-আউট। হোয়াইট ওয়াশ নামটি তার কোনও দিনই পছন্দ নয়। শব্দটার মধ্যে কেমন চুনকাম চুনকাম গন্ধ। কে যে নামকরণ করেছিল! তার চেয়ে — ভাবতে বসল রৌণক, ডিটারজেন্ট পাউডারটি যখন বাজারে ভাল চলছে না, তখন তার নাম বদলে নতুন ঝকঝকে প্যাকেটে ভরে বাজারে ছাড়লে কেমন হয়। নতুন একটা নাম দেওয়া যাক্, সফেদ-সাদা, কিংবা মার্বল হোয়াইট, কিংবা কিংবা মিল্ক হোয়াইট—

তার এমন রকমারি ভাবনার ফাঁকে হঠাৎ তার চেম্বারের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন রাহুল রায়, কী ব্যাপার, মুখার্জি সাহেব, খুব খোসমেজাজে আছেন মনে হচ্ছে। কালকের ওই ব্লাস্টিঙের পরেও—

—কী আর করা যাবে, মিঃ রায়, এই বয়সে তো আর কাঁদা যায় না!

—রাইট য়ু আর। কিন্তু দেখছেন, আকারে ইঙ্গিতে সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়েই এসে পড়ছে। যাদের বিক্রি করার কথা, সেই সেল্‌স্ উইং কিন্তু নির্বিকার। সেল্‌সের লোকেরা কেবলই হুইস্পারিং ক্যাম্পেন করে চলেছে, প্রোডাক্ট ভাল নয়, লোক কিনছে না, এ মাল চলবে না, এইসব। কিন্তু তাদের যে বিক্রি করার গরজ নেই, এটা কেউ দেখছে না। সেল্‌স্ ম্যানেজার মাসে কদিন ট্যুরে বেরোয় বলুন তো? এমনকি এরিয়া অফিসার, যাদের রেগুলার ট্যুর করার কথা, তারা বিভিন্ন ছুতোয় অফিসে এসে আড্ডা মারে, তা হলে বিক্রি হবে কী করে? আরে বাবা, সেল্‌সে ভাল লোক থাকলে আটা বলে ভুসিও বিক্রি করে আসা যায়—

রৌণক হাসল, কিংবা এও তো বলতে পারেন, ঠিকমতো বিজ্ঞাপন হচ্ছে না বলেই বিক্রি বাড়ছে না।

—আজকের দিনে বিজ্ঞাপনের রোল ভাইটাল সে কথাও ঠিক। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন তো ভালই হচ্ছে। তবে কোম্পানির উচিত বিজ্ঞাপনের বাজেট আরও বাড়ানো। আগে দু-একবার টি. ভি.-তে দেওয়া হয়েছিল, সেও কতকাল হল বন্ধ হয়ে গেছে। অল ইন্ডিয়া মার্কেট ধরতে হলে খবরের কাগজ তো মাস্ট। কিন্তু টিভিতেও দিতে হবে।

রৌণক ঘাড় নাড়ল, বাজেটের যা অবস্থা, তাতে টি ভি-তে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ভাবতেই পারছি না। বরং সেল আরও বাড়ুক। টার্ন-ওভার বাড়লে তখন টি ভি-র জন্য আলাদা বাজেট করব। তা ছাড়া টি ভি-র জন্য যে অ্যাড-ফিল্মটা তোলা হয়েছিল, সেটাও এখন পুরনো হয়ে গেছে। নতুন একটা অ্যাড ফিল্ম তুলতে গেলেই এখন দু তিন লাখ টাকা মিনিমাম লাগবে।

রাহুল রায়কে হতাশ দেখায়, তা হলে কী করা যায় বলুন তো! সেল বাড়ানোর ব্যাপারে আপনি কিছু ভেবেছেন?

রৌণক এর মধ্যে অনেকটা ভেবে ফেলেছে, অন্তত তার দৃষ্টিকোণ থেকে। কিছুটা ড্রাফটিং করেছে, বাকিটা করে ফেলে বিকেলে টাইপ করিয়ে নেবে। কিন্তু সেটা এখনই পি এম-এর সামনে সে ভাঙতে চায় না। হেসে বলল, ভাববার চেষ্টা করছি, মিঃ রায়। মিটিং তো কাল সন্ধের পর। তখন যা হোক কিছু একটা সাবমিট করে দেব। আপনিও ভাবুন না—

প্রোডাকশন ম্যানেজার ঘাড় নাড়তে লাগলেন অসহায়ভাবে, আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। এম. ডি. তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন সব দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে। অথচ প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের কথা ভাবুন। সেখানে এম. ডি. নিজেই প্রোডাকশনের সঙ্গে ইনভলভড্। ইন ফ্যাক্ট, এম. ডি.ই তাঁর নিজস্ব ফর্মুলায় প্রোডাকশন করান। হি ইজ অ্যা গ্রেট মাস্টার। প্রোডাকশন ম্যানেজারের কোনও রোলই নেই সেখানে। কৌশিক দত্ত কত আরামে চাকরি করছে ওখানে ভাবুন। তার ডিউটি শ্রেফ ফ্যাক্টরি ঠিকমতো চলছে কি না তা দেখা, সবাই শিফ্ট অনুযায়ী হাজিরা দিচ্ছে কি না তা মিলিয়ে নেওয়া। ব্যস্।

—কিন্তু কৌশিক দত্ত ওখানে থাকতে চাইছে না শুনেছিলাম।

—একজ্যাক্টলি, রাহুল রায় হঠাৎ ভীষণ উৎসাহী হয়ে পড়লেন, কেন জানেন, সায়ন চৌধুরী প্রোডাকশনের ব্যাপারটা পুরোপুরি তার নিজের হাতে রেখেছে বলেই কৌশিক দত্তের আক্ষেপ। ওদের প্রোডাক্টের এত রমরমা, তার কৃতিত্বের পুরোটাই ভোগ করছেন

এম. ডি. নিজে। তাতে প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্তের কোনও ভূমিকা নেই। সেদিন কৌশিক দত্তের সঙ্গে দেখা হল। একদম ফিউরিয়াস হয়ে আছে। রাগে গরগর করছে এম. ডি.র ওপর। বলল, আমার হাতে প্রোডাকশনের ভার দিক না। এর চেয়েও ভাল প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়তে পারি—

রৌণক আশ্চর্য হয়ে বলল, তা এম. ডি. তো কিছুটা ছেড়ে দিতে পারেন কৌশিক দত্তের হাতে—

রাহুল রায় ঘাড় নাড়ল, কেনই বা ছাড়বে। আমাদের এম. ডি.র যেমন শুধু ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি আছে, টেকনিক্যাল নো-হাউ কিছুই জানেন না। প্যারাডাইসের সায়ন চৌধুরী তো আর তা নন। তাঁর টেকনিক্যাল নলেজও আছে। এরকম এম. ডি.র আন্ডারে কাজ করতে পারলে আমি তো বর্তে যেতাম। প্রোডাকশনের ব্যাপারে নিজের রেসপনসিবিলিটি খুব বেশি থাকত না। কত আরামের চাকরি—

রৌণক হাসতে হাসতে বলল, কৌশিক দত্ত কি সত্যিই চাকরি ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়?

—উঁহু, মনে হয় না। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, খুব জটিল ধরনের মানুষ। মুখে এক রকম বলে, কাজে আর এক রকম। ওদের প্ল্যান্টে একটা মেশিন সেদিন বার্স্ট করেছে। একজন সাসপেন্ড হয়েছে, কিন্তু সে লোকটা নিরপরাধ। কিন্তু যার পক্ষে এই স্যাবোটাজ করা সম্ভব, কৌশিক দত্ত তাকে সেভ করতে চাইছে। নিশ্চয় কোনও গূঢ় অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে ওর ভেতর।

রৌণক আশ্চর্য হল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তবে কৌশিক দত্ত যদি চাকরি ছাড়ে তখন আমাকে সায়ন চৌধুরীর শরণাপন্নই হতে হবে। বিকজ মাই চেয়ারম্যান ইজ নট হ্যাপি উইথ মি। যদি হঠাৎ ডিসচার্জ লেটার ধরিয়ে দেন তা হলে খুব বিপদে পড়ে যাব।

রৌণক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রাহুল রায়ের মুখের দিকে। খুবই শেকি আর নার্ভাস হয়ে আছেন ভদ্রলোক। তার হাসিও পেয়ে গেল এই কারণে যে, কয়েকদিন আগে ওই রাহুল রায়ই সায়ন চৌধুরীর কোম্পানিকে ক্র্যাশ করার জন্য তার চেম্বারে এসে খুব তাতিয়েছে। আজ আবার কৌশিক দত্ত চাকরি ছাড়বে খবর পেয়ে প্যারাডাইসে জয়েন করার তাল করছে। সত্যিই পৃথিবীটা ভারি বিচিত্র। অবশ্য ডিসচার্জ লেটার ধরিয়ে দেওয়ার কথাটা শুনে রৌণকের নিজেরও খুব অস্বস্তি হচ্ছে। হঠাৎ তাকেও যদি চেয়ারম্যান স্যাক্ করেন, তার পক্ষেও নতুন চাকরি খুঁজে পাওয়া এ মুহূর্তে ভারি কঠিন কাজ। চকিতে ঋতবৃতার সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠল তার মগজের ক্যানভাসে। সেই হাসি হাসি মুখটি মিলিয়ে না যেতেই তার চেম্বারে ঢুকে পড়লেন সেল্‌স্ ম্যানেজার অনঙ্গ চক্রবর্তী। মাঝারি উচ্চতার চেহারা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ, কপালের অনেকটা জুড়ে টাক আছে, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁকে দেখেই রৌণকের ঋতবৃতা-ভাবনার চটকা ঝট্ করে কেটে গেল, বলল, কী ব্যাপার, মিঃ চক্রবর্তী, আপনিও খুব দুশ্চিন্তায় আছেন বলে মনে হচ্ছে!

অনঙ্গ চক্রবর্তী সাদাসাপ্টা মানুষ, বললেন, আমার জীবনে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। সেলসের লোক মানেই কথা বিক্রি করে খেতে হয়। কারখানা থেকে যে রকম মাল বেরুবে

সে রকম বিক্রি করব। ভাল মাল বেরুলে ভাল বিক্রি হবে, খারাপ মাল বেরুবে সেলও ফল করবে। কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে খারাপ মাল একবার বিক্রি করা যায়, দুবার বিক্রি করা যায়, বার বার গেরস্তকে টুপি পরানো যায় না। আজকালকার মানুষ ভীষণ অ্যালার্ট। যত দিন যাচ্ছে, ততই টাফ হয়ে উঠছে সেলসের লাইন। এখন দরকার হল ভাল প্রোডাক্ট। বুঝলেন?

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, একটা রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছি। প্রোডাকশন ম্যানেজারের হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দিয়েছি রিপোর্টে। এম. ডি-কে গিয়ে নাকি বলেছে, সেলস্ উইং কাজ করছে না। দেখুন দেখি ছেলেগুলো ঢন ঢন করে ঘুরতে ঘুরতে সব জনডিস বাধিয়ে ফেলল, আর উনি কি না—

—তাই! রৌণক চুপ করে থাকে। প্রোডাকশন ম্যানেজার আর সেলস ম্যানেজারের এই ঝগড়াটুকু কোম্পানিতে সবাই বেশ উপভোগ করে মনে মনে। দু দফতরই চায় অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে পার পেয়ে যেতে। অথচ গলদ যে আসলে কোথায় তা কেউ খুঁজে দেখতে চায় না। কাল চেয়ারম্যানের মিটিঙে ব্যাপারটা তা হলে বেশ জমে উঠবে।

কথা বলতে বলতে সেল্স ম্যানেজার হঠাৎ উঠে পড়লেন, যাই, এম. ডি.র সঙ্গে একটা পরামর্শ করে নিই। বাঘের সামনে পড়ার আগে--

বাঘ অর্থাৎ চেয়ারম্যান। অর্থাৎ সেলস্ ম্যানেজারও বেশ টেনস্ হয়ে আছেন আগামী কালের ব্যাপারে।

রৌণক তার পরিকল্পনা আবার নতুন করে ভাবতে বস্ল। পুরনো প্রোডাকশন পুরনো নামে পুরনো প্যাকে চালানো সুবিধেজনক, না কি পুরনো প্রোডাকশনকে একটু বদলে ফেলে নতুন প্যাকে নতুন নামে বিক্রি করাটা অধিকতর শ্রেয়। হুইচ ওয়ান ইজ মোর সেলেবল্?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পার্সোনেল ম্যানেজার সামঞ্জস্য মৈত্রের ঘরে ঢুকল রৌণক, তার টেবিলে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মৈত্র সাহেব, আপনি কি এই সিগারেটই বরাবর খেয়ে আসছেন, নাকি মাঝে মাঝে বদলে ফেলেন ব্র্যান্ড?

সামঞ্জস্য মৈত্র বিস্মিত হলেন, কেন হঠাৎ? কলেজে যখন সিগারেটে হাতে খড়ি হয় থুড়ি হাতে খড়ি নয়, মুখে আগুন হয় তখন বেশ দামি সিগারেট ধরেছিলাম। তারপর গত কুড়ি বছর এইটেই চলে আসছে। এখন আর বদলাতে ইচ্ছে করে না। কেমন একটা মায় পড়ে গেছে—

—ও, তার মানে আপনি লয়্যাল, রৌণক তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে গিয়ে ফোন করল দীপঙ্করকে, আচ্ছা দীপঙ্কর, আপনি কি একই ব্র্যান্ডের সিগারেট বরাবর খেয়ে আসছেন, না কি মাঝে মাঝে বদলান?

দীপঙ্করও অবাক হল, আমি তো প্রায়ই ব্র্যান্ড বদলাই। ইন ফ্যাক্ট নতুন কোনও সিগারেট বাজারে বেরোলেই কেন জানি না, আমার কিনতে খুব লোভ জাগে। মনে হয় দেখি না কেমন টেস্ট—

—আপনি হলেন ফ্লোটার, রৌণক ফোন ছেড়ে দেয়। একান্ত আত্মমগ্ন হয়েই বাড়ি ফেরে সেদিন, হঠাৎ ঋতবৃতাকে জিজ্ঞাসা করে, একই সাবান রোজ রোজ মাখতে ইচ্ছে করে তোমার, নাকি মাঝে মাঝে বদলাতে চাও।

হকচকিয়ে যায় ঋতবৃতা, কেন, নতুন নতুন সাবানে চান করতেই তো মজা বেশি, নতুন

গন্ধই তো—

রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ঋতবৃতার ফরসা নরম আঙুল তুলে নেয় নিজের বুকের উপর। ঈষৎ গোলাপি নেল-পালিশে চকচক করছে ঋতুর নখ। — বলো তো ঋতু, একই নেল-পালিশ রোজ রোজ মাখতে ভাল লাগে, নাকি এক-একদিন এক-এক রঙের এক-এক ব্র্যান্ডের?

ঋতবৃতা ফুলে ফুলে হাসে, কেন, সেদিন দেখনি, কি রকম রক্তের রঙের নেল-পালিশ পরেছিলাম, তুমি আরও বললে, কী ব্যাপার, আমার পিঠ থেকে রক্ত খামচে নিয়েছ নাকি, এত লাল কেন নখ? এমন অসভ্য না তুমি—

—তার মানে তুমি ফ্লোটার, রৌণক বিড় বিড় করে।

—ফ্লোটার মানে?

—কেউ কেউ একই ব্র্যান্ড চিরকাল আঁকড়ে ধরে থাকে, তাদের বলা হয় লয়্যাল। আবার কেউ কেউ ইচ্ছেমতো ব্র্যান্ড বদলায়, নতুন কোনও কিছুতে তাদের আকর্ষণ, মার্কেট রিসার্চের ভাষায় এদের ফ্লোটার বলে। আচ্ছা, বলো তো ঋতু, মার্বল-হোয়াইট নামটা বেশি ভাল লাগে শুনতে, নাকি সফেদ-সাদা, নাকি মিল্ক-হোয়াইট?

ঋতবৃতা সে কথার জবাব না দিয়ে রৌণকের হাতটা তার বুকের উপর তুলে নেয়, তা হলে এবার তুমি বলো তো, একই বউ রোজ-রোজ পছন্দ হয় তোমার, নাকি রোজ নতুন-নতুন—

রৌণক হেসে ফেলল, এই একটা ব্যাপারে শতকরা নিরানব্বই ভাগ বাঙালি লয়্যাল, তবে অবশ্যই সাংসারিক জীবনে, মনে মনে হয়তো নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে একজন ফ্লোটার আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে, তিনি প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের চেয়ারম্যান কাম এম. ডি. সায়ন চৌধুরী। রোজ কাগজে যা পড়ছি, নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে—

কঙ্কাকে কোম্পানির কয়েকটি জরুরি চিঠি লেখার তাগিদ ছিল বলে ডেকে পাঠিয়েছিল সায়ন। কঙ্কা রায় তার পি.এ.-কাম-সেক্রেটারি, খবরের কাগজে প্রায় 'পাত্রী চাই'এর ভঙ্গিতে তার দেওয়া বিজ্ঞাপন, 'একজন সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী পি.এ. চাই, যাকে একইসঙ্গে স্টেনো এবং সেক্রেটারির কাজও জানতে হবে। স্যালারি নিগোশিয়েবল।' এর উত্তরে ছবিসহ একশো তিনখানা দরখাস্ত পেয়েছিল। ছবি দেখে, যোগ্যতা বিচার করে ইন্টারভিউতে ডেকেছিল ষোলজনকে, তার মধ্যে থেকে নিখুঁত বাছাই করে পছন্দ করেছিল এই কঙ্কা রায়কে, গত দেড় বছরে কঙ্কার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সে বুঝেছে তার নির্বাচন ব্যর্থ হয়নি। শুধু সুন্দরীই নয় কঙ্কা, স্মার্ট, সদা হাস্যময়ী, বুদ্ধিমতী, চমৎকার নোট নেয় শর্টহ্যান্ডে, টাইপও ঝকঝকে। ফাইলের রক্ষণাবেক্ষণও ছবির মতো। আর — কোনও কোনও লঘুমুহূর্তে সামান্য

চপলাও।

টেনশন পরিবৃত অফিসের কাজের ফাঁকে তার এই টুকরো-টাকরা চাপল্যটুকু বেশ উপভোগ করে সায়ন।

কিন্তু দুর্ঘটনার কারণে গত কয়েকদিনের বিরতির পর যখন নতুন করে অফিস শুরু করল, তখন থেকেই লক্ষ করেছে, কঙ্কা ঠিক আগের মতো নেই, একটু গম্ভীর, সতর্ক, একটু যেন এড়িয়ে থাকছে। অবশ্য শুধু সে-ই নয়, অফিসের অন্য সবাইই তার কাছ থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে আগের চেয়ে। ঐন্দ্রিলার মৃত্যু হয়তো এ রকম দূরত্ব সৃষ্টি করার পক্ষে একটি যথেষ্ট কারণ, তবু কঙ্কা রায়ের এই গাম্ভীর্য তাকে কিছুটা ক্ষুব্ধ, কিছুটা বিচলিত করে তুলেছে।

আজ দেখল, কঙ্কার ধনুকের মতো সরু বাঁকানো দুই ভুরুর মাঝখানে একটা ছোট্ট কোঁচও। হাতে যথারীতি সেই হিজিবিজি অক্ষরের শর্টহ্যান্ড খাতাটি এবং পেন্সিল।

তার পরনে কালো পাড়, হালকা বাদামিরঙের জংলা ছাপার শাড়ি, গায়ে কালো ব্লাউজ, ব্লাউজের হাতা একটু বড়ই পরে কঙ্কা, তাতে ওর ফর্সা শরীরে দারুণ মানানসই লাগছে। অন্য বাঙালিমেয়ের চেয়ে কঙ্কার শারীরিক উচ্চতা একটু বেশিই, পাঁচ-পাঁচটাচ হবে। সেই সঙ্গে মানানসই দোহারা চেহারা। তার দিঘল, টানটান শরীর যে-কোনও পুরুষের কাছে নিঃসন্দেহে প্রবল আকর্ষণীয়। তবু গত দেড় বছরে শুধু একটু আধটু হাসিঠাট্টার লঘুমুহূর্ত সৃষ্টি করা ছাড়া কঙ্কার প্রতি আর কোনও দুর্বলতা কখনও প্রকাশ করেনি সায়ন। তার দরকারও হয়নি, কারণ দিঘির মতো শান্ত, টলটলে ঐন্দ্রিলাই ছিল তার এই দু বছরের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন। তবু কঙ্কার ভুরুতে কেন এই কোঁচ, বিরক্তির কারণই বা কী, এমন ভাবতে ভাবতে হঠাৎই ডিক্‌টেশন দিতে শুরু করে, ডিয়ার স্যার, কাইন্ডলি রিকল আওয়ার ডিসকাশন...

অফিসে এসে প্রতিদিন নিজেই ডাকের চিঠি খোলে সে। ডাক ফাইলের ঝকঝকে খামগুলোর ভেতব থেকে চিঠির পর চিঠি বার করে সামনে মেলে ধরাটা তার কাছে এক ধরনের রোমাঞ্চ। এত বড় দেশটার কত-কত জায়গা থেকে কত জন প্রতিদিন স্মরণ করে তার প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে। কোনও চিঠি বাঙ্গালোর থেকে এল তো পরের চিঠিটা তমলুক কি কোচবিহারের। কোনও চিঠি সিউড়ির তো পরের চিঠি ভিলাই কিংবা জব্বলপুরের। যে চিঠিগুলো জরুরি শুধু সেগুলোই কাছে রেখে বাকি চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেয় রিসিপ্ট-ডেসপ্যাচ-এর ক্লার্ক ঋষিতা তালুকদারের কাছে। জরুরি চিঠিগুলোর মধ্যে যেগুলোর এখনই উত্তর দেওয়া দরকার, তার প্রতিটির ডিকটেশন এভাবে নিজেই দিয়ে থাকে রোজ। যাঁরা চিঠি দিচ্ছেন, তাঁরা পত্রপাঠ উত্তর পেলে খুশি তো হনই, প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের তৎপরতা সম্পর্কে নিশ্চিন্তও থাকেন। সায়নের অফিসের কাজেও একটা অন্য রকম গতির সঞ্চার হয়। নইলে অন্য অফিসারদের ওপর নির্ভর করলে দেখা যাবে, অর্ধেক চিঠি তাদের ড্রয়ারে, কিংবা কোনও ফাইলের দুরূহ কোণে অবহেলায় জিরোচ্ছে। দশ-পনেরো দিন পরে হঠাৎ রিমাইন্ডার এলে তখন খোঁজ খোঁজ খোঁজ—

খুবই দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে ডিকটেশন নিতে পারে কঙ্কা। ডিকটেশন নিতে নিতে একদিন হঠাৎই বলেছিল, স্যার, ইংরেজি লেখার ব্যাপারে আপনি বোধহয় খুবই কনজারভেটিভ।

সায়ন একটু অবাক হয়ে তার নতুন রিক্রুটেড্ পি. এ. টি র ঈষৎ কৌতুক মেশানো মুখের

দিতে তাকিয়েছিল, কেন?

—আপনি একেবারে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজিতে ডিক্টেশন দেন। লিখতে গিয়ে আমার পেন্সিলের শিস্ ভেঙে যায়। আর একটু সহজ ইংরেজিতে লিখলে চিঠিগুলো এত বড়ও হয় না বোধহয়।

প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সায়ন। কোম্পানির যিনি অল-ইন-অল, যার সঙ্গে ম্যানেজারিয়াল স্টাফ থেকে শুরু করে মিনিয়্যালস্ পর্যন্ত সব্বাই প্রবল সমীহ করে কথা বলে, সেখানে মাত্র কয়েক মাসও চাকরি হয়নি যে কঙ্কা রায়ের সে কিনা—

ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা বেশ কিছুক্ষণ মগজে ঢালা উপুড় করেছিল সায়ন। স্কুল-লাইফ থেকেই সে এই ভিক্টোরিয়ান ইংরেজিতেই অভ্যস্ত। যে শিক্ষক তাকে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন, তিনিও এমন রক্ষণশীল, পুরনো ট্রাডিশন আঁকড়ে ধরার মানুষ ছিলেন। এত দিনেও তাঁর শেখানো সেই গণ্ডি সে যে পেরোতে পারেনি সেদিন কঙ্কার এই আলটপকা মন্তব্য শুনে উপলব্ধি করেছিল, হুঁ, ঠিকই বলেছে মেয়েটা। একটু পরেই ঘাড় নেড়েছিল, রাইট ইউ আর, বিষয়টা এভাবে ভাবিনি কখনও।

—কিছু মনে করলেন না তো স্যার? পানপাতা-মুখের উপর উড়ে এসে পড়া চূর্ণচুলের গুচ্ছ বাঁ-হাতে সরাতে সরাতে হেসে উঠেছিল কঙ্কা, আমার মাঝেমধ্যে এ রকম উল্টোপাল্টা কথা বলার অভ্যেস আছে। কলেজে পড়ার সময় আমাদের রাশভারী হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টকে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে প্রায়ই বিব্রত করতাম। এমনকি বাংলার অধ্যাপককে একদিন বলেছিলাম, স্যার, কখনও কখনও আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দ বড় কবি, শুনে সেই অধ্যাপক আমাকে মারতে আসেন আর কি। আমি মেয়ে বলে অদ্দুর আর গড়ায়নি ব্যাপারটা, নইলে—

কঙ্কা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, হাসির প্রাবল্য একটু বেশিই ছিল বোধহয়, পর মুহূর্তেই সংযত করেছিল নিজেকে, এটা অফিস, বাড়ির বৈঠকখানা নয় বুঝতে পেরে। সায়ন অবশ্য কৌতুক অনুভব করেছিল ঘটনাটায়। এ সব কোম্পানিতে ব্যবসাজনিত টানাপোড়েনে প্রতিটি মুহূর্ত এমন রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকে যে কখনও চটুল পরিহাস হয়তো দরকার। তারপরও অবশ্য মাঝেমধ্যে কাজের অবসর বুঝে কঙ্কা তার যুক্তিতে, শানিত কথায়, কৌতুকের স্ফুরণে কোনও নতুন ভাবনায় আন্দোলিত করত সায়নকে, ডিকটেশন শেষ হওয়ার পরও দু-একটা লঘু সংলাপে সায়নের চাপ চাপ টেনশন লাঘব করত কিছুটা। কিন্তু আজ নোট নেওয়া শেষ হতেই সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনই চুপচাপ শব্দহীন, মাথা নিচু করে তার খাতা-পেন্সিল গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল দ্রুত। চেয়ার ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াতেই সায়ন অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, কঙ্কা—

বোধহয় কিছুটা বিস্মিত হয়েই কঙ্কা ফিরে দাঁড়ায় সায়নের দিকে, ভুরুতে তেমনই কোঁচ।

—আর ইউ সিক, কঙ্কা?

কঙ্কা সহসা হতচকিত, তেমনই বিস্ময় নিয়ে বলল, কেন স্যার?

—তোমাকে ক'দিন ধরেই খুব গম্ভীর দেখছি। শরীর ঠিক না থাকলে কয়েকদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম নিতে পারো। আমি পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের পি.এ. রোহিণীবাবুকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব।

সায়নের কণ্ঠস্বরে এমনই দৃঢ়তা ছিল যে, কঙ্কা রায়ের ফরসা মুখখানা মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল, অভিব্যক্তিতে একটা অস্বস্তিও, দ্রুত বলে ফেলল, নো স্যার, আই অ্যাম ও. কে, স্যার।

—ঠিক আছে, এখন যেতে পার, সায়ন আরও গম্ভীর হয়ে বলল।

দ্বিধাজড়িত পায়ে কঙ্কা বেরিয়ে যাওয়ার পর চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে রইল সায়ন। সংবাদপত্রে গত এক মাস ধরে যে সব কুৎসা মেশানো রসালো ঘটনা, তার প্রতিক্রিয়া পর পর প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তাতে একটি বাঙালি পরিবারের মেয়ের পক্ষে, সে যত আধুনিকাই হোক না কেন, সায়ন চৌধুরীকে এই মুহূর্তে এড়িয়ে থাকতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক, ইতিমধ্যে একদিন কোর্টে হাজিরা দিতে হয়েছে সায়নকে। গার্গী তার সঙ্গে কোর্টে যেতে চেয়েছিল, সায়ন আঁতকে উঠে বলেছিল, এই কাজটি কোরো না প্লিজ। কাল কাগজে আমার ছবি তো উঠবেই, সঙ্গে তোমার ছবিও। সঙ্গে আর এক প্রস্থ পর্নো-মেশানো স্টোরি। ছবি আর গল্প ছাপাতে চাও তো—

গার্গী অদ্ভুতভাবে হেসেছিল, বদনাম তো হয়েই গেছে। না হয় আরও কিছু মিথ্যে বানিয়ে বানিয়ে লিখবে। কী মিথ্যুক ওরা বলুন! সেদিন দিব্যি লিখে দিল, আমাকে নাকি কোলাঘাট বাংলোয় নাইটি পরা অবস্থায় দেখা গেছে আপনার সঙ্গে। অথচ আদৌ কোনও বাংলোয় যাইনি আমরা। রূপনারায়ণের তীরে বসে জেলেদের মাছ ধরা দেখছিলাম—

সায়ন রেগেমেগে বলেছিল, যত্ত সব রাবিশ।

গার্গী হাসতে হাসতে বলেছিল, তবু ভাগ্যিস লেখেনি রাত্রিবাসও করেছি আমরা। তাহলে লোকে আরও রসিয়ে রসিয়ে পড়ত।

সায়ন গম্ভীর হয়েছিল, যখন হাতি কাদায় পড়ে, তখন ব্যাঙেও তাকে লাথি মারে। সেদিন আমার পি.এ. কঙ্কা রায়কে জড়িয়েও অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে পড়েছ?

গার্গী তৎক্ষণাৎ বলেছিল, পড়েছি, এমন কনভিন্সিং ভঙ্গিতে ওরা লেখে যে, প্রথমে বিশ্বাস করেও ফেলেছিলাম। পরে যখন দেখলাম, আমার সম্পর্কেও যা-তা লিখেছে ; যা সত্যি নয় তাইই লিখেছে অসহ্য গা-রি-রি করা বর্ণনা দিয়ে, তখন আর ওদের কোনও লেখাই বিশ্বাস করি না।

—তা হলে কোর্টে যাওয়াটা থাক, কী বলো, গার্গী।

গার্গীও সায় দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, তা হলে থাক।

তার চেম্বারের দরজায় সামান্য শব্দ তুলে কঙ্কা ধীর পায়ে বেরিয়ে যেতে সায়ন মনে মনে ঘাড় নাড়ল, কাগজের লোকদের ভয়েই কঙ্কা এড়িয়ে যেতে চাইছে তাকে। অবশ্য ঠিকই করছে সে। কঙ্কা গার্গীর মতো বেহিসেবি নয়, সে তার কেরিয়ার গড়ে তুলেছে অতি সযত্নে! তার অফিস-বসের সঙ্গে কতটুকু মিশলে, কতটা কথা বললে, হাসলে, শরীরে কতটা ঢেউ তুললে তার অ্যাম্বিশন ঊর্ধ্বমুখী হবে, তা সে ভালই জানে। এই মুহূর্তে প্যারাডাইসের গুড উইলের গ্রাফ নিম্নমুখী, এখানে তার চাকরির ভবিষ্যৎ এখন শূন্যই বলা যায়। হয়তো সে এর পর চাকরি খুঁজবে অন্য কনসার্নে, কিছু একটা অফার পেলেই তক্ষুনি রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে অব্যাহতি চাইবে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস থেকে। সায়ন অবশ্য তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেবে তাকে। অমন একটি শিক্ষিতা, চৌখস মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হোক, সে কখনওই চাইবে না।

ভাবতে ভাবতে কয়েক মুহূর্তের জন্য বোধহয় অনামনস্ক হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কখন যেন বেল বাজিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রকে। বছর বত্রিশের হ্যান্ডসাম, স্মার্ট যুবক, কথাবার্তায় দারুণ শার্প, চেম্বারের দরজা ঠেলে একটা চেয়ার টেনে বসতেই সায়ন জিজ্ঞাসা করে, সেলস-এর খবর কী, মিঃ মিত্র?

বেশ কয়েকদিন পর দেখা হল রোহিতাশ্ব মিত্রর সঙ্গে, স্পষ্টতই তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ভাল নয়, স্যার। এক মাসে সেল ফল্ করেছে প্রায় অর্ধেক।

—মাই গড্! সায়ন চমকে উঠল, টেবিলের উপর রাখা একটি ফুল-লতাপাতা-ভরা পেপারওয়েট আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছিল, কমার্শিয়াল ম্যানেজারের জবাব শুনে একদম স্টিফ্ হয়ে গেল পেপারওয়েটটা, বলেন কি—

—হ্যাঁ স্যার, অনেক চেষ্টা করছি সেল্ তুলতে, কিন্তু ঠিকমতো রেসপনস পাচ্ছি না। এরিয়া ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিংও করলাম দু-তিনটে—

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সায়ন বলল, দেন, হোয়াট'স্ দ্য ওয়ে আউট?

—কিছু ভাববেন না স্যার, ক'দিন পর আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এক-আধটা খারাপ সময় তো আসতেই পারে কোম্পানিতে, তখন বাজার কিছুটা মন্দা হয়ে যায়। আপনি কয়েকদিন ছিলেন না বলে একটু স্ল্যাক্‌নেসও দেখা দিয়েছিল ফিল্ড-ওয়ার্কারদের মধ্যে। সামান্য কনফিউশনও, তাদের চাকরির ভবিষ্যৎ কী হবে এই ভেবে। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া? সায়নের ভুরুতে কোঁচ পড়ল।

আবার ইতস্তত করলেন মিঃ মিত্র, স্যার কাগজে এত লেখালেখি হচ্ছে, তার একটা এফেক্ট তো কোম্পানির গুডউইলের ওপর পড়বেই। এই ক্রাইসিস্ ফেজটা কেটে গেলেই দেখবেন আবার সব কিছু নর্মাল হয়ে উঠবে।

রোহিতাশ্ব মিত্র যা বলেন, একটু স্ট্রেটকাটই বলেন। এই জন্যেই তাকে বেশ পছন্দ হয় সায়নের। কাজেকর্মেও যেমন তুখোড়, কোনও সমস্যার মোকাবিলাও করেন বেশ সোজাসুজি। পেছনে সমালোচনা না করে সামনাসামনি বলাটা অনেক যুক্তিযুক্ত। তাতে কোম্পানির চেহারাটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

—ঠিক আছে, মিঃ মিত্র। ট্রাই ইয়োর বেস্ট।

রোহিতাশ্ব মিত্র 'ও. কে. স্যার' বলে বাইরে গেলেন।

গত কয়েকদিন ধরে অফিসে আসছে বটে সায়ন, কিন্তু সে এতই অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তায় ভুরুতে এমন কোঁচ ফেলে আছে যে মন বসাতেই পারছে না কাজে। একে ওকে ডেকে টুকটাক এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করেছে। খোঁজখবর নিয়েছে কোনও কোনও সেকশনের, কিছু হয়তো কাজও দিয়েছে কাউকে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে মন বসানোর তাগিদ খুঁজে পায়নি। বার বার মনে হচ্ছিল, কার জন্যই বা তার এত পরিকল্পনা, এত খাটা-খাটুনি। ঐন্দ্রিলার কথা যতবার মনে পড়ছে, ততই তার ভেতর উসকে উঠছে-এক ধারাবাহিক অস্থিরতা।

প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত অফিসে আসেননি আজ। ফ্যাক্টরিতে ফোন করে দেখল, সেখানেও নেই। কাল দেখা হয়েছিল এক মুহূর্তের জন্য, তখন কিন্তু বলেননি, আজ আসবেন না। অথবা হয়তো বলেছিলেন, অন্যমনস্ক ছিল বলে সায়ন শুনতে পায়নি, কিংবা

মনে নেই।

তিন-চার দিন ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে মন ও শরীরের সম্পূর্ণ জড়তা ঝেড়ে ফেলে আবার আগের মতো শুরু করতে পারে তার দৈনন্দিন রোজনামচা। কিন্তু কী একটা বিপুল অপরাধের বোঝা তার ঘাড়ে চেপে বসেছে যা থেকে বহু চেষ্টা করেও মুক্ত হতে পারছে না। সেল্ ফল করেছে, তার অর্থ গত এক মাসের প্রোডাকশনের অনেকখানি স্টক জমে গেছে। স্টক পাইলিং হয়ে যাওয়া মানে টাকা ব্লকড হয়ে যাওয়া। তার মানে ব্যাঙ্কে বিরাট অঙ্কের সুদ গুনতে হবে। সব মিলিয়ে—

না কি, সে অফিসে ছিল না বলে গত এক মাসে ঠিকমতো প্রোডাকশনও হয়নি! কৌশিক দত্ত অবশ্য তাকে একবারও বলেনি সে কথা। গত কয়েকদিন বেশ কয়েকবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল সায়ন। নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে, ড্যামেজ্ড্ প্ল্যান্ট নিয়েই যা কিছু আলোচনা, প্ল্যানিং হয়েছে। পাইলিং-এর ব্যাপারে নয়। কিন্তু যদি পাইলিং হয়ে থাকে, তাহলে কোন্ প্রোডাক্টটা — রোজবেরি না ড্রিমবাথ! নাকি দুটোই! আগেকার প্রোডাক্টের সেল যদি আগের জায়গায় ধরে রাখা না যায়, তবে নতুন প্রোডাক্টের ভাবনা তো আরও পিছিয়ে দিতে হবে। না কি এক্ষুনি নতুন কোনও প্রোডাক্ট শুরু করে দেওয়াটাই উচিত?

এত সব ভাবনা একসঙ্গে মাথার ভেতর ভিড় করে আসায় অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল তার। একটা রাইজিং কনসার্ন হঠাৎ কীভাবে এক অভাবিত দুর্ঘটনার ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না। এখন এহেন ক্রাইসিস থেকে উদ্ধার পেতেই হবে তাকে। তার জন্যে দরকার নতুন উদ্যোগ, নতুন কোনও পরিকল্পনা। আবারও নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিতে হবে কাজের মধ্যে।

হঠাৎ তার ভাবনার তার ছিঁড়ে বাইরে প্রথমে তিনবার টক্ টক্ টক্ শব্দে নক্। তার পর সুইংডোর ঠেলে যিনি সায়নের ঘরে ঢুকলেন তিনি মধুমন্তী রায়মজুমদার, কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার। সায়ন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, বসুন, মিসেস রায় মজুমদার

—স্যার, এ ক'দিন অফিসে এসেছেন, কিন্তু আমাকে একবারও ডাকেননি, তাই নিজেই চলে এলাম, সামনের চেয়ারে ছড়িয়ে বিছিয়ে বসে কাঁধের শাড়ি বিন্যস্ত করতে করতে মধুমন্তী বললেন।

সবুজ-হলুদ প্রিন্টের চমৎকার একটি সিল্কের শাড়ি পরেছেন মধুমন্তী, কপালে বড় করে একটা টিপ, তাতে ওঁর চওড়া কপালে বেশ মানানসই লাগছে, রোজ টিপের রং-ও বদলে যায় শাড়ি-ব্লাউজের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করতে। আজ পরেছেন সবুজে-হলুদে মেশানো টিপ বয়স বত্রিশ তেত্রিশের মতো হবে, কিন্তু এমন চমৎকার শরীরের বাঁধুনি আর মুখের গড়ন যে পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি মনেই হয় না। হাতে শাঁখা বা কপালে সিঁদুর কোনওটাই নেই অথচ নাম লেখেন মিসেস—। এ ব্যাপারে কখনও কৌতূহল প্রকাশ করেনি সায়ন, তবু কারও কাছে যেন অস্পষ্ট শুনেছিল, ভদ্রমহিলা ডিভোর্সি।

এ-কোম্পানিতে জয়েন করার পর থেকেই মধুমন্তী বরাবর কেমন বিষণ্ণ, নিষ্প্রভ হয়ে থাকতেন অথচ মুখশ্রী কী চমৎকার, যখন হাসেন, একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য ছড়িয়ে থাকে সমস্ত শরীরময়। বিষণ্ণ সৌন্দর্যই। এই সৌন্দর্যও যে কতটা নজর কাড়তে পারে একজন পুরুষের তা মধুমন্তীকে না দেখলে বোঝা যায় না।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে. মধুমন্তী কেন যেন বেশ খুশি খুশি। সেই খুশিয়াল রেশ ঝরে পড়ল তার গলায়, স্যার, বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কোনও ডিসিশন নিইনি আপনার অ্যাবসেন্সে। বিভিন্ন কাগজের লোকরা অনবরত আসছে। সবাইকে বলেছি, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে।

অন্য দিনকার তুলনায় বেশ ফ্রিও লাগছে আজ মধুমন্তীকে। চোখের কোণে জমে থাকা বিষণ্ণতার রেশটুকু আজ তেমন নেই। একটু বেশি সেজেওছেন মনে হচ্ছে। আগে ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক লাগাতেন, আজ গাঢ় রক্ত রঙের লিপস্টিক গ্লেজ দিচ্ছে দারুণভাবে। ব্যাপার কী, নতুন করে কারও প্রেমে পড়লেন নাকি মধুমন্তী!

—স্যার, সেল্ ফল্ করেছে শুনে আমিও খুব দুশ্চিন্তায় আছি। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে নতুন একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। এই মুহূর্তে আমাদের অ্যাডের খানিকটা ডাইভার্সান করাই উচিত। মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল। নতুন কোনও থিম্ পেলে অনায়াসে ভুলে যায় পুরনো সব কথা। পুরনো অ্যাড্ বদলে নতুন কয়েকটা লে-আউট কাগজে ছাপালেই দেখবেন আমাদের প্রোডাক্ট আবার বাজার ধরে নিয়েছে।

সায়ন ঘাড় নাড়ল, হুঁ, ঠিক আছে—

—এক উঠতি ফিল্ম-আর্টিস্ট আমার প্রায় বান্ধবীর মতো। বোম্বে গিয়ে সিরিয়াল করে খুব নাম করেছে। দশ-বারো করে নেয়, আমি বললে হাজার পাঁচেকে রাজি হয়ে যাবে আমাদের কোম্পানির মডেল হতে। ওকে দিয়ে কয়েকটা অ্যাড করাই। নতুন ক্যাপশনে নতুন লে-আউটে।

সায়ন আবার ঘাড় নাড়ল, অনুমোদনের ভঙ্গিতে। মধুমন্তী রায়মজুমদারের মাথায় এসব ব্যাপারে বেশ আইডিয়া-টাইডিয়া খেলে। চমকপ্রদ ক্যাপশন দিয়ে ভাল অ্যাড করানোর ব্যাপারে কিছুটা খ্যাতি হয়েছে। একজন তরুণ আর্টিস্টকে ধরে এনে তাকে নিজের মতো করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছেন। একটা নামী অ্যাডভার্টাইজিং সংস্থার থ্রু দিয়ে রিলিজ করাচ্ছেন বিজ্ঞাপনগুলো। তাতে ওই অ্যাড এজেন্সি কমিশনের একটা পার্সেন্টেজ নিয়ে নেয় বটে, কিন্তু তাতে বড় কাগজগুলো থেকে ক্রেডিট পাওয়া যায়। ক্যাশ ডাউন করতে হয় না সঙ্গে সঙ্গে।

রোজবেরি আর ড্রিমবাথ দিয়ে গত বছর চমৎকার একটা টিভি অ্যাডও করিয়েছেন মধুমন্তী। কম্পোজিশনটা দারুণ হয়েছিল। প্রায় স্বপ্নের মতো একটা দৃশ্য। চারদিকে শুধু নীল, নীল আর নীল। তার ভেতর একটা বাথটাবে শুয়ে আছে নীল সাবানের ফেনায় মাখামাখি একটি সুন্দরী যুবতী। স্বপ্নের মতো তার চোখদুটো। সে একবার মিষ্টি করে হাসতেই বাথটাবটা হঠাৎ রূপান্তরিত হল বিশাল একটি অ্যাকোয়ারিয়ামে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও পরিণত হল এক মৎস্যকন্যায়। মৎস্যকন্যার মতো ডানা দুলিয়ে সে সাঁতার কাটতে থাকে অ্যাকোয়ারিয়ামের নীল জলের ভেতর। সেই সঙ্গে সারাক্ষণ জলতরঙ্গের একটা মিহি সুর বেজে চলেছে। অ্যাড-ফিল্মটা টিভিতে রিলিজ করার পর সে সময় অনেকের মুখেই প্রশংসা শুনেছিল সায়ন। সেও রিটার্ন থ্যাংকস জানিয়েছিল মধুমন্তীকে।

মাসখানেক আগেও তাদের নতুন প্রোডাক্ট মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার নিয়েও একটা অভিনব অ্যাড-ফিল্ম করানো হবে এমন ভাবাভাবি চলছিল, ঠিক সে সময়ে সায়নের

জীবনে এই দুর্ঘটনা।

—ঠিক আছে, গো অ্যাহেড্, সায়ন তার অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের ভাবনাচিন্তা অনুমোদন করে দিতেই 'থ্যাঙ্কু য়্যু, স্যার' বলে হেসে উঠে পড়লেন মধুমন্তী। তার চলে যাওয়ার পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সায়ন। ভদ্রমহিলার স্বামী নেই, অথবা থেকেও নেই। তাকে দেখে সায়নের মনে বরাবর একধরনের সহানুভূতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত। আজ তার উচ্ছল খুশিয়াল চেহারা দেখে সায়নের ভালই লাগল।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ শ্লথ হয়ে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে রইল সে। চোখদুটো বোজানো। এক ধরনের ডিপ্রেশন তার সারা শরীর ও মনে জাঁকিয়ে বসছে দ্রুত। সারাক্ষণ এমন এক ক্লান্তি তাকে অবশ করে তুলছে যা তার চরিত্রের মানসিক গঠনের বিরোধী। যে কোনও ঝড়ঝাপটাকেই সে প্রতিহত করে এগিয়ে গিয়েছে এতকাল। অতিক্রম করেছে সমস্ত বাধাবিপত্তি। তার অ্যাম্বিশন ছিল আকাশছোঁয়া। অন্যের চেয়ে, অন্যকে ছাড়িয়ে বড় হতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তা কেবল নিজেব প্রতিভা আর শ্রমের জোরে। কোনও অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়। লাইম ইন্ডিয়া কিন্তু তার এই সাফল্যকে কখনও ভাল চোখে দেখেনি। গত কয়েক দিন আগেই এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কাগজে, 'স্বপ্নস্নান আর স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন, তার থেকে দূরে থাকুন।' তারপর আর একদিন, 'গোলাপে কণ্টক থাকে, মাখতে গেলে গায়ে লাগে।'

সায়ন বুঝতে পেরেছে ড্রিমবাথ আর রোজবেরিকে আক্রমণ করে এই বিজ্ঞাপন। আর তা প্রকাশিত হয়েছে লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায়ের নির্দেশে। অর্থাৎ লাইম ইন্ডিয়া অলক্ষ্যে প্যারাডাইসের প্রোডাক্টকে হেয় করে তুলতে চাইছে মানুষের চোখে। বুদ্ধিমান মানুষের তো আর অভাব নেই দেশে। তারা ঠিকই আলোচনা করবে বিজ্ঞাপনগুলো নিয়ে। হাসাহাসি করবে। তারপর হুইস্পারিং চলবে পথেঘাটে, ট্রামে-বাসে, কী ব্যাপার, তা হলে রোজবেরি আর ড্রিমবাথ!

প্যারাডাইসের সেল যখন হু হু করে পড়ে যাচ্ছে, তখন এই বিজ্ঞাপন গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো। মধুমন্তীর সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবে ভেবে রেখেছিল, একদম ভুলে গেছে অন্যমনস্কতায়।

এখন চারদিকের এই ছোবল এড়াতে একটা কিছু পরিত্রাণের পথ খুঁজে বার করতে হবে তাকে। এত বড় অফিস, এমন বিশাল এস্টাব্লিশমেন্ট, এত লোকের জীবিকা, তার মানসম্মান সব জিইয়ে রাখতে গেলে নতুন কোনও ওয়ে-আউট বাতলাতে হবে তাকে। মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রোডাকশন আরম্ভ হওয়ার আগেই বন্ধ করে দিতে হল এক আচম্বিত দুর্ঘটনায়। কেন যে হঠাৎ প্লান্ট বার্স্ট করল তার কারণও বেশ রহস্যময় রয়ে গেল তার কাছে। এও কি তা হলে আর এক স্যাবোটেজ? কার হাত আছে এর পেছনে। লাইম ইন্ডিয়ার নয় তো! তার কানে এসেছে, তাদের মেশিন বার্স্ট করায় ভারি খুশি হয়েছেন লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান। তার প্রোডাক্ট মার্কেটে বেরুলে সায়ন নিশ্চিত ছিল, লাইম ইন্ডিয়ার 'হোয়াইট-ওয়াশ' বাজারে মার খেয়ে যাবে। লাইম ইন্ডিয়ার কাছে সেটা হত একেবারে দুঃস্বপ্নের মতো। সেজন্যে কি তারাই—

লাইম ইন্ডিয়ার ভাবনাটা মাথায় কয়েক বার রোল খাওয়ার পর সায়ন হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল,

ডিটারজেন্ট পাউডার যখন বাজারে ছাড়া যাচ্ছে না, তখন নতুন কোনও একটা স্নানের সাবান তৈরি করবে সে। রোজবেরি কিংবা ড্রিমবাথের মার্কেট যখন ফল্ করছে, তখন নতুন কোনও প্রোডাক্ট মার্কেটিং করাই হবে সবচেয়ে সহজ কাজ। একেবারে আনকমন একটি প্রোডাক্ট। নতুন নামে, নতুন গন্ধে, নতুন রঙে। ভাবতে ভাবতে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। তা হলে আরও একবার তাকে ম্যাজিক দেখাতে হবে। নতুন ফর্মুলায় নতুন সাবান। আরও একবার তার ল্যাবরেটরিতে নতুন ফর্মুলার উৎস সন্ধানে ডুব দিতে হবে, হুঁ ঠিকই, দ্যাটস দ্য আইডিয়া। লাফিয়ে উঠল সায়ন।

ঠিক এই মুহূর্তে একটি ফোন বেজে উঠল তার টেবিলে, রিসিভার তুলে বেশ প্রসন্ন মেজাজেই বলল, হ্যালো, কে, গার্গী? কী ব্যাপার, কদিন একদম দেখা নেই কেন? আমাকে ভুলে গেলে নাকি!

কিন্তু একটু পরেই টেলিফোনের ওদিককার কথা শুনতে শুনতে সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। গার্গীর প্রতিটি সংলাপ ভূমিকম্পের মতো কাঁপাচ্ছে তার শরীর, তার বর্তমান, ভবিষ্যৎ — সব।

রিসিভার হাতে নিয়ে সায়ন বসেই থাকে নির্বাক, রক্তশূন্য মুখে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের হাজারো ভাবনায় যখন সে বিপর্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত, ঠিক তখনই গার্গী তাকে জানাল আর এক কঠিন বার্তা। এতই জটিল সে সমস্যা যে সায়ন এখন তাকে নিয়ে কী করবে সে-কথা ভাবার এতটুকু সময় পর্যন্ত তার সামনে নেই।

গার্গীকে সে এতকাল চিনে এসেছে একভাবে, এখন দেখছে, সে নতুন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ। সে-ভূমিকা সায়নের অভিভাবকের। সায়নও এই প্রবল ঝোড়োঝাপটের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে তাকেই আঁকড়ে ধরেছিল খড়কুটোর মতো। তাতে সে নিজে কিছুটা সামলে উঠলেও প্রবল ক্ষতি হয়েছে গার্গীর। তার সঙ্গে গার্গীকে জড়িয়ে এমন অনেক রসালো খবর প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে, যার অনেকটাই সত্যি নয়। তবু লোকে তাইই বিশ্বাস করে যা প্রকাশিত হয় ছাপার অক্ষরে।

এত সব ভাবতে ভাবতে সায়ন তার টেবিল গুছিয়ে, ব্রিফকেস বন্ধ করে দ্রুত নেমে এল নীচে। পার্ক করে রাখা গাড়িটির চালকের আসনে বসে সেল্‌ফ্ অন্ করল মুহূর্তে। তারপরই বাঁই করে চকোলেট রঙের মারুতি বার করে আনল কলকাতার প্রধান রাস্তায়। দ্রুত পার হতে লাগল রাজপথ, ক্রসিঙের পর ক্রসিং।

এসপ্লানেড ইস্টে রোজই কোনও না কোনও মিটিং, প্রতিবাদ। তাতে রাস্তা বন্ধ থাকে। ভাগ্যক্রমে আজই কোনও জমায়েত বা মিটিং ছিল না। সন্ধেও নেমে আসছে ততক্ষণে। চৌরঙ্গি মোড় সেজেগুজে ক্রমশ রূপসী হয়ে উঠছে, কিন্তু সায়নের চোখে এখন আর

কোনও রং নেই। এখন তার চারপাশে ধূসর আলো আরও ম্লান হয়ে আসছে দ্রুত। মাত্র কয়েকদিন আগেও তার পৃথিবী ছিল আলো ঝলমলে, বর্ণাঢ্য, রঙিন। এই অল্পসময়ে আমূল বদলে গেছে সমস্ত পটভূমিকা। এক অনন্ত লোডশেডিং চলছে তার জীবনযাপনে।

ঐন্দ্রিলা ছিল, আর ঐন্দ্রিলা নেই — মাত্র একটা শব্দের পরিবর্তনে তার জীবনে এখন পর-পর এলোঝড়। সে-ঝাপট তাকে এখন সামলাতে হবে অভিমন্যুর মতো, একা, নিরুপায়ভাবে।

গাড়ি প্রায় টপ্-গিয়ারে রেখে দ্রুত সায়ন ফিরে এল তাদের ফ্ল্যাটে। বেশ একটু জোরেই চালিয়েছে আজ, কিছুটা উত্তেজনায়ও বটে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে টার্ন নেওয়ার পর ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে একটা ছোট দুর্ঘটনা হতে হতেও সময়মতো ঘুরিয়েছে তার স্টিয়ারিং। গাড়ি গ্যারাজে না ঢুকিয়ে, লনের ওপর রেখেই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল উপরে।

গার্গী যেমন বলেছিল ফোনে, তার কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। সেন্টার-টেবিলের সামনে সোফার ওপর বসে আছে একটা অসহায়-অসহায় মুখ করে, প্রায় নীবক্ত, বেবাক্ হয়ে। গার্গীর চলে আসার কারণ আগেই ফোনে শুনেছিল সায়ন, শোনার পর থেকেই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা তার। হঠাৎ একটি কুমারী মেয়ে বাড়ির অভিভাবকদের সঙ্গে বিবাদ করে যদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সুটকেস, আর আশ্রয় নেয় এমন একজনের বাড়ি, যার জীবনযাপনে চলছে এক তীব্র টানাপোড়েন, তার ওপর সে পুরুষটি যদি মাত্র একা বসবাস করে ফ্ল্যাটে, এমনকি তার ঘরে একটি ঠাকুর-চাকরও নেই, তবে তার অবস্থা কী দাঁড়ায়! হঠাৎ কী কারণে গার্গী এমন একটি সিদ্ধান্ত নিল, এমন অতর্কিতে, তা সায়ন জানে না। শুধু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছে, ও বাড়িতে আর থাকা গেল না, সায়নদা—

অথচ সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, ঘরে টিউব জ্বলছে, মনে হচ্ছে বুঝিবা এখন অনেকটা রাত, এই সঙ্কটের মুহূর্তে এহেন গার্গীকে নিয়ে সায়ন এখন কী করবে! কীই বা করা উচিত তার?

গার্গীর মুখে অসহায় চাউনি দেখে ঘেমে নেয়ে উঠল সায়ন। এপ্রিলের শেষাশেষি ঘরের ভেতর ফুল-স্পিডে ফ্যান চলতে থাকা সত্ত্বেও ভ্যাপ্‌সা গরম। সে গরম কিছুটা উত্তেজনাতেও।

সায়ন চোখ ফিরিয়ে গার্গীব সুটকেস, ব্যাগের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। মুখে একটুকরো ছায়াও ঘনিয়ে এল বোধহয়, তা সত্ত্বেও হাসতে চেষ্টা করল, কী হল, হঠাৎ এরকম ডিসিশন নিতে হল কেন?

গার্গী সায়নের চোখমুখ দেখে মুহূর্তে বুঝে ফেলল সব। মেয়েরা এভাবেই বোঝে পুরুষের চাউনি, দেখলেই তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব পলকে উপলব্ধি করে ফেলে। তৎক্ষণাৎ বলল, তাহলে চলে যাব?

সায়ন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, দাঁড়াও। চলে যেতে বললাম নাকি? জানতে চেয়েছি, কী হয়েছিল। কার সঙ্গে ঝগড়া হল, দাদা, না বউদি?

—দু'জনের সঙ্গেই, বলে গার্গীও হাসার চেষ্টা করল, এরকম তো মাঝেমধ্যেই হত, কিন্তু এ ক'দিন ধরে ভীষণ চলছিল। আজ সকালে অফিস বেরুবার মুখে দাদা বলে গেল, তোর

জন্যে আর লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। অফিস থেকে ফিরে এসে যেন এ বাড়িতে আর তোকে না দেখি।

হাসছিল গার্গী, হঠাৎ শেষ কথাগুলো বলার সময় তার চোখে জল এসে গেল।

গার্গীর চোখে জল! সায়ন ভাবতে পারে না। গার্গীর শৈশব-কৈশোর কেটেছে এক প্রবল যুদ্ধের ভেতর। তার বাবা নেই ছোটবেলা থেকেই, মা কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে মানুষ করেছিলেন দুই ছেলে-মেয়েকে। সুশোভন লেখাপড়ায় মোটামুটি মেধাবীই ছিলেন, নিজের অধ্যবসায়ের জোরে তিনি এখন ভাল কোম্পানির এক্সিকিউটিভ পোস্টে। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হলেও মাইনে পান ভালই। জুবিলি পার্কের এই ভাড়া বাড়িতে আছেন বহুকাল। কোম্পানি থেকে লোন নিয়ে নতুন ফ্ল্যাট কিনে চলে যাবেন খুব শিগগির। গার্গীর মা যখন মারা যান, তখন গার্গী কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনও ভাই-বোনের সম্পর্ক ভালই ছিল। এমনকি সুশোভন চাকরি পেয়ে বিয়ে করার পর পর্যন্তও। তারপর হয়তো—

ছাত্রী হিসেবে গার্গীও কম মেধাবী ছিল না, কিন্তু প্রচণ্ড জেদি, একগুঁয়ে মেয়ে বলে বরাবরই তার সামনে কোনও সুস্পষ্ট নিশানা ছিল না। সে কখনও ভেবেছিল গণিতের অধ্যাপিকা, না হলে শিক্ষিকা হবে। কখনও ভাবত, ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। তথ্য সংগ্রহের নেশাটা এখনও আছে। এর মধ্যে হঠাৎ সোসিও-ইকনমিক রিসার্চ অ্যাকাডেমি নামের এক সমাজ-সংস্কারের সংস্থায় ঢুকে পড়েছে, তাতে কখনও সমাজ-সংস্কারক হবে এমন ইচ্ছের কথাও একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল। আসলে যখন যে বিষয়ে সে মনোনিবেশ করে, খুব সিরিয়াসলিই করে। পরে নতুন বিষয় এলে ঝুঁকে পড়ে সেদিকেই। এভাবেই চলছিল বেশ, হঠাৎ এই এলো ঝড়ের ভেতর ঢুকে পড়ে সায়নের সঙ্গে তার জীবনটাও এলোমেলো, ছন্নছাড়া হয়ে উঠেছে সহসা।

সায়ন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল গার্গীকে। এই মুহূর্তে তাকে ভীষণ দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছে। সেরকমই ম্লান, নিঃস্ব, বিধ্বস্ত মুখেই বিড়বিড় করছিল, আসলে কি জানেন, সারা দুপুর ভেবেও ঠিক করে উঠতে পারিনি, দাদার আশ্রয় ছেড়ে এখন কোথায় যাব। তেমন কোনও আত্মীয় নেই, কিংবা কোনও নিকট-বান্ধবী, যার কাছে গিয়ে ক'দিনের জন্য উঠতে পারি। যতক্ষণ না কোনও একটা নিজস্ব আস্তানা খুঁজে বার করা যায়! কঙ্কার বাবা-মা তাঁদের মেয়ের শোকে এমনই পাগল যে সেখানেও যাওয়ার মতো সাহস অর্জন করতে পারিনি—

ফ্ল্যাটের জানলার বাইরে যে তারাভরা কলকাতার আকাশ সেদিকে তাকিয়ে আপনমনে কথাগুলো বলে চলেছিল গার্গী। মাত্র কদিন আগেই সে তার দাদা-বউদির কাছে বলে ফেলেছিল, 'আমি সায়নদাকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি', এখন সায়নের বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে নিতান্তই কল্পকথা। এই মুহূর্তে সে বুঝে ফেলেছে, হঠাৎ খেয়ালের বশে, ঝোঁকের মাথায় সে এগিয়ে এসেছে অনেকদূর। এখন আর এক-পাও এগোনো যাবে না, ফিরে যে যাবে সে আরও কঠিন, কঠিনতর কাজ। তবু তো ফিরতেই হবে তাকে, তাই উথলে ওঠা কান্নার দমক চেপে অস্ফুট গলায় বলল, আছে কোনও আস্তানা আপনার সন্ধানে, যেখানে থাকা যাবে অন্তত ক'দিন?

—দাঁড়াও, এত অস্থির হচ্ছ কেন, এমন বলল সায়ন, তার এই একলা-একা ফ্ল্যাটে কোনও মতেই রাখা যায় না গার্গীকে — ভাবতে ভাবতে নিজেকে গুছিয়ে ফেলল সহসা,

হেসে ফেলল, এতক্ষণের টেনশনপীড়িত অস্বস্তি, বিব্রতভাব কাটিয়ে, দ্রুত বদলে ফেলল পটভূমিকা, যেন কিছুই হয়নি এমন সাবলীল হয়ে বলল, ঠিক আছে, সে একটা আস্তানা খুঁজে বার করা যাবে'খন। আপাতত দু'কাপ কফি করে আনো তো। অফিস থেকে ফেরার পর কফি না পেলে মেজাজটা ঠিক বাগে আনা যায় না। মগজও ঠিকঠাক কাজ করে না যেন—

গার্গীর মুখ থমথমে, গম্ভীর, কিছু একটা আলোর ঝিলিক সায়নের চোখে পড়েছে এমন মনে হল। আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, চেনা একটা মানুষ কখনও ঝঞ্ঝাটে পড়লে কেমন অচেনা হয়ে যায়। সায়নও তার কাছে এই মুহূর্তে যেন অন্য এক গ্রহের মানুষ। ইচ্ছে করলেও তাকে আর ছুঁতে পারবে না। কী অদ্ভুত সে, কী নিষ্ঠুর! পরক্ষণেই ভাবল, সায়নই নিশ্চয় তার সিদ্ধান্তে ঠিক, সেইই বিচক্ষণ। গার্গীই এক বিচিত্র ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে চলেছে ক'দিন ধরে। তাতে ক্রমাগত জটিল, ছিন্নভিন্ন হয়ে উঠেছে তার জীবনযাপন। সায়ন যেদিন কাস্টডি থেকে মুক্তি পায়, সেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে না গেলেই হয়তো সবচেয়ে ভাল হত।

অন্যমনস্কভাবেই গ্যাস জ্বেলে দু-কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে এসে বসল গার্গী, আবহাওয়া লঘু করে ফেলার জন্য একটু হাসল, সত্যিই খুব বিপদে ফেলেছি আপনাকে। কিন্তু আমিও তো বিপন্ন। হঠাৎ সেই মুহূর্তে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে যদি আপনার কথা আমার মনে পড়ে থাকে তা হলে আমি কী করব? গত দু-তিন বছর এত প্রশ্রয় দিয়েছেন আমাকে—

কফিতে বেশ শব্দ করে চুমুক দেয় সায়ন, গাঢ় বাদামি ধোঁয়া-ওঠা কফি, বেশ কড়া, একটু কড়াই দরকার ছিল সায়নের, গরম স্বাদ জিভ বেয়ে কণ্ঠনালিতে যেতেই বেশ চনমনে হয়ে উঠল তার শরীর। হেসে বলল, সত্যিই। এখন মনে হচ্ছে, আমার এখানে না এসে অন্য কোথাও গেলে সবচেয়ে আশ্চর্য হতাম আমিই। হয়তো ভীষণ রেগেও যেতাম। যে দিন কাস্টডি থেকে বেরুলাম, সেদিন একমাত্র তুমি, তুমিই তো এসেছিলে আমাকে নিতে—

কফিতে চুমুক দিতে দিতে আবারও আনমনা হয়ে যাচ্ছিল গার্গী। সে যে সায়নের ঝড়ঝাপটের ভেতর একটা বাড়তি বোঝা হয়ে উঠল ভেবে একটুও স্বস্তি পাচ্ছে না। এর পর সায়ন কী বলবে, কী করবে তাকে নিয়ে এ ভাবনা পীড়িত করছে তাকেও।

কফি খাওয়া শেষ হতেই সায়ন উঠে দাঁড়াল, চলো, তোমাকে একটা জায়গায় নিযে যাই—

গার্গী বিস্মিত হয়ে তাকাল, কোথায়?

শব্দ করে হাসল সায়ন, কোথাও একটা আস্তানার সন্ধান তো বার করতেই হবে। নইলে এক যুবতী হঠাৎ যদি এভাবে একলা-পুরুষের ঘরে রাত কাটায়, সেটা কি ভাল দেখাবে, গার্গী?

গার্গীও উঠে দাঁড়াল, খুব গভীরভাবে তাকাল সায়নের দিকে, আমার কিন্তু আপনার ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে।

—আমারও নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে, সায়ন গার্গীর চোখের দিকে চোখ রাখে, কিন্তু পাবলিকের নেই। একজন পুরুষ আর একজন নারী এক বাড়িতে রাত কাটিয়েছে, আর তৃতীয় প্রাণীটি নেই যে ফ্ল্যাটে, মানুষ ধরেই নেবে তারা এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে।

গার্গী হঠাৎ কেঁপে উঠল নিজের ভেতরে, কী বলবে ভেবে পেল না। সায়নই আবার বলল, তাও একজন খুনি আসামির সঙ্গে। সেটা তোমার পক্ষে নিশ্চয় স্বস্তির হবে না।

ভীষণ রেগে উঠল গার্গী, এই 'আসামি' শব্দটা ব্যবহার করতে কি খুব ভাল লাগে আপনার? যখন আপনি জানেন, মিথ্যে করে জড়ানো হয়েছে আপনাকে?

সায়ন হাসল, সে হাসি ম্লান, হয়তো ক্ষোভে, অপমানে মেশানো, বলল, সারা পৃথিবীর লোক যখন বলছে, সায়ন চৌধুরীই খুন করেছে, তখন আমার আর নিস্তার পাওয়ার পথ কোথায়? তুমি কি জানো, আমার স্টেনো পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসতে চাইছে না। আমার নিঃশ্বাসেও এখন বিষ। কে যে আমার এমন ক্ষতি করে গেল, সেটাই প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত করছে আমাকে? চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত।

গার্গী সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। দরজা লক্ করে সায়ন নেমে এল তরতর করে। গাড়ি ফের স্টার্ট দিল চাবি ঘুরিয়ে, হু-হু করে বেরিয়ে এল শরৎ বসু রোডে, গার্গীকে পাশে বসিয়ে নিয়ে। গার্গীর একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে, কোন জাহান্নামে', কিন্তু করল না, সে এখন সায়নের কাছে সমর্পণ করেছে নিজেকে। শুধু যেতে যেতে বলল, যে হত্যাকারী তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না?

সায়ন ততক্ষণে দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে পৌঁছে টার্ন নিয়েছে গড়িয়াহাটের দিকে। রাত্রি প্রায় আটটার মতো। কলকাতা শহর এমনি সময়ে সবচেয়ে জমজমাট, বর্ণাঢ্য। আলোর ফুলকি দোকানে-দোকানে, লাইটপোস্টে, সার সার বাড়ির একতলা-দোতলা-বহুতল জানলায়। লোডশেডিং না থাকলে প্রথম রাত্রির কলকাতা তো বিলাসের তুঙ্গে থাকে। গড়িয়াহাট ক্রশিঙের ঝলমলে অহঙ্কার পার হয়ে বিজনসেতুতে উঠতে উঠতে সায়ন বলল, সবাইই তো খুঁজছে। পুলিশ, সাংবাদিক, কোর্ট — সব্বাই। তাদের প্রতিটি আঙুলই তো এই সায়ন চৌধুরীর দিকেই তুলে ধরা।

গার্গী তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে সায়নকে, হঠাৎ বলল, এ ক'দিন প্রসঙ্গটা তুলিনি। কাগজে নানারকম পড়ছিই শুধু, আর তা থেকেই নানারকম ধারণা করে নিচ্ছি। এখন বুঝতে পারছি, প্রকৃত রহস্য বোধহয় আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা, সত্যিই বলুন তো, কী ঘটেছিল সেদিন রাতে? আপনার কী মনে হয়?

সায়ন গাড়ি চালাতে চালাতে অনমনা হয়ে যাচ্ছিল, বোধহয় সে রাতের বীভৎস স্মৃতি ফিরে আসছিল তার মগজে, আর চমকে উঠছিল বারবার। তেমন অন্যমনস্ক স্বরেই বলল, ঐন্দ্রিলার মৃত্যুকে আমি আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই ভাবিনি প্রথমে। একাই ঘরে ছিল ঐন্দ্রিলা সেদিন। আমি বাইরে ট্যুরে গেলে প্রায়ই এভাবে একা থাকত। কতবার বলেছি, তার বাবা-মা'র ওখানে গিয়ে থাকতে, প্রথম-প্রথম গিয়ে থাকতও, পরে আর যেত না। বলত, বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়া ঠিক নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে একা একজন মহিলার পক্ষে সুইসাইড করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অবাক হয়ে ভেবেছি, কেনই বা? সে-কথা আকাশ-পাতাল ভেবেও কিনারা করতে পারিনি। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেকটর দেবাদ্রি সান্যাল সেদিন বললেন—

—কী বললেন? গার্গী উৎসুক হল।

—জানালেন, ইট'স নট আ কেস অব্ সুইসাইড, মিঃ চৌধুরী, ইট'স আ মার্ডার। পোস্টমর্টেম থেকে জানা গেছে, প্রথমে গলা টিপে হত্যা করে, তারপর গায়ে আগুন ধরিয়ে

দিয়ে, বলতে বলতে শিউরে উঠল সায়ন সে দৃশ্য কল্পনা করে, আমি আজও বুঝতে পারি না, কে বা কার দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড সম্ভব। দেবাদ্রি সান্যাল বলেছিলেন, ভেবে দেখুন ব্যাপারটা, পাশেই আপনার মা ও ভাই থাকেন, আপনার সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না, কথা পর্যন্ত নয়, এ ক্ষেত্রে—

—ও, গার্গী কয়েক লহমা কিছু যেন ভাবল, তারপর ফের তাকাল সায়নের দিকে, আর কী বললেন পুলিশ ইন্সপেকটর?

—উনি তো আমাকে বারবার বলছিলেন, মিঃ চৌধুরী, সে-রাতে আপনি বাড়িতে ছিলেন না, তা কিন্তু এখনও ঠিকঠাক প্রমাণ করতে পারেননি। বিলাসপুর থেকে আপনার ফেরার কথা পাঁচ তারিখ সকালেই। আপনার কাছ থেকে ট্রেনের টিকিটও পাওয়া গেছে ওই তারিখেরই। অথচ আপনি বলছেন, ফিরেছেন হত্যার পব ভোররাত্রে—, অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছ'তারিখ ভোরে। কেন একদিন দেরি হল তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ এখনও দেখাতে পারেননি কিন্তু।

গার্গী ঠিক একই প্রশ্ন করল, কেন ফেরেননি?

সায়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সে কথা এখন থাক, গার্গী, পরে একসময় বলব।

—ফেরার সময় আপনার সঙ্গে কেউ ছিল?

—ছিল, সায়ন ঘাড় নাড়ল, আলো বোস—

গার্গী চকিতে সায়নের দিকে তাকাল একবার। অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না তাকে। দু-একবার সামনের দিক থেকে আসা কোনও গাড়ির হেড-লাইটের আলোয় কখনও উদ্ভাসিত হচ্ছে সায়নের মুখ, পরক্ষণেই হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। সহসা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল গার্গী। কী অবলীলায় সায়ন উচ্চারণ করল আলো বোসের নাম, একটুও কাঁপল না তার কণ্ঠস্বর! কে এই আলো বোস, তার সঙ্গে সায়নের সম্পর্কই বা কী? কতদূর সে সম্পর্কের শিকড়? কথাটা ভাবতে গিয়ে গার্গীর নিজের শরীরটা কেঁপে উঠল হঠাৎ, পরক্ষণেই সে সায়নের দিকে আছড়ে ফেলল পরবর্তী প্রশ্ন, একদিন পরে যে ফিরেছিলেন সে-কথা আলো বোসকে এনে প্রমাণ করাতে পারবেন?

সায়ন ঘাড় নাড়ল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, চেষ্টা করব।

—আপনার আর কাউকে সন্দেহ হয়?

সায়নের মারুতি তখন রাস্তা ফাঁকা পেতে হু-হু করে ছুটছে ইস্টার্ন বাইপাসের দিকে। গার্গী বুঝতেই পারছে না এ তারা কোথায় চলেছে, কেনই বা। এ পথে গার্গী আরও দু-একবার এসেছে আগে। একবার সায়ন আর ঐন্দ্রিলার সঙ্গে, যেবার তারা দারুণ হইহই করতে করতে গিয়েছিল বেথুয়াডহরি, ফরেস্টের একটি চমৎকার ডাক-বাংলোয়। গোলাপি রঙের দোতলা বাড়িটার ঠিক নীচেই, চত্বরে রোজ সন্ধের পর হরিণের দল এসে ভিড় করেছিল। জ্যোৎস্নায় চাপুরচুপুর ভিজতে ভিজতে তারা হাঁ করে দেখছিল গার্গীদের। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু এত রাতে সায়ন নিশ্চয় বেথুয়াডহরি যেতে চাইবে না—

গার্গীর প্রশ্নে সায়ন আবারও দ্বিধাগ্রস্ত, কাকেই বা সন্দেহ করব? আমার জীবনে কোনও শত্রু আছে কি না তা কখনও ভেবে দেখিনি। ভাবার সময়ও পাইনি কখনও। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তখন একটাই টার্গেট, কী করে আমার তৈরি প্রোডাক্ট বাজারে এক নম্বর হবে। কীভাবে আমার অফিস বড় হবে, আমার ব্যবসা হু-হু করে ছড়িয়ে পড়বে সারা বাংলায়,

সারা ভারতবর্ষে। প্রায় নেশার ঘোরে ছিলাম। তার ওপর তুমি আবার ঐন্দ্রিলাকে এনে দিলে আমার জীবনে। সে আর এক নেশা।

—তবু কাউকেই সন্দেহ হয় না আপনার?

সায়ন যেন এক ঘোরের ভেতর তলিয়ে গিয়েছিল, যেন এক স্বপ্নের ভেতর থেকে কথা বলছিল, সেভাবেই বলল, আমি অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করেছি, কে বা কারা এর পেছনে থাকতে পারে। লাইম ইন্ডিয়ার কারও কথা মাথায় এতদিন ছিল না, এখন পর পর কয়েকটা ঘটনায় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো ব্যাপারটা ঘোরাফেরা করছে আমার মাথায়। লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান পর্যন্ত ঈর্ষা করে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে। হঠাৎই আমাদের ডিটারজেন্ট পাউডারের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওদের কোম্পানির সবাই উল্লসিত। ওদের হোয়াইট ওয়াশ নামের ডিটারজেন্ট পাউডারটি নাম বদলে হঠাৎ মিল্ক হোয়াইট হয়ে গেল। সেই নামেই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আজ। নতুন নামে, নতুন প্যাকে ওরা পুরনো প্রোডাক্টটা বাজারে ছাড়ছে শিগগির। বুঝতে পারছি না, এ সব কিছুর মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি না—

বলতে বলতে হঠাৎ আবার কেমন থম্‌ মেরে গেল সায়ন। এক অদ্ভুত ঘোরের ভেতর আছে, অথচ স্টিয়ারিং, অ্যাকসিলারেটর, ক্লাচ, ব্রেকে তার হাত-পা ঠিকঠিক কাজ করে যাচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে এক ধরনের রিফ্লেক্স কাজ করে। কসবা-এলাকা অনেকক্ষণ আগেই পার হয়ে ঢুকে পড়েছে ইস্টার্ন বাইপাসে, দ্রুত ছুটতে থাকা আরও শয়ে-শয়ে গাড়ির পিছনে শামিল হতে হতে বলল, জানো গার্গী, সেদিন পুলিশ-অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল হঠাৎ একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, ঐন্দ্রিলা দেবী কি মাঝেমধ্যে বা নিয়মিত সিগারেট খেতেন? আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, কই, না তো? দেবাদ্রি সান্যাল বলেছিলেন, এমনও তো হতে পারে, আপনি জানতেন না। আমি হেসে উঠে বলেছিলাম, তাহলে আর দু'বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করলাম কেন? কিন্তু হঠাৎ পুলিশ অফিসার কথাটা কেন জিজ্ঞাসা করলেন, তা আজও ভেবে পাইনি। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে কেউ সিগারেট খায় কি খায় না তাও লেখা থাকে নাকি!

গার্গী প্রতিবাদ করল তৎক্ষণাৎ, অসম্ভব, রুক্কা কখনওই সিগারেট খেত না। শখ করেও কখনও খায়নি।

—আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন পুলিশ ইন্সপেকটর। বলেছিলেন, আপনার অ্যাবসেন্সে কেউ আসত কি না ঐন্দ্রিলার কাছে। কোনও পুরুষ কিংবা মহিলা? আমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, না, তাহলে আমি জানতে পারতাম। সব কথাই ঐন্দ্রিলা বলত আমাকে। ইন্সপেকটর হেসে বলেছিলেন, দু'বছর কি কোনও মহিলাকে চিনে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট সময়, মিঃ চৌধুরী। তিরিশ বছর ঘর করেও অনেক পুরুষই নিজের স্ত্রীকে চিনে উঠতে পারেন না, তা জানেন? তবে জেনে রাখুন, কেউ না কেউ সে রাতে এসেছিল আপনার ঘরে। ঐন্দ্রিলা দেবীর চেনা কেউ।

গার্গী এবারও ফুঁসে উঠল, পুলিশের লোক সব সময়েই ছিদ্রান্বেষী হয়। আশ্চর্য, ঐন্দ্রিলার নামেও বদ্‌নাম করতে ওরা পিছপা হয় না।

সায়ন হাসল, ওরা এখন কেবলই স্ক্যান্ডাল খুঁজে বেড়াচ্ছে, যাতে শেষ পর্যন্ত আমাদের

কাউকে না কাউকে ওরা দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারে। শুনলাম পুলিশ দ্রুত গুটিয়ে ফেলছে অনুসন্ধানের জাল। আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের জালে ধরা পড়বে সেই অপরাধী। কে জানে হয়তো আমার বিরুদ্ধেই ওরা প্রমাণ তৈরি করছে। একের পর এক—

সায়নের শেষ কথাগুলো কেমন ভারী আর জড়ানো, তাতে মেশানো একটুকরো দীর্ঘশ্বাসও। তার বুকের ভেতরও যেন এক ধরনের কাঁপ। এ ক'দিন সায়নের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে গার্গী, ঐন্দ্রিলা-প্রসঙ্গ একবারের জন্যও তোলেনি এই ভেবে যে সায়নের মানসিক আঘাত তাতে হয়তো আরও তীব্র হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, যখন সায়ন কিছুটা সহজ, সাবলীল, তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত সব কথা জেনে নিল গার্গী। শুনে বুঝল, অনেক কিছু তথ্যই এই পরিবারের সঙ্গে মিশেও জানতে পারেনি এতকাল।

সায়নের মারুতি তখন ইস্টার্ন-বাইপাসের আলো ঝলমলে বিস্তৃত রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। রাতের বেলা এ রাস্তায় ইচ্ছে করলেও আস্তে চালানো যায় না। পেছনে সামনে দু'দিকেই সমস্ত গাড়ির গতি তখন তুঙ্গে। সায়নও নিখুঁত ড্রাইভিং-এ এগিয়ে চলেছে হু-হু করে। প্রথমে পার্ক সার্কাস কানেকটরের মোড়, তারপর বেলেঘাটা মেন রোড ক্রশিং পার হয়ে, সল্টলেক স্টেডিয়াম ডাইনে রেখে একসময় ঢুকে পড়ল সল্টলেকের নির্জন রাস্তায়। হঠাৎ সল্টলেকেই বা ঢুকে পড়ল কেন, গার্গী বুঝতে পারছে না। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই বলেনি সায়ন। তবে কি গার্গীর হাত থেকে নিস্তার পেতে তাকে কোনও নির্বাসনে নিয়ে যাচ্ছে?

হঠাৎ একলহমার জন্য ভয় পেয়ে গেল গার্গী। মনে হল, বাইরের পৃথিবী যে সায়নকে ঐন্দ্রিলার খুনি হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তেমনিভাবে গার্গীকেও কি সে—

বুকের ভেতরটা কয়েকমুহূর্ত ধক্‌ধক্ করে উঠল তার। পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে স্টিয়ারিং ধরে থাকা সায়নের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করল। এতদিন ধরে দেখছে সায়নকে, তবু মনে হল, এই সায়নকে সে যেন চেনে না।

সায়ন তখন রাস্তার পর রাস্তা পেরুচ্ছে, অনেকগুলো আইল্যান্ড পার হয়ে জলের ট্যাঙ্ক ক্রশ করে এগিয়ে যাচ্ছে তার গন্তব্যে। সল্টলেকের ভেতরটা কিছুতেই মনে রাখতে পারে না গার্গী। কত যে রাস্তা, কত যে জলের ট্যাঙ্ক, কত যে পাখির খাঁচা তা যেন বারবার ওলটপালট হয়ে যায়। তার ওপর রাতের সল্টলেক তো তার কাছে এক গোলকধাঁধা। এমনই অনেক ধাঁধা, গাছপালাময় পথ। সুন্দর সুন্দর বাড়ির সারি পার হয়ে ছোট্ট অথচ ছবির মতো চমৎকার একটি বাড়ির সামনে ঘ্যাঁচ্ করে গাড়ি দাঁড় করাল সায়ন। গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, নামো—

প্রায় যন্ত্রচালিত হয়ে নেমে এল গার্গী। সায়ন ততক্ষণে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে বেল টিপছে। ঘরের মধ্যে চড়ুইপাখির মতো কিচমিচ শব্দে বেল বাজাতে থাকল কিছুক্ষণ। পরক্ষণেই দরজা খুলে যিনি বেরুলেন, তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে সায়ন গার্গীকে বলল, ইনিই হলেন সেই আলো বোস, যাঁর সঙ্গে বিলাসপুর গিয়েছিলাম আমি, হোটেলে একই ঘরে রাত কাটিয়েছিলাম।

গার্গী সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত, হতচকিত, নির্বাক হয়ে গেল মুহূর্তে।
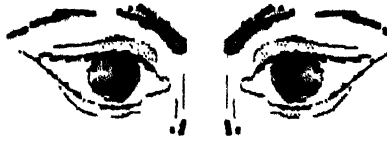
মধ্যবয়স্ক, গোলগাল মুখের সেই ভদ্রলোকের দিকে তখন বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে গার্গী। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর চেক-কাটা সবুজ লুঙি। মাথায় মস্ত টাক চকচক করছে সদ্য-জ্বালা টিউবলাইটের আলোয়, যেটুকু চুল আছে এ-পাশে ও-পাশে তাও আধপাকা, বয়স পঞ্চাশের একটু ওপরেই।

বারান্দায় কারুকাজ-করা গ্রিলের কাছে এসে প্রথমে গার্গীর দিকে চোখ পড়তে একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন, পরক্ষণেই সায়নকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন, আরে সায়ন যে—

সায়ন বারান্দায় উঠতে উঠতে বলল, আপনি যে গুজরাত চলে গেছেন তা জানতামই না। এ ক'দিন এমন ঝঞ্ঝাটের ভেতর কেটেছে যে আপনার সাহায্য নেওয়ার ফুরসতই জোটেনি। অথচ খুব দরকার পড়েছিল মাঝখানে। ভাগ্যিস আজ সকালে আপনি ফোন করেছিলেন, তাই সন্ধের পর এমন একটা বিপদে পড়লাম যে প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়ল।

বলে একটু থেমে গার্গীর দিকে একবার তাকিয়ে সায়ন বেশ স্মার্টভঙ্গিতে বলল, আপনাকে একটা দারুণ সারপ্রাইজ দেব বলে চলে এলাম, আলোদা। মিট গার্গী, গার্গী মুখার্জি। আমার বান্ধবী।

আলোদা হাত জোড় করে হাসি-হাসি মুখে বললেন, এ অধম তোমাদের যদি কোনও উপকারে লাগে—

—উপকারে লাগবে বলেই এলাম, আলোদা। সেই সংকটময় মুহূর্তে যদি আপনি কলকাতায় থাকতেন, তাহলে হয়তো আরও সুবিধে হত।

—প্রায় চার সপ্তাহ পরে কলকাতা ফিরে এসে এ কদিনের খবরের কাগজ পড়ছি, আর চমকে চমকে উঠছি। প্রায় ভূত দেখারই মতো অবস্থা আমার। আমাকে নিয়েও কত স্টোরি লিখেছে। আজ তো আবার দেখছি, পুলিশ তোমার অফিস নিয়ে পড়েছে। এমনকি বার্স্ট হয়ে যাওয়া মেশিনটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, সায়ন চৌধুরী নিজেই গোপনে বার্স্ট করিয়ে দিয়েছে, যাতে সবার নজর ওদিকেই ঘুরে যায়। সে রাতে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তোমার অফিসেরই কেউ নাকি একজনকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছিল ফ্যাক্টরি-অফিস থেকে টেলিফোন করবে বলে! সে নাকি তোমারই খুব আস্থাভাজন ব্যক্তি। কিন্তু তার নাম চেপে যাওয়া হচ্ছে—

সায়ন ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, কালীজীবনবাবু। ফ্যাক্টরির কাছেই তাঁর রেসিডেন্স। এরকম প্রায়ই যান টেলিফোন করতে। সেদিন অত রাতে গিয়েছিলেন কেন, বুঝতে পারছি না। তিনি কোম্পানিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, আমাকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়ে রাখেন। তিনি মেসিনের সর্বনাশ করবেন, তা ভাবা যায় না। তাই পুলিশকে জানাইনি তাঁর নাম।

গার্গী তখনও অবাক হয়ে দেখছিল, আলোদা নামের গৃহকর্তার দিকে। রাতের বেলা চারপাশ অসম্ভব ফাঁকা বলে সল্টলেক ডুবে থাকে ঘোর নির্জনতায়। এখানে ছবির মতো এক-একটা বাড়ি যেন এক-একটা দ্বীপ। বড়-বড় রাস্তার দুপাশ জুড়ে এমন অসংখ্য দ্বীপের সমাহার বলে সল্টলেককে নির্জনতম আখ্যায় ভূষিত করা যায়। দিনের বেলায় সাজানো ছিমছাম এই নির্জন শহর তবু একরকম, রাতের বেলা গার্গীর কাছে মনে হল প্রায় জনহীন সাইবেরিয়া। সে থাকে জুবিলি পার্কের মতো গা-ঘেঁসাঘেসি বাড়ি এমন জনবহুল সরগরম এলাকায়, তাকে যদি হঠাৎই রাতের বেলা সল্টলেকের এই গহন নির্জনতায় উপস্থিত করা যায়, তাহলে বুকে একটু হৃৎকম্প জাগবেই।

আলোদার পেছনেই বেরিয়ে এলেন এক মহিলা, প্রায় মধ্যবয়সী, মুখশ্রী ভারি সুন্দর। তাঁকে দেখে সায়ন হেসে বলল, বউদি, আজ রাতে আমরা আপনার গেস্ট, আবার নতুন করে রাঁধতে হবে।

হঠাৎ সায়নকে এত রাতে দেখে, তার ওপর সঙ্গে এক অচেনা তরুণী, স্বভাবতই বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন বউদি। সায়নের কথা শুনে অবশ্য হাসিতে ভরিয়ে ফেললেন মুখ, ঈষৎ অবাঙালি কথার টানে বললেন, আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য আমার। সল্টলেকে বাড়ি করে চলে আসার পর তো গেস্ট পাওয়াই যায় না আজকাল।

এতক্ষণে সায়নের খেয়াল পড়ল গার্গীর দিকে, গার্গী, এই হল আমার এক দাদা-বউদি, আলো বোস আর সুচন্দনী—

আলো বোস নামটা কানে যাওয়ার পর থেকেই প্রবল এক ধাঁধার ভেতর ছিল গার্গী, মাথায় চকিতে ঘাই দিয়ে উঠেছিল সংবাদপত্রে পড়া সরকারি উকিলবাবুর সওয়ালের সারসংক্ষেপ। পুলিশ-রিপোর্ট অনুযায়ী আলো বোসের একজন মহিলা হওয়ার কথা! অথচ কী আশ্চর্য, তার বদলে ভুঁড়িওয়ালা এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ! ভদ্রলোককে গার্গী এর আগে কখনও চোখে দেখেনি, সায়নের কাছে শোনেওনি এঁর কথা। একমাত্র উকিলবাবুর সওয়ালেই--

সুচন্দনী ততক্ষণে সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে গিয়েছেন ভিতরে। বোধহয় চল্লিশের কিছু ওপারে বয়স সুচন্দনীর, একটু বেশি রকমের স্বাস্থ্যবতী, হয়তো বয়সের গুণেই, তবু মুখখানা কোনও এক চিত্রতারকার আদল মনে পড়ায়। মহিলা তরুণীবয়সে নিশ্চয়ই অনেক পুরুষের চিত্তবেদনার কারণ হয়েছেন। পরনে ঠাসবুনোটের চমৎকার ধনেখালি শাড়ি, হালকা হলুদের ওপর ম্যাজেন্টা রঙের স্ট্রাইপ। তার সঙ্গে হলুদ রঙের ব্লাউজে তাঁর কাঁচা সোনার মতো শরীরের রং এক আশ্চর্য দীপ্তি পেয়েছে। কেন কে জানে, সুচন্দনী বউদি বারবার তাকিয়ে দেখছিলেন গার্গীকে। সে চাউনিতে মিলমিশ হয়ে আছে একটুকরো সন্দেহের আঁচ। গোলমেলে ব্যাপার মেয়েরাই তো আঁচ করে প্রথমে।

—রান্না হতে তো দেরি হবে, ততক্ষণে একটু চা করি, বলে আলতো হেসে সুচন্দনী সেঁধিয়ে গেলেন রান্নাঘরে। আলোদা তখন ড্রইংরুমের সোফায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন বৈঠকি ভঙ্গিতে, পায়ের উপর পা তুলে। তাঁর সামনের দুটো সিঙ্গল সোফায় সায়ন আর গার্গী, এত রাতে এসে পরিস্থিতির চাপে একজনের মুখ অপ্রস্তুত তো অন্যজনের অস্বস্তিতে ভরা। মাঝখানে গোলাপি সানমাইকা-লাগানো ট্রাপেজিয়াম-আকারের চমৎকার একটি

সেন্টার-টেবিল। তার উপর সাদা অ্যাশট্রের গুহায় আধ-খাওয়া সিগারেট। হয়তো খেতে খেতে রেখে দিয়েছিলেন, আগুন নিভে গেছে কিছুক্ষণ পর। অ্যাশট্রের পাশে দু-দুটো সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। বোঝাই যাচ্ছে, ভদ্রলোক ধূমপানে খুব বেশি আসক্ত।

কথা শুরু করার আগেই সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে একটি সায়নের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অন্যটা নিজের ঠোঁটে গুঁজলেন আলোদা। তারপর দুটিতেই আগুন সংযোগ করে গার্গীর দিকে তাকালেন, খুব আশ্চর্য ঘটনা এই যে, সায়ন কিন্তু কখনও আমাকে বলেনি তার এমন একটি সুন্দরী বান্ধবী আছে। কাল সকালে গুজরাত থেকে ফিরে কদিনের বাসি খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই গার্গী নামটা প্রথম জানলাম।

এতক্ষণে সামান্য সহজ হওয়ার চেষ্টা করল গার্গী, তাহলে এখন আমি খুবই বিখ্যাত মেয়ে বলুন?

আলোদা হেসে উঠলেন, বেশ বলেছ কথাটা। বিখ্যাত—

—বিখ্যাত নিশ্চয়ই। সায়নদার কল্যাণে এখন আমার নাম সবাই একডাকে চেনে। সায়নদা কয়েকদিন আগে মজা করে বলেছিল, ইচ্ছে করলে কাগজে ছবিও ছাপা হয়ে যেতে পারে আমার, বলতে বলতে গার্গী হাসল, তবে আলোদা, পুলিশ কিন্তু আপনাকেও বিখ্যাত করে দিয়েছে, কেবল ভুলবশত বদলে দিয়েছে জেন্ডারটি। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, পুলিশের এই ভুলটা কেন এতদিন ভাঙিয়ে দেয়নি সায়নদা।

সায়ন এতক্ষণে বলল, প্রথমে আমি এতটাই পাজ্‌ল্‌ড হয়ে পড়েছিলাম যে ব্যাপারটা মাথায় আসেনি আমার। পরে যখন পুলিশকে বলতে গেলাম, হেসে উড়িয়ে দিল ওরা। বলল, ও-সব গাঁজাখুরি গল্প ছাড়ুন। মাঝখানে একদিন আলোদার খোঁজ করতে পাঠিয়ে শুনি, ওঁর ঘর তালা-বন্ধ। তারপর তো আজ সকালে ফোন পেয়ে জানলাম, উনি এতদিন কলকাতায় ছিলেনই না।

গার্গী হাসি-হাসি মুখে বলল, আশ্চর্য এই যে, সায়নদার সঙ্গে এই কবছর মেলামেশা করেও আপনার নামটা কিন্তু আমি কখনও জানতে পারিনি।

—আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ আমি এতই অকিঞ্চিৎকর মানুষ যে সায়ন আমার নাম অন্যের কাছে কেনই বা বলে বেড়াবে, আলোদা হাসতে হাসতে বললেন, তবে আসল কথা হল এই যে, সায়নের সঙ্গে আমার আলাপ বহুকাল আগের, সায়ন তখন স্কুলে পড়ত। তারপর আমি কর্মসূত্রে আমেদাবাদ থেকে আরও ত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে একটা মফস্বল শহরে বদলি হয়ে চলে যাওয়ায় কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেখানেই বিয়েশাদি করে বেশ তোফা ছিলাম। সুচন্দনীর বাবাও সেখানকার প্রবাসী বাঙালি। এমন বাঙালি পাত্র হাতে পেতে মেয়েটা গছিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ পনেরো বছর পর ফের কলকাতায় বদলি হয়ে এসে কয়েকমাস নর্থ ক্যালকাটায় ভাড়া ছিলাম। তারপর সল্টলেকে এই বাড়ি করে চলে এসেছি কমাস আগে। এর মধ্যে সায়নের সঙ্গে হঠাৎ পথে একদিন দেখা। ও এতই সুন্দর আর সুপুরুষ হয়েছে যে আমি চিনতেই পারিনি প্রথমে। ও-ই বলল, কী আলোদা, চিনতে পারছেন না, আমি সায়ন। তারপর আস্তে আস্তে পুরনো সম্পর্ক কিছুটা ঝালাই হল। জানতাম, সায়ন জিনিয়াস, এখন দেখলাম, সে তার মেধার সদ্ব্যবহার করেছে। আমাকে দেখে ও এতই খুশি হল যে সঙ্গে সঙ্গে বলল, একদিন আমার অফিসে আসুন আলোদা। তারপর

বেশ কয়েকবার ওর অফিসে গিয়েছি। দেখলাম আমাকে পেলে ও বেশ খুশি হয়। অনেক মনের কথাও গড় গড় করে বলে ফেলে। মাঝেমধ্যে দু-একটা পরামর্শও চায়। আসলে এই সব কৃতী পুরুষরা কখনও কখনও নিজের ভেতর একা হয়ে পড়ে। তখন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে পেলে স্বস্তি বোধ করে কিছুটা। এর আগে কলকাতায় দু-চারবার গাড়ি করে ও আমাকে নিয়ে গেছে ডিস্ট্রিবিউটারদের কাছে, কখনও বলেছে, বলুন তো আলোদা, লোকটা কেমন? রিলায়েব্‌ল্? ফেরার পথে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে এখানে, এক কাপ চা নিয়ে বসে হয়তো আধ ঘণ্টা গল্প করেছে। ব্যস, আমাদের সম্পর্ক বলতে এটুকুই। তাও মাত্র কয়েকমাস। হয়তো এ জন্যেই যেমন তুমি আমার সম্পর্কে কিছু জান না, আমাকেও কোনও দিন বলেনি তোমার সম্পর্কে। মানে তেমন সুযোগই হয়নি হয়তো। তবে, আলোদা আবার একটু হাসলেন, সুন্দরী বান্ধবীর কথা কোনও পুরুষই বোধহয় অন্যের কাছে বলতে পছন্দ করে না—

গার্গী হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, আপনি তখন থেকে আমাকে সুন্দরী সুন্দরী বলছেন, আলোদা। আমি কিন্তু তেমন সুন্দরী নই। আয়নায় নিজের মুখখানা রোজই দেখতে পাই আমি।

একটু ঝাঁঝিয়ে বলল গার্গী, কিন্তু এ হেন তীক্ষ্ণ আক্রমণে মোটেই ঘাবড়ালেন না আলোদা, বললেন, কেন, সুন্দরী নয়ই বা কেন। আমাদের দেশে সুন্দরীর সংজ্ঞা হল, দুধে-আলতা রং, আর দেবী সরস্বতীর মতো তুলিতে আঁকা চোখমুখ, তাই না? কিন্তু আজকালকার বিউটি-কনটেস্টে যে সব মেয়েরা যোগ দেয়, তাদের কেউই কিন্তু ওরকম কনসেপ্টের সুন্দরী নয়। মুখশ্রী আর ফিগারের সঙ্গে তাদের চাউনি, হাসি, ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধিও পরখ করে দেখা হয়। আমি কিন্তু সুন্দরী বলেছি সেই অর্থে। অর্থাৎ টোটাল বিউটি বলতে যা বোঝায়, তাইই। শুধু তোমার বুদ্ধিদীপ্ত চাউনিটুকুর দামই যে লাখটাকা।

গার্গী হেসে উঠে বলল, কী যে সব বলেন—

—একটুও বাড়িয়ে বলিনি কিন্তু। তোমার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে, অনেক আগেই কিছু খ্যাতি প্রাপ্য ছিল তোমার। অবশ্য যে অর্থে একটু আগে নিজেকে বিখ্যাত বললে, সে অর্থে নয়। সদর্থেই—

সায়ন এতক্ষণ দুজনের বাগবিতণ্ডা উপভোগ করছিল, এবার বলল, ও কিন্তু সত্যিই একদিন খ্যাতিমান হবে, দেখবেন আলোদা।

গার্গী চোখমুখ পাকিয়ে বলল, এর চেয়েও খ্যাতিমান! এখনই বলে সুইসাইড করার মতো অবস্থা—

আলোদা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, জীবনে এমন এক-আধটা দুর্বিপাক আসতেই পারে কারও। সময় পেরোলে সে-সব গ্রহও কেটে যায় একসময়। এই তো, এখন সংবাদপত্রের কল্যাণে সায়ন রীতিমতো লেডি-কিলার হিসেবে খ্যাত। অথচ আমি তো মাত্র ক'মাস ওর সঙ্গে মিশেই বুঝে ফেলেছি, মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার ব্যাপারে ও মোটেই এক্সপার্ট নয়। তাই আজ সত্যি সত্যিই আস্ত একটা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দেখে আমি তাজ্জব। বুঝতেই পারছি না, এরকম একটা ম্যাজিক কী করে ঘটাল সায়ন।

গার্গীর মুখের আলো দপ করে নিভে গেল হঠাৎ, মুখ নিচু করে বলল, এর জন্যে আমিই

দায়ী, আলোদা।

সায়ন হাসতে হাসতে বলল, পরে সব বলব, আলোদা। আমি এখন ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে।

ইতিমধ্যে সুচন্দনী চার কাপ চা ট্রেতে চাপিয়ে নিয়ে এলেন। তার থেকে একটা কাপ প্রথমেই তুলে নিয়ে আলোদা বললেন, চা না হলে আড্ডাটা ঠিক জমছিল না যেন। তারপর বেশ আয়েস করে চুমুক দিয়ে বললেন, কী আশ্চর্য সায়ন, তুমি তো এর আগে ভাগ্য মানতে না। বরাবরই বলে এসেছ, পুরুষের ভাগ্য সে নিজের হাতেই তৈরি করে—

—এতদিন তাইই বলেছি। বিশ্বাসও করতাম সেরকমই। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে সেই বিখ্যাত প্রবচন হয়তো সত্যিই। ম্যান প্রপোজেস অ্যান্ড গড ডিসপোজেস। আপনি তো এর-ওর হাত দেখতেন শুনেছি। এখন মনে হচ্ছে, আপনাকে হাতটা দেখাই। আমার তিলতিল করে গড়া প্যারাডাইস এখন ডুবতে বসেছে। সেদিন আমাদের অ্যাকাউন্টস্ সেকশনের কালীজীবনবাবু হঠাৎ এসে বললেন, স্যার, লাইম ইন্ডিয়ার একজন স্টাফ এসেছিল, আমাকে বলল, লাইম ইন্ডিয়ার সব এরিয়া-ম্যানেজার, সুপারভাইজাররা এবার থেকে হুইসপারিং ক্যাম্পেন চালাবে প্যারাডাইসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ডিসট্রিবিউটরের কাছে, কলকাতায়, জেলায় জেলায়। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী সাংঘাতিক কনস্পিরেসি! বলুন তো, এরপর প্যারাডাইসকে আর দাঁড় করাতে পারব?

হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল গার্গী, চায়ে চুমুক দিতে দিতে সায়নের কথাগুলো তাকে বিষণ্ণ করে তুলছিল। হাত দেখার নাম শুনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, তার এতক্ষণের অস্বস্তি, ঔদাসীন্য ভেঙে ফেলল মুহূর্তে, আপনি হাত দেখতে পারেন নাকি, আলোদা? সেই জন্যে তখন থেকে গ্রহট্রহের কথা বলছেন! আমার হাতটা একবার দেখে দেবেন?

হো হো করে হেসে উঠলেন আলোদা, সায়ন আমার ক্যাপিটাল তোমার কাছে প্রথম দিনেই ফাঁস করে দিয়ে ভারি বিপদে ফেলল যে। আসলে কি জানো, হাত দেখানোর ব্যাপারে মেয়েরা একেবারে পাগল। আর মেয়েদের এই দুর্বলতাটুকু আমি এক্সপ্লয়েট করি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি হাত দেখতে জানিই না।

কিন্তু গার্গী নাছোড় হল, উহুঁ, দেখতেই হবে আপনাকে। আমি এসব কখনও বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার ভবিষ্যৎটা এক্ষুনি জানা দরকার।

অগত্যা আলোদা গার্গীর হাতটা টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ গভীরভাবে দেখলেন রেখাগুলো, তারপর হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন, খুব জেদি, একগুঁয়ে মেয়ে—

গার্গীর মুখে একঝলক হাসি ঢেউ খেলে গেল, কিছু বলবে ভাবল, তার আগেই আলোদা আবার বললেন, খুব ঝড়-ঝাপটের ভেতর দিয়ে কেটেছে তোমার শৈশব। বরাবরই তুমি খুব লড়াকু স্বভাবের মেয়ে। সংসারে প্রত্যেকের জন্যই অনেক করেছ, কিন্তু কারও মন পাওনি কখনও। তুমি সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করো, কিন্তু অন্যে তোমায় ভুল বোঝে—

এক-একটা বাক্য বলছেন আলোদা, এক মুহূর্তের জন্য থামছেন, প্রতিক্রিয়া দেখছেন গার্গীর চোখমুখের, তারপর ফের বলতে শুরু করেছেন :

—তোমার হৃদয় খুব বড়, তোমার নজর সবসময় বেশ উঁচুর দিকেই। বেশ বনেদিবংশে তোমার জন্ম। তোমার বাবা-মায়ের মনও ছিল খুব উঁচু। মাঝেমধ্যে তোমার মন খুব চঞ্চল

হয়ে ওঠে। কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে কিছুতেই মন স্থির রাখতে পার না। এই মুহূর্তে কোনও একটা ব্যাপারে ভীষণ চঞ্চল হয়ে আছ, তবে শিগগির তোমার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে—

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, কী পরিবর্তন?

আলোদা হাতের রেখা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, সেটা আমি পরিষ্কার করে বলছি না। তবে তোমাকে খুব শিগগির পর-পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনেক বড় একটা দায়িত্ব তোমার কাঁধে চাপবে হয়তো—

গার্গী তখন বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তিরতির করে কাঁপছে চোখের পাতা, কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, আর?

—ছোটবেলায় একবার তুমি পড়ে গিয়েছিলে, খুব আঘাত লেগেছিল তাতে। স্কুলে কিংবা কলেজে পড়াকালীন খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল একটা, মনকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা, বলে বেশ জিজ্ঞাসু চোখে গার্গীর দিকে তাকালেন আলোদা. কী হল, এত যে কথা বললাম, তুমি কিছু বলছ না যে? কিছুই মিলছে না নাকি?

গার্গী এতক্ষণ কেমন সম্বিতবিহীন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চমক ভাঙতে বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল. না, না, মিলছে, মিলছে, দারুণ হাত দেখতে পারেন তো আপনি!

শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন আলোদা। ওদিকে হাসছিল সায়নও। গার্গীর হাত ছেড়ে দিয়ে আলোদা বললেন, ধুর, সব গাঁজাখুরি। আমি হাত দেখতেই পারিনে।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন, সবই তো মিলেছে।

মিটিমিটি হাসতে হাসতে আলোদা এবার বললেন, তাহলে রহস্যটা ফাঁস করে দি। বুঝলে, আমার যিনি হাত দেখার গুরু, তিনি এরকম তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা বাক্য আমার একটা খাতায় লিখে দিয়েছিলেন। তার থেকে দশ-বারোটা করে বাক্য এক-একজনের হাত দেখে বলে দি। কাকে কী কী বলব সেটা অবশ্য তাদের মুখ দেখে একটু আন্দাজ করে নিতে হয়। তাতে শতকরা নিরানব্বই জন মেয়েই বলবে, মিলেছে, মিলেছে। বিশ্বাস না হয়, তোমার কোনও বান্ধবীকে হাত দেখার ছুতো করে তোমাকে বলা কথাগুলোই তাকে বলে দেখ, দেখবে সেও বলছে, মিলেছে মিলেছে।

বলতে বলতে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে লম্বা করে টান দিয়ে আলোদা বললেন, বিবাহিত হলে আর একটা কথা যোগ করতাম ওর সঙ্গে। বলতাম, তোমার স্বামীটি বড় আলাভোলা, অপদার্থই বলা যায়। স্বামীর ওপর তোমার একটু ডমিনেট করার অভ্যেস আছে। মাঝে মধ্যে খিটিমিটি হয় তোমাদের মধ্যে?

এত সব হাত-দেখাদেখির মধ্যে সুচন্দনী কখন যেন গরম গরম ভাত আর ডিমের ঝোল তৈরি করে ফেলেছেন। ডাইনিং টেবিলে চমৎকার করে সাজিয়ে দিয়ে ডাক দিলেন সবাইকে। খিদের মাথায় অমৃতের মতো মনে হল সে ডিমের ঝোলের স্বাদ। সায়ন মুখে দিয়ে বলে উঠল, কী দারুণ!

খেয়ে উঠতে উঠতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। সায়ন এতক্ষণে আলোদার কাছে একান্ত হয়ে সব ঘটনা বিবৃত করে বলল, গার্গীকে কয়েকদিন আপনাদের কাছে রেখে যেতে চাই, আলোদা। যতক্ষণ না ওর জন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করতে পারছি।

আলোদা সাগ্রহে ঘাড় নাড়লেন, ঠিক আছে। নো প্রব্লেম। আমাদের বাড়িতে তো ছেলেপুলে নেই। ক'দিন মজা করে কাটাব ওর সঙ্গে।

সায়ন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, তাহলে আমি এবার ফিরব।

সায়ন ফিরবে শুনতে সুচন্দনী হই-হই করে বললেন, এত রাতে! সে আবার কী কথা!

আলোদা ঘাড় নেড়ে বাধা দিলেন, উঁহু, তা হয় না। এত রাতে ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে ফেরাটা যুক্তিযুক্ত হবে না। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার পর পথঘাট সব নির্জন হয়ে যায়। কোথায় কোন বিপদ ঘটে যাবে তার ঠিক নেই। তা ছাড়া — হঠাৎ রসিকতা করে আলোদা বললেন, হঠাৎ একটি অচেনা যুবতীকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে চাইছ' তারপর ইলোপমেন্টের দায়ে পুলিশ আমাদের বাড়ি এসে চড়াও হোক আর কি!

সায়ন হাসতে হাসতে বলল, পুলিশ তো সারাক্ষণ আমার পিছু নিয়েই আছে, কত আর তা নিয়ে ভাবব!

—না হে, রাতটা এখানেই থেকে যাও। রাস্তাঘাট তেমন ভাল নয়. তা ছাড়া বাড়ি ফেরার তো কোনও টানটোন নেই এখন। এসেছ যখন, থেকেই যাও, বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবেখন।

'বাড়ি ফেরার তো কোনও টানটোন নেই এখন' বাক্যটি হঠাৎ সায়নের বুকের ভেতর গেঁথে গেল যেন। মুহূর্তে একঁ অব্যক্ত ব্যথায় তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। অফিসের কাজে মাঝেমধ্যে এখানে-ওখানে সে চলে যেত ঠিকই, কিন্তু তার মন পড়ে থাকত ঐন্দ্রিলার কাছে। রাতে বাড়ি ফিরলে ঐন্দ্রিলার সাহচর্য ভরিয়ে তুলত তার সমস্ত পৃথিবী। সত্যিই, তারই টানেটানে তাকে তো ফিরে আসতে হত শরৎ বোস রোডের বাড়িতে।

এখন সেই খালি বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মানেই তো একাকিত্বের প্রবল যন্ত্রণায় শুধু ক্ষতবিক্ষত হওয়া। কীই বা হবে শুধু শুধু এত রাতে সেখানে গিয়ে — এমন ভাবতে ভাবতে আলোদার বাড়িতেই সে রাতে থেকে গেল সায়ন। অনেকদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমোলও বোধহয়। কিন্তু পরদিন সকালে সংবাদপত্র যে খবর বয়ে আনল তাদের জন্য, তাতে সল্টলেক সিটির এই সুন্দর ছোট্ট বাড়িটিতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। 'সায়ন চৌধুরীর নৈশবিহার' এমন একটি হেড-লাইন দিয়ে সায়নের হঠাৎ অফিস ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসা, গার্গীকে নিয়ে সন্ধের পর গাড়িতে করে বেরিয়ে যাওয়া এ সবই কাভার করেছে রিপোর্টে। তারা যে রাতে কেউই আর বাড়ি ফেরেনি সে খবরও দিয়ে বলেছে, খুনের মোটিভ্ সম্পর্কে পুলিশ এতদিনে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

খবরটি পড়ে সায়ন স্তম্ভিত হয়ে রইল অনেকক্ষণ। কাল রাতে খাওয়াদাওয়ার পর অত রাস্তা ড্রাইভ করে ফেরাটা ক্লান্তিকর মনে হয়েছিল তার। তাইই সে শেষপর্যন্ত দোনামোনা করেও থেকে গিয়েছিল সল্টলেকে। এখন মনে হচ্ছে, ফিরে গেলেই ভাল হত। তাহলে কেচ্ছার গল্পটা লেখা হত না অমন রসালো করে।

আলোদা কাগজ পড়ে খুব আফসোস করছিলেন। বললেন, ইচ্ছে করছে, সংবাদদাতাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি এখানে। এনে দেখাই, কোথায় কীভাবে তারা রাত কাটিয়েছে।

সুচন্দনী হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গেছেন। এমনিতে তিনি বেশ হাসিখুশি মানুষ, তবু সায়ন আর গার্গীর হঠাৎ রাতের বেলা একসঙ্গে উদয় হওয়াতে তিনি মোটেই স্বস্তি পাননি। রাতের

বেলা স্বামীকে বলেওছেন, ব্যাপারটা তাঁর কাছে ঠিক ভাল ঠেকছে না—

সকাল থেকে বাড়ির পরিবেশ আরও বদলে গেল যেন। কেমন থমথমে আর অস্বস্তিকর সায়ন অন্যমনস্ক, গার্গী গম্ভীর। আলোদা অবশ্য খোলামেলা মানুষ। সবকিছু শুনে, দেখে কাগজ পড়ে, আলাদা আলাদা করে ডাকলেন সায়নকে, এ ব্যাপারে তুমি কিছু ভেবেছ সায়ন?

সায়ন অবাক হল, কোন ব্যাপারে? গার্গীর?

—হ্যাঁ, যা শুনলাম, গার্গীর সঙ্গে তোমার তো অনেকদিনের সম্পর্ক। ওর সম্পর্কে তোমার কিরকম ধারণা?

সায়ন ভেতরে ভেতরে বিপর্যস্ত হয়ে ছিল, কিছুটা সম্বিতবিহীনও, আলোদার কথার মর্মার্থ যেন ঠিক অনুধাবন করতে পারল না, বলল, গার্গী খুবই ভাল মেয়ে, আলোদা, বিশ্বাস করুন। একটু বেপরোয়া বটে, কিন্তু ওর লেখার হাত চমৎকার। সুযোগ পেলেই আপনাকে আইনস্টাইনের টাইম অ্যান্ড স্পেস থিয়োরি বুঝিয়ে দেবে, আবার সংরক্ষণের প্রশ্ন নিয়েও এক-দেড় ঘণ্টা তর্ক করে যেতে পারে। কত বিষয়ে যে ওর আগ্রহ—

আলোদা লক্ষ করছিলেন সায়নের অভিব্যক্তি, তার কথা শেষ হতেই হেসে বললেন, তা হলে বরং তুমি গার্গীকে বিয়ে করে ফ্যালো।

আলোদা কথাটা এমন আচমকা বললেন যে সায়নের ঠিক বোধগম্য হল না। হয়তো তখনও সে তার আগের ভাবনার ঘোরেই ছিল, চমকে উঠে বলল, কী বললেন?

আলোদা কথাটা আবার বলতেই সায়ন প্রায় বেবাক্‌, বিমূঢ়, ছিটকে উঠে বলল, কী বলছেন আপনি, আলোদা? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে। আপনি জানেন না, গার্গীর সঙ্গে স্রেফ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।

আলোদা আরও কিছু যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলেন, কিন্তু সায়ন প্রবল বেগে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, এ অসম্ভব, আলোদা, আমার সমস্ত সত্তার ভেতর এখনও ঐন্দ্রিলার অস্তিত্ব বর্তমান, আমাকে এতটা নিষ্ঠুর হতে বলবেন না, প্লিজ—

বিষয়টা সায়নকে এতটাই নাড়িয়ে দিল যে সে আর সেখানে বিন্দুমাত্র দেরি করল না। সুচন্দনীর তৈরি করা ব্রেকফাস্ট আর চা খেয়ে শুধু গার্গীকে একবার বলল, গার্গী, ক'টা দিন ওয়েট করো। নিশ্চয় কোথাও একটা থাকার ব্যবস্থা করে ফেলব তোমার, বলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতো দ্রুত বেরিয়ে পড়ল তার মারুতি নিয়ে, অমন লম্বা ইস্টার্ন বাইপাস পেরোতে পেরোতে ঘাড় নাড়তে লাগল বারবার, না, এ কিছুতেই হতে পারে না, এ অসম্ভব, বলতে বলতে একসময় পৌঁছে গেল তার এসপ্লানেড ইস্টের অফিসে। তারপর সকালের খবরের কাগজ পড়া থেকে শুরু করে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা ভুলে যেতে নিবিড়ভাবে নিমগ্ন হল তার অফিসের কাজে। প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্তকে ডেকে পাঠাল প্রোডাকশনের খবরাখবর নেওয়ার জন্য। কৌশিক দত্ত নেই শুনে ব্যস্ত হয়ে ডেকে পাঠাল স্টোরের ইন-চার্জকে, কত মাল এখনও স্টকে আছে তার হিসেব নিয়ে ডেকে পাঠাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রকে, পর পর দুটো মিটিং করল তার এরিয়া ম্যানেজারদের নিয়ে। মিটিং শেষ হতেই কঙ্কা রায়কে আসতে বলল একবার। ক্ষতিগ্রস্ত মেশিনের যে পার্টস্‌গুলো আনার জন্য বিদেশে চিঠি দিয়েছে তার একটা রিমাইন্ডার দেবে বলে। কঙ্কা রায় অফিসে

আসেনি শুনে অবাক হয়ে বলল, কেন, তার আবার কী হল? কী হয়েছে তা অবশ্য কেউ বলতে পারল না। কোনও ছুটির দরখাস্ত দিয়ে যায়নি কঙ্কা, কাল বাড়ি যাওয়ার সময় কিছু বলেও যায়নি, তাহলে নিশ্চয় তার অসুস্থ হওয়াই সম্ভব এমন ভাবল সায়ন। ঠিক আছে, রিমাইন্ডার না-হয় পরদিনই দেবে। কিন্তু পরদিনও কঙ্কা না আসায় সে অবাক হল। পার্সোনেল ম্যানেজারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কঙ্কা কিছু বলে গেছে কি না তাকে, বলেনি শুনে বেশ আশ্চর্য হল। কঙ্কার খবর এল তৃতীয় দিনে, ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে জানিয়েছে, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

খবরটা পেয়ে কেন কে জানে একটু আশ্বস্ত হল সায়ন। তার পি. এ.-র অনুপস্থিতি হঠাৎ কেন যে তাকে একগলা টেনশনে ফেলেছিল তা অনুধাবন করতে পারল না, তবে উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলে সে ডেকে পাঠাল পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের স্টেনো রোহিণীবাবুকে, একটা লম্বা ডিকটেশন দিয়ে বলল, আগের চিঠির রেফারেন্সটা উল্লেখ করে দেবেন রিমাইন্ডারে আজকেই যেন আউট হয় চিঠিটা।

কিন্তু রেফারেন্স খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ প্রবল এক গোলযোগ উপস্থিত হল অফিসে। ডেসপ্যাচ-রেজিস্টার তন্নতন্ন খুঁজে আগের চিঠি যে পাঠানো হয়েছিল তার কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না। সায়ন এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, তার চিঠি নিশ্চয়ই এতকালে পৌঁছে গেছে বিদেশে, তার প্ল্যান্টের ফরেন পার্টস হয়তো এর মধ্যে রওনা দিয়েছে, এসে পৌঁছবে শিগগির। এখন জানতে পারল, সে চিঠি আদৌ পাঠানো হয়নি তার অফিস থেকে।

কথাটা সায়ন যেন বিশ্বাসই করতে পারল না। তার পর সারা অফিস তোলপাড় করে, ঋষিতার বাড়ি লোক পাঠিয়ে সন্ধের দিকে যে খবর তার কাছে পৌঁছল, তা আরও অবিশ্বাস্য। কঙ্কা রায় চিঠি টাইপ করে সায়নকে দিয়ে সই করিয়ে দিয়ে এসেছিল ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক ঋষিতা তালুকদারের কাছে। ঋষিতা যে-মুহূর্তে আরও কয়েকটা চিঠির সঙ্গে সে চিঠিটিও রেজিস্টারে নোট করতে যাবে, তখন তার একটি জরুরি ফোন আসে বাইরে থেকে। ফোনে তক্ষুনি তাকে বাড়ি চলে যেতে বলা হয়। ঋষিতা তড়িঘড়ি চিঠিগুলি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে নেমে আসে নীচে। বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, তাতে তার পায়ের বুড়ো আঙুলে এমন চোট পেয়েছে যে তার পরদিন থেকে আর অফিসেই আসতে পারেনি। ডেসপ্যাচে পরদিন থেকে অন্য একজন কাজ করছে বদলি হিসেবে। সে ওইসব চিঠির কথা জানেই না। ঋষিতাও কোনও খবর পাঠায়নি। চিঠিগুলো তার ড্রয়ারেই আছে এখন।

শুধু সায়নের মুখ থেকে প্রায় অবধারিতভাবে বেরিয়ে এল, স্যাবসাড, কই, ড্রয়ারটা খুলুন তো—

ড্রয়ারের চাবি কারও কাছে নেই। ঋষিতার অবর্তমানে অগত্যা তালা ভাঙা হল ড্রয়ারের। আর আশ্চর্য, ড্রয়ারের ভেতর থেকে বেরুল চিঠির গোছা, তার মধ্যে কঙ্কা রায়ের টাইপ করা সেই চিঠিটাও।

সায়ন চিঠিটি হাতে নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল। তার চেতনা, তার বোধ যেন এখন আর ঠিকঠাক কাজ করছে না। সে ভাবতেই পারছে না, এরকম একটি ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে। কে ঋষিতাকে ফোন করল, কেনই বা করল, কেনই বা তাকে আহত হতে হল, তার কোনও সূত্রই খুঁজে পাচ্ছে না। সবকিছু কি নিতান্তই কাকতালীয়, না কি কেউ

সুপরিকল্পিতভাবে এত সব ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে আড়ালে থেকে। তারা কি তারই অফিসের লোক? প্রথমে তার মেশিন বার্স্ট করিয়ে, এখন গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি ডেসপ্যাচ না করিয়ে আরও দেরি করিয়ে দিতে চায় নতুন মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারটির উৎপাদন! তার অফিসের ভেতরেই কি তাহলে কাজ করছে কোনও দুষ্টচক্র? তারাই ঐন্দ্রিলাকে খুন করেছে? ভাবতে ভাবতে সায়ন স্থাণু হয়ে গেল একেবারে। তাকে ধ্বংস করার একটা প্রস্তুতি যেন প্রবলভাবে ঘনিয়ে আসছে চারপাশ থেকে। কিন্তু কে তারা? কেনই বা?

এসপ্লানেড ইস্টের অফিস থেকে দ্রুত ড্রাইভ করে শরৎ বোস রোডের দিকে ফিরতে ফিরতে সায়ন ভাবছিল, তার অফিসের এত অফিসার, এত-এত স্টাফ, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তো তার এক নিবিড় সংযোগ, প্রত্যেকেরই সুখদুঃখের শরিক সে, অথচ তাদের মধ্যেই কেউ বা কারা অদৃশ্যে থেকে আয়োজন করে চলেছে সায়নেরই সর্বনাশ, তা কি কখনও সম্ভব! তার কোম্পানির ওঠাপড়ার সঙ্গে বাকি সবার ভবিষ্যৎই তো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা জেনেও কি কেউ—

চকিতে তার অফিসারদের মুখগুলো এক-এক লহমা ঘাই দিয়ে গেল মগজে। দফতরের যে-যে কর্মীর মুখগুলো তার চেনা, তাদের কথাও নাড়াচাড়া করল কয়েকবার। সে অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাইই উঠে দাঁড়ায়, মাথা নাড়িয়ে নড় করে, কখনও চেম্বারে এসে কোম্পানির কাজকর্ম নিয়ে নিবিড় আলোচনা করে, সেই তারাই কি এভাবে চক্রান্ত করতে পারে তার আড়ালে গিয়ে! কেন কে জানে, সায়নের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না সে-কথা। সে যে বড় বেশি বিশ্বাস করে মানুষকে।

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে একা আপনমনে ঘাড় নাড়তে থাকে, তারই চেনা কেউ ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করেছে এ যেন সে ভাবতেই পারে না। অথচ পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের মত তাইই। সায়নের চেনাজানা সবাইকে ইন্টারোগেট করে তার ডায়েরি বোঝাই করেছেন। সায়নকে তো প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করছেন কিছু-না-কিছু। তার অফিসে, ফ্যাক্টরিতে ঘুরে ঘুরে কতকিছু দেখছেন, নোট নিচ্ছেন, জিজ্ঞাসা করছেন একে-ওকে। এমনকি ফ্যাক্টরির নাইটগার্ড এতওয়ারিকেও অনেকক্ষণ জেরা করেছেন বার্স্ট হওয়া মেসিনটির ব্যাপারে। কে কে ফ্যাক্টরিতে বেশি রাত পর্যন্ত ছিল সেদিন কে কোথায় ডিউটি দেয়, এইসব।

দেবাদ্রি সান্যাল বলেছেন, এই পৃথিবীতে কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয়, তা কেউ জোর গলায় বলতে পারে না।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করতে করতে এই নিঃসঙ্গ, শব্দহীন ঘরে একা-একা ভারি মুষড়ে পড়ল সায়ন। তার অদৃষ্টই তাকে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেবে না। তা হলে

এই একলা, হেরো, ফতুর জীবন সে আর এভাবে কতদিন টেনে নিয়ে বেড়াবে! এ ক'দিন যতক্ষণ অফিসে থাকত, তবু কিছুটা নিশ্চিন্তে কাটাত কাজের ভেতর ডুব দিয়ে। বাড়িতে ফিরলেই তো এই হা-হা, নিঃস্ব রিক্ত ঘর, ঐন্দ্রিলার হাজারো স্মৃতি তাকে অবিশ্রান্ত ঝাপটে ঝাপটে অস্থির করে তোলে। রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারে না। চোখে তন্দ্রা এলেই হঠাৎ চমকে জেগে ওঠে। কেমন শিরশির করে ওঠে শরীর। খোলা জানলা দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ। বুকের ভেতর একটা নিবিড়, চিনচিনে ব্যথা তাকে পোড়াতে থাকে। কেবলই মনে হয়, কখন রাত ফুরিয়ে সকাল হবে। সকাল হলে কোনওক্রমে চা খেয়ে, দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিয়ে অফিসে পৌঁছুতে পারলেই এড়াতে পারবে এই দুঃস্বপ্নের রাত। অফিসে কাজের অজস্র ব্যস্ততার ভেতর মুখ গুঁজে উটপাখির মতো পালিয়ে থাকতে পারবে সন্ধে পর্যন্ত। কিন্তু এখন সেই অফিসও যদি তার কাছে নিশ্চিন্তের জায়গা না হয়, তা হলে?

তা হলে কি পুলিশ অফিসারটি যেমন বলেছিলেন, সে কালীজীবনবাবুর নাম বলে দিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করিয়ে দেবে? কালীজীবনবাবু অ্যারেস্ট হলেই ধরা পড়ে যাবে ঐন্দ্রিলার হত্যাকারী? ফ্যাক্টরির নাইটগার্ড এতওয়ারির কাছ থেকে কালীজীবনবাবুর কথা জানতে পেরে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল সায়ন। ভদ্রলোক এসে হাউমাউ করে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরেছিল সায়নের, বিশ্বাস করুন স্যার, আমার পাড়ার ওই ছেলেটির ভাই বরানগরে হোস্টেলে থাকে। হঠাৎ কার কাছে খবর পেয়েছিল, ভাই নাকি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাই ফোন করে হোস্টেল-সুপারের কাছে খবর নিতে গিয়েছিলাম। আমি তো মাঝেমাঝেই দরকারমতো ফ্যাক্টরি থেকে ফোন করি। আপনাকেও একবার রাতে ফোন করেছিলাম, বোধহয় আপনার মনে আছে।

খুবই দায়িত্বশীল মানুষ কালীজীবনবাবু। অ্যাকাউন্টস-সেকশনের খুঁটিনাটি হিসেব তার নখদর্পণে। খুবই সৎ এবং অভিজ্ঞ। এহেন মানুষ কি—

একা-একা এমনতর সব ভাবনায় সায়ন যখন ছিন্নভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত, সেসময় তাকে সচকিত করে বেজে উঠল টেলিফোনের শব্দ। ভাবনার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হতে বিস্মিত হয়ে ভাবল, কে-ই বা এত রাতে তাকে স্মরণ করবে? অফিসেরই কেউ, না কি আবার পুলিশের লোক!

রিসিভার তুলতেই ওপাশে গার্গীর গলা, আপনি কি আমাকে এখানে সত্যিই নির্বাসনে দিয়ে গেলেন, সায়নদা?

গার্গীর কণ্ঠস্বরে কেমন একধরনের অভিমান, যন্ত্রণা। সায়ন চমকে উঠে বলল, তুমি কোত্থেকে ফোন করছ?

—আলোদার পাশের বাড়ি থেকে। বাধ্য হয়ে করতেই হল। বুঝতে পারিনি, আমি হঠাৎ এসে পড়ে এমন বোঝা হয়ে উঠব আপনার কাছে। ঠিক আছে, আর কখনও বিরক্ত করব না আপনাকে। কাল সকালেই আমি আমার নিজের পথ দেখে নেব।

সায়ন কোনও কিছু বলার আগেই ওপাশে টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ। খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে গার্গী, আর তা হওয়ারই কথা। সায়ন রিসিভার হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সহসা ভীষণ এক অনুশোচনায় ভরে গেল তার শরীর। এই মুহূর্তে মনে করতে পারছে না, ঠিক কতদিন আগে সে গার্গীকে জিম্মা দিয়ে এসেছিল আলোদার কাছে। দুদিন, তিনদিন,

না কি সাতদিন! সেই যে চলে এসেছিল, গার্গীর জন্য অন্য কোথাও আশ্রয় ঠিক করে দেবে বলে, তারপর নিজের অফিস আর একাকিত্ব নিয়ে যন্ত্রণায় এতখানি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে যে গার্গীর কথা ভাবেওনি আর।

নাকি ভেবেওছিল! কিন্তু সেদিন আলোদার প্রস্তাবে সে এমন চমকে উঠেছিল যে সল্টলেকে যাওয়ার কথা মনে হলেই কী এক উত্তেজনায় আক্রান্ত হয়েছে। তাই এভাবেই পালিয়ে থাকতে চাইছিল গার্গীর কাছ থেকে। এবং হ্যাঁ, নিজের কাছ থেকেও। কিন্তু কাল সকালেই 'আমি আমার নিজের পথ দেখে নেব' বাক্যটি পুনর্বার তার মগজে ঘাই দিয়ে উঠতেই সে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। যা জেদি আর একগুঁয়ে মেয়ে গার্গী! ঘড়িতে নজর করে দেখল, রাত তখন নটার মতো। এখনও যদি সে বেরিয়ে পড়ে—

তৎক্ষণাৎ গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে হু-হু করে চালিয়ে দিল সেই পথে, যে পথ দিয়ে সেদিন গিয়েছিল গার্গীকে পাশে বসিয়ে নিয়ে। প্রবলগতিতে, প্রায় সম্বিতবিহীন হয়ে চালিয়ে মিনিট চল্লিশের মধ্যে সে গিয়ে পৌঁছল তার গন্তব্যে।

আলোদা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, গার্গীর ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসবে সায়ন। গেট খুলে দিতে দিতে বললেন, বেশ লোক তুমি যা-হোক। মেয়েটাকে দিয়ে গেলে, তারপর একবার খোঁজও নিতে এলে না!

সায়ন কিছু বলতে পারছিল না। অনুশোচনা ক্রমাগত গ্রাস করছিল তাকে। সে যে কী প্রবল ঝামেলার মধ্যে আছে, কী ভয়ঙ্কর টেনশনে, তা বললে কি এঁরা বুঝবেন!

গার্গী তখন অভিমানে, রাগে থমথমে হয়ে আছে। একবারও এল না সায়নের সামনে। পাশের ঘরেই আছে, অথচ এড়িয়ে থাকছে সায়নকে। যেন এক রুদ্ধশ্বাস ঝড় ওতপ্রোত হয়ে আছে তার শরীরে। যে কোনও মুহূর্তে সে ঝড় তুমুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সায়নের ওপর।

সুচন্দনী বেরিয়ে এসে সায়নের চেহারা দেখে কিন্তু আঁতকে উঠলেন, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? দাড়ি কামাননি কেন এ ক'দিন?

আলোদা হাসতে হাসতে বললেন গার্গী ঠিক একরকমই বলছিল কাল, বলছিল, জানেন, সায়নদা একা ঘরের ভেতরে কীরকম ছিরকুট্টি হয়ে থাকে! নিজের হাতে কিছু করতে পারে না। ঘরের ময়লা যেমন কে তেমন পড়ে থাকে। কেউ পরিষ্কার করারও নেই। বদলানো হয় না বিছানার চাদর। একই চাদরে দিনের পর দিন শোয়। দাড়ি কামানোর কথাও মনে থাকে না তার।

সায়ন হেসে দুগালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল, কদিন ধরে অফিসে যা ঝড়ঝাপটা গেল, তার দাপট সামলাতেই আমি অস্থির। শেভ করার কথা মনেই পড়েনি।

আলোদা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, আবার কী হল?

—আর বলবেন না, সায়ন হাসতে হাসতে গত কয়েকদিনের ঘটনা বিবৃত করে বলল, আমার কোম্পানিতেই এখন স্যাবোটেজ শুরু হয়ে গেছে। আর বোধহয় চালানো গেল না। ব্যবসাপাতি বন্ধ করে দিতে হবে মনে হচ্ছে।

– গার্গী তাহলে ঠিকই বলছিল। বলছিল, নিশ্চয়ই অফিসে আবার কোনও ঝামেলায়

পড়েছে। অফিসে ঝামেলা হলে আর কোনও হুঁশজ্ঞান থাকে না বাবুর। সেইজন্যে খোঁজখবর নিতেও পারছে না।

সায়ন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ঠিকই বলেছে। এ কদিন একা-একা এত সব টাইফুনের ঝাপটা সয়েছি, আর ক্রমাগত শ্রিঙ্ক করেছি নিজের ভেতর। মনে হচ্ছিল, এই চাপ বোধহয় আর সইতে পারব না। এরপর হয় পাগল হয়ে যাব না হয়—

আলোদা হঠাৎ মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, ছি সায়ন, এত ভেঙে পড়লে চলে! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই দেওয়াই হল মানুষের কাজ। জীবনটাকে ওয়ান-ডে ক্রিকেটের মতো ভেবে নাও। শেষ বল পর্যন্ত যুঝে যেতে হবে। শেষ বলেও বহু খেলার ফয়সালা হয়।

সায়নের এই উদ্‌ভ্রান্তি কাটিয়ে দিলেন সুচন্দনী, প্রায় ম্যাজিকের মতো ধূমায়িত চায়ের কাপ তার সামনে এগিয়ে দিয়ে। চা পেয়ে সায়ন বর্তে গেল, প্রায় শিশুসুলভ হাসি হেসে শব্দ করে চুমুক দিতে দিতে বলল, গার্গী আসবে না চায়ের আসরে?

আলোদা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, নাহ, ও ভীষণ রেগে গেছে। বলেছে, সায়নদা আমাকে এখানে ডাম্প করে দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখব না এরপর। আমি যথেষ্ট সাবলম্বী, নিজেই নিজের পথ দেখে নিতে জানি।

সায়ন বিব্রত হয়ে ফের হাসল, একবার ভেতরের ঘরের দিকে চোখ চালিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল, কোন নিভৃত কোণে নিজেকে অন্তর্লীণ রেখেছে গার্গী। না দেখে শুধু আবার শব্দ করে চুমুক দিল চায়ের কাপে।

সেদিন আরও একপ্রস্থ জম্পেশ খাওয়াদাওয়ার পর আলোদা আবার একান্তে ডাকলেন সায়নকে, বললেন, আমার প্রস্তাব নিয়ে আর কিছু ভেবেছ?

—কোন প্রস্তাব? সায়ন যেন বিস্মিত।

—আমার মনে হয়, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। মেয়েটাকে দেখেও আমি বুঝেছি, ও তোমাকে ভালবাসে। খুবই ভালবাসে। সারাক্ষণ তুমি একা-একা ফ্ল্যাটে কীভাবে কাটাচ্ছ, কী কষ্টে আছ ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। এদিকে তুমি তার খবর একবারও নিচ্ছ না দেখে গুম্ হয়ে থাকছে রাগে, ক্ষোভে। আর তাছাড়া —, তাছাড়া এখন ওর সামনে ফেরারও কোনও পথ নেই।

সায়ন কিন্তু আগের দিনের মতোই মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিল আলোদার প্রস্তাব, তা হয় না, আলোদা। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে গেছে, তার রেশ মেলায়নি এখনও। আজও সর্বক্ষণ মনে হয়, ঐন্দ্রিলা নেই, তবু সে যেন আমার কাছে-কাছে ঘুরছে, হাসছে, কথা বলছে, শুধু আমার কাজে সে সাহায্য করতে পারছে না দেখে কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে।

একটু চুপ করে থেকে আলোদা বললেন, সবই আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার পক্ষে এখন একা থাকাও যে কী কষ্টকর তাও অনুভব করতে পারি। ঐন্দ্রিলা নেই বলেই সারাক্ষণ আফসোস করছে গার্গীও। তবু গার্গীকে তোমার এখন দরকার। কেন, তুমি কি গার্গী সম্পর্কে কিছুই অনুভব করতে পার না?

—পারি, আলোদা। পারি বলেই এ কদিন কেবলই ভেবেছি, গার্গীকে নিয়ে আমি এখন কী করব, কোথায় রাখব। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই তো ও এমন বিপদের মধ্যে পড়েছে।

আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে এখন ওব কত দুর্নাম হয়ে গেল। সবই বুঝতে পারি, কিন্তু সমাজ বলেও তো একটা কথা আছে।

আলোদা হাসলেন, সমাজে যা দুর্নাম হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। বরং বিয়ে না করে এভাবে দুজনে ঘুরলেই দিন দিন আরও দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে। সে আরও কষ্টকর ব্যাপার। ভেবে দ্যাখো কথাটা।

সায়ন তখনও প্রবলভাবে মাথা নেড়ে চলেছে, তা হয় না আলোদা। নানা কারণে আমার মনটা ভাল নেই। দেবাদ্রি সান্যালের একটা কথা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। বলেছিল, আপনার অনুপস্থিতিতে কেউ কি আপনার ফ্ল্যাটে আসে? কথাটা শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম, কিন্তু কাল মোহনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি জান মোহন, কেউ আসত কি না? মোহন ঘাড় নিচু করে কেবল বিড়বিড় করতে লাগল, আমি জানি না সাহেব, আমি জানি না। আমি কিছু দেখিনি। কিন্তু তার বলার ধরনটা ভাল লাগল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, কিছু একটা লুকোতে চাইছে সে। তার পর থেকে এত যন্ত্রণা হচ্ছে ভেতরে যে, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। বেঁচে থাকতে যাকে কখনও কণামাত্র সন্দেহ করিনি, তার মৃত্যুর পর হঠাৎ এ কী বিষ ঢুকে গেল মনে! কে আসত তা হলে? কেনই বা আসত? সত্যিই কি আসত?

আলোদা ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমার কী মনে হয়? কেউ আসত?

সায়ন তখনও অন্যমনস্ক হয়ে বিড়বিড় করছে, আমি কিছুই জানি না। হয়তো রবার্ট আসত। দ্যাট্ ওল্ড ব্লাডি ফেলো। মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে ও ভারি ওস্তাদ। কিন্তু ভাবনাটা মনে এমন গেঁথে গেছে যে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না।

আলোদা সান্ত্বনা দিলেন, সেটা না-ও হতে পারে। যতক্ষণ না কোনও প্রমাণ পাচ্ছ, সন্দেহ করে লাভ নেই। শুধু শুধু ডিপ্রেশনে ভুগবে। আর সেজন্যেই তো গার্গীকে এখন তোমার চাই। একমাত্র সে-ই পারবে তোমাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। ওকে তো কদিন ধরে আমি দেখলাম।

—তবু এ বিয়েটা হলে চারদিকে কী ভীষণ ঝড় বয়ে যাবে তা ভাবতে পারছেন? টি টি পড়ে যাবে চারদিকে।

—টি টি পড়ার আর কিছু বাকি আছে নাকি? বিয়ে করলে হয়তো ক'দিন হইচই হবে, কানাকানি হবে, আলোচনা হবে, কাগজে লেখালেখি হবে, কিন্তু তাতে নিত্যনতুন গল্প খোঁজার তাগিদ চলে যাবে সবাইকার।

সায়ন তবু সুস্থির হতে পারে না, বলল, কিন্তু হত্যার রাতে আমি যে কলকাতায় ছিলাম না সেটাই তো বিশ্বাস করছে না পুলিশ। বারবার ট্রেনের টিকিটের তারিখের কথা বলছে। আমার মা ও রবার্ট পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে বলেছে, সেদিন মধ্যরাতে তারা ল্যাবরেটরিতে আলো জ্বলতে দেখেছে। সবাই জানে একমাত্র আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কারও ল্যাবরেটরিতে প্রবেশাধিকার নেই, এমনকি ঐন্দ্রিলার কাছে চাবি থাকত, সেও কখনও ঢোকেনি ভেতরে, পাছে আমার কাগজপত্র এদিক-ওদিক হয়ে যায়। তাহলে সেদিন নিশ্চয় আমিই ছিলাম। কোর্ট তো মুখের কথায় বিশ্বাস করবে না—

আলোদা অদ্ভুতভাবে হাসলেন, বললেন, কাল গার্গীর সঙ্গে ডিটেইল্স আলোচনা হয়েছে

এ-ব্যাপারে। একটা ভাল পয়েন্ট বার করেছে ও। দাঁড়াও, ভেতর থেকে আসছি—

বলে আলোদা হঠাৎ উঠে গেলেন, একটু পরেই দুটো কাগজ এনে সায়নের হাতে দিলেন— তার একটি খড়গপুরের কোনও এক আদিবাসী-ক্লাবের ছাপানো আমন্ত্রণপত্র, অন্যটি উলুবেড়িয়ার কাছে একটি মোটর-রিপেয়ারিং গ্যারেজের বিল। বললেন, কাল কাগজদুটো হঠাৎই পেয়ে গেলাম শার্টের পকেটে, যে শার্ট পরে গিয়েছিলাম বিলাসপুরে। বিলাসপুর থেকে এসে হঠাৎ গুজরাত চলে যেতে হওয়ায় শার্টটা কাচতে দেওয়া হয়নি তখন। হয়নি বলেই কাগজ দুটো পেয়ে গেলাম ভাগ্যক্রমে। পরে কোর্টে লাগবে, কোর্ট হয়তো ওখানকার কাউকে কাউকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে পাঠাবে।

সায়ন হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কাগজ দুটোর দিকে। অবাক হল গার্গীর বিচক্ষণতার কথা ভেবে। পরক্ষণেই কী যেন মনে পড়তে হঠাৎ বলল, গার্গীকে একবার ডাকুন তো। একটা দরকারি কথা আছে—

আলোদা হেসে বললেন, গার্গী রাগের চোটে ও-পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার সামনে আসতেই চাইছে না।

গার্গী ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু সায়নের চোখে ঘুম এল না সে-রাতে। চোখ জুড়ে তন্দ্রা এসেও ফিরে গেল কতবার, কখনও ঘুম আসতে না আসতে চটকা ছুটে গেল। খুব ভোরে উঠে বারান্দায় এসে দেখল এক দুর্লভ দৃশ্য। গার্গী তারও আগে উঠে হাঁটছে সামনের রাস্তায়। ঘন নীল রঙের একটি শাড়ি ঘিরে রেখেছে তার দিঘল শরীর, চুল এলো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে পিঠময়, ছোট-ছোট স্টেপ ফেলে রাস্তায় পায়চারি করছে এদিক থেকে ওদিক, আবার ওদিক থেকে এদিক। তাকে ভোরের মতোই স্নিগ্ধ আর পবিত্র লাগছে

সায়নও দ্রুত এগিয়ে গেল, আস্তে করে ডাক দিল, গার্গী—

গার্গী তার দিকে তাকাল, কিন্তু কথা বলল না।

—গার্গী, সেদিন দেবাদ্রি সান্যাল কয়েকটা কথা বলে গেলেন। খুবই অদ্ভুত কয়েকটা পয়েন্ট, তার মধ্যে একটি আমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হয়েছে। কাল রাতেই ভেবেছিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করব—

গার্গী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। এবারও কোনও কথা বলল না।

—বললেন, বিয়ের আগে ঐন্দ্রিলার কোনও প্রেমিক ছিল কি না। সে প্রেমিক এখনও ঐন্দ্রিলার কাছে যাতায়াত করত কি না। আমি উত্তরে বললাম, আমার জানা নেই। তবে এ বাড়িতে সে এলে নিশ্চয় জানতে পারতাম। তখন জানালেন ঐন্দ্রিলার বাবাকেও উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ঐন্দ্রিলার বাবা প্রথমে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, না। শেষে নাকি বলেছেন, কোনও এক যুবকের কাছে ফরাসিভাষা শিখতে যেত ঐন্দ্রিলা। ভাল নাম বলতে পারেননি। ডাক নাম, রুনু। রুনু মুখার্জি। কবিতা লিখত নাকি। ঐন্দ্রিলার বাবা ভাষা শেখার ব্যাপারে বারণ করেননি মেয়েকে। কিন্তু পরে একদিন ঐন্দ্রিলার খাতার ভেতর একটা চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিটি ফরাসি ভাষায় লেখা। চিঠির মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেননি, তবে তার সম্বোধনটি পড়ে নাকি বুঝেছিলেন, সেটি প্রেমপত্র। পরদিন থেকেই মেয়ের ফরাসি ভাষা শেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, বলতে বলতে সায়ন থামল, তারপর একটু পরে বলল, তুমি জান, কে রুনু?

গার্গী গম্ভীর হয়ে বলল, রুক্মা ফরাসিভাষা শিখতে যেত তা জানি। কিন্তু কার কাছে তা জানি না। কিন্তু সে কথা এখন জেনে কী লাভ?

—তার সঙ্গে কি ঐন্দ্রিলার এখনও যোগাযোগ ছিল? কথাটা ভেবে কী জানি কেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

গার্গী আরও গম্ভীর হয়ে বলল, যে দু'বছর ঐন্দ্রিলা আপনার কাছে ছিল, কখনও কি আপনার মনে হয়েছে, সে অন্যের কথা ভাবছে? উপেক্ষা করছে আপনাকে?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সায়ন বলল, না, কখনও মনে হয়নি।

তাহলে আর শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন কেন? রুক্মার হয়তো কোনও একটা ছোট্ট খেয়ালিপনা ছিল। সে তো অনেক মেয়েরই থাকে। সেটা বড় করে দেখছেন কেন? আপনারও তো সারাদিনে কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়, কথাবার্তা হয়, তার মধ্যে মেয়েও তো থাকে কতজন। তা নিয়ে রুক্মা কি কখনও ভাবত, না ভেবে কষ্ট পেত! তবে জেনে রাখুন, রুক্মা যেই হোক না কেন, এ বাড়িতে সে এলে আপনার অজানা থাকত না। আপনাদের দারোয়ান মোহন জানত তাহলে।

—কিন্তু হত্যার রাতে মোহন ছুটিতে গিয়েছিল।

গার্গী তার দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, ভুরু কুঁচকে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল সহসা।

সেই মুহূর্তে আলোদা বারান্দায় এসে ডাক দিলেন তাদের, শিগগির শোনো—

তারা দুজনে ঘরে ঢুকতেই হইহই করে উঠলেন আলোদা, খুবই সুখবর সায়ন, গার্গীর জন্য একটা দারুণ থাকার জায়গা খুঁজে পেয়েছি। খুব নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।

সায়ন আশার আলো দেখল আলোদার দিকে তাকিয়ে। গার্গীও উৎফুল্ল হয়ে বলল, কোথায়?

আলোদা হাসলেন, কাল রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আইডিয়াটা মাথায় এল। এ কদিন কেন মনে পড়েনি তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। সুচন্দনীও বলল, ওইটেই সবচেয়ে ভাল জায়গা। দাঁড়াও, পাশের বাড়িতে গিয়ে টেলিফোন করে খবরটা ঠিকঠাক নিয়ে আসি।

সুচন্দনী তখন রান্নাঘরে সেঁধিয়ে গিয়েছেন, বোধহয় ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে ব্যস্ত। আলোদা বেরিয়ে যেতে সায়ন তাকাল গার্গীর দিকে। কাল থেকে কথাই বলেনি সায়নের সঙ্গে, এখনও তার দুচোখ জুড়ে শুধু অভিমান আর অভিমান। অভিমানের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে ক্ষোভ, ক্রোধ, একটা যন্ত্রণাও। আলোদা বেরিয়ে যেতেই বলল, যাক্, আলোদার কল্যাণে তবু আমার বোধহয় একটা হিল্লে হল। অন্তত আপনার শিরঃপীড়ার কারণ হচ্ছি না দেখে স্বস্তি পাচ্ছি। যেভাবে আমাকে নির্বাসন দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন—

সায়ন কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সে কী যে টানাপোড়নের মধ্যে আছে, কেন যে গার্গীর মুখোমুখি হওয়ার সাহস অর্জন করতে পারছে না, তা গার্গী বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না। সে তার সায়নদাকে ভালবাসে, অতএব সায়নদাই তার উদ্ধারকর্তা হবে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

গার্গীর এহেন আক্রমণে আরও বিপর্যস্ত হয়ে উঠল সায়ন, তবু বলল, ভাল জায়গাতেই

তোমাকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলাম। আলোদা হয়তো এমন ভাল জায়গায় তোমাকে রাখার ব্যবস্থা করছেন, যা আমি পারতাম না।

গার্গী চোখে আগুন জ্বেলে প্রায় ভস্ম করে দিতে চাইল সায়নকে। ঋষি দুর্বাসার মতোই।

কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরেই ফিরে এলেন আলোদা, তাঁর মুখে তখন বিশ্বজয়ের হাসি, এসেই হইহই করে বললেন, আমার মিশন সাকসেসফুল, প্লিজ গেট রেডি বাই নাইন থার্টি। সুচন্দনী, সুচন্দনী, শিগগির ব্রেকফাস্ট রেডি করে ফেলো। হেভি ব্রেকফাস্ট।

আলোদা এমন হইচই করতে লাগলেন যে সায়ন গার্গী দুজনেই কিছুটা উৎফুল্ল, কিছুটা অনিশ্চিত চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। সায়ন দু-একবার জিজ্ঞাসাও করল, কোথায় সায়নদা। কোনও হোস্টেলে নাকি?

—প্রায় সেরকমই। তবে তোফা আরামে থাকবে গার্গী। সায়নকে আর দুশ্চিন্তায় ভুগে ভুগে চোখের কোণে কালি ফেলতে হবে না। বলতে বলতে আবার হাঁক দিলেন আলোদা, সুচন্দনী, ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে গেলে তুমিও রেডি হয়ে নাও। আমরা সবাই মিলে গার্গীকে নতুন আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

সাড়ে নটার মধ্যেই সায়নের মারুতিতে চড়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই। গার্গী তার একমাত্র সম্পত্তি ছোট্ট সুটকেসটা বয়ে নিয়ে চলেছে এক আস্তানা থেকে আর এক আস্তানায়। কদিন আগেও সে একবারও ভাবতে পারেনি তাকে এভাবে ক্রমাগত এক অনিশ্চিত জীবনযাপনের শরিক হয়ে উঠতে হবে। সমস্ত রাস্তা সে চুপচাপ, গম্ভীর হয়ে রইল। আলোদাই যা দু-একটা কথা বলছিলেন। মাঝেমধ্যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন সায়নকে — কোন পথে তাদের গন্তব্য। বিজন সেতু পার হয়ে সোজা গিয়ে পৌঁছুল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ক্রশিঙে, সেখান থেকে ডাইনে বাঁক নিয়ে হাজরা মোড়ের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ অন্য এক লেনের ভেতর ঢুকে যে বাড়িটার সামনে তারা পৌঁছুল, সেটা হিন্দু মিশন।

এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে তাই-ই জানত না সায়নরা, এটা কিসের প্রতিষ্ঠান, কী হয় এখানে তাও অবহিত ছিল না। গাড়ি থেকে নেমে দেখল, আলোদার পরিচিত আরও এক দম্পতি তাদের অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে, তাঁদের হাতে অজস্র ফুলের সম্ভার, একটি চমৎকার বোকেও।

সায়ন, গার্গী দুজনেই হকচকিয়ে গেল, হঠাৎ তাদের এমন ফুলেল অভ্যর্থনা কেন তাও বুঝে উঠতে পারল না। বাড়িটার ভেতর ঢুকে আলোদা হাসি-হাসি মুখে বললেন, বুঝলে, রেজিস্ট্রি অফিসেও যেতে পারতাম, কিন্তু সেখানে একমাসের নোটিস দিতে হয়। অবশ্য ব্যাকডেটে সে-সবও করা যেত, কিন্তু আইনত একমাস আগে তুমি নোটিস দিতে পার না। তাইই হিন্দু-মিশনে আসতে হল।

এতক্ষণে সায়নের কাছে খোলসা হল ব্যাপারটা। বুঝতে পেরেই তার পা নিথর, অবশ হয়ে গেল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, এ সব কী, আলোদা?

আলোদা তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, কী সেটা একটু পরেই জানতে পারবে। এখন এদিকে এসো। বেশি সময় লাগে না এখানে, মাত্র পাঁচমিনিটের নোটিসেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।

সায়ন একা নয়, গার্গীও ততক্ষণে নির্বাক। এ কোথায় তাদের নিয়ে এলেন আলোদা,

কেনই বা, তা বুঝতে সেও খানিকটা সময় নিল। তারপর সায়নের রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।
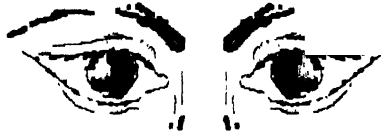
আলোদা যেমন বলেছিলেন, মাত্র কিছুক্ষণেব মধ্যেই এক অসম্ভব ঘোরের ভেতর মুখোমুখি হল সায়ন আর গার্গী। কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছিল না। যেন এক ধূসর স্বপ্নের ভেতর দুজনে দাঁড়িয়ে, স্পন্দনহীন, রুদ্ধশ্বাস। সে মুহূর্তে যা করার আলোদারাই করলেন। নামাবলি গায়ে জড়ানো পুরোহিত যন্ত্রের মতো পালন করলেন তাঁর ভূমিকা। এক অসম্ভবকে চমৎকার কৌশলে সম্ভব করে মুচকি মুচকি হাসছিলেন আলোদা, সুচন্দনী বউদি।

সায়ন-গার্গী দু'জনেরই ভেতর তখন এক ভুঁইকাঁপ চলছে। প্রবল টানাপোড়েনে, তীব্র অস্থিরতায়, গভীরতর এক উত্তেজনায় তখন লীন হয়ে যাচ্ছে দুজনের সত্তা, দুজনের অস্তিত্ব, দুজনের ভেতর এতাবৎ জমা হয়ে থাকা যাবতীয় টালমাটাল। পরিবর্তে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন চাঞ্চল্য, শঙ্কা, এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা।

সায়ন-গার্গীর বিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না আলোদা। হিন্দু মিশন থেকে বেরিয়ে সবাই মিলে হাজির হলেন একটা বাঙালি হোটেলে। চমৎকার ছিমছাম হোটেলটির একটি নির্জন কোণ বেছে নিয়ে একরাশ খাবারের অর্ডার দিলেন হইহই করে। খাওয়াও হল প্রায় রাজকীয়ভাবে, অনেকক্ষণ ধরে। আলোদারা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন সায়ন আর গার্গীর অপ্রস্তুত মুহূর্তগুলো। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দুজনকে শুভকামনা জানিয়ে বললেন, গো অ্যান্ড এনজয় টু-নাইট। আজ তোমাদের বাসর। তবে তার আগে কাগজের অফিসে একটা ফোন করে জানিয়ে দিয়ো ঘটনাটা। না হলে কাল আবার কী না কী লিখবে।

আলোদাদের বিদায় দিয়ে দুজনে কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরল, তারপর প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ফিরে এল তাদের শরৎ বসু রোডেব ফ্ল্যাটে। এমন অবিশ্বাস্যভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল যে গার্গী বিমূঢ়, ভাল করে তাকাতেও পারছে না সায়নের দিকে। বন্ধ ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দুজনে ঘরের ভিতর ঢুকল, গার্গীর মনে হল তার শীত করছে, শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত কাঁপুনি। সে কাঁপুনি আনন্দের, না ভয়ের, না লজ্জার তা সে জানে না।

কয়েকদিন আগেও গার্গী অনুমান করতে পারেনি, তাকে সত্যিই এহেন অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

সল্টলেকে যেদিন সে যায়, তখন কিন্তু ভেবেছিল, সায়নের সঙ্গে একই বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে রাত কাটানো তার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। অথচ এ কদিনে পরিস্থিতি বদলে গেছে আমূল। আজ ভাবতে পারছে না, কীভাবে একজন পুরুষের সঙ্গে একই ঘরে থাকবে সে!

সোফার উপর আড়ষ্ট, জবুথবু হয়ে গার্গীকে বসে থাকতে দেখে সায়ন হঠাৎ বলল, অমন চুপচাপ হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে চলবে? সবে তো যুদ্ধের শুরু। এখনও অনেক

ঝামেলার মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। নাও, ওঠো—

গার্গী হতভম্ব হয়ে তাকাল সায়নের মুখের দিকে। সায়নের কণ্ঠস্বরে কিছু হাল্কা মেজাজ, যেন কিছুই হয়নি এমন একটা অনুভূতি। হঠাৎ কীভাবে এমন সহজ হয়ে উঠল সায়ন তা ভেবে আশ্চর্য হল, কেঁপেও উঠল গার্গী। একটা অজানা ভয়ও ঘিরে ধরল তার শরীর। সোফার জড়তা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াতেই পারল না।

পাশের ঘর থেকে ততক্ষণে জামাকাপড় বদলে এসেছে সায়ন। খুবই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল মনে হচ্ছে তাকে। অথচ এই বিয়ের জন্য সেইই প্রস্তুত ছিল না একেবারে। আলোদাই তো তাকে জোর করে নিয়ে এসে—

—নাও, ড্রেসটা চেঞ্জ করে এসো, গার্গী। আলোদা বলেছেন, আজ আমাদের বাসর। কিন্তু বাসর জাগবার লোক নেই যখন, তখন আমরা দুজনেই আজ জাগব। বুঝলে, একটা অন্যরকম কিছু করি আমরা, আন্‌কমন। পুরো ব্যাপারটাই যখন স্বপ্নের মতো হল, তখন বিয়ের প্রথমরাত আমরা নতুন কোনও পদ্ধতিতে এন্‌জয় করি—

হঠাৎ একজন পুরুষের সঙ্গে একা একটি ফ্ল্যাটে রাত কাটাতে হবে ভাবতেই সারাটা শরীর কেঁপে উঠল গার্গীর। কোনও পুরুষের সঙ্গে এভাবে প্রথম রাত, এমন গা-শিরানো মুহূর্ত মেয়েদের জীবনে একবারই আসে, সব মেয়েদেরই তা কাঙ্ক্ষিত, তবু গার্গী কিছুকাল আগেও ব্যাপারটা আদপেই ভাবেনি। তার জীবন বয়ে চলেছিল একেবারে ভিন্ন খাতে, বিপরীত মেরুতেই বলা চলে, হঠাৎ প্রলয়ের মতো সেই রাত্রি তার জীবনে এমন দাপিয়ে এসে গেল কীভাবে, তা ভেবে ক্রমশ নিথর হয়ে আসছিল তার হাত-পা।

সায়নও যেন তার কাছে এই মুহূর্তে কেমন অচেনা, দুর্বোধ্য। তার কথা বলার সহজ ভঙ্গিটুকুই আরও আশ্চর্য করছিল তাকে। যাকে সে বহুকাল ধরে দেখে আসছে এক অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, সেই যুবকের সহসা তার জীবনে পুরুষ হয়ে ওঠাটাই রীতিমতো বিস্ময়ের। তার ওপর সে যদি এমন রহস্যময় হয়ে ওঠে—

একবুক অস্থিরতা নিয়ে গার্গী ঢুকে পড়ল পাশের ঘরে, গিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল। তাতে স্বস্তিও পেল যেন। পাশের ঘরটিই শোওয়ার ঘর। শোওয়ার ঘরে যেভাবে নবদম্পতির বাসর হয় তার কোনও অনুষঙ্গই আজ এ-ঘরে নেই, থাকার কথাও নয়, বরং পোশাক বদলানোর ফাঁকে সহসা ঘরের চারদিকে তাকিয়ে কেমন ছমছম করে উঠল তাঁর শরীর। সর্বত্রই তো ঐন্দ্রিলার ছাপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এ ক'দিন যতবার এ ঘরে এসেছে গার্গী, প্রতিবারই মনে হয়েছে, ঐন্দ্রিলা যেন বলছে, ছি মিতুন, তুই থাকতেও ও এমনভাবে কষ্ট পাবে! কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্নরকম। আজ যেন ঐন্দ্রিলা তার শতচক্ষু বিস্তৃত করে দেখছে গার্গীকে, আর স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে তার কাণ্ডকারখানায়। যেন তার ফেলে যাওয়া রাজাপাটে হঠাৎ দখল বসিয়েছে গার্গী।

কথাটা মনে হতেই দারুণভাবে শিরশির করে উঠল গার্গীর শরীর। পোশাক বদলে সে দ্রুত বেরিয়ে আসতে চাইল ঘর থেকে। বেরিয়ে আসার মুহূর্তে হঠাৎ নজর পড়ল খোলা জানলার ভেতর দিয়ে ও পাশের ফ্ল্যাটের দিকে। অন্ধকারে মনে হল, হিমনদের ফ্ল্যাটের এদিককার জানলা খোলা, সেখানে পর্দা সরিয়ে কেউ যেন তাকিয়ে আছে এদিকে। পুরুষ কিংবা নারী তা ঠিক বুঝতে পারল না, শুধু একজোড়া চোখ অন্ধকারে যেন জ্বলছে। অপলক

অপেক্ষা করছে কখন এ ফ্ল্যাটের পর্দা হাওয়ায় উড়ে বেআব্রু করে দেবে ঘরটাকে।

দ্রুত জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে সে চলে এল বাইরের ঘরে। এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতিতে তার বুকের ভেতর স্টিমারের ভট্‌ভট্‌ শব্দ। এ-ঘরে তখন এতদিনের চেনা সায়ন তার দিকে তাকাচ্ছে কেমন স্বপ্নিল দৃষ্টিতে। গার্গীর পরনে যে চমৎকার রাত পোশাকটি, সমুদ্র-নীল রঙের, একটু হাওয়া লাগলেই ফুলে ওঠে এমন ফুরফুরে, সেদিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, আজ রাতটা আমরা জেগেই কাটাব, তবে ঘরের ভেতর নয়।

গার্গীর শরীর অবশ, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কোথায়—

সায়ন নিজেই বলল, অনেকদিন ছাদে ওঠা হয় না। চলো, আজ দু'জনে ছাদে গিয়ে বসি।

অবাক হল গার্গী, তবু মনে হল সায়ন যা বলেছে সেইটেই ঠিক এই মুহূর্তে। চারপাশের দেওয়াল-ঘেরা পরিসর ছেড়ে খোলা ছাদে পালিয়ে যাওয়াটাই এখন সবচেয়ে স্বস্তির। ততক্ষণে দু'খানা বেতের চেয়ার দু'হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে সায়ন, কুশন দুটো গার্গীর হাতে দিয়ে বলল, চলে এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সায়নের পিছুপিছু চলে এল গার্গী, ছাদে এসে মুগ্ধ হয়ে দেখল, রাতের কলকাতা ক্রমশ রহস্যময় হয়ে উঠছে। সায়নদের দোতলার ছাদ থেকে কলকাতা শহরের খুব বেশি দেখা যায় না, তবু নীচের শরৎ বোস রোড, চারপাশের তিনতলা-চারতলা বাড়ি, আরও দূরের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, সব মিলিয়ে কলকাতা এখন এক অনন্য সৌন্দর্যে গরীয়ান।

ছাদের যে-কোণটিতে বসলে সবচেয়ে ভালভাবে দেখা যায় এ-শহর, সেখানে দু'খানা চেয়ার পাতা হল মুখোমুখি। তার উপর নরম কুশন বিছিয়ে গা এলিয়ে দিল সায়ন, গার্গীকে বসতে বলে বলল, হঠাৎ একটা অদ্ভুত গল্প মনে পড়ে গেল, গার্গী।

গার্গীর স্বর মনে হল বসে গেছে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, কী গল্প!

—বিদেশি পটভূমিকার এক গল্প। এক যুবক আর যুবতী হঠাৎই বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে, বোহেমিয়ানের মতো। ধরা যাক, তাদের নাম পল আর ভিভিয়েন। দু'জনেরই বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, অফুরন্ত টাকা তাদের খরচের জন্য বরাদ্দ। তবু একদিন তাদের মনে হল, এই ধরাবাঁধা জীবন, তা সে যত আরামদায়কই হোক না কেন, তাদের জন্য নয়। তারা দু'জন পৃথিবী ভ্রমণে বেরুবে। কীভাবে তাদের এই বিশ্বপর্যটন হবে, কোন পথে যাবে তারা, তার কিছুই ঠিক করল না, শুধু ভাবনাটা মনের ভেতর চারিয়ে যেতেই দুটো চিরকুট পাঠিয়ে দিল দু'জনের বাড়িতে, তাতে লেখা, মে নট সি ইউ এগেইন। তারপর দু'জনে দুটো বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনির্দেশ্যের উদ্দেশে।

বহু পিচঢালা পথ সারাদিন দুরন্ত গতিতে চাকার নীচে ফেলে সন্ধের সময় তারা আবিষ্কার করল, এমন একটা নির্জন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে ত্রিসীমানায় কোনও লোকালয় নেই। দু'জনে বাইক থামিয়ে একমুহূর্ত ভাবল, কোথায় রাত কাটানো যায়। তাদের জীবনের প্রথম রাত। আস্তানা তো একটা খুঁজে বার করতেই হবে।

পল বলল, তাহলে আর একটু এগিয়ে যাই—

আরও খানিকটা বাইক ছুটিয়ে এবার যেখানে পৌঁছল, সেটা একটা বিশাল নারকেলবাগান। দীর্ঘ পথের দু'পাশ জুড়ে শুধু লম্বা লম্বা নারকেল গাছ। সে পথও আবার

পেরোতে পেরোতে হঠাৎ একসময় শেষ হয়ে গেল রাস্তাটা। দেখল, সামনে একটা সমুদ্র। শুধু জল আর জল। অন্তহীন জলরাশি যেন তার সহস্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের দু'জনকে অভ্যর্থনায়। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিকে। আকাশের অজস্র নক্ষত্র চুমকি-আলো হয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে চকমকাচ্ছে। অজস্র ব্রেকার প্রবল গর্জন করে আছড়ে পড়ছে বিশাল সি-বিচে। কিন্তু কোথাও কোনও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। ভিভিয়েন কখনও সমুদ্র দেখেনি, পলও নয়, তবু পলের মনে হল, সমুদ্রটা তার চেনা।

পল হাসল ভিভিয়েনের মুখের দিকে তাকিয়ে, মনে হচ্ছে আজ রাতে আমাদের কপালে কোনও আস্তানা নেই। কী করা যায় বলো তো?

ভিভিয়েন তার সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে হাসল, সারা পৃথিবীটাই তো আমাদের আস্তানা। তাহলে এই সমুদ্রতীরে রাত কাটানোতেই বা আমাদের আপত্তি কিসের?

—গুড আইডিয়া, পল লাফিয়ে উঠল, তাহলে এসো, আজ সারারাত এই বিচের উপর বসে আমরা গল্প করে কাটাই—

বলল বটে পল, কিন্তু বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে চারপাশে আঁতিপাতি করে কী যেন খুঁজতে লাগল। এই অন্তহীন নারকেল গাছের সারি, সামনের সমুদ্র, সাদা ফেনা-তোলা ব্রেকার, কাল্চে জলরাশি এই সব কিছুই যেন তার খুবই চেনা। হঠাৎ তার নজর পড়ল নারকেল বনের মধ্যে কিছু ভাঙা ইঁট, ধ্বংসস্তূপের মতো। দেখে সে বিস্ময়ে মোহিত হয়ে গেল, বিড়বিড় করে বলল, কী আশ্চর্য ভিভিয়েন, মনে হচ্ছে এ জায়গাটা আমার ভারি চেনা। ভিভিয়েনও অবাক হল, তাই! তাহলে তুমি নিশ্চয়ই এই সমুদ্রতীরে কখনও এসেছ। পল মাথা নাড়ে, কখনও না, আমি কখনও সমুদ্র দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের বাড়ি তো সমুদ্রতীর থেকে দুশো চল্লিশ মাইল দূরে। ভিভিয়েন চোখে বিস্ময় মাখিয়ে বলল, তাহলে? পল তখন তার দু-চোখে সমুদ্র মিশিয়ে নজর সেঁধিয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে, অন্ধকারে তার চোখে জ্বলতে লাগল ফসফরাস, বলল, কেবলই মনে হচ্ছে, আমি কোনও কালে এখানে বাস করতাম। যেখানে ধ্বংসস্তূপ রয়েছে সেখানে একটা বাড়ি ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যেতাম বালির বিচে। দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর —, হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে পল বলল, জানো একদিন দাঁড়িয়ে আছি বিকেলবেলা, হঠাৎ দূর থেকে দেখি, একটা বিশাল নৌকো আসছে, লম্বা ধরনের। নৌকোটা ক্রমশ কাছে আসতে আসতে একেবারে আমাদের ঘাটের সামনে এসে ঢেউয়ের এক ধাক্কায় আছড়ে পড়ল বিচের উপর। নৌকোর উপর তিন-চার-জন লোক। তার মধ্যে একজন বেশ দীর্ঘদেহী, লম্বা লম্বা চুল, মুখে দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল। প্রায় যিশুর মতো দেখতে। তিনি এসে হঠাৎ আমাকে কোলে তুলে নিলেন।

শুনতে শুনতে ভিভিয়েন আশ্চর্য হল, স্ট্রেঞ্জ। সত্যিই কি একরকম কোনও ঘটনা ঘটেছিল তোমার জীবনে!

পল ঘাড় নাড়ে, নাহ্। কিন্তু ছবিটা এখনও আমার মনে জীবন্ত হয়ে আছে।

সমুদ্রতীরে বিচের উপর হাত পা ছড়িয়ে বসে পল আবার বলল, আমার নিজেরও ভারি অবাক লাগছে। হঠাৎ এরকম একটা ছবি আমার মাথার ভিতর হন্ট করে উঠল কেন! ইয়েস, ইয়েস, পল হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে গেল নিজের ভিতর, মনে পড়েছে, অভিজ্ঞতাটা আমার

নিজের নয়, আমার বাবা খুব ছোটবেলায় হঠাৎ এরকম একটা গল্প আমাকে বলেছিলেন। অভিজ্ঞতাটা কিন্তু তাঁরও নয়। তিনি আবার শুনেছিলেন তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার ঠাকুর্দার কাছ থেকে। আমার ঠাকুর্দারা থাকতেন এরকম একটা নারকেল-বনের ভিতর। সমুদ্রের ধারে। তাঁর বাবা নাকি নৌকোয় করে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে গিয়েছিলেন, বহুদিন যাবৎ ফিরতে পারেননি। ঝড়ের মধ্যে পড়ে অন্য কোথাও, কোনও দ্বীপে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর ফিরে এসেছিলেন চার-পাঁচ বছর পরে। সেই ফেরার দৃশ্যটি এমনই অসাধারণ হয়ে গেঁথে ছিল ঠাকুর্দার মনের ভিতর। ঠাকুর্দা বড় হয়ে গল্পটা বলেছিলেন বাবাকে। বাবাও আমাকে ছোটবেলায় গল্পটা বলেছিলেন বহুবার। তাঁর বর্ণনা এতই জীবন্ত ছিল যে ছবিটা এখনও হুবহু মনের ভিতর রয়ে গেছে। গেছে নয়, ছিল। হঠাৎ এই দৃশ্যের ভিতর এসে পড়তেই ঘাই দিয়ে উঠল মগজের ক্যানভাসে।

ভিভিয়েনের চোখের পলক পড়ছিল না, তাহলে তোমার ঠাকুর্দা এখানে বসবাস করতেন বলছ? পল ঘাড় নাড়ল, সেইরকমই শুনেছি আমি। তারপর থেকেই বারবার আমার মনে হচ্ছে ঠাকুর্দার বাবা কিংবা তার বাবাও নিশ্চয় চিরকাল এই সমুদ্রতীরে থাকেননি। হয়তো অন্য কোথাও, কোনও পাহাড়ে, কিংবা কোনও উপত্যকায় থাকতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ হয়তো আর কোনখানে, আরও দূরে, হয়তো মরুভূমিতেও থাকতেন। হয়তো বেদুইন কিংবা তাতার, কিংবা অন্য কিছু ছিলেন। ব্যাপারটা ভাবতে দারুণ ভাল লাগে আমার।

ভিভিয়েন সম্মোহিতের মতো বলল, অদ্ভুত, অদ্ভুত। ইটস স্ট্রেঞ্জ। আচ্ছা, এই বিষয়টি নিয়েই তো আমরা একটা গবেষণা করতে পারি।

দু'জনে তখন অনেক পরিকল্পনা করল, কীভাবে শুরু করবে তাদের গবেষণা। আলোচনা করতে করতে একসময় সমুদ্রতীরে ভোর হয়ে গেল। লাল বলের মতো একটা সূর্য লাফিয়ে উঠতে লাগল নীল সমুদ্রের ভেতর থেকে।

গল্পটা সম্মোহিতের মতো শুনছিল গার্গীও। হঠাৎ চমক ভেঙে বলল, কিন্তু কলকাতায় এখনও ভোর হয়নি—

সায়ন প্রায় ঘোরের মধ্যে থেকে কথা বলছিল, ঘড়িতে চোখ রেখে বলল, এখন রাত দুটো। রাস্তার দিকে চোখ রেখে দ্যাখো গার্গী, কলকাতায় এখনও পথে লোক চলছে। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, কলকাতায় সারারাত কেউ না কেউ জেগে থাকে। কলকাতা কখনও পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ে না। তবে যাই হোক, আমার গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এবার এই কাহিনীর পরিপূরক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি—

তখনও স্কুলে পড়ি। একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা, আমাদের এই ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি হয়েছে পঞ্চাশ সালের পর। তার আগে আমাদের বাড়ি কোথায় ছিল? তখন জানতে পারি, ঠাকুর্দা তাঁর খুব ছোটবেলায় চলে এসেছিলেন কলকাতায়। একটা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন উত্তর কলকাতার দিকে। তারও আগে থাকতেন বাঁকুড়া জেলার কোথাও। তবে বাঁকুড়াই যে আদি নিবাস ছিল তাও নয়। বাবাকে কথাপ্রসঙ্গে একবার ঠাকুর্দা বলেছিলেন, তাঁদের আদি বসত ছিল বিহারে। পাটনা থেকে সতেরো মাইল দূরে দ্বারশিলা নামের একটি গ্রামে। বাবা কিন্তু কখনও মাথা ঘামাননি দ্বারশিলা নিয়ে। কিন্তু পল-ভিভিয়েনের গল্প পড়ার পর আমার একদিন মনে হল, দ্বারশিলা যেতে হবে। আমার পূর্বপুরুষেরা যখন

সেখানে বসবাস করতেন, তাহলে এখনও আমাদের বংশের কেউ-না-কেউ সেখানে থাকবেই। হঠাৎ একদিন একা-একা চলে গেলাম পাটনা। সেখান থেকে বাসে করে দ্বারশিলা। সেখান থেকে টাঙা নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম এক গাঁয়ে। অনেককেই জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ আমার পূর্বপুরুষদের খোঁজ দিতে পারে কি না। কিন্তু কেউই বলতে পারেনি। চৌধুরী পদবিধারী কয়েকটি পরিবারকে খুঁজে বার করলাম। আশ্চর্য, তারা কেউ বাংলা জানে না। তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছিল আমরা তাদের বংশেরই মানুষ। সেখানে একজন বয়স্ক মানুষ আমাকে বলেছিলেন, রাজস্থান বা অন্য কোথাও তাঁদের আদি নিবাস ছিল। সেখানে একবার খরা হতে তাঁরা বাস তুলে নিয়ে চলে এসেছিলেন দ্বারশিলায়।

বলতে বলতে সায়ন হাসল, যদি সত্যিই প্রত্যেক মানুষ তার পূর্বপুরুষের উৎস খুঁজতে বেরোয়, তাহলে কোথায় যে তার শেষ, তা বলা খুবই দুষ্কর।

শুনতে শুনতে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জন করছিল গার্গীও। কতক্ষণ এভাবে সম্মোহিতের মতো শুনেছে তা জানে না। একসময় অবাক হয়ে দেখল, এবারে ফর্সা হয়ে আসছে আকাশ, লাল হয়ে উঠেছে পূর্বকোণ, দীর্ঘ রাত শেষ হয়ে কলকাতার বুকে এসে পৌঁছল আরও একটি কর্মব্যস্ত দিন। সায়নও যেন ফিরে পেল তার সম্বিত, ব্যস্ত হয়ে বলল, চলো, নীচে চলো, কী আশ্চর্য, সত্যিই না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম রাতটা!

গার্গী বলে উঠল, ঘুমের জন্য অবশ্য একটুও আফসোস নেই আমার। অন্তত একটি রাতের জন্য আমরাও পল আর ভিভিয়েন হয়ে গিয়েছিলাম।

সায়ন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল বারবার, হয়তো তার অফিসের কথা ভেবে। ছাদ থেকে নীচে নামতে নামতে বলল, আজ কিন্তু আমাকে একবার অফিসে যেতেই হবে।

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, এই সারারাত না-ঘুমের পরও!

—কোনও উপায় নেই গার্গী। ভীষণ টেনশনে আছি অফিস নিয়ে। যা ঘটনা ঘটে চলেছে—

নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি কাটাতে এই ভোরেই স্নান সেরে এল গার্গী, তারপর দু'কাপ চা করে ধীর পায়ে চলে এল বাইরের ঘরে। রাখল সেন্টার-টেবিলে। দু'জন মুখোমুখি বসে চায়ের কাপে লম্বা-লম্বা চুমুক দিয়ে শরীর থেকে ক্লান্তি ঝরিয়ে ফেলতে চাইল দ্রুত। তার মধ্যে গার্গী হঠাৎই বলে ফেলল, আচ্ছা, হিমনকে তোমার কীরকম মনে হয়, বলো তো?

—হিমন। কখন যে গার্গী আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে তা মনে করতে পারে না সায়ন। প্রথম দু-একবার কানে লেগেছিল, এখন স্বাভাবিক লাগছে। সব মেয়েদেরই বোধহয় এটা সহজাত। কিছুক্ষণ আনমনা থেকে বলল, আমার তো কিছুই মনে হয় না। একটা জড় বস্তুই যেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলা বলত, যতই ওকে দেখছি, ততই অদ্ভুত লাগছে আমার।

—তাই নাকি? গার্গীর ভুরুতে কোঁচ পড়ে, এরকম বলত নাকি? আশ্চর্য তো। তারপর নিজেই হেসে ফেলল আবার, মনে হওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

সায়ন অবাক হল, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কেন?

—না এমনিই, বলে গার্গী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মনে হচ্ছে, পাশের বাড়ি থেকে সারাক্ষণ কেউ এই ফ্ল্যাটের উপর নজর রাখে।

—তাই? সায়ন আশ্চর্য হল, ঐন্দ্রিলাও কিন্তু ঠিক এরকমই বলত। কিন্তু কে?

—জানি না কে। তোমার মা-ও হতে পারেন। অথবা হিমন। অথবা রবার্ট। যে কেউই আচ্ছা, দীয়া নাকি এ বাড়িতে এখন আর থাকে না?

সায়ন অন্যমনস্ক হয়ে বলল, না।

—কিন্তু কেন?

—কি জানি, সায়ন ঘাড় নাড়তে থাকে, ওদের বোধহয় অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না। অথবা অন্য কোনও কারণেও হতে পারে।

গার্গী গোটা ব্যাপারটা নিয়ে কেন যেন কদিন ধরে ভাবছে। একই বাড়িতে একটি বউ খুন হচ্ছে, অন্য বউ চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। এর মধ্যে কোথাও কি একটা যোগসূত্র আছে?

চায়ের টেবিলেই কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছল সেদিনকার সংবাদপত্র। গার্গী একবুক আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল প্রথম পৃষ্ঠার নীচের দিকে, যেখানে ঐন্দ্রিলা-হত্যাকাহিনীর ঘটনাগুলো ছাপা হয় রোজ। আজ সংবাদপত্র অবশ্য তেমন রসালো করে তাদের বিয়ের খবর লিখতে পারেনি। আলোদার কথাই তাহলে ঠিক। কিন্তু কাগজে জানিয়েছে, ঐন্দ্রিলা হত্যা-রহস্য নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ এমন প্রমাণাদি হাতে পেয়েছে, তাতে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে যে, এই হত্যার পেছনে জড়িত আছে কোনও নারী। তবে কে খুনি তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করতে নারাজ। আরও তদন্ত চলছে।

খবরটা পড়তে পড়তে গার্গীর মুখখানা হঠাৎ কালো হয়ে গেল। বুঝি একটু দিশেহারাও। পুলিশ কি তাহলে তাকেই সন্দেহ করছে! তাকেই! চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাতেই হঠাৎ কেমন তিতকুটে মনে হল চা-টা। কাপটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখল সেন্টার-টেবিলে।

কিন্তু সায়ন খবরটা পড়ে বিড়বিড় করে বলল, রাবিশ! এদের তদন্তের মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সারারাত না-ঘুমের পর গার্গীর অনুরোধ সত্ত্বেও সায়ন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল অফিসে। এখন এই দীর্ঘ দুপুর কীভাবে একা কাটাবে এই ফ্ল্যাটে এমন ভাবনায় যখন জেরবার হচ্ছে গার্গী, ঠিক সে মুহূর্তে ফোন বেজে উঠল তার ঘরে। হয়তো সায়নেরই ফোন ভেবে রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে শুনল, আমি দেবাদ্রি সান্যাল বলছি। আপনাকে আরও একবার ইনটারোগেট করতে চাই। এখনই—

গার্গী সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, এখন তো মিঃ চৌধুরী বাড়ি নেই। অফিসে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধের পর আসবেন।

—মিঃ চৌধুরীকে নয়। আপনাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাচ্ছি। আপনি একা আছেন বলেই। কয়েকমিনিটের মধ্যেই পৌঁছচ্ছি আমরা।

গার্গী তার বুকের ভেতর ধকধক শব্দ শুনতে পেল।
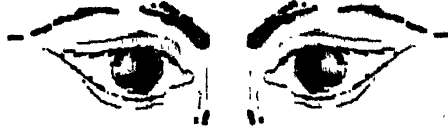
ঐন্দ্রিলা-হত্যার রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে যেমন এক অসম্ভব জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন দেবাদ্রি সান্যাল, তেমনই উৎকণ্ঠায় ডুবে যাচ্ছেন ক্রমাগত। দশ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে তাঁর চাকরির বয়স। এই দশ বছরে কত যে জটিল কেস তদন্ত করতে হয়েছে তাঁকে, আর তা সমাধান করতে গিয়ে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর, মুখোমুখি হয়েছেন কত না বিপদের, তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে এক ভয়ঙ্কর স্টোনম্যানের আতঙ্কে যখন সমস্ত কলকাতা টানটান, তখন কত কত রাত সতর্ক দৃষ্টি ফেলে টহল দিয়ে বেড়িয়েছেন শহরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত অবধি। গত বছর এক ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার তাঁর এলাকায় আত্মগোপন করে আছে খবর পেয়ে তার পেছনে ঘুরেছেন পাক্কা দেড় মাস। তাঁর একজন হায়ার-অফিসার কার কাছে যেন বলেছিলেন, সান্যালের টেনাসিটি বুলডগের মতো।

সেই দেবাদ্রি সান্যালের এবার গ্যালন-গ্যালন ঘাম ঝরে যাচ্ছে এই গৃহবধূ-হত্যার কেসটি তদন্ত করতে গিয়ে। সেই ঘামবিন্দু আরও কিছু ফুটে উঠল আজ এই মুহূর্তে 'ব্লু-ওয়ান্ডার' নামে এই দোতলা বাড়িটির ডোরবেলে হাত দিয়ে। ভেতরে এক চমৎকার জলতরঙ্গের শব্দ।

কেন যেন দেবাদ্রি আজ ভীষণ উত্তেজনায় ভুগছেন। তাঁর উচ্চতা পাঁচ-আটের ওপরে। চমৎকার সুপুরুষ চেহারা, প্রায়শ একটা রোদ-চশমা চোখে লাগানো থাকে বলে বেশ রহস্যময় হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্ব। আপাতত সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রোদ-চশমাটা খুলে নিয়েছেন হাতে। তবু কড়কড়ে ইস্ত্রি-করা ঝকঝকে ইউনির্ফম আর স্মার্ট চেহারার জন্য তাঁর উপস্থিতিই একটা অন্যরকম সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। পুলিশ-ইনস্পেক্টরের চাকরিতে এই ধরনের সপ্রতিভতা, শানিত কথাবার্তা, অনুসন্ধিৎসু চোখ, প্রবল বুদ্ধিমত্তা— সবকিছুরই একান্ত প্রয়োজন। কলকাতার মতো জটিল শহরের ভয়ঙ্কর আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে অনবরত টক্কর দেওয়ার জন্য আরও চাই চিতার মতো ক্ষিপ্রতা, রয়েল বেঙ্গলের মতো সাহস ও ক্ষমতা, বুলডগের মতো টেনাসিটি। প্রায় সবটাই আছে দেবাদ্রির।

কিন্তু এই মুহূর্তে যাকে ইন্টাররোগেট করতে এসেছেন, তার সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর ইতিমধ্যে নিয়ে উঠতে পেরেছেন, তাতে এই যুবতীর দুঃসাহস, চৌখস কথাবার্তা, চালচলন তাঁকেও সমীহ করতে বাধ্য করেছে। জমা হয়েছে যথেষ্ট কৌতূহলও। এমন একজন চৌখস বুদ্ধিমতীর কাছ থেকে কথা আদায় করতে হলে তার ওপর সৃষ্টি করতে হবে এক অপরিসীম চাপ। অপেক্ষা করতে হবে দুর্বল মুহূর্তটির।

ডোরবেলের আওয়াজ শেষ হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর দরজার ওপাশে ছিটকিনি খোলার শব্দ। অন্য পুলিশ অফিসারদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তিনি মাথার টুপিটি খুললেন, তারপর গার্গীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, মে আই কাম ইন, মিসেস চৌধুরী?

—আসুন, বলে গার্গী দেবাদ্রিকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। ড্রইংরুমের সোফায় বসতে বলে সে মুখোমুখি অন্য সোফাটিতে আসীন হল। তাকাল রীতিমতো জিজ্ঞাসু-চোখে।

গার্গীর পরনে হালকা আকাশি রঙের একটি ছাপা শাড়ি, সেই রঙেরই একটি ব্লাউজ। চুল সাধারণভাবে বেণী করা, কপালে ছোট্ট একটি নীল টিপ। দেবাদ্রি নজর চালিয়ে দেখলেন, সিঁথির রেখা বরাবর আজ সরু একফালি সিঁদুর-ঢালা পথ। তাতে কয়েকদিন আগের গার্গীর সঙ্গে আজকের গার্গীর অনেকখানি ফারাক। আজ আরও অভিজ্ঞ লাগছে, একটু অন্যরকম সুন্দরীও। তার চাউনিটিও আজ একটু বেশিই প্রখর। সেই দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে আছড়ে পড়ল দেবাদ্রির ওপর, হঠাৎ কী এমন জরুরি ব্যাপার ঘটল, মিঃ সান্যাল, যে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করার আর তর সইল না আপনাদের?

দেবাদ্রি হাসলেন, পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়-গলা-মুখের ঘামবিন্দুগুলো মুছতে মুছতে বললেন, আসলে প্রশ্নগুলো শুধু আপনাকেই করতে চাই, এবং একদম একা। তাই এমন একটা সময় বেছে নিয়েছি যখন মিঃ চৌধুরী থাকবেন না।

গার্গী কড়া চোখে তাকাচ্ছিল দেবাদ্রির দিকে, হুঁ, তা যে প্রশ্নগুলো আগের বার করেছিলেন, নিশ্চয় সেগুলো আর রিপিট করবেন না?

দেবাদ্রি আবার হাসলেন, মিসেস চৌধুরী, দরকার হলে পুলিশ-অফিসারদের একই প্রশ্ন দশবার রিপিট করতে হয়। তাতে প্রায়ই দেখা যায়, দশবার দশ রকম উত্তর আসছে। অর্থাৎ সত্য ঘটনা গোপন করতে গিয়ে এক-একবার এক-একরকম মিথ্যে বলতে হয় উত্তরদাতাকে। এক মিথ্যা চাপা দিতে গিয়ে আরও হাজারও মিথ্যে বলতে হয়। এভাবেই ধরা পড়ে অপরাধী।

গার্গী মুচকি হেসে বলল, সেভাবেই কি আপনারা আমাকে ধরতে এসেছেন আজ!

—না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা খুঁজে বার করতে আপনার সাহায্য চাইছি। আপনি যে নিরপরাধ সেটা প্রমাণ করার জন্য সত্য ঘটনাটা বলা প্রয়োজন আপনারই। আচ্ছা বলুন তো মিসেস চৌধুরী, আগেরবার আপনি বলেছিলেন, সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই আপনার আলাপ। আপনিই সম্বন্ধ করে ঐন্দ্রিলাদেবীর সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করেছিলেন তাঁর। তাহলে ঐন্দ্রিলাদেবীর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তাঁকেই বিয়ে করলেন কেন?

এহেন সব কূট প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তা যেন জানতই গার্গী, খুব সহজভাবেই উত্তর দিল, প্রায় নির্লিপ্ত গলায়, বলতে পারেন, ইটস জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। নিতান্তই একটি দুর্ঘটনা।

দেবাদ্রি লক্ষ্য করছিলেন গার্গীর নিস্পৃহতা। খুবই শক্ত নার্ভ এই যুবতীর তা জানতেন, এখন মনে হল স্টিলের মতো। সতর্কভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নটি রাখলেন, কিন্তু এই দুর্ঘটনাটি ঘটানোর জন্য কতদিন আগে থেকে আপনারা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, ছমাস, একবছর, নাকি তারও আগে থেকে?

গার্গী অবলীলায় উড়িয়ে দিল দেবাদ্রির প্রশ্ন, সহজভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, কোনও প্রস্তুতিই ছিল না। থাকার কথাও নয়। পরশু সকালেও জানা ছিল না বিয়েটা হয়ে যাবে এভাবে।

দেবাদ্রি হেসে উঠে বললেন, বলছেন একেবারে ধূমকেতুর মতো হঠাৎই?

—হ্যাঁ, তাইই। এখন মনে হচ্ছে, ভালই হয়েছে তাতে। দরকারও ছিল। আপনাদের এবং খবরের কাগজঅলাদের নিত্যনতুন গসিপ রচনা বন্ধ করতে পেরেছি অন্তত।

—কিন্তু তাতে সমস্ত মানুষের সন্দেহের তীর যে আপনাদের দুজনের ওপরই গভীরভাবে ধাবিত হচ্ছে তা কি আন্দাজ করতে পেরেছেন?

গার্গী হেসে ফেলল, দুজনেরই ওপর? তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দেবাদ্রি এবার গম্ভীর হলেন, আমরা কিন্তু এতদিনে নিশ্চিত হয়েছি, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছেন একজন নয়, দুজন। এতদিন সায়ন চৌধুরীই ছিলেন আমাদের ইনভেস্টিগেশনের কেন্দ্রবিন্দু। এখন—

দেবাদ্রিকে থামিয়ে দিয়ে গার্গী হঠাৎ প্রশ্ন করল, আচ্ছা, মিঃ সান্যাল, আউট অব অল পিপল, ঐন্দ্রিলার হত্যাকারী হিসেবে হঠাৎ একমাত্র মিঃ চৌধুরীকেই আপনারা বেছে নিলেন কেন?

—একমাত্র নয়, বলতে পারেন, হি ইজ ওয়ান অব দ্য সাসপেক্টস্। র‍্যাদার, নাম্বার ওয়ান সাসপেক্ট।

যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে জিজ্ঞাসা করি, ওঁকে সাসপেক্ট হিসেবে ভাবার কী কী কারণ খুঁজে পেয়েছেন আপনারা?

দেবাদ্রি তীক্ষ্ণ চোখমুখ করে বললেন, এ তো একেবারে জলের মতো সোজা। মাত্র দুবছর বিয়ে হয়েছে সায়ন চৌধুরীর। এর মধ্যে একাধিক নারী তার জীবনে এসেছে, যাদের কাউকে না কাউকে পাওয়ার জন্য ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করার দরকার হয়ে পড়েছিল তাঁর।

—কিন্তু তিনি তো সে রাতে কলকাতাতেই ছিলেন না।

—একশোবার ছিলেন, মিসেস চৌধুরী। অবশ্য না থাকার অ্যালিবাই হিসেবে তিনি একটি চমৎকার গল্প তৈরি করে শুনিয়েছেন আমাদের, কিন্তু সেটি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্বাসযোগ্য নয়, তার অনেকগুলি প্রমাণও আমাদের হাতে এসেছে।

—কী প্রমাণ? গার্গীকে সামান্য উত্তেজিত দেখায় যেন।

—আমাদের ধারণা, ট্রেনের টিকিটের তারিখ অনুযায়ী তিনি পাঁচুই এপ্রিল সকালেই কলকাতা এসে পৌঁছেছিলেন। সারাদিন হয় বাড়িতেই ছিলেন অথবা অন্য কারও সঙ্গে, সম্ভবত তিনি একজন মহিলাই হবেন, বেরিয়েছিলেন বাইরে। সন্ধের পর বাড়ি ফিরেছিলেন তাঁকেই নিয়ে। গভীর রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কিছু কাজকর্ম করেছিলেন। তারপর ঐন্দ্রিলার সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। সম্ভবত সঙ্গী মহিলার কারণেই। বচসার পরিণতিতেই খুন হতে হয় ঐন্দ্রিলাকে। হত্যাকাণ্ড সারা হলে ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ একটা ফোন যায় থানায়। তাতে জানানো হয়, ঐন্দ্রিলাদেবী খুন হয়েছেন। সে স্বর একটু ফ্যাসফেসে হলেও আমাদের ধারণা তা সায়ন চৌধুরীরই।

গার্গী তার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে, তারপর বলল, কোনও মহিলা তাঁর সঙ্গী ছিল বলছেন? হঠাৎ একজন মহিলার উপস্থিতি সম্পর্কে কী করে নিঃসন্দেহ হলেন?

—কোনও একজন মহিলা যে সে রাতে উপস্থিত ছিলেন, তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে।

—তাই? কাকে সন্দেহ করছেন আপনারা?

দেবাদ্রি আলতো হাসি ঠোঁটের ডগায় ঝুলিয়ে রেখে গার্গীর ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে বললেন, অনেককেই সন্দেহ করছি, কারণ সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে তো অনেক মহিলারই ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ইদানীং। তার মধ্যে প্রথম জন —, দেবাদ্রি ঘাড় নাড়লেন, হুঁ, আপনিই।

গার্গী হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল নিজের ভেতরে, বলে ফেলল, আশ্চর্য আপনাদের কল্পনাশক্তি!

—মোটেই আশ্চর্য নয়। কারণ সায়ন চৌধুরীকে পেতে হলে ঐন্দ্রিলাদেবীকে সরিয়ে দেওয়াটা খুব জরুরি ছিল আপনার কাছে।

—তাই? কিন্তু তা হলে এ কথাটা কেন ভাবছেন না যদি মিঃ চৌধুরীকে বিয়ে করতেই চাইতাম, তবে অনেক আগেই বিয়ে করার সুযোগ ছিল আমার। নিজে উদ্যোগী হয়ে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম না।

দেবাদ্রি হেসে উঠল, বুঝলেন গার্গী দেবী, প্রেমের অঙ্কটা যদি এতই সহজ হত, তাহলে পৃথিবীটা এত জটিল হয়ে উঠত না। দু বছর আগে হয়তো আপনার বা সায়ন চৌধুরীর কারওরই মনে হয়নি যে পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাওয়া দরকার। দু বছরে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। এই দু বছরে আপনারা পরস্পরকে আরও ভালভাবে আরও গভীরভাবে জেনে ফেলেছেন। তারপর একটা সময় এসেছে, যখন কেউ আর কাউকে ছেড়ে থাকতে পারছিলেন না। তখনই দরকার হয়ে ওঠে দুজনের প্রেমের মধ্যে যে বাধা তাকে সরিয়ে দেওয়ার।

—চমৎকার ব্যাখ্যাটি তো আপনার, গার্গী হেসে ফেলল।

—তা ছাড়া, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমাদের হাতে এসেছে। আপনি আগের দিন আমাদের বলেছিলেন, সাধারণত রাত নটা-সাড়ে নটার মধ্যে আপনি বাড়ি ফেরেন। পাঁচুই এপ্রিল অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের দিনও তা-ই ফিরেছিলেন। কিন্তু আপনার দাদার কাছে খবর নিতে যেতে উনি বললেন, আমার বোনের খবর আমি রাখি না। রাত দশটা-এগারোটা-বারোটা যখন খুশি ফেরে ও। আপনার বউদিও তা-ই সমর্থন করলেন। ইদানীং নাকি আপনি বাড়িও ফিরছিলেন না রাতে।

গার্গী বুঝিবা একটু অবাক হল, সে রাতে কিন্তু সাড়ে নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিলাম।

—আমাদের ধারণা অবশ্য অন্য রকম। রাতে বেশ দেরি করেই বাড়ি ফিরেছিলেন। অথবা ফেরেননি তাও হতে পারে। কারণ যে সোসিও ইকনমিক রিসার্চ অকাদেমিতে আপনি কাজ করেন, সেদিন তাদের একটি বিশেষ সমীক্ষার কাজে আপনারা কয়েকজন গিয়েছিলেন তিলজলার কাছে একটা বস্তিতে। ফেরার সময় আপনার এক বান্ধবীর সঙ্গে গড়িয়াহাট থেকে ট্রামে উঠেছিলেন রাত সাড়ে আটটা নগাদ, আপনার নামার কথা ছিল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ক্রশিঙে, সেখান থেকে টালিগঞ্জের ট্রাম ধরবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে আপনি নেমে যান। আপনার বান্ধবীকে বলেছিলেন, বিশেষ দরকারে নামছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিতে পারি, আপনি নিশ্চয় সে রাতে এই শরৎ বসু রোডের অর্থাৎ সায়ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটেই এসেছিলেন, হয়তো সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে সে রকমই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আপনার।

—তারপর আমরা দুজনে মিলে ঐন্দ্রিলাকে—, বলতে বলতে হেসে ফেলল গার্গী, বোধহয় গলাটা ধরেও এল তার। তারপর বলল, আপনাদের ইনভেস্টিগেশনের প্রশংসা

করতেই হয়, মিঃ সান্যাল। এত সব খবর জোগাড় করেছেন?

দেবাদ্রি সান্যালও হাসলেন, করতেই হয়, গার্গীদেবী।

—তাহলে তো দুই মার্ডারারকে পেয়েই গেছেন আপনারা। অ্যারেস্ট করে চার্জশিট দাখিল করে দিন।

এমনই কৌতুক করে সহজ গলায় কথাটা বলল গার্গী যে দুঁদে পুলিশ ইনস্পেক্টর সামান্য থমকে গেলেন। তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, না। সায়ন চৌধুরীর সহযোগী হিসেবে আরও কয়েকজন মহিলাও আমাদের সাসপেক্টের তালিকায় আছেন। তাঁদের গতিবিধিও আমরা খতিয়ে দেখছি।

—যেমন?

—কঙ্কা রায়কেও আমরা ইন্টারোগেট করেছি। ইদানীং তাঁর সঙ্গে সায়ন চৌধুরীর একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। যে কোনও সেমিনারে কিংবা কনফারেন্সে যাওয়ার সময় কঙ্কা রায়কে প্রতিবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন মিঃ চৌধুরী। তাদের দুজনকে যথেষ্ট অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল ইদানীং।

গার্গীর বুকের ভেতরে একটা চিনচিনে ব্যথা গড়িয়ে গেল সহসা। যন্ত্রণা গোপন রেখে সে বলল, তারপর?

—পাঁচুই এপ্রিল কঙ্কা রায়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট-নোটের পৃষ্ঠায় লেখা আছে : টু মিট মাই বস অ্যাট টেন থার্টি। টেন থার্টির পর এ এম বা পি এম কিছুই লেখা নেই। যদি ওটা এ এম হত, তাহলে ডায়েরিতে লেখার দরকারই হত না, কারণ সকাল সাড়ে দশটায় তো এমনিতেই সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে কঙ্কা রায়ের দেখা হওয়ার কথা। নিশ্চয় রাত সাড়ে দশটায় — বলতে বলতে দেবাদ্রি বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নিজের পকেট থেকে বার করলেন তাঁর সিগারেটের প্যাকেট। বেশ দামি সিগারেটের প্যাকেট। তার একটা ঠোঁটে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, উইথ ইয়োর পারমিশান—

— ওহ্, শিওর, গার্গী সপ্রতিভ হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই দেবাদ্রির কথার উত্তরে বলল, ওটা দিন সাড়ে দশটাই হবে। ওদিন সকালেই তো বিলাসপুর থেকে ফেরার কথা ছিল মিঃ চৌধুরীর, তাই-ই। যাই হোক, কঙ্কা রায়ের সঙ্গে তার বসের এতটা ঘনিষ্ঠতা যদি হয়েই থাকবে, তাহলে কার্যসিদ্ধির পর অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলে কঙ্কা রায় চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন?

—কঙ্কা রায় চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে নাকি? তাহলে তো আমার অনুমান মিলে গেল, বলতে বলতে তাঁর হাতের সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন গার্গীর দিকে, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আপনার চলে?

গার্গী একটু কুঁকড়ে গেল, না, না, বলেই সামান্য সময় থমকে গিয়ে পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করল, কী অনুমান মিলে গেল?

—কঙ্কা রায় এতদিন সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছিল কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর যখন সে ভাবতে শুরু করেছে, এবার সায়ন চৌধুরীকে সে পাবে, ঠিক তখনই তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে গার্গী মুখার্জি এসে গেল সায়ন চৌধুরীর জীবনে। অগত্যা কঙ্কা রায়কে তো পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতেই হবে।

গার্গী ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, হুঁ, আর কেউ?

দেবাদ্রি তখন ফের তাঁর পকেট হাতড়াচ্ছেন কিসের যেন খোঁজে, বললেন, আমরা নজর রেখেছি প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায় মজুমদারের ওপর।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, তিনিও?

—হ্যাঁ, ব্যক্তিগত জীবনে খুবই অসুখী মধুমন্তী। অথচ সম্প্রতি, ঐন্দ্রিলা খুন হওয়ার পর ভারী উৎফুল্ল দেখাচ্ছে মধুমন্তীকে। তাঁর সাজপোশাক, চালচলন বদলে গিয়েছে আমূল। আমরা তাঁর গতিবিধির খোঁজ নিতে গিয়ে জেনেছি, পাঁচুই এপ্রিল রাতে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। কোনও একজন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে আউটিঙে গিয়েছিলেন। রাতে ফেরার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ফেলেননি। মধুমন্তীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি মুখে কুলুপ এঁটে আছেন।

গার্গীর মুখটা হঠাৎই কেমন যেন কালো হয়ে গেল। পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। সামান্য অস্পষ্ট গলায় বলল, আর কেউ?

— হুঁ, বলতে বলতে দেবাদ্রি হঠাৎ তাঁর পকেট থেকে অন্য একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন, সে প্যাকেটটা দেখতে একটু অন্য রকম। বললেন, এটা লেডিজ সিগারেট, সঙ্গে রেখেছি অনেক মহিলা পছন্দ করেন বলে, এটা থেকেও নিতে পারেন, ইফ ইউ সো লাইক—

গার্গীকে বেশ বিস্মিত দেখাল, না, না, আমার কখনই এসব অভ্যেস নেই। কেন, হঠাৎ আমাকে দেখে কি আপনার মনে হল, আমি স্মোক করি?

—না, দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের প্যাকেট ঢুকিয়ে ফেললেন পকেটে, আসলে আজকাল কোনও কোনও অভিজাত ঘরের মহিলারা একটু-আধটু স্মোক করেন, তাইই। যাই হোক, আমরা কিন্তু আর একজন মহিলাকেও খুঁজছি। তিনি আলো বোস। এই মহিলার হদিস এখনও আমরা পাইনি। যে ঠিকানা সায়ন চৌধুরী আমাদের দিয়েছিলেন, চার-পাঁচদিন আগে সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেছি, অনেকদিন ধরে তালা বন্ধ হয়ে রয়েছে বাড়িটা। বাড়িটা জনৈক এ এম বোসের। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর নাম শুনলাম সুচন্দনী, আলো নয়। নতুন বাড়ি করে এসেছেন ওঁরা। আশেপাশের লোক ভাল করে বলতেও পারল না কেউ—

এবার প্রবল কৌতুকে, যেন ভীষণ মজা পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে খিলখিল করে হেসে উঠল গার্গী, হাসতে হাসতেই বলল, দারুণ জমেছে তো ব্যাপারটা!

দেবাদ্রি গার্গীর এই অকারণ হাসির কোনও অর্থ খুঁজে পেলেন না, তবে সামান্য অপ্রতিভ হলেন, কিন্তু নিখুঁতভাবে মনে-মনে নোট করে নিচ্ছিলেন গার্গীর মুখের অভিব্যক্তি। গার্গীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করাই তো তাঁর প্রতিটি সংলাপের উদ্দেশ্য। চাপের পর চাপ সৃষ্টি করছেন তাঁর উপর। কিন্তু একটি কথাও বেরুচ্ছে না। কিন্তু কথা তো বার করতেই হবে। এবার কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তাঁর মোক্ষম যুক্তিটি ছাড়লেন, আসলে আমার সন্দেহের তালিকায় যে সব মহিলারা আছেন, তাঁদের কেউ স্মোক করেন কি না বাজিয়ে দেখছি। কারণ ঐন্দ্রিলাদেবীর মৃত্যুর পর যখন আমরা তাঁর ঘরে ঢুকি, তখন ড্রইংরুমের অ্যাশট্রেতে একটা আধপোড়া সিগারেট দেখতে পাই। সারপ্রাইজিংলি ইট ওয়াজ আ লেডিজ সিগারেট। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ঐন্দ্রিলাদেবীর সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস ছিল না। সে জন্যেই

আধপোড়া সিগারেট পেলাম, কিন্তু সিগারেটের প্যাকেট ছিল না। অর্থাৎ সিগারেট খেয়েছিলেন অন্য মহিলা, যিনি সেদিন রাতে এই ফ্ল্যাটে ছিলেন। প্যাকেটটি ছিল তাঁর ব্যাগে। হত্যার পর ব্যাগ নিয়ে সরে পড়েছিলেন বলেই প্যাকেট পাওয়া যায়নি।

—ও, গার্গী অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তাই আপনি বার বার সিগারেট অফার করছিলেন?

—হ্যাঁ, দেবাদ্রি তাঁর কণ্ঠস্বর এবার ঘন করলেন, যাঁদের আমরা সন্দেহ করছি, তাঁদের মধ্যে সেদিন রাতে যাঁর নির্বিঘ্নে ঐন্দ্রিলাদেবীর সঙ্গে থাকার সম্ভাবনা, তিনি হলেন আপনিই—

কয়েক ঘণ্টা হল এক নতুন ভূমিকা পালন করতে ব্লু-ওয়াভারে প্রবেশ করেছে গার্গী, এরই মধ্যে তার ওপর এক প্রলয় বয়ে চলেছে যেন। দুঁদে পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল, তিনি জানেন স্টিলের মতো শক্ত নার্ভকেও কীভাবে ব্লাস্ট-ফার্নেসে ফেলে গলিয়ে ফেলতে হয়। সেরকমই বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে এই সদ্য-বিবাহিতা যুবতী এমনই ভেবেছিলেন, কিন্তু গার্গী বোধহয় অন্য ধাতুতে তৈরি। বরং সুপুরুষ পুলিশ অফিসারটির চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, তাহলে এই জটিল কেসটির স্কেপগোট হিসেবে এক সায়ন চৌধুরী আর গার্গীকেই বেছে নিয়েছেন, মিঃ সান্যাল?

দেবাদ্রি হাসলেন, না, আমি আগেই বলেছি। মিঃ চৌধুরী হলেন নাম্বার ওয়ান সাসপেক্ট। আমাদের তালিকায় যিনি নাম্বার টু, তিনি হলেন রবার্ট ও'নীল।

—তাই?

—হ্যাঁ, আমরা জানতে পেরেছি, কোনও একজন পুরুষ মাঝেমধ্যে ঐন্দ্রিলার কাছে এমন সময়ে আসতেন, যখন তিনি একা থাকতেন। আমাদের ধারণা, তিনি রবার্ট ও'নীল হওয়াই সম্ভব। কারণ তাঁর অন্যতম হবিই হল, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া। হয়তো ঐন্দ্রিলা তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। তারপর নিশ্চয়ই সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবার্ট তার শিকারকে সহজে হাতছাড়া করে না, এমন আরও অসংখ্য যুবতী তার কামনার শিকার হয়েছে, তাইই শেষপর্যন্ত প্রাণ দিতে হল ঐন্দ্রিলাকে। এ-ব্যাপারে তাঁর মহিলা সহযোগী হিসেবে চন্দ্রাদেবীর কথাই ভেবেছি আমরা।

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, চন্দ্রাদেবীর মোটিভ?

—রবার্টের সঙ্গে ঐন্দ্রিলার এই ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয়ই চন্দ্রাদেবীর নজরে পড়ে থাকবে। চন্দ্রাদেবী একজন জবরদস্ত জাঁহাবাজ ধরনের মহিলা। তাঁর চরিত্রের সুনাম কোনও কালে ছিল না, এখনও নেই। স্বামীর জীবিতকালেই ব্যভিচার করেছেন যে পুরুষের সঙ্গে, সে এখন ঐন্দ্রিলার সাহচর্য পাচ্ছে তা নিশ্চয়ই মেনে নিতে পারবেন না। এমনিতেই তাঁর ধারণা ঘরের বউরা তাঁর হুকুমমাফিক চলবে। দীয়ার ওপর হুকুম চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন এর আগে—

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, ব্যর্থ?

—হ্যাঁ, আপনিও বোধহয় জানেন না। দীয়া ইতিমধ্যে ডিভোর্সের নোটিস দিয়েছেন।

গার্গী জানত না। নড়েচড়ে উঠে বলল, তাই নাকি?

—ইয়েস, দীয়া অনেকদিন ধরেই এ বাড়িতে ঠিকমতো থাকে না। কখনও দুপুরে আসে, বিকেলেই চলে যায়। কখনও সকালে আসে, দুপুরের আগেই চলে যায়। কখনও চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে চলে আসত ঐন্দ্রিলার কাছেও। দু-এক ঘণ্টা সুখদুঃখের কথা বলে চলে যেত ফের। তাই দীয়ার ওপর একটা আক্রোশ ছিল চন্দ্রাদেবীর। তখন তিনি ভেবেছিলেন, ঐন্দ্রিলা নরমসরম মেয়ে, সে অন্তত তাঁর কথা শুনবে। সায়নের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না থাকলেও ঐন্দ্রিলার ওপর হুকুম চালানোর চেষ্টা করেছিলেন প্রথম প্রথম। কিন্তু সায়নের নির্দেশে ঐন্দ্রিলাও কখনও ঘেঁসেনি চন্দ্রাদেবীর কাছে। সেই রাগ, উপরন্তু রবার্টের সঙ্গে ঐন্দ্রিলার ঘনিষ্ঠতা তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল।

—বাহ্, গার্গী যেন খুব তারিফ করল দেবাদ্রির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণে, তারপর বড় বড় চোখ করে বলল, আর কেউ?

—হিমনের নামও আমাদের তালিকায় আছে। হয়তো রবার্ট নয়, চন্দ্রাদেবী হিমনের সাহায্যেই ঐন্দ্রিলাকে —, বলতে বলতে থামলেন দেবাদ্রি, তারপর আবার বললেন, হিমন, অন্য কোনও কারণেও এ কাজ করতে পারে। তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আমরা জানতে পেরেছি, তার এক বান্ধবী আছে, চেন-স্মোকার, কলকাতার এক নামী হোটেলে নাচে। স্মোকার বলেই তার খোঁজ করছি আমরা। তার পেছনে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে হিমনের। হয়তো টাকার জন্যেও—

—বাহ্, আর কেউ?

দেবাদ্রি তাঁর যুক্তিতে, বিশ্লেষণে ভারি তৃপ্ত, আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, আপাতত এইই ঢের। তবে আরও তদন্ত চলছে, বলে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন এতক্ষণ কার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন এই ভেবে। তিনি এসেছিলেন গার্গীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। গার্গী তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কখন যে সে-ই পালটা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে দেবাদ্রিকে, তা খেয়াল করতে পারেননি। বোধহয় আনমনে নিজের যুক্তিজালকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন আলোচনার মধ্যে। যে আলোচনা কোনও হায়ার অফিসার কিংবা সহকর্মীর সঙ্গে করার কথা, তা কিনা করে বসলেন এই মামলার অন্যতম সন্দেহভাজনের সঙ্গে! চিন্তাটা মাথায় রোল করতেই সোফা থেকে উঠতে চাইলেন হঠাৎ, ঠিক আছে, মিসেস চৌধুরী, তাহলে আজ—

—বসুন, গার্গী এতক্ষণে নিজেকে যেন প্রস্তুত করে নিয়েছে মনে মনে। আরও শক্ত দেখাচ্ছে তার চোখমুখ, আপনার সন্দেহের তালিকায় লাইম ইন্ডিয়ার কেউ নেই? দুই কোম্পানির বহু মানুষই তো পরস্পরের শত্রু, এঁদের মধ্যে কারও পক্ষে ষড়যন্ত্র করে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়ে দেওয়াও তো অসম্ভব নয়।

—হ্যাঁ, সে সম্ভাবনাও মাথায় আছে আমাদের। কিন্তু কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও হাতে আসেনি। প্রমাণ না থাকলে তাকে মামলায় জড়ানো যায় না।

—ও, কিন্তু প্যারাডাইস প্রোডাক্টসে এতসব স্যাবোটেজ হচ্ছে —, প্রথমে মেসিন বার্স্ট

করল, তারপর গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি গেল না বিদেশে, তার কোনও কারণ খুঁজে বার করলেন না?

—না, দেবাদ্রি ঘাড় নাড়লেন, এগুলো সবই আমাদের মনে হচ্ছে, সায়ন চৌধুরীর গট-আপ কেস। ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সযত্নে গার্ড করছেন উনি, যাতে কারও কোনও ক্ষতি না হয়। তাতেই ধারণা হচ্ছে—

এতক্ষণ বেশ সহজ, স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছিল গার্গী। কখনও তার কণ্ঠস্বরে উপচে পড়ছিল শ্লেষ, কখনও কৌতুকও, হঠাৎ বেশ শক্ত হয়ে গেল যেন, দেবাদ্রির আত্মতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলেন মিঃ সান্যাল, আপনাদের মনে প্রথম থেকেই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে সায়ন চৌধুরীই হত্যাকারী, তাই চারপাশে আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে সেগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আপনার কেস এমনভাবে সাজাচ্ছেন যাতে আপনাদের ধারণাটাই কোর্টে বহাল থাকে।

দেবাদ্রি মুচকি হেসে বললেন, আপনার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

—হওয়ার তো কথাই। কারণ তদন্ত যে ভুলপথে চলছে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। সমস্ত ব্যাপারটার আরও গভীরে ঢুকতে হবে। আরও বহু তদন্ত বাকি। সমস্ত ঘটনা না খতিয়ে দেখে আপনি শুধু টার্গেট করেছেন সায়ন চৌধুরী আর এই গার্গীকে। বন্যার রচনা পড়েছে পরীক্ষায়, আপনারা ঘুরেফিরে সেই গরুর রচনা লিখতে বসেছেন।

দেবাদ্রি সান্যালের মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠল। বিস্মিত হচ্ছিলেন গার্গীর সাহস ও স্পর্ধা বিবেচনা করে, বললেন, সে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমাদের ভাবতে দিন।

গার্গী আরও শক্ত হয়ে বলল, ভুল বললেন, মিঃ সান্যাল। আমাদেরও ভাবতে দিতে হবে। আপনি বিনা তদন্তে আমাদের অভিযুক্ত করছেন। অত্যন্ত অন্যায়ভাবেই। তা মেনে নেওয়া যায় না।

দেবাদ্রি সান্যাল হঠাৎ রেগে উঠলেন, আপনি আপনার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন কিন্তু। আমরা ঘটনার প্রতিটি পদক্ষেপ নোট করে যাচ্ছি। ভুল কি ঠিক, তা কোর্টেই প্রমাণিত হবে।

—কিন্তু নোট করাই সার হচ্ছে, বলতে বলতে বাঘা পুলিশ ইন্সপেক্টরের রোষদীপ্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল গার্গী, এত সহজে উত্তেজিত হলে কি চলে মিঃ সান্যাল। আপনি আমাদের খুনের আসামি বানাতে চাইছেন! আর তা নির্বিবাদে আমরা হজম করে নেব বলতে চান! দরকার হলে আমাদেরই উদ্যোগী হয়ে খুঁজে বার করতে হবে হত্যাকারীকে।

—কী বলতে চাইছেন আপনি?

গার্গী গম্ভীর হয়ে বলল, বলতে চাইছি, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র আছে। আপনারা ধরতে পারছেন না।

—আছে নাকি? দেবাদ্রি অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, তাহলে দেখুন তদন্ত করে—

বলতে বলতে উঠে পড়লেন সোফা থেকে, দরজার বাইরে বেরিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি তদন্ত করুন, আবার দেখা হবে।

গার্গী হাসি-হাসি মুখে বলল, হবে তো নিশ্চয়ই। যখন কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন ঠিক করেই ফেলেছেন।

দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর দলবল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর এতক্ষণে অবসন্ন বোধ করল গার্গী। কাল রাতে ঘুম হয়নি, আগের দিনও প্রবল টেনশনে কেটেছে। তার উপর পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে যেরকম ঝড় তুলে গেলেন তার ভিতরে, এখন আর দাঁড়ানোর ক্ষমতাই নেই যেন। তবু ক্লান্ত ক্ষুব্ধ শরীরে সে আবারও ভাবতে চাইল গোটা ব্যাপারটা। অভিমন্যুর মতো সে ঢুকে পড়েছে এই জটিল ঘটনার মধ্যে। তাকেই এখন বেরুবার পথ ভাবতে হবে। বেশ কৌতুকও অনুভব করল এই ভেবে যে, দেবাদ্রি সান্যাল এসেছিলেন তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে, উল্টে সে-ই প্রায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে পুলিশ-কর্তৃপক্ষকে। এখন তার সামনে বিশাল দায়িত্ব।

তখনও মধ্য দুপুর গড়ায়নি। বাইরে ঝমঝম করছে বৈশাখের গা-ঝলসানো রোদ্দুর। এ হেন দাবদাহের দিনে গার্গীর সমস্ত শরীর জুড়ে এল একগলা জ্বর। গতকাল অসম্ভব এক ঘোরের ভেতর তাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন আলোদা, তারপর থেকেই তুমুল ঝড়ের ভেতর উথালপাথাল হচ্ছে ক্রমাগত। এই জটিলতার ভেতর এক অত্যাশ্চর্য বাসর জাগার স্মৃতি কাল তাকে উপহার দিয়েছে সায়ন। সে স্মৃতি জুড়োতে না জুড়োতেই পুলিশের উপদ্রব। উত্তেজনার মধ্যে যেভাবে সে কড়কে দিয়েছে দেবাদ্রিকে, চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে পুলিশের তদন্তকে, এখন বুঝে উঠতে পারছে না সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা কি সত্যিই তার পক্ষে সম্ভব'

একটু থিতু হতেই সে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ঐন্দ্রিলার ব্যবহৃত ঘর। এ ফ্ল্যাটের সর্বত্রই ঐন্দ্রিলার স্মৃতি। সে স্মৃতি সহসা সহস্র চক্ষু মেলে ঘিরে ধরল তার সমগ্র অস্তিত্ব। ঐন্দ্রিলার হত্যাকারী কে, তা যদি খুঁজে বার করতেই হয়, তাহলে এর পর প্রতিটি মুহূর্ত সন্ধানী হয়ে উঠতে হবে তাকে। মুখোমুখি হতে হবে আরও অনেক বিপদের। জটিল হয়ে উঠবে জীবনযাত্রা।

কোথায় ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীরটা পাওয়া গিয়েছিল, কীভাবে শোয়ানো ছিল, তা সায়নের কাছ থেকে এর মধ্যে জেনে নিয়েছিল গার্গী। এখন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল সেই জায়গাটা। ঘরের চারপাশে ঐন্দ্রিলার স্মৃতিবহ জিনিসপত্র। তার ব্যবহৃত শাড়িগুলো এতদিনেও রয়ে গেছে আলনায়। ড্রেসিং টেবিলের ওপর তার বাঁধানো ছোট্ট ছবি, বিয়ের রাতে তোলা। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সায়ন আর ঐন্দ্রিলার একসঙ্গে তোলা ছবি। সারা ঘরেই তার একটা নিঃশব্দ উপস্থিতি।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই গার্গী চলে এল দেওয়াল আলমারিটার কাছে। ভেতরে কিছু বই, সবই বাংলা গল্প-উপন্যাস, গার্গী জানে এগুলো ঐন্দ্রিলারই। কৌতূহলবশত আলমারিটা খুলে ফেলল সে। ভেতরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই তার হাতে উঠে এল একটা বাঁধানো খাতা। খাতাটা খুলতেই সে অবাক, বস্তুত সে যা আশা করছিল তাইই। খাতাটা ঐন্দ্রিলার সেই ফরাসিভাষা শেখার প্রমাণপত্র। খুব বেশিদিন পড়ার সুযোগ ঘটেনি বেচারির। তার বাবা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মেয়ের এই অদ্ভুত ইচ্ছেটি।

ফরাসিভাষা গার্গীর কাছে অবশ্যই গ্রিক কিংবা ল্যাটিনের মতোই দুর্বোধ্য। পৃষ্ঠা ওলটাতে

ওলটাতে শুধু যা চমকে দিল তাকে তা হল, খাতার ভেতরে লেখা একটি নাম, রৌণক মুখার্জি, তার পাশে লেখা একটি টেলিফোন নম্বর। খুদে খুদে অক্ষরে লেখা, প্রায় পড়া যায় না এমন, তবু তা গার্গীর কাছে এই মুহূর্তে এক বিশালপ্রাপ্তি। হতবাক হয়ে সে ভাবল, তাহলে এই রৌণকই কি সেই রুনু, রুনু মুখার্জি! ঐন্দ্রিলার সেই রুনুদা? রুনুদাকে কখনও দেখেনি গার্গী, কিন্তু ঐন্দ্রিলা দু-একবার তার কাছে বলেছিল রুনুদার কথা, বিয়ের অনেক আগে। তার কথা বলতে বলতে প্রায়ই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত ঐন্দ্রিলা। গার্গী একদিন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী রে, তুই কি ওর প্রেমে পড়েছিস? ঐন্দ্রিলা হাসত, না রে, ওর একজন প্রেমিকা আছে, সে নাকি ভারি মিষ্টি। গার্গী বিস্মিত হয়েছিল, সে কী! তোর চেয়েও মিষ্টি? ঐন্দ্রিলা কিছু বলত না, কিন্তু কেমন বিষণ্ণ, মেঘলা হয়ে উঠত তার মুখ। গার্গী পরে অবাক হয়েছিল এই খবর পেয়ে যে, সেই রুনুদাই ঐন্দ্রিলাকে প্রেমপত্র লিখেছিল ফরাসিভাষায়। কী অদ্ভুত মানুষ!

আজ সকালেও একবার সায়ন জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি জানো গার্গী, রুনু কে? গার্গী আবার মাথা ঝাঁকিয়েছিল, না। তবে সেসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কীই বা লাভ এখন। আসলে সুন্দরী মেয়েদের অনেক প্রেমিক থাকে, থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেই মেয়ে কারও প্রেমিকা ছিল কি না সেটাই বিবেচ্য। আমি জানি, ঐন্দ্রিলা কারও প্রেমিকা ছিল না।

এরকম বলেছিল বটে গার্গী, কিন্তু সে জানত, ঐন্দ্রিলা মনে মনে দারুণ পছন্দ করত তার রুনুদাকে। ফরাসিভাষা শেখা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সে যত না অখুশি হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের ঢের মনমরা হয়েছিল রুনুদার কাছে তার যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই কি বন্ধ হয়েছিল মেলামেশা? নাকি গোপনে তার যোগাযোগ ছিল রুনুদার সঙ্গে! তবে কি বিয়ের এতদিন পরেও সে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি? রুনুদাই কি তাহলে মাঝেমধ্যে এ বাড়িতে যাতায়াত করত সায়নের অনুপস্থিতির দিনগুলোতে? তা কি আদৌ সম্ভব?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল গার্গী। ফোনের নম্বরটি দেখে খুবই ইচ্ছে হল ডায়াল ঘুরিয়ে একবার বিষয়টি পরখ করতে। কে রৌণক মুখার্জি? ঐন্দ্রিলার সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী ছিল এতদিন? কতদূর গভীরে সেই সম্পর্কের শিকড়!

এমন নিবিড় ভাবনার আবর্তে ওতপ্রোত হয়ে কখন যে সে ডায়াল ঘুরিয়েছে তা মনে নেই। ওপাশ থেকে সুরেলা নারীকণ্ঠে যে শব্দটি ধ্বনিত হল তা শুনে প্রায় ছিটকে উঠল গার্গী।

—ইয়েস, লাইম ইন্ডিয়া—

লাইম ইন্ডিয়া! এটা কি লাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ফোন-নম্বর? তাহলে কি রৌণক মুখার্জির নম্বর নয়? ভাবতে ভাবতে গার্গী পরবর্তী প্রশ্ন করে ফেলল, এখানে রৌণক মুখার্জি কেউ আছেন?

—প্লিজ হোল্ড অন—, বলতে বলতে টেলিফোন অপারেটার লাইন সংযোগ করে দিল অন্য ঘরে। পরমুহূর্তে ভারী পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল রিসিভারে, রৌণক মুখার্জি স্পিকিং—

গার্গী চমকে উঠে পট করে রেখে দিল রিসিভারটা। তার বুকের ভেতর একঝলক রক্ত ছলাত করে উঠল যেন। রৌণক মুখার্জি তাহলে লাইম ইন্ডিয়ায় কাজ করে? তার সঙ্গে এতকাল এক গোপন সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে ঐন্দ্রিলা? কিন্তু কেনই বা? তার মূলে

কি শুধুই প্রেম? আর সেই যোগাযোগ বজায় রাখার কারণেই কি শেষপর্যন্ত তাকে প্রাণ দিতে হল! নাকি অন্য কোনও গভীরতর কারণ? যার শিকড় নিহিত আছে লাইম ইন্ডিয়া আর প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের পারস্পরিক বিদ্বেষ, অসূয়া, প্রতিযোগিতা!

সারাটা দুপুর এমন অজস্র প্রশ্নে তোলপাড়, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল গার্গী। কোথায় যে এই রহস্যের শিকড় তার থই পেতে গিয়ে সে নিজেই হারিয়ে ফেলল ভাবনার যোগসূত্র। ভীষণ একা লাগছিল তার। অফিসে যাওয়ার মুহূর্তে সায়নকে বারবার বলে দিয়েছিল সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে। কিন্তু সায়ন একবার অফিসে গেলে বোধহয় বাড়ির কথা মনে রাখতে পারে না। বারতিনেক টেলিফোন করার পর ফিরে এল সাড়ে সাতটা নাগাদ। কিন্তু তখন সে ভীষণ চিন্তাক্লিষ্ট। বুঁদ হয়ে কিছু যেন ভাবছে। গার্গী বারবার জিজ্ঞাসা করল, নতুন কোনও সমস্যা হয়েছে?

সায়ন ঘাড় নাড়ল, তেমন কিছু নয়। তবে সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে।

নটার মধ্যেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে বলল, আজ আমাদের কালরাত্রি, খেয়াল আছে তো? রাতে কেউ আর কারও মুখ দেখব না। তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি ল্যাবরেটরি ঘরে যাচ্ছি। নতুন একটা ফর্মুলা বার করতে হবে। পুরনো প্রোডাক্টের সেল ফল করেছে। অতএব নতুন প্রোডাক্ট বাজারে না ছাড়লে প্যারাডাইস আর স্বর্গ থাকবে না, ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। ব্যাপারটা তুমি বুঝবে আশা করি। কাজ শেষ হলেই ওখানে যে কটটা পাতা আছে, তাতেই শুয়ে পড়ব। কাল সকালে আবার দেখা হবে—

বলেই গার্গীকে কথা বলার কোনও সুযোগ না দিয়ে সে ল্যাবরেটরি ঘরের তালা খুলে ঢুকে পড়ল তার ভেতর। ভেতরে প্রশস্ত ঘর, অনেক র‍্যাক, বইপত্র, টেস্টটিউব, ফানেল, বিকার, কেমিক্যালের স্তূপ। খুবই অগোছালো। ঐন্দ্রিলাও নাকি কখনও ঢুকত না ও ঘরে। সায়ন তার ভেতর ঢুকে, 'গুডনাইট' বলে দরজা বন্ধ করে দিল আচমকা।

সমস্ত ব্যাপারটা এমন দ্রুত, প্রস্তুতিবিহীনভাবে ঘটে গেল যে গার্গী হকচকিয়ে গেল। আলো না নিবিয়ে অনেকক্ষণ একা বসে রইল বিমূঢ় হয়ে। যত দেখছে সায়নকে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। প্রথম রাত জেগে কাটাল বাসর-জাগার মতো। দ্বিতীয় রাত কালরাত্রি। এ পর্যন্ত একবারও সে তার কামনার বাঁধ ভেঙে গার্গীর হাতটা পর্যন্ত ছোঁয়নি। ভারি অদ্ভুত আর অন্যরকম পুরুষ। হয়তো ঐন্দ্রিলার স্মৃতিই তাকে আড়ষ্ট অসহায় করে রেখেছে। এ সায়নকে গার্গী চেনে না। অফিস থেকে আজ ফেরার পর ভারি অন্যমনস্ক আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছিল তাকে। তার কোম্পানির সেল দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। যে কলঙ্ক তার চরিত্রে লেগে গেছে, তা ছুঁয়ে ফেলেছে তার কোম্পানিটিকেও। পরপর নানারকম বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পড়ে তার কোম্পানির কর্মীরাও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সায়নের সঙ্গে সহজ হয়ে কথাই বলতে পারছে না কেউ। তাদের আচার-আচরণ দেখে সায়নও হতাশ, বিষাদে ডুবে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে অন্য নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে না ছাড়লে কোম্পানির সামনে সমূহ বিপদ। গতরাত জেগে কাটিয়েছে সায়ন, হয়তো আজও জেগে কাটাবে।

কিন্তু গার্গী এই বন্ধ ঘরে একা-একা সারারাত কাটাবে কী করে! চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো ঐন্দ্রিলার স্মৃতি তাকেও বারবার বিহ্বল করে তুলছে। এ কদিন কী এক প্রবল ঘোরের ভেতর বাস করছিল, হঠাৎ আজ এ বাড়িতে এসে চমকে চমকে উঠছে বারবার। কিছুক্ষণ

স্পন্দনহীন বসে থাকতে থাকতে তার হঠাৎই মনে হল সে যেন ঐন্দ্রিলার গলা শুনতে পেল, কী রে মিতুন, তুই এখনও বাড়ি যাসনি। অনেক রাত হয়ে গেল যে!

গার্গী শিউরে উঠে আশেপাশে তাকাল। না, কেউ কথাটা তাকে বলেনি। তার অবচেতন মন থেকেই উঠে এসেছে বাক্যটি। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল তার। সেই মুহূর্তে কেউ তাদের ফ্ল্যাটের দরজায় বেল টিপল, টিঙ নানা, টিঙ নানা, টিঙ নানা, টিঙ—

গার্গী চমকে উঠল, ভয়ও পেয়ে গেল খুব। রাতের এমন নিশুতি প্রহরে তাদের ফ্ল্যাটে আবার কার আগমন! সায়নের কোনও পরিচিত লোকজন, অথবা গার্গীর চেনাজানা কেউ! দ্রুত উঁকি দিয়ে দেখল, ওদিকে ল্যাবরেটরি ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। এক-লহমা দাঁড়িয়ে ভাবল, সায়নকে ডাকবে কি না, কিন্তু সায়ন বলে গেছে, আজ কালরাত্রি, আজ সে গার্গীর মুখ দেখবে না। তাহলে কী করবে সে? কী করা উচিত, এমন ভাবতে ভাবতে আবার বেল বাজার শব্দ, টিঙ নানা, টিঙ নানা, টিঙ নানা, টিঙ—

কোনও দিশে না পেয়ে গার্গী দ্রুত গিয়ে তাদের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল। আর বাইরের আবারও চমকে উঠল সে।

দাঁড়িয়ে রয়েছে রবার্ট। রবার্ট ও নীল।

এত রাতে রবার্ট ও নীল এ-ফ্ল্যাটে কেন?

দরজার বাইরে রবার্ট ও নীলকে দেখার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না গার্গী। একমুখ দাড়িগোঁফের জঙ্গলে মৃদু মৃদু হাসছিলেন রবার্ট, গার্গীকে দেখে বললেন, তোমাদের বিয়েতে শুভকামনা জানাতে এলাম—

গার্গী বিস্ময়ে তখনও থ। এক প্রবল টেনশন ক্রমশ চারিয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত শরীরে। শ্মশ্রুগুম্ফময় এই যুবকপ্রতিম বিদেশিটিকে সে অনেকবার দেখেছে এ বাড়িতে। যখনই গার্গীর দিকে তাকিয়েছেন এরকমই এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি মাখানো থাকত তার মুখে। কখনও কোনও কথা হয়নি, তবু বলা যায় তারা পরস্পরের পরিচিতই। মানুষটিকে যত না দেখেছে গার্গী, শুনেছে তার চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু অনেককিছু হয়তো না-শোনাও আছে এখনও।

গার্গীর আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই রবার্ট ও নীল সোজা ঢুকে এলেন তাদের ড্রইংরুমে, বললেন, হোয়ার ইজ দ্যাট ব্রাইডগ্রুম? কাউকে কিছু বলা নেই, নিমন্ত্রণ নেই, হঠাৎ চুপিচুপি বিয়ে করে ফেললে, তাও জানতে হল খবরের কাগজ পড়ে, এ আবার কীরকম কাণ্ড! উই শ্যুড্ সেলিব্রেট সাচ অকেশন।

এতক্ষণে চোখে পড়ল গার্গীর, তাঁর হাতে একটা ফুলের বোকে, ঢাউস সাইজের, তার ভেতর উপচে পড়ছে লাল-হলুদ-সবুজের উম্‌সুম্ সৌন্দর্য।

ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছিল গার্গী, ঠিক বুঝতেও পারছিল না রবার্টের হঠাৎ উদয় হওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী! অথচ রবার্ট এমনভাবে কথা বলছেন, এত স্বাভাবিকভাবে, যেন এ ফ্ল্যাটে তাঁর দীর্ঘদিনের যাতায়াত। ঐন্দ্রিলার কাছেও এভাবে হুটহাট চলে আসতেন নাকি! লম্বা চুরুটটি এক-একবার মুখে দিচ্ছেন, আবার নামিয়ে নিচ্ছেন পরক্ষণেই। গার্গী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ও তো ল্যাবরেটরি রুমে, কী সব কাজ করছে।

রবার্ট বিস্মিত হয়ে বললেন, মাই জেসাস! বিয়ের পরদিন নতুন যুবতী বউকে একা এ ঘরে রেখে দ্যাট চাইল্ড ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ করতে ঢুকেছে! অ্যাম আই টু বিলিভ দিস! কল্ হিম—

'কল্ হিম' শব্দদুটোয় বেশ আদেশের সুর জড়ানো, ধমকই বলা যায়, অথচ তার মধ্যে একটা স্নেহের স্বরও মিলমিশ।

গার্গী কী করবে ভেবে পেল না। এক অদ্ভুত উত্তেজনায়, তীব্র শিরানিতে বুকের ভেতরটা কাঁপছে তার। সায়নকে ডাকবে কি ডাকবে না এই দোলাচলে কিছুক্ষণ টালমাটাল হল। সায়ন যখন ল্যাবরেটরিতে থাকে, তখন সে দারুণ আত্মমগ্ন, নিবিষ্ট, তাকে ডাকবার হুকুম নেই। রাতের বেলা কাজ করতে করতে নাকি ভোর করে ফেলে প্রায়শ। রাতে অবশ্য কখনও তাকে ল্যাবরেটরি রুমে দেখার সৌভাগ্য হয়নি গার্গীর, দিনের বেলাতেই দেখেছে। সে তখন এমন আচ্ছন্ন, বুঁদ হয়ে থাকে কাজের ভেতর যে, অনেকসময় ডেকেও সাড় ফেরাতে পারেনি তার। একটু আগেই দুবার ডোরবেল বাজানোর শব্দ হয়েছে, শুনেছে কি শোনেনি কে জানে, দরজা খোলেনি সে। বাধ্য হয়ে মাথা নিচু করে গার্গী বলল, ও বলছিল, আজ কালরাত্রি।

কালরাত্রি! একমুহূর্ত থমকালেন ও'নীল, তারপর হঠাৎ হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন, কালরাত্রি! দ্য আইডিয়া! ছেলেটা তো লেখাপড়া, ল্যাবরেটরি আর তার কোম্পানি নিয়েই মেতে থাকত জানতাম, এসব সামাজিক রীতি-আচার সম্পর্কেও যে ওয়াকিবহাল তা তো বুঝতে পারিনি, ইটস রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ!

বলে আর একদফা হো হো করে হাসতেই গার্গীর বুকের ভেতর বিদ্যুৎ খেলা করে গেল যেন। সে বুঝতে পারছে না, সায়ন কেন তার ল্যাবরেটরি-রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে না। এখন রাত্রি অনেক, চারপাশ সুনসান, তার মধ্যে রহস্যময় বিদেশি মানুষটির এমন বুক-কাঁপানো হাসি শুনে তার এখন ভয়ঙ্কর দিশেহারা অবস্থা।

পরক্ষণেই রবার্ট আবার বললেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন সারারাত ধরেই কি ল্যাবরেটরিতেই কাটাবে নাকি? সেদিন পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল বললেন, মার্ডারের পরদিন ভোরবেলা এসে তারা ল্যাবরেটরি রুমের মেঝেয় বহু কাগজপত্র ছড়ানো-ছিটানো দেখতে পেয়েছিলেন। টেবিলের ড্রয়ার খোলা, তার ভেতরও সব কাগজ ওলটপালট। সে নাকি এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই নাকি? হঠাৎ ল্যাবরেটরি রুমের কাগজপত্র কার দরকার পড়ল?

—কে জানে কার দরকার? সেজন্যই বোধহয় সে রাতে পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স থেকে ফিরে অত রাতে ল্যাবরেটরি রুমে আলো জ্বলতে দেখেছিলাম আমরা। বলতে বলতে তাঁর কোটের পকেট থেকে যে কালো রঙের বস্তুটি হঠাৎ বার করলেন সে দিকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাকিয়ে রইল গার্গী। যেন হৃৎপিণ্ড থেমে গেল একলহমা। কী থাকতে পারে ওর মধ্যে?

আর-ডি-এক্সের মতো কোনও শক্তিশালী বিস্ফোরক!

বিহ্বল, ভয়ত্রস্ত চোখে গার্গী ভাল করে তাকিয়ে দেখল রবার্টের হাতের দিকে। কালো কাগজে মোড়া একটা মাঝারি আকারের প্যাকেট। রবার্ট সযত্নে মোড়কটি খুলতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল চমৎকার একটি পারফিউমের শিশি। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ায়। সে-গন্ধ এতই মনোরম যে কিছুক্ষণের জন্য মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে গেল সে। গন্ধটা চেনা-চেনা। একটু ভাবতেই মনে পড়ল, কাঁঠালিচাঁপা ফুলের গন্ধ। গার্গী অবাক হল, খুশি হল, পরমুহূর্তে দ্বিধান্বিত হল। তার বুকের কাঁপুনি এখনও যায়নি। এমন অদ্ভুত চেহারার একটা মানুষের সামনে একা রাতের বেলা এভাবে বসে থাকাটা ভারি বিচিত্র মনে হচ্ছে তার। বুঝে উঠতে পারছে না কী উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা তার কাছে এসেছে। হঠাৎ যদি কোনও খারাপ মতলব প্রকাশ করার চেষ্টা করে, তবে প্রস্তুত থাকতে হবে তার জন্য। তার ক্যারাটের বিদ্যেটা জাহির করতে হতে পারে আজ। গার্গীর চমক ভাঙিয়ে রবার্ট বললেন, তুমি হয়তো শুনেছ, কলকাতায় অসংখ্য বন্ধু আছে আমার। আমার সৌভাগ্য এই যে তারা প্রায় সবাই বিভিন্ন অকেশনে নিমন্ত্রণ করে আমাকে, অনেক নব-বিবাহিত দম্পতিও। বিশেষ করে নব-বিবাহিতদের অনুষ্ঠানে গেলে আমি অবশ্যই এই সামান্য উপহারটুকু দিতে চেষ্টা করি — এক শিশি পারফিউমের আর একটি ফুলের বোকে। তার সঙ্গে প্রার্থনা করি, নববিবাহিত দম্পতির সমস্ত জীবন যেন এমনই সুগন্ধে ভরে থাকে। লেট ইউ অলসো বি হ্যাপি, বলতে বলতে চুরুটের ধোঁয়া আবার খানিকটা ছাড়লেন ও'নীল, হয়তো তুমি কিছুটা সারপ্রাইজড্ হয়েছ, হাউ দিস ওল্ড ফেলো কুড কাম টু ইয়োর ফ্ল্যাট উইদাউট এনি ইনভিটেশন, বাট —, ও'নীল হাসলেন, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোরম, আমি তার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করি, ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অনেক ঝড়ঝাপটা, অনেক শোক, দুঃখ, অনেক রক্তপাত — তা পেরিয়ে সুন্দরের কাছে পৌঁছনো জীবনের এক পরম প্রাপ্তি। অনেক অসুন্দরের মধ্য থেকে সুন্দর খুঁজে বার করে তাকে পুজো করতে পারার মতো আনন্দ তো জীবনে আর কিছু নেই। আমার জীবনের মন্ত্রই হল, যা কিছু সুন্দর তার পুজো করা। ভাল একটা ছবি, তার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকো। ভাল একটা বই, তার মধ্যে বুঁদ হয়ে থেকে তার সৌন্দর্য আহরণ করো। ভাল একটি দৃশ্য, তার দিকে তাকাও,তার ভেতরের চমৎকারিত্ব হৃদয়ের ভেতরে নিঃশেষে ভরে নাও।

ও'নীল আবার একটু থামলেন, হাসলেন গার্গীর দিকে তাকিয়ে, পৃথিবী ভারি সুন্দর জায়গা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথম সূর্যের দিকে তাকাবে। লালবর্ণ সূর্যের রূপ, ভোরবেলাকার কুয়াশারং পৃথিবী, সবুজ গাছের ঘুম ভাঙা রূপ, সব মিলিয়ে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। সেই সৌন্দর্য দেখার পর মনে হবে, এই পৃথিবীতে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকি। জীবন একটাই, অথচ তার পরমায়ু কত কম। আই হ্যাভ অলরেডি ক্রশড্ সিক্সটি, তবু আমার

মনে হচ্ছে, পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখা হয়নি, ভালবাসা হয়নি অনেক সৌন্দর্যকে। হয়তো মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাইই মনে হয় সমস্ত মানুষের। মানুষের দ্বিতীয় জন্ম আছে কি না তা জানা নেই আমার। আর জন্মালেও কোনও লাভ নেই, কারণ তখন তাকে আবার সবকিছু নতুনভাবে জানতে হয়, শিখতে হয়। নতুন করে এ বি সি ডি শিখে চিনতে হবে এই সুন্দর পৃথিবীটা। আগের জন্মের সবকিছুই তার কাছে তখন অদৃশ্য। অতএব যা কিছু জানার, চেনার, শেখার, পাওয়ার — তা এক জীবনের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

বলতে বলতে নিজের ভেতর তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন রবার্ট ও'নীল। হঠাৎ চমক ভেঙে বললেন, ওই যা, একা একা কত কিছু বকবক করে চলেছি। তোমার নিশ্চয় খুব ঘুম পেয়ে গেছে। ভাবছ, বুড়ো মানুষটা বকে যাচ্ছে পাগলের মতো। কিন্তু রাগ কোরো না, বয়স হলে মানুষের কথা বলার প্রবণতা বাড়ে। হাউএভার, বিয়ের পর হনিমুনে যাওয়ার একটা প্রথা আছে। তোমরা কোথাও বেরুচ্ছ নিশ্চয়?

রবার্টের প্রশ্নে একটা ঝাঁকুনি খেল গার্গী। হঠাৎ হনিমুনের কথা জানতে চাইছেন কেন তা আঁচ করতে পারল না। রবার্ট এত রাতে তাদের ফ্ল্যাটে কেন এসেছেন, এতক্ষণের কথাবার্তা থেকে তারও কিছু হদিস করতে ব্যর্থ হল। সমস্ত ব্যাপারটা এখনও ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে তার কাছে। কথার পৃষ্ঠে কথা জিইয়ে রাখতে বলল; কোনও বিশেষ সাজেশন আছে নাকি আপনার? কোনও বিশেষ স্পট?

—উঁহু, ও'নীলের চোখ হঠাৎ স্বপ্নময় হয়ে উঠল, আমি প্রচলিত টুরিস্ট-স্পটগুলোতে যাওয়ার কথা ভাবি না। আই অলওয়েজ প্রেফার আনকমন প্লেসেস। সে পাহাড় হোক, সমুদ্র হোক, অথবা কোনও জঙ্গলই হোক। অথবা —, ও'নীলের গলায় ঈষৎ কৌতুক, মরুভূমি হলেও আপত্তি নেই, যদি সঙ্গে জল, খাদ্য আর একটা তাঁবু থাকে। সঙ্গে একটা উট হলে আরও চমৎকার। এমনকি কোনও অপরিচিত মফস্বল শহরে যদি দিন-সাতেক কাটিয়ে আসো, তাহলেও দেখবে চমৎকার লাগছে। কলকাতা থেকে একটু অন্যরকম জীবনযাপন। সেখানে এত ব্যস্ততা নেই, ট্রাফিক-জ্যাম নেই, সে জীবনটা এত মেক্যানিকাল নয়। আমি মাঝেমধ্যেই কলকাতা থেকে হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাই, একটা অন্য জীবনের স্বাদ নিয়ে ফ্রেস হয়ে ফিরে আসি কলকাতার ব্যস্ততায়। আমার অনুভূতিতে এক-এক জায়গার জীবনযাপন এক-একরকম।

গার্গীর ঘুম আসছিল, জুড়ে আসছিল দুচোখের পাতা, কাল রাতে ঘুম হয়নি, আজ যদি না ঘুমোতে পারে — ,কিন্তু রবার্ট ও'নীলের কথায় এমন এক অদ্ভুত মাদকতা আছে, তার সঙ্গে একটা টেনশন এমন শিরিয়ে উঠছে রক্তের ভেতর যে, ঘুমদেবী তার চোখ ছুঁয়েই ফের সরে যাচ্ছিল। মুখে আগ্রহ দেখিয়ে সে আবার জানতে চাইল, কীরকম?

— ধরো নীল সমুদ্রের ধারে বসে আছ সারা বিকেল, চারপাশে অখণ্ড নির্জনতা, দূরে নীল জলে কয়েকটা নৌকা ঢেউয়ের দোলায় উঠছে নামছে। পরম একাগ্রতায় তার মাঝিমাল্লারা মাছ ধরছে জাল ফেলে, শুধু দূরে দিকচক্রবাল ছাড়া দিগন্তরে জনমনিষ্যি নেই, তখন দেখবে, তোমার মনটা কী বিশাল কী উদার হয়ে উঠছে সহসা। মনে হবে, এই চরাচরের অধীশ্বর তুমিই। মনটা এত্ত বড় হয়ে যায় যে, তখন জাগতিক সমস্ত সুখদুঃখ, টানাপোড়েন সব তুচ্ছ হয়ে যায়। কিংবা ধরো, একটা পাহাড়ের উপর, ছ হাজার কি আট

হাজার ফিট উপরে বসে আছ, দূরে-দূরে আরও সব পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত স্পর্ধায়, কেউ কেউ মাথা বাড়িয়ে ছুঁতে চাইছে আকাশ, চারদিকে শুধু অহঙ্কার আর অহঙ্কার। কিছুক্ষণ এই উপলব্ধির ভেতর থাকলে দেখবে এই অহঙ্কার ক্রমশ চারিত হচ্ছে তোমার মধ্যেও।

গার্গী হেসে উঠল, আর জঙ্গল? রবার্ট ও'নীল এবার দুষ্টু-দুষ্টু মুখ করে মিটিমিটি হাসলেন, ফরেস্ট ইজ আ প্লেস অব্ লাভ। জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা নিবিড় ব্যাপার আছে যা শরীরে একটা অদ্ভুত ফিলিংস নিয়ে আসে। সে এক অনন্য অনুভূতি, অনির্বচনীয়, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন রবার্ট ও'নীল, ফিসফিস করে বললেন, ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। সে এক গভীর, গভীরতম প্রেম। যাক্, প্রথমদিন এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলব না। আজ রাত যখন কালরাত তখন আপাতত এ আলোচনায় ইতি, বরং আগামীকাল ভেবে রেখো, হাউ টু মেক লাভ উইথ আ ম্যান।

রবার্টের শেষ বাক্যটিতে এমন এক অদৃশ্য জাদু জড়িয়ে ছিল যা ভেতরে সেঁধুতেই গার্গীর সমস্ত শরীরে এক বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। সে.থমকে গেল সহসা, কিন্তু ততক্ষণে তার ভেতরে অন্য এক অনুসন্ধিৎসা চাগাড় দিয়ে উঠেছে। একটু আগের কথার সূত্র ধরে রবার্টের দিকে ফের ছুড়ে দিল তার ভেতরে উথলে ওঠা প্রশ্নাবলি, আচ্ছা রবার্ট, আপনি নিশ্চয় পুলিশের অজস্র জিজ্ঞাসাবাদে জেরবার হয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যে। তবু আমাকেও যদি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেন—

রবার্ট চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বিস্মিত হয়ে থমকালেন, কী প্রশ্ন?

—আমি ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর দিনের কথা বলছি। সেদিন চন্দ্রাদেবীকে নিয়ে আপনি সন্ধের সময় বেরিয়ে গিয়েছিলেন পার্ক-সার্কাস মিউজিক কনফারেন্সে। আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই কি মোহন ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিল, না পরে?

—তার আগেই।

—আচ্ছা, আপনারা যখন বেরিয়ে যান, তখন আপনাদের ফ্ল্যাটে আর কেউ ছিল?

—না।

—সে দিন আপনারা বাড়ি থাকাকালীন আর কেউ কি এসেছিলেন আপনাদের ফ্ল্যাটে?

—বাইরের কেউ আসেনি, একমাত্র দীয়াই এসেছিল দুপুরের দিকে। বিকেলে আমরা বেরিয়ে যাওয়ার একটু আগেই সেও চলে গিয়েছিল।

—তখন মোহন বাড়িতে ছিল?

—ছিল। কারণ মোহনই গেটের তালা খুলে দিয়েছিল, তারপরে সেও চলে যায় ছুটি নিয়ে।

—তা হলে আপনারা দুজন যখন বেরিয়েছিলেন, তখন এ বাড়িতে ঐন্দ্রিলা ছাড়া আর কেউ ছিল না?

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।

—আচ্ছা, সে-রাতে ল্যাবরেটরি রুমে আলো জ্বলতে দেখে কী মনে হয়েছিল আপনাদের?

—ভেবেছিলাম, হয়তো সায়নই ছিল।

—কিংবা এও হতে পারে ঐন্দ্রিলা নিজেই ছিল। অথবা অন্য কেউ, যে ঐন্দ্রিলার চেনা?

—হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

—আচ্ছা রবার্ট, মোহন যখন ছুটিতে যায়, তখন গেটের ডুপ্লিকেট চাবি আপনাদের ফ্ল্যাটে কার কার কাছে থাকে?

—একটা চন্দ্রার কাছে। অন্যটা হিমনের কাছে।

—মোহন আমাকে বলেছে, সে যতক্ষণ এ বাড়িতে পাহারায় ছিল, বাইরের কোনও লোক সেদিন আসেনি। আপনিও তাইই বললেন একটু আগে। তাহলে আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার পর একমাত্র হিমনই তার কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল?

রবার্ট এবার হাসলেন, তুমি তো প্রায় গোয়েন্দাদের মতো প্রশ্ন করছ দেখছি। যাই হোক, এই প্রশ্নের উত্তরে বলি, হিমন এসেছিল রাত সাড়ে নটা নাগাদ, তার আগে বা পরে অন্য কেউও আসতে পারে যে ঐন্দ্রিলার চেনা। ঐন্দ্রিলাদের ফ্ল্যাটেও তো একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। তাহলে সায়ন, কিংবা অন্য কেউ হয়তো এসেছিল।

গার্গী একটুখানি কেঁপে উঠল যেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তার, অন্য কেউ যদি এসেই থাকে, তা হলে সে কে?

—নিশ্চয়ই তার চেনা কেউ। বলে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে রবার্ট বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। সায়নকে কাল সকালে বোলো, আমি এসেছিলাম, আর তোমাদের বিবাহে শুভকামনা জানিয়েছি। ফুলের এই তোড়াটি কাল আমার হয়ে তুমিই ওকে প্রেজেন্ট করবে। গুড্ নাইট।

গার্গীকে প্রায় হতবাক করে দিয়ে যেমন হঠাৎ এসেছিলেন ও'নীল, তেমনই দ্রুত নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে গার্গী যখন ফিরে আসছে ঘরের ভেতর, হঠাৎ পাশের ফ্ল্যাটে চোখ পড়তেই সে চমকে দেখল, এক জোড়া চোখ এতক্ষণ যেন নজর রাখছিল তাদের দিকে। বিস্মিত হয়ে দ্রুত জানালার পর্দাটা টেনে নিয়ে পাল্লা বন্ধ করে দিল। ব্যাপারটা আশ্চর্যই! কিন্তু কে ওখানে দাঁড়িয়ে! চন্দ্রাদেবী? না কি হিমন! কেন নজরদারি করছে তাদের ফ্ল্যাটে!

পরদিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হয়ে গেল গার্গীর। ঘুম ভাঙতে দেখল, ভোরের কুয়াশা- রং আজ যেন একটু অন্য রকম। সায়ন এই ভোরেই শেভ্ করে স্নান করে ফিটফাট। কিচেনে ঢুকে চা বসিয়েছে গ্যাসে। গার্গীকে দেখে হাসল, গুড্ মর্নিং ম্যাডাম। খুব ঘুমিয়েছ যা-হোক।

—আর তুমি নিশ্চয়ই ঘুমোওনি। সারারাত কাজ করেছ ল্যাবরেটরিতে?

—প্রায় তাই। ভোরের দিকে শুয়েছিলাম একটু। এক ঘণ্টাও ঘুমোইনি, হঠাৎ দেখলাম, চোখে আলো লাগল জানলা দিয়ে। কাগজওয়ালা বেল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে রাস্তায়। আজকাল আর খবরের কাগজে চোখ রাখতে ইচ্ছে করে না, তবু পুরনো অভ্যাসবশত ঘুম ভেঙে গেল। খুব ক্লান্ত লাগছিল, কিন্তু স্নান করে এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

বলতে বলতে গ্যাস-ওভেন থেকে চায়ের পাত্র নামিয়ে ফেলল, গার্গীকে বলল, যাও মুখ ধুয়ে এসো, নইলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। গো, কুইক।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, রোজ কি তুমিই চা করবে নাকি?

— উঁহু, কখনও করিনি। আজ হঠাৎ ইচ্ছে হল। শুধু আজই। কাল থেকে তোমার দায়িত্ব। আরও ভোরে উঠতে হবে।

চায়ের টেবিলে বসে হঠাৎ সায়নের নজর পড়ল ঘরের একপাশে রাখা ফুলের বোকেটির দিকে। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার, হঠাৎ ফুলের বোকে এল কোত্থেকে?

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর একটা কথাই গার্গীর মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল, সে রাতে ঐন্দ্রিলা ছাড়া সত্যিই আর কেউ ছিল এ ফ্ল্যাটে? থাকলে সে কে? ফুলের ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। হেসে বলল, সে এক মজার কাণ্ড হয়েছে। কাল তুমি যখন ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে গেলে, তখনই হঠাৎ দরজায় কলিং বেল—

—তাই নাকি? শুনতে পাইনি তো?

গোটা ঘটনাটা বেশ বিস্তৃতভাবে সায়নের কাছে বিবৃত করে গার্গী বলল, কী অদ্ভুত মানুষ, বুঝলে?

সায়ন কিন্তু শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেল, ওই স্কাউন্ড্রেলটা এসে কলিং বেল বাজাল, আর তুমি দরজা খুলে দিলে? আমাকে ডাকোনি?

—বাহ্, আমি কী করব? তুমি তো কালরাত্রি বলে দিব্যি ঢুকে গেলে ল্যাবরেটরি রুমে। তখন ডাকলে যদি রেগে যাও। দরজা খোলা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল আমার?

সায়ন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল মুহূর্তে, মুখ লাল করে বলল, তুমি জানো না, লোকটা একটা আস্ত শয়তান। আমার বাবার লাইফটাকে একেবারে হেল করে দিয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসে বসে থাকত এ বাড়িতে। মায়ের সঙ্গে গল্প করত। বাবা তাঁর চেম্বার অ্যাটেন্ড করে যাও বা দু-তিন ঘণ্টার জন্য ঘরে আসতেন, মাকে কাছে পেতেন না। মা তখন হয়তো রবার্টের পপ গান শুনতে ব্যস্ত। শেষের দিকে বাবা প্রায় আসতেনই না চেম্বার ছেড়ে। তাঁর লাঞ্চ, ডিনার পর্যন্ত দিয়ে আসা হত চেম্বারেই। ঐন্দ্রিলার কাছেও এভাবে একদিন এসেছিল বোকে নিয়ে। কিন্তু ঐন্দ্রিলা তাকে পাত্তা দেয়নি। তারপর লোকটা আর ঘেঁসেনি এ ফ্ল্যাটে।

—ঘেঁসেনি! গার্গীর কিন্তু মনে হয়েছিল রবার্ট আরও অনেকবার এসেছে। যাই হোক, মুখে গম্ভীর হয়ে বলল, ঠিক আছে, আমিও আর পাত্তা দেব না। প্রথম দিন বলেই—। তা ছাড়া, এমন একটা অকেশনের কথা বলে এল, ফেরাতে পারলাম না।

—লোকটা মেয়েদের সাইকোলজি ভীষণভাবে বোঝে। আর বোঝে বলেই নানান্ বয়সী মেয়েদের ভোলাতে একনম্বরের এক্সপার্ট। কত মেয়েকে যে এভাবে নষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এখনও নাকি ষোল-সতেরো বছরের মেয়েদের নিয়ে বারে পর্যন্ত যায়—

গার্গী বলতে যাচ্ছিল, বাহ্, লোকটার তাহলে এলেম আছে, কিন্তু বলল না। সায়নকে এখন ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে, ক্ষুব্ধও। তাকে ঠাণ্ডা করতে বলল, আসলে লোকটা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে মেয়েদের বশ করে ফেলে। আমাকেও—

—তোমাকেও বলেছে বুঝি? সায়ন উত্তেজিত হয়ে বলল, লোকটার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি বাড়ি আছি জেনেও—

গার্গী স্থির চোখে লক্ষ্য করছিল সায়নের অভিব্যক্তি। ঐন্দ্রিলার কাছেও এভাবে আসত নাকি রবার্ট! তাই-ই সায়নের এত রাগ? আস্তে আস্তে বলল, আর একটু চা দেব?

—নাহ্।

কথা ঘোরানোর জন্য গার্গী হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে ফেলল, পর পর দু রাত ঘুমোওনি কিন্তু। অফিসে কাজের চাপ কি খুব বেশি? না গেলে হয় না?

অফিসের প্রসঙ্গ তুলতেই সায়ন বেমালুম ভুলে গেল সব, চিন্তিত হয়ে বলল, উঁহু, খুব জরুরি অনেক ব্যাপার আটকে আছে। ডিটারজেন্ট পাউডারের ব্যাপারটা তো পণ্ড হয়েই গেল, নতুন স্নানের সাবান তৈরি করব বলে ঠিক করেছি, তাও কেউ বা কারা যেন চাইছে না। পর পর-একটা অদৃশ্য হাত এসে যেন বাদ সাধছে।

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, কে, তা বুঝতে পারছ?

সায়ন মাথা নাড়ল, না। তবে হঠাৎ প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত প্রায়ই অ্যাবসেন্ট হচ্ছে কাজে। সেদিন এসে বলল, আমি একটা ফর্মুলা বার করেছি। একবার ট্রাই করে দেখুন না। কিন্তু সেটা আমার পছন্দ হয়নি বলাতে ভীষণ রেগে গেল হঠাৎ। লোকটার চালচলন আমার ভাল ঠেকছে না। হয়তো এত সব স্যাবোটেজের পেছনে তার হাত থাকতে পারে।

—তাই? তাহলে লোকটাকে সরিয়ে দিলেই তো হয়?

—সে ভাবনাও না ভেবেছি তা নয়। কিন্তু কোম্পানির এই সঙ্কটের মুহূর্তে প্রোডাকশন ম্যানেজারের রোল খুব ভাইট্যাল। প্রোডাকশনের অনেক খুঁটিনাটি তার জানা হয়ে গেছে। এ সময় তাকে ছেড়ে দিলে ক্ষতিই হবে।

—তাহলে কৌশিক দত্তকে ট্যাক্টফুলি কাজকর্ম থেকে সরিয়ে একদম সাইফার করে দাও, যাতে নতুন প্রোডাকশনের ব্যাপারে কোনও ঝামেলা পাকাতে না পারে।

সায়ন হেসে বলল, আইডিয়াটা ভালই দিয়েছ তো। মনে হচ্ছে তোমাকেই শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ম্যানেজারিয়াল ফাংশনে নিয়ে আসতে হবে। আমি একা আর পেরে উঠছি না। যাই হোক, আপাতত সমস্যা হচ্ছে, প্রোডাকশন ম্যানেজার নিজেই কাজ ছেড়ে দেবে মনে হচ্ছে। ছেড়ে দিলে এই মুহূর্তে একটু মুশকিলেই পড়ব। ফ্যাক্টরির লোকজন ওকে খুব মানে। ওর খুব হোল্ড আছে কর্মীদের ওপর।

একটু ভেবে নিয়ে গার্গী বলল, প্রোডাকশন ম্যানেজারের দু-একজন ডেপুটি আছে না? তাদের মধ্যে কেউ চৌখস নয়? যদি কৌশিক দত্ত কাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদেরই কেউ কাজ চালিয়ে দিতে পারবে না? তুমি নিজেই যখন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট—

সায়ন অবাক হয়ে শুনছিল গার্গীর কথাবার্তা। সে ঐন্দ্রিলার মতো নিরীহ মুখ করে তাকিয়ে থাকে না। তার সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে কোম্পানির ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করছে। একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, বেশ বলেছ যা হোক। তুমি যখন অভয় দিচ্ছ, মনে হয় ক্রাইসিসটা কাটিয়ে উঠতে পারব।

—ও হ্যাঁ। কাল সারারাত ল্যাবরেটরিতে কাটালে, কিছু সূত্র পাওয়া গেল? তোমার নতুন প্রোডাক্টের?

—কিছুটা। নতুন একটা সেন্ট আনার চেষ্টা করছি গায়ে-মাখা সাবানে। জুঁইফলের গন্ধ। গন্ধটা এমন মিষ্টি যে সারাদিন লেগে থাকবে গায়ে। সে খুব ফ্যান্টাস্টিক হবে। ব্যাপারটা আপাতত কারও কাছে প্রকাশ করছি না। দেখা যাক—

বলতে বলতে সায়নের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যখনই সে তার নিজের তৈরি প্রোডাকশনের কথা বলে সহসা তার চেহারায় এক অন্য দীপ্তি ফুটে ওঠে। দু-দুটো রাত

সে যে ঘুমোয়নি, তার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি তার শরীরে লেগে নেই। সৃষ্টির আনন্দই বোধহয় এরকম। গার্গী তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল সে মনোরম আনন্দ। ছুঁতে চাইল সায়নের হৃদয়।

কিন্তু সায়ন কাজের মানুষ। তার ততক্ষণে মনে পড়ে গেছে, অফিসে আরও একশো কাজ বাকি। ব্যস্ত হয়ে বলল, সকাল-সকাল বেরোতে হবে কিন্তু—

ঝকঝকে পোশাকে প্রস্তুত হয়ে, হাসি-হাসি মুখে সায়ন যখন বেরুবার উদ্যোগ করছে, সে সময় কী যেন মনে পড়ল গার্গীর, জিজ্ঞাসা করল, ল্যাবরেটরি রুম থেকে কোনও কাগজপত্র কি খোয়া গেছে এর মধ্যে?

সায়ন চমকে উঠে বলল, তুমি কী করে জানলে?

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, সত্যিই গেছে নাকি? কেন যেন মনে হল আমার—

সায়ন স্তব্ধ হয়ে বলল, সত্যিই গেছে কিন্তু। হঠাৎ কে বা কারা যেন লণ্ডভণ্ড করে গেছে আমার যাবতীয় গবেষণার কাগজপত্র। কাল গোছাতে গোছাতে দেখি অনেক কাগজ নেই।

গার্গী তার অনুমানে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, আমারও সেরকম মনে হয়েছিল। রবার্ট কাল যখন বললেন কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে মেঝেয় —, বলতে বলতে গার্গী আবার জিজ্ঞাসা করল, খুব দরকারি কাগজপত্র খোয়া গেছে?

সায়ন এতক্ষণে হাসল, না। ভাগ্যক্রমে দরকারি কাগজপত্রে হাত দেয়নি লোকটা। যেগুলো নিয়ে গেছে তা ওদের কোনও কাজে লাগবে না।

গাড়ি নিয়ে সায়ন বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গী অনেকক্ষণ চুপচাপ নিথর হয়ে রইল। কার দরকার হতে পারে কাগজপত্রগুলো? কে ঐন্দ্রিলার কাছে হাজির হতে পারে গবেষণার দরকারি কাগজপত্র হাতাতে! কিন্তু নিয়ে গেছে অদরকারি কাগজ। তার মানে লোকটা আনাড়ি, বিজ্ঞানমনস্ক নয়।

বিশাল বেডরুমের মস্ত খাটটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে একলা-একা সারাটি দুপুর সেদিনকার সংবাদপত্র উল্টেপাল্টে দেখছিল গার্গী। লাইম ইন্ডিয়ার তরফ থেকে আজ আরও একটি মারাত্মক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে আক্রমণ করে। আকারে-ইঙ্গিতে হলেও তা প্যারাডাইসের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকারক। একেই তো সায়নের কোম্পানিতে বিক্রি কমে গেছে প্রায় অর্ধেক, তার ওপর এই বিজ্ঞাপন যে আরও ভয়ঙ্কর প্রভাব ছড়াবে, তাতে গার্গী নিঃসন্দেহ। বিজ্ঞাপনটি যতবার দেখছিল, ততই ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল নিজের ভেতর, আর ভাবছিল কী করেই বা এই অশ্লীল আক্রমণের মোকাবিলা করা যায়। লাইম ইন্ডিয়া হঠাৎ এহেন রণকৌশল গ্রহণ করলই বা কেন!

ইতিমধ্যে খবর নিয়ে সে জেনেছে, লাইম ইন্ডিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার রৌণক

মুখার্জিই এহেন সব বিজ্ঞাপনের নেপথ্য-নায়ক। সেই রৌণক মুখার্জি, যাকে একদা ঐন্দ্রিল পাগলের মতো ভালবেসেছিল, খুবই নীরবে অবশ্য। সেই রৌণক মুখার্জি যে একসময় কবিতা লিখত, ঐন্দ্রিলা যার কাছে ফরাসি ভাষা শিখতে গিয়ে উপহার পেয়েছিল প্রেমপত্র সেই রোমান্টিক যুবকটির মনে হঠাৎ কী এমন প্রতিহিংসার সৃষ্টি হল, যার জন্য প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে বারবার এতখানি আঘাত হানছে! তাহলে কি সমস্ত বিষয়টির মধ্যে কোনও গভীরতর রহস্য লুকিয়ে আছে! প্রেম কখনও রূপান্তরিত হয় প্রতিহিংসায়, প্রতিহিংস থেকেই হতে পারে হত্যাকাণ্ড। ঐন্দ্রিলা-হত্যার পেছনে কি তাহলে এই প্রতিহিংসাই! কিন্তু সেই হত্যার পরেও কি নিবৃত্ত হয়নি প্রতিহিংসার কামড়! কিন্তু প্রেমে ব্যর্থতার পরিণতিতেই যদি ঐন্দ্রিলা খুন হয়ে থাকবে, তাহলে ল্যাবরেটরি রুমের কাগজপত্র খোয়া গেল কেন? কাগজগুলো যে নিতে এসেছিল, সায়নের মতে সে নিতান্তই অজ্ঞ, আনাড়ি, গবেষণার কোন কাগজটি জরুরি তা উপলব্ধি করার ক্ষমতাই নেই তার। তবে কি রৌণক মুখার্জিই—

ঘটনাটা বারদুই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবতেই খুবই উত্তেজিত, শিহরিত হল গার্গী। দু-একদিনের মধ্যেই রৌণক মুখার্জির সঙ্গে তার একবার অবশ্যই দেখা হওয়া দরকার। এমন অবস্থায় টানটান হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল, কিন্তু ভেবেই পেল না কীভাবে তা সম্ভব কী পরিচয়েই বা যাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে! অবশ্য যেতে পারলেই কোনও ছলছুতোয় সে জিজ্ঞাসা করবে ঐন্দ্রিলার কথা। ঐন্দ্রিলার কাছে তিনি আসতেন কি না মাঝেমধ্যে। ঐন্দ্রিলা কি সত্যিই আজও ভালবাসত তাঁকে। এবং রৌণকও কি!

দেবাদ্রি সান্যাল সেদিন বলেছিলেন, হত্যাকাণ্ডের রাতে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে নির্বিঘ্নে উপস্থিত থাকার যার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ছিল, সে গার্গীই।

দেবাদ্রির কথা নাড়াচাড়া করে এখন গার্গীর ধারণা, সে রাতে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে যদি কেউ নিশ্চিন্তে প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকে তিনি হয়তো রৌণক। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে গার্গীকে। কিন্তু কীভাবে! সেই মুহূর্তে তার মনে হল, একটাই উপায় আছে। সে যদি পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে লাইম ইন্ডিয়ার ওপর একটা রাইট-আপ তৈরি করার ছলছুতোয় যায় ওদের অফিসে, তাহলে দেখা হতে পারে রৌণকের সঙ্গে। রৌণক তো ওদের পি. আর. ও-ও বটে।

কিন্তু তাতে ঝুঁকিও কম নয়। আজ গার্গীর প্রধান পরিচয় সে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের কর্ণধার সায়ন চৌধুরীর স্ত্রী। লাইম ইন্ডিয়ার অফিসে গেলে কেউ না কেউ চিনে ফেলতেই পারে তাকে। তাহলে কি তার উপস্থিতি মুহূর্তে শোরগোল তুলবে সেখানে? পরক্ষণেই মনে হল, তাকে না চেনাই সম্ভব। সংবাদপত্রের দৌলতে গার্গী চৌধুরীর নাম বিখ্যাত হলেও তার ছবি তো আর ছাপা হয়নি কাগজে। সে বরং নাম বদলে মিতুন মুখার্জি হয়ে সাক্ষাৎকার নিতে যাবে রৌণকের। ব্যাপারটা দুঃসাহসিক হবে, তবু তাতে উত্তেজনাও কম নয়। এক ধরনের মজাও আছে।

সায়ন অফিসে বেরিয়ে গেছে সেই সাং সকালেই। রোজই যায় এমন। একবার ভাবেও না এমন পেল্লাই দুপুরগুলো কীভাবে কাটাবে গার্গী। কাল অনেক রাত পর্যন্ত ঐন্দ্রিলার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছিল সায়নের সঙ্গে। সব শুনে সায়ন অবাক হয়েছে, তুমি এই রহস্যের কিনারা করতে চাও?

গার্গী হেসে বলেছে, একটা কিছু তো করতে হবে। কাঁহাতক আর দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হওয়া যায়? নাকি আমাদের সোসিও-ইকনমিক-রিসার্চ অকাদেমিতে আবার যোগ দেব? কতদিন যে যাইনি সেখানে এত সব ঝড়-ঝঞ্ঝাটে পড়ে। ওরা সব কী ভাবছে আমার সম্পর্কে কে জানে!

সায়ন হেসে উড়িয়ে দিয়েছে তার প্রস্তাব, ধুর, তোমার ওই হিজিবিজি চাকরিটা ছেড়ে দাও। আগে কয়েকটা টাকার দরকার ছিল বলেই না ওই জনসেবার প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়েছিলে। এখন তো আর সে দরকার নেই।

তবু সায়ন অফিসে চলে যাওয়ার পর যখন সে একা ভেবে আন্দোলিত হচ্ছে তার অকাদেমির অফিসে যাবে কি যাবে না, ঠিক তখনই ফোনটা এল সায়নের। হ্যালো, গার্গী, তুমি কি ফ্রি আছ। চট করে আমার অফিসে চলে এসো তো। খুব ঝামেলায় পড়েছি হঠাৎ। কুইক। একটা ট্যাক্সি নিয়ে —, ওপাশে মুহূর্তে ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ। তাতে আরও ঘাবড়ে গেল গার্গী। অফিসে গিয়ে তার হঠাৎ কী এমন বিপদ হতে পারে যাতে গার্গীকে এই মুহূর্তে ছুটতে হবে!

কিন্তু ভাবার আর সময় পেল না। দ্রুত তৈরি হয়ে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ। ট্যাক্সিতে গেলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু আপাতত ধারেকাছে কোনও ট্যাক্সির টিকিটিও দেখতে না পেয়ে উঠে পড়ল একটা মিনিবাসে। কিন্তু দুপুরের দিকের মিনিবাস যেন আর চলতেই চায় না। তাতে ক্রমাগত টেনশন বাড়তে থাকে তার। তবু ভাগ্যি, বসার একটা জায়গা পেয়ে গেল। বসেই ভাবতে আরম্ভ করল, সায়ন সম্ভাব্য কী কী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে। পর-পর যেরকম অঘটন ঘটে চলেছে তাতে নতুন কোনও বিপর্যয় ঘটে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নিশ্চয় কোনও বড় রকমের অঘটনই—

মিনিবাস ততক্ষণে শরৎ বোস রোড পার হয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে এসে পৌঁছেছে ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে। হঠাৎ সেখানে কীভাবে যেন জ্যাম হয়ে আটকে পড়ল মিনিট দশেকের মতো। সে জট ছাড়িয়ে আরও মিনিট কুড়ি পর পৌঁছতে পারল সায়নের অফিসে।

পৌঁছতেই চারদিকের ব্যাপারস্যাপার দেখে বেশ হকচকিয়ে গেল গার্গী। বোধহয় তার একটু দেরিই হয়ে গেছে, তাই তার অপেক্ষায় না থেকে একটা বড়সড় মিটিং শুরু করে দিয়েছে সায়ন।

গার্গী নজর করে দেখল, গত দুবছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে সায়নের অফিসে। আরও অনেকটা ঝকমকে হয়েছে ভেতরের চেহারা। আরও খানিকটা কেতাদুরস্ত। সায়নের বসার চেয়ারটিও এখন বিশাল, সিংহাসনপ্রতিম। সামনে বড় আকারের অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিল। তাতে কাঠের রঙের সানমাইকা লাগানো। তার উপর পেন-স্ট্যান্ড, ডেস্ক-ক্যালেন্ডার, পেপারওয়েট, পিনকুশন পর-পর সাজানো। টেবিলের এদিকে খানপাঁচেক গদি-আঁটা ঝকঝকে স্টিল ফ্রেমের চেয়ার। তার সব কটিই আজ ভর্তি। বসে আছেন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজারিয়াল র‍্যাঙ্কের সব কজন অফিসার। গার্গী ভেতরে ঢুকে বেশ অস্বস্তিতে পড়ল। তার বসার মতো একটি চেয়ারও খালি নেই।

সায়ন অবশ্য তাকে ডাকল, এদিকে এসো—

এতক্ষণে নজরে পড়ল গার্গীর, সায়নের বিশাল চেয়ারটির ঠিক পাশেই আরও একটি

কাঁধ-উঁচু সুদৃশ্য চেয়ার পাতা। সেই খালি চেয়ারটির দিকে ইঙ্গিত করে গার্গীকে বলল, এখানে বোসো। একটা জরুরি মিটিং ডেকেছি আজ সব অফিসারদের নিয়ে। এ মিটিঙে তোমারও থাকা দরকার।

গার্গী তখনও বুঝতে পারছে না, হঠাৎ এই জরুরি তলবের কী কারণ থাকতে পারে। অন্য সব অফিসারই অবশ্য টেনস্ হয়ে বসে আছে পর-পর। সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। তাতে তার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল প্রবলভাবে। এর আগে ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে সে কয়েকবার এসেছে এ অফিসে। দু-তিনবার নিতান্তই খোলামেলা আড্ডা দিতে, তাও বছর দুয়েক আগে। বলা যায়, বন্ধু হিসেবেই। আজ সে অফিসে এসেছে আর এক পরিচয়ে। যে খালি চেয়ারগুলির কোনও একটিতে সে এসে আগে বসত, সেখানে এখন পর-পর বসে আছেন প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত, কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্র, অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায়মজুমদার, ওয়ার্কস্ ম্যানেজার বরুণ নন্দী, এমনকি এরিয়া ম্যানেজার প্রীতীশ মজুমদারও। সায়নই পরিচয় করিয়ে দিল সবার সঙ্গে।

গার্গী হঠাৎ বলতে চাইল, কী ব্যাপার, হঠাৎ এমন জরুরি মিটিং-এ আমাকে—

কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনও স্বরই বেরুল না যেন। কেন যে হঠাৎ সে এত নার্ভাস হয়ে পড়ল।

সায়ন নিশ্চয় ব্যাপারটা খেয়াল করে থাকবে। গার্গীকে আরও সহজ করে তোলার জন্য বলল, বুঝলে, আমাদের অফিসে প্রতি মাসেই সব অফিসারদের নিয়ে একটা কনফারেন্স হয়। তাতে গত একমাসের কাজের হিসেবনিকেশ যেমন হয়, তেমনই আলোচনা হয় আগামী একমাসের প্ল্যান্স্ অ্যান্ড প্রোগ্র্যামস্। আজ মিটিং আরম্ভ হওয়ার আগেই হঠাৎ এসে পৌঁছল একটা রেজিগনেশন লেটার। পাঠিয়েছেন আমার পি. এ. কঙ্কা রায়। কঙ্কা গত কয়েকদিন ধরে অফিসে আসছিলেন না। কে যেন আমাকে বলেওছিলেন, কঙ্কা রায় অন্য একটা কনসার্নে কাজের অফার পেয়েছেন। আজ চিঠি আসতেই সেটা কনফার্মড হল। যাই হোক, কোম্পানির এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কঙ্কা রায় আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় কিছুটা ক্ষতি হল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম নানা ওঠা-পড়ার ভেতর দিয়েই তো কোম্পানিকে এগিয়ে চলতে হয়।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বলে সায়ন একমুহূর্তের জন্য থামল। ততক্ষণে সুদৃশ্য কাপ-প্লেটে ফার্স্ট রাউন্ড চা সার্ভ করা হয়েছে প্রত্যেকের সামনে। গরম চায়ে একটা বড় করে চুমুক দিয়ে সায়ন বলতে শুরু করল আবার, গত কয়েকদিন ধরে আমি চেষ্টা করছি নতুন একটা প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়ার। খুব চমকপ্রদ হবে আমাদের এবারকার সাবানটা। যদিও কী ধরনের ফ্লেভার হবে, কোন সাইজের — তা এখনও ঠিক হয়নি। তবু আশা করি, এই প্রোডাক্টটিও আমাদের কোম্পানির অন্য প্রোডাক্টগুলির মতোই জনপ্রিয় হবে। সুতরাং—

চায়ের কাপে আর একটি চুমুক দিয়ে সায়ন বলে চলল, আমাদের সবাইকে এবারও ফ্রেশ চ্যালেঞ্জ নিয়ে তৈরি হতে হবে। কোম্পানির প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ, কোম্পানিতে যে সাময়িক সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে, তা এই মুহূর্তে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা সবাই সমবেতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি। নতুন প্রোডাক্টটিকে বাজারে ঠিকমতো ধরিয়ে দিতে পারলেই দেখবেন, আমাদের কোম্পানির টার্নওভার আবার হু-হু করে বাড়তে থাকবে। একটা কথা

মনে রাখতে হবে, প্রোডাক্ট বিক্রি হয় তার কোয়ালিটির গুণে। আমাদের এতাবৎ এত প্রোডাক্ট বাজারে বেরিয়েছে, তার গুণমান অন্য কোম্পানির থেকে অনেক অনেক ভাল বলেই বিক্রি বেশি ছিল। শুধু একটা দুর্ঘটনার জন্যই সাময়িকভাবে ধাক্কা খেয়েছে বিক্রি। কিন্তু এই নতুন প্রোডাক্ট ছাপিয়ে যাবে বাকি সব সাবানকে। শুধু আপনাদের সম্মিলিত প্রয়াস আর তৎপরতা থাকলেই দেখবেন—

চায়ের কাপে আবারও চুমুক দিয়ে সায়ন এবার চলে এল অন্য প্রসঙ্গে, আর —, নতুন করে কোম্পানিতে রক্ত সঞ্চার করার জন্য আপনাদের আমি একটা সারপ্রাইজ দিচ্ছি আজ—

সায়নের কথায় এমন একটা সাসপেন্স ছিল যে উত্তেজনায় অন্য সব অফিসাররা একবার চোখাচোখি করে নিলেন নিজেদের মধ্যে। হয়তো নিজেদের অজান্তেই। গার্গী তখনও বুঝতে পারছে না, সায়ন আসলে কী বলতে চায়, কেনই বা হঠাৎ তাকে এমন টেলি-বার্তায় প্রায় হাইজ্যাক করে তুলে আনল অফিসে!

কিন্তু সায়নের পরবর্তী কথায় সে হতচকিত, স্তম্ভিত হয়ে গেল মুহূর্তে। যেন অবিশ্বাস্য মনে হল কথাগুলো।

সায়ন তখন বলছে, আপনারা জানেন, এই কোম্পানিতে আমিই এতদিন চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু গত দু-তিনবছরে কোম্পানির কাজ যেমন বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ, তেমনি এক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে আমি নিজেও ভীষণভাবে বিব্রত, বিপর্যস্ত হয়ে আছি। ঠিকমতো মনই বসাতে পারিনি বেশ কয়েকদিন। তাতে কোম্পানি যে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়েছে তা আপনারা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছেন। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, আজ থেকে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ করা হল কোম্পানিতে। অ্যান্ড মিট হার, সি ইজ গার্গী চৌধুরী, দ্য নিউ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড। আজ থেকে গার্গী চৌধুরী কোম্পানির কাজে সবরকমভাবে সহায়তা করবে আমাকে।

সায়নের এই আকস্মিক, প্রায়-শকিং ঘোষণায় শুধু গার্গীই নয়, কোম্পানির সমস্ত ম্যানেজার স্তব্ধ, বাক্‌রহিত। এহেন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বোধহয় কেউই আশা করতে পারেনি, সামান্যতম আন্দাজও করেনি কেউ। প্রত্যেকেই আরও একবার চোখাচোখি করে নিল নিজেদের মধ্যে।

অতঃপর আর কোনও আলোচনা, কোনও মন্তব্য ঝরে পড়ার আগেই হঠাৎ চমৎকার সুবাসে ঘর ভরিয়ে দিয়ে চেম্বারে ঢুকে পড়ল বিশাল আকারের সব খাবারের প্যাকেট। প্রতিবারেই মান্থলি কনফারেন্সের দিন একটা মস্ত আয়োজন থাকে খাওয়ার। আজ আরও বড় আকারের আয়োজন, বোধহয় আজকের এই আকস্মিকতা কাটিয়ে দেওয়ার জন্যই। অথবা কোম্পানির নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনারেও হতে পারে।

গার্গীর শরীর তখনও অবশ, যদিও গত কয়েকদিন যাবৎ সায়নের অফিসে আসার একটা ছুতো খুঁজছিল গার্গী। তার মনে হচ্ছিল, কেন পর-পর স্যাবোটেজ চলছে অফিসে, কারা এর পেছনে আছে, কী তাদের উদ্দেশ্য, সেগুলো খুঁজে বার করার জন্য দিনকয়েক এই অফিসে আসাটা তার প্রয়োজন। সেই সুযোগ হঠাৎ এভাবে পেয়ে যাবে তা অবশ্য আদৌ আঁচ করতে পারেনি। এভাবে চায়ওনি সে। তাই যেমন ভেতরে ভেতরে উল্লসিত বোধ

করছিল, তেমনই এত বড় দায়িত্ব তার কাঁধে বর্তানোয় নার্ভাসও হয়ে গেল ভীষণ। মিটিং ভেঙে যাওয়ার পর প্রায় সম্মোহিতের মতো সায়নের চেম্বারে এসে বসল গার্গী। অন্য অফিসারদের ভেতর তখন সামান্য গুঞ্জন, ফিসফাস, অস্বস্তিও। সায়নের সামনে কারও মুখ খোলার প্রশ্নই নেই। কিন্তু তার আড়ালে যে কানাকানির ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তাতে তাবৎ অফিস উত্তাল, তা স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিল সে। সায়নের জীবনে গার্গীর আকস্মিক প্রবেশ যেমন ইতিমধ্যে ঝড় তুলেছে সমাজে, পুলিশমহলে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, তেমনই প্যারাডাইস প্রোডাক্টসে তার এই দায়িত্বভার যে কোম্পানির গুডউইলের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে, আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল তাই-ই। তা ছাড়া, হঠাৎ একজন মহিলা বসের অধীনে কাজ করতে বোধহয় সব পুরুষের পৌরুষেও কিছুটা আঘাত লাগে।

সায়ন অবশ্য ব্যাপারটাকে কোনও আমলই দিল না। কিন্তু রাতে একান্ত হতেই গার্গী প্রশ্ন তুলল, হঠাৎ এরকম ডিসিশন নিলে যে—

—আসলে কিছুদিন ধরেই ভীষণ একটা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলাম অফিসে। মনে হচ্ছে, সবাই-ই কেমন একটা দূরত্ব রচনা করেছে আমার কাছ থেকে। কেউ সহজ হতে পারছে না। তার ওপর কঙ্কা রায় আমার খুব হেল্পিং-হ্যান্ড ছিল। সেও চলে যাওয়ায় মনে হল, খুব একা হয়ে গেছি। এরকম সঙ্কটময় মুহূর্তে কোম্পানিতে আমার নিজস্ব একজন কাউকে খুব দরকার। অতএব এই ডিসিশনটা না নিয়ে কোনও উপায় ছিল না। এখন তোমার হাতেই কোম্পানির ভাগ্য।

গার্গী অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি কি পারব?

—না পারার কিছু নেই গার্গী। আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীর ছেলেও প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। চেয়ার মেকস আ পারসন। প্রথম কদিন একটু অসুবিধে হবে। হয়তো সাত দিন, কি বড়জোর পনের দিন। তারপর দেখো, বল একবার রোল করিয়ে দিলে ঠিক চলতে শুরু করবে আপন গতিতে। কয়েকদিন আগে তোমার কিছু-কিছু সাজেশনস শুনে আমার মনে হয়েছিল, তুমি এই কাজের জন্য উপযুক্ত। তাছাড়া তোমার মনে পড়ে, অনেকদিন আগে, যখন কঙ্কা রায়কে আমার পি.এ. হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে, আগে জানলে তুমি ওই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে। আমি তখনই বলেছিলাম, পি. এ. কেন, তোমাকে আমার অফিসের এম. ডি. হিসাবেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি। আশ্চর্য, এতদিন পরে সে কথাই সত্যি করে তুলতে হল! আজ থেকে তুমি কোম্পানির এম. ডি., পি. এ. নয়। এম. ডি. হিসেবেই আমার সব কাজে সাহায্য করবে।

গার্গী তখনও প্রবল দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে, কী সাহায্য করতে হবে?

—অফিসে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকলে আমি নিজেকে কিছুটা ফ্রি করে নিতে পারি। আরও অনেক বেশি সময় দিতে পারি ফ্যাক্টরিতে। প্রোডাকশনটা নিজের হাতে পুরোপুরি রাখতে পারলে আরও বেটার কোয়ালিটির মাল তৈরি হবে। তাছাড়া ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টগুলোতে আরও বেশি করে ঘুরতে পারি। যত ঘুরতে পারব, তত ভাল সুপারভিসন হবে। তত বিক্রি বাড়বে। তুমি যদি অফিসটা সামলাতে পার—

— কিন্তু একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনেক রেসপন্সিবিলিটি।

—হ্যাঁ, তা অনেক, সায়ন যেন তন্ময় হয়ে বিড়বিড় করল, এম. ডি.-ই কার্যত হেড অব্

দ্য অফিস। হেড অব্ দ্য অফিস হওয়াটা যেমন অনেক সুখের, তেমনই তার যন্ত্রণাও কম নয়। তোমার হাতে এখন কর্তৃত্বের লাগাম। অনেক ক্ষমতা, অনেক পার্ক্স্। তোমার চেম্বারে সবাই আসবে, বসবে, কথা বলবে, কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমার অজান্তেই একটা বিরাট দূরত্ব রচনা হয়ে যাবে। তুমি সবসময় একা, বান্ধবহীন, চাইলেও কেউ তোমার কাছাকাছি হতে পারবে না। সর্বক্ষণ একটা কাচের দেওয়াল থাকবে মাঝখানে।

গার্গী হিম হয়ে গিয়ে বলল, তাই!

—হ্যাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকবেন তাঁর চেম্বারের মধ্যে, অথচ তাঁর চোখ ছড়ানো থাকবে সমস্ত দফতরে। একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ দিয়ে অলক্ষ্যে নজরদারি করতে হয় অফিসের কাজকর্ম। যেমন অনেকগুলো চোখ দিয়ে কাজ তদারকি করতে হয, তেমনই অনেকগুলো কানও থাকে এম. ডি.-র। নানান জনে এসে নানান কথা বলবে। কেউ তোষামোদ করবে, কেউ কান-ভাঙানি দেবে, কেউবা এসে নালিশ করবে অন্যের নামে। কখনও একজনের কথা শুনে ডিসিশন নেবে না। আগে যাচাই করার চেষ্টা করবে ব্যাপারটা, সমস্যাটা নিয়ে ভাববে, অপরপক্ষের বক্তব্য শুনবে, তারপর সিদ্ধান্ত তোমার—

এখন আরও অনেক কথাই অনর্গল বলে যেতে লাগল সায়ন, কিন্তু গার্গী যেন আর ভাবতে পারল না। সে তখন একা-একা খাবি খেয়ে চলেছে এক অতলস্পর্শী সমুদ্রের মাঝখানে।

পরদিন থেকে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অফিসে একেবারে হই-রই কাণ্ড। এতকাল সায়ন চৌধুরীর ঘরের সামনে নেমপ্লেট লেখা থাকত, 'চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর'। সেখানে এখন ঝুলতে শুরু করল শুধুই 'চেয়ারম্যান' শব্দটি। চেয়ারম্যানের ঘরের পাশে অনেকখানি জায়গা বার করে নিয়ে সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি করা হল আর একটি মস্ত চেম্বার। তার দরজার পাশে টাঙানো হল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নেমপ্লেট। চেম্বারের ভেতর সাজানো হল দামি-দামি চেয়ার-টেবিল দিয়ে। টেবিলের উপর যথারীতি ঝকঝকে পেন-স্ট্যান্ড, টেবিল-ল্যাম্প, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, পেপার-ওয়েট, পিন কুশন, লেটার-ডেস্ক, আরও কত কি। তার সঙ্গে দরজায় জানলায় চমৎকার রঙের পর্দাও। সমস্ত ব্যাপার দেখেশুনে গার্গী একেবারে হতভম্ব।

এমন আকস্মিকতায় থ হয়ে গেলেও কাজের ব্যাপারে গার্গী বরাবরই ভীষণ সিরিয়াস। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের যাবতীয় খুঁটিনাটি সে বুঝে নিতে লাগল বাধ্য ছাত্রীর মতোই। যখন তখন তার চেম্বার ছেড়ে বিভিন্ন অফিসারদের ঘরে ঢুকে পড়ে আলোচনার মাধ্যমে জানতে শুরু করল কোম্পানির বর্তমান অবস্থা, তার সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য কে কি ভাবছেন, মোকাবিলাই বা করছেন কিভাবে। হঠাৎ-হঠাৎ অফিসের বিভিন্ন সেকশনে ঢুকে পড়তে লাগল। সুপারভাইজার থেকে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রত্যেকের টেবিলে ঘুরে-ঘুরে যেমন কাজ শিখতে লাগল, তেমনই তাদের অজান্তে কাজের হিসেবও বুঝে নিতে শুরু করল নানারকম প্রশ্ন করে। তার এই সিনসিয়ারিটি আর অসম্ভব মোবিলিটিতে সাড়া পড়ে গেল কোম্পানিতে।

আর এই গতিময়তার অন্তরালে আসলে গার্গী তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল সমস্ত অফিসার আর কর্মীদের চালচলন, গতিবিধির ওপর। কে কীভাবে স্যাবোটেজ করেছিল, বা ভবিষ্যতে

আবারও করতে পারে কি না, তার সঙ্গে ঐন্দ্রিলা-হত্যা রহস্যের কোনও সম্পর্ক আছে অথবা নেই, তা যাচাই করাই তার মূল উদ্দেশ্য।

প্রথম কয়েকদিন সে আর সায়ন একই গাড়িতে যাতায়াত করল অফিসে, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারল, সেটা রোজ সম্ভব হবে না। সায়ন প্রায়ই অফিস থেকে দুপুরের দিকে বেরিয়ে যায় ফ্যাক্টরিতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসে ফিরতে পারে না, ফ্যাক্টরি থেকেই ফোন করে বলে দেয় গার্গীকে, 'প্লিজ, আজকের দিনটা ট্যাক্সি করে চলে যেয়ো। এখানে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।' বিকেলে, অফিস ছুটির পর, ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কঠিন। ফলে গার্গীর জন্য একটা আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল সায়ন।

কিছুদিন যাতায়াত করতেই গার্গী বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল তার এই নতুন কর্মভারে।

সেদিনও সায়ন ফ্যাক্টরিতে চলে গেল দুপুরের পর, গার্গীকে বলে গেল, ফিরতে রাত হবে, তার জন্য যেন চিন্তা না করে। নতুন প্রোডাক্ট তৈরির ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত রয়েছে সে। সতর্কও থাকতে হচ্ছে যাতে আবার স্যাবোটেজ না হয় ফ্যাক্টরিতে।

কিন্তু বিপদটা এল সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে। সন্ধের অনেকটা পর গার্গী অফিসের কাজ শেষ করে নেমে এল নীচে। তার গাড়ি পার্ক করানো থাকে অনেকটা দূরে, সিধু-কানহু-ডহরে। একা হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে এগুচ্ছে। হঠাৎই একটা মোটর-সাইকেল প্রচণ্ড শব্দে ছুটে এল পেছন দিক থেকে। গার্গী সতর্কই ছিল, শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে না দাঁড়ালে তাকে রাস্তায় সপাটে ছিটকে ফেলে চুরমুর করে দিয়ে যেত সাইকেল-আরোহী। প্রায় তার গায়ের কাছ ঘেঁসে চলে গেল মহিষপ্রতিম বাইকটি। একচুলের জন্য প্রাণ ফিরে পেল।

সম্বিত ফিরতে কয়েক মুহূর্ত দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল গার্গী। নিতান্ত দুর্ঘটনা নয়, সে বুঝতে পারল তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চক্রান্ত ফেঁদেছিল কেউ। সে সতর্ক না থাকলে —। কিন্তু কে ছিল মোটরবাইকে? তাদের অফিসের কেউ?

খুবই দুশ্চিন্তা নিয়ে দ্রুত গিয়ে তার নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠে বসল। একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলও। সায়নকে এই মুহূর্তে বলা যাবে না ব্যাপারটা। বললেই হয়তো বলবে, তাহলে তোমার অফিসে গিয়ে আর কাজ নেই। অথচ এখন অফিসে তার নিয়মিত যাওয়াটা খুবই দরকার। হয়তো তাদের অফিসেই ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে সমস্ত ষড়যন্ত্রের শিকড়।

তাছাড়া এই নতুন কাজটি ভালই লাগছে তার। অফিসে সারাদিন কাজের ধকলে সে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও এই দায়িত্বভার পেয়ে সে কিছুটা থ্রিল্‌ড্‌ও বটে। কোম্পানির বিক্রি বাড়ানোর জন্য সে আজ নিজেই দু-দুটো মিটিং করছে নিজের চেম্বারে। সুপারভাইজার, এরিয়া ম্যানেজাররা সবাই খোলা মনে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানিয়েছে। কেউ কেউ বলেওছে, ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম। এভাবে আমরা কখনও ভাবিনি।

সেদিন লেক-মার্কেটে মার্কেটিং সেরে যখন ফ্ল্যাটে ফিরল, তখন রাত সাড়ে আটটার মতো। কিন্তু বাড়ি ফিরতে আরও দু-দুটো ঘটনা যে তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল তা অনুমানে ছিল না তার। দুর্ঘটনাও বলা যায়—

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে সিঁড়িতে উঠতে যেতেই হঠাৎ সে মুখোমুখি হিমনের। উপর থেকে ধীর পায়ে নেমে আসছিল হিমন। হঠাৎ গার্গীকে দেখে যেন চমকে উঠল, কেমন সম্মোহিতের মতো পিছু হঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। পিছোতে পিছোতে পট করে

দোতলায় তাদের ঘরে সেঁধিয়ে গেল। যেন কোনও বাঘিনীর সামনে পড়ে ভয়ে পালিয়ে গেল সহসা। গার্গী অবাক হল। কেন তাকে দেখে কুঁকড়ে গেল হিমন, পালিয়েই বা গেল কেন বুঝতে উঠতে পারল না। তার হাঁটাচলা এমন জড়গ্রস্তের মতোই বা কেন!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল সে ঘরে ঢোকার পর। সায়ন তখনও ফেরেনি। গার্গী ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সবে ফ্যান, লাইট অন করেছে, সেসময় বাইরে কলিং বেলের আওয়াজ। বিস্মিত হয়ে দরজা খুলতে এবার গার্গীই চমকে উঠল ভীষণভাবে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কেউ নয়, দীয়া।

দীয়ার চোখেমুখে জড়িয়ে রয়েছে কি এক প্রবল বিষণ্ণতা। তা থাকাটাই স্বাভাবিক। তার সঙ্গে আজ কিছুটা ত্রাসও। গার্গী দরজা খুলতেই সে চট করে চলে এল ভেতরে, ফিসফিস করে, বলল, দরকার আছে। বলে নিজেই দরজা বন্ধ করে আবারও ফিসফিসায়, সব জেনেশুনেও তুমি এ বাড়িতে এলে?

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

—সে অনেক কথা। এ বাড়িতে কোনও বউ বাস করতে পারেনি। ঐন্দ্রিলা পারেনি, আমিও পারিনি, তুমিও পারবে না।

স্তম্ভিত গার্গী আবার বলল, কেন?

দীয়ার চোখ তখনও ভয়ত্রস্ত, কি এক শঙ্কায় সে চমকে-চমকে উঠছে যেন। ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে, হয়তো তার নজর পড়ছে ঘরের মেঝেয়, যেখানে ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীরটা পড়ে ছিল অসহায়ভাবে। তাতে আরও আতঙ্কিত দেখাল তাকে। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কখনও সময় পেলে তোমাকে সব বলব। কিন্তু আজ নয়। আজ আমি এ বাড়িতে এতক্ষণ ছিলাম তোমাকে সাবধান করে দিয়ে যাব বলেই। রাতে আমি কখনও এ বাড়িতে থাকি না—

—কেন? রাতে কি অসুবিধা?

—সে সব পরে বলব। এখন সময় নেই। রাত বেশি হওয়ার আগেই চলে যেতে হবে আমাকে। পারলে তুমিও এ বাড়িতে রাত কাটিয়ো না। যত শিগগির সম্ভব পালিয়ে যাও। নইলে তুমিও এদের হাতে মারা পড়বে।

আর দাঁড়াল না দীয়া। ঘরের মেঝেয় নজর রাখতে রাখতে বেরিয়ে গেল সহসা। তার গলায় এমন এক ভয়ঙ্কর ত্রাসের সুর, যা কানে যেতে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল গার্গীর। ততক্ষণে দীয়া দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে গেট পার হয়ে নেমে গেছে রাস্তায়।

একা ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে হিম হতে লাগল গার্গী।

মিতুন মুখার্জি নামে একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক ঠিক সোয়া দশটায় ফোন করেছিল রৌণককে। লাইম ইন্ডিয়ার উৎপাদন, তার সেল, টার্ন-ওভার, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী —

এই সব নিয়ে একটা আর্টিকেল ছাপাতে চায় তাদের পত্রিকায়। বেশি সময় নেবে না। মাত্র দশ মিনিট। তাকে আসতে বলে তারই অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে রৌণক অপেক্ষা করছিল তার চেম্বারে। কোম্পানির এই টালমাটাল অবস্থায় যদি কোনও পত্রিকায় একটা ভাল কাভারেজ পাওয়া যায়, তাদের সেল কিছুটা বাড়াতে পারে এই আশায় তৎক্ষণাৎ মহিলা সাংবাদিকটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

এ হেন অপেক্ষার মুহূর্তে তার চেম্বারে এসে ঢুকলেন সেল্‌স ম্যানেজার অনঙ্গ চক্রবর্তী, চোখ পিট পিট করতে করতে বললেন, অবস্থা ভাল ঠেকছে না, মুখার্জি সাহেব।

রৌণক চোখ ফেলল অনঙ্গ চক্রবর্তীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে। কিছু বলার আগেই অনঙ্গ চক্রবর্তী ফের বললেন, দিস কোম্পানি ইজ নাউ আ সিঙ্কিং শিপ। জাহাজ সমুদ্রে অসহায়ের মতো ডুবছে, সবাই দূরে দাড়িয়ে দেখবে, চেঁচাবে, উপদেশ দেবে, কিন্তু কেউ বাঁচাতে ছুটে আসবে না। এদিকে জাহাজের লাইফবেল্টও কাজ করছে না। তার ওপর আজ আর এক বিপদ।

রৌণক ভুরু কোঁচকাল, কী বিপদ?

—পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল কাল আসছে আবার। নতুন করে ইন্টারোগেট করবে সবাইকে।

—তাই নাকি! কিছুটা থতমত খেয়ে রৌণক বলল, এই তো কদিন আগেই একবার ঘুরে গেল। আবার কেন?

—সেবার তো শুধু চেয়ারম্যানের ঘরেই ঢুকেছিল। তাঁকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিল। এবার নাকি প্রত্যেক অফিসার, কর্মী — সবাইকে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করবে।

কেন যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল রৌণক। সবে সে ভাবছিল, সেল্‌স্ ম্যানেজারকে আশ্বাস দেবে এই বলে যে, এত ভেঙে পড়ছেন কেন আপনি! সব কোম্পানিরই তো এরকম ওঠা-পড়া আছে। কখনও তর তর করে উপরে উঠতে থাকে, কখনও পা হড়কে পিছলে পড়ে যায়। একদা প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের চমকপ্রদ উত্থানে লাইম ইন্ডিয়ার পতন শুরু হয়েছিল, এখন প্যারাডাইসের দুর্দিনে নিশ্চয় সুসময় ফিরে আসছে লাইম ইন্ডিয়ার। কিছুদিন ধৈর্য ধরুন না।

কিন্তু বলতে পারল না। হঠাৎ পুলিশ এসে কেন লাইম ইন্ডিয়ার অফিসারদের ইন্টারোগেট করবে তা ভাবতে সময় নিল। অবাক হয়ে বলল, কেন?

—সেইটেই তো কেউ বুঝতে পারছে না। ফিন্যান্স অফিসার তো শুনেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছেন। বললেন, কাল অফিসে আসবেন না। আর প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল রায় হেসে বলেছে, বাহ্, ভারি ইন্টারেস্টিং তো। নিজের স্ত্রীকে খুন করল সায়ন চৌধুরী, আর পুলিশ এসে কিনা হাতকড়া পড়াবে লাইম ইন্ডিয়ার অফিসারদের। ভাল শার্লক হোমসের পাল্লায় পড়েছি।

হাতকড়ার কথা শুনে রৌণকের বুকের ভেতর এক ধরনের শব্দ হচ্ছিল। যেন হঠাৎ ছলাত করে চলকে উঠল তার শরীরের রক্ত। কি এক ঘোরের মধ্যে পরমুহূর্তে শুনল অনঙ্গ চক্রবর্তী বলছেন, আজ সাড়ে বারোটায় চেয়ারম্যান সাহেব ডেকেছেন তাঁর ঘরে। বোধহয়

এই পুলিশি তদন্তের ব্যাপারেই কথা বলবেন।

আরও কিছুক্ষণ বকবক করে অনঙ্গ চক্রবর্তী উঠে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও রৌণক থম্ হয়ে বসে রইল। কিছুটা অস্থিরতা, কিছুটা মন-খারাপ, কিছুটা আশঙ্কা নিয়ে হাতের কব্জিতে চোখ রেখে দেখল, আরও চল্লিশ মিনিটের মতো সময় আছে চেয়ারম্যানের ঘরে যেতে। সেখানে কী আলোচনা হবে, পুলিশ-অফিসারই বা কী জিজ্ঞাসা করবে এই ভেবে ভীষণ মুষড়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সেই মহিলা-সাংবাদিকের দেখা না পেয়ে আরও চঞ্চল হয়ে উঠছিল রৌণক। মহিলা টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, একটু পরেই আসছি, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় কিছু জানাননি। সে চেয়ারম্যানের ঘরে যাওয়ার পর যদি এসে পড়েন—

ভাবনার মধ্যে সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে ওঠায় সাগ্রহে রিসিভারের দিকে সে হাত বাড়াল, হ্যালো, রৌণক মুখার্জি স্পিকিং—

—আমি দেবাশিস মজুমদার। আপনি তিনটের দিকে কি ফ্রি আছেন? বেশি সময় নেব না। জাস্ট কার্টসি ভিজিট।

—হ্যাঁ হ্যাঁ; চলে আসুন।

দেবাশিস কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, বিজ্ঞাপন দফতরে আছেন। স্মার্ট চেহারা, মাথার সামনের দিকে সামান্য টাক, চিবুকে ফ্রেঞ্চকাট, তাতে চেহারায় একটু লেনিন-লেনিন টাচ্ এসেছে। কথাবার্তায়ও দারুণ তুখোড়। মাঝেমধ্যে রৌণকের চেম্বারে এসে আড্ডা দিয়ে যান। বিজ্ঞাপন জগতের এইসব এক্সিকিউটিভদের অন্যতম কাজই হল, বড় বড় কোম্পানির পি. আর. ও. কিংবা অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের ঘরে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করা, কিছুক্ষণ আড্ডা মারা — অর্থাৎ কিনা তাঁদের গুড হিউমারে রাখা। তাতে পত্রিকায় নিঃসন্দেহে একটু বেশি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। আর বিজ্ঞাপন মানেই পত্রিকার পক্ষে লক্ষ্মীবিশেষ।

দেবাশিস মজুমদারের ফোন পেয়ে একটু যেন স্বস্তি পেল রৌণক। এই সব মন-খারাপের মুহূর্তে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলে টেনশনমুক্ত হওয়া যায়।

ভাবতে ভাবতে ঘড়িতে চোখ পড়তেই রৌণক উঠে পড়ল চেয়ারম্যানের ঘরে যাবে বলে। চেম্বারের বাইরে বেরুতেই দেখা রাহুল রায়ের সঙ্গে। রাহুল রায় বেশ খোস মেজাজেই আছেন মনে হল। রৌণককে দেখেই বললেন, আপনি এক-একখানা যা বিজ্ঞাপন ছাড়ছেন প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে আক্রমণ করে, তাতেই টনক নড়েছে পুলিশের। ভাবছে, প্রাইম ইন্ডিয়া হঠাৎ এভাবে উঠে-পড়ে লেগেছে কেন প্যারাডাইসের বিরুদ্ধে। তা হলে ডাল্‌মে কুছ্ কালা হ্যায়। তাই-ই তো হঠাৎ তড়িঘড়ি করে ছুটে আসছে দেবাদ্রি সান্যাল। খুব ঘাগু পলিশ অফিসার, বুঝলেন? সাবধানে থাকবেন কিন্তু।

রাহুল রায়ের কথায় এমন একটা তীব্র কামড় যে রৌণক ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ল। প্রতিবাদ করে বলল, বিজ্ঞাপন কি আমার একার ইচ্ছেয় বেরিয়েছে?

রাহুল রায় হা হা করে হাসল, কিন্তু সোল্ রেসপনসিবিলিটি তো বিজ্ঞাপন দফতরের, তাই না?

অন্য দিনকার মতো আজও চেয়ারম্যানের মিটিঙে দারুণ উত্তেজনা। এমনিতেই বিক্রি

কমে যাওয়ার পর থেকে চেয়ারম্যানের ঘরে আসা মানেই ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন হওয়া, তার ওপর আবার পুলিশি উপদ্রব। বোঝাই যাচ্ছে খুবই হেনস্তা কপালে আছে অফিসারদের।

কিন্তু আজ অবশ্য তেমন বীভৎস মেজাজে দেখা গেল না চেয়ারম্যানকে। বরং চায়ের সঙ্গে সামান্য স্ন্যাকসের ব্যবস্থাও করেছেন। মনে হচ্ছে তিনিও কিছুটা ভাবনায় আছেন। প্রথমে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে কোম্পানির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলেন সবাইকে, তারপর বললেন, কিছু রদবদল হচ্ছে খুব শিগগির। কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে বদলি করা হচ্ছে কয়েকজন এরিয়া-ম্যানেজারকে। দু-একজন নতুন লোককে আনাও হচ্ছে কোম্পানিতে। আর কেউ কেউ হয়তো যাচ্ছেও। আরও হদিস দিলেন, কীভাবে মার্কেট বাড়াতে হবে। কোন সিজনে কোন প্রোডাক্টের উপর জোর দিতে হবে তার একটা প্ল্যানিং করা দরকার। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী দোকানে দোকানে মাল পৌঁছে দিতে হবে। কখন কোন এলাকায় কোন প্রোডাক্টের চাহিদা বাড়ছে, কোথায় কমছে তার হিসেব রাখতে হবে। যেখানে চাহিদা বাড়ছে, সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরও প্রোডাক্ট পৌঁছে দিতে হবে। যেখানে চাহিদা কমছে, কেন কমছে সেখানে বাজার ঘুরে অ্যানালাইজ করতে হবে। তার ফলাফল জেনে সেখানে সেল বাড়ানোর জন্য আলাদাভাবে ক্যাম্পেন করতে হবে।

এই পর্যন্ত বলার পর হঠাৎ চেয়ারম্যান থামলেন, তারপর প্রায় অপ্রত্যাশিতের মতো দুম্ করে বললেন, কী ব্যাপার, হঠাৎ পুলিশ আসছে কেন? আপনারা কেউ খুনটুন করেছেন নাকি?

এমন কৌতুকময় ভঙ্গিতে বললেন, এত সহজভাবে যে, কারও কারও মুখে চিলতে হাসির রেখাও খেলা করে গেল। কিন্তু রৌণকের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একরাশ গরম রক্তস্রোত বয়ে গেল লহমায়। চেয়ারম্যান ততক্ষণে বলছেন, পুলিশের সঙ্গে বেশি কথা বলার দরকার নেই। যতটুকু না বললে নয়, ততটুকুই বলবেন।

আরও অনেক কিছু বললেন চেয়ারম্যান, কিন্তু সব কথা রৌণকের কানে গেল না। মিটিং রুম থেকে সে বেরিয়ে এল আচ্ছন্নের মতো। নিজের চেম্বারে ফিরে এসে শুনল, এক মহিলা এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন তার চেম্বারে, তার দেরি দেখে ফিরে গেলেন একটু আগে। রৌণক জিভে চুক চুক শব্দ করে বলল, এহ্, তাই নাকি? অবাক হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতে বুঝল, প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি মিটিং করেছেন চেয়ারম্যান। এতক্ষণ অপেক্ষা করা কোনও মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, লাইম ইন্ডিয়া তার কাভারেজ বোধ হয় আর পেলই না।

ফোমের চেয়ারটিতে মনমরা হয়ে বসে হাতের ফাইলগুলো সেরে ফেলল রৌণক। শেষ ফাইলটিতে সই করে সবে মুখ তুলেছে দেখল অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় তার চেম্বারের দরজা ঠেলে লেনিন-মুখ বাড়ালেন দেবাশিস, মে আই কাম ইন—

রৌণক দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। যে দু-একজন মানুষের সব সময় একটা প্লিজিং অ্যাপিয়ারেন্স থাকে, দেবাশিস নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একজন, তাকে বসতে বলে বলল, আপনি কিন্তু অনেকদিন আসেননি মিঃ মজুমদার।

দেবাশিসও মৃদু হাসলেন, আর বললেন না। আমাদের কোম্পানিতে একটা নতুন ফোর্টনাইটলি চালু হয়েছে, মেয়েদের কাগজ, তার জন্য খুব ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। আমাদের চিফ্ অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার বলেছেন, আমাকে অন্তত প্রতি ইসুতে পাঁচটা করে কালার ফুলপেজ জোগাড় করতে হবে। তাই ক'দিনের জন্য বোম্বে চলে গিয়েছিলাম।

—বিজ্ঞাপনের বাজার তো বোম্বেতেই। কলকাতায় আর ক'টা ভালো কোম্পানি আছে যে তারা বিজ্ঞাপন জোগাবে রোজ রোজ।

—তা ঠিক, দেবাশিস মাথা নাড়লেন, তবু আপনাদের মতো দু-চারটে বাঙালি কনসার্ন কলকাতায় আছে বলেই তো আমাদের ভরসা। আপনারা তো বছরে কম বিজ্ঞাপন দেন না আমাদের।

—সে একসময় দিতাম ঠিকই, রৌণক তার ম্লানহাসিতে বুঝিবা একটু ধূসর হল। কিন্তু এখন তো বিজ্ঞাপন অনেক কমে গেছে আগের তুলনায়। বরং আজকাল বোধহয় প্রচুর বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন প্যারাডাইসের কাছ থেকে।

—তা অবশ্য পাচ্ছি।

—ওদের এখন প্রচুর বিজ্ঞাপন না দিয়েও কোনও উপায় নেই। কারণ ওদের এম. ডি.-র পার্সোনাল ক্রাইসিসটা হঠাৎ এমন করে আছড়ে পড়ল কোম্পানির ঘাড়ে। জানেন তো ওদের সেলও ফল করেছে—

—আমরা কাগজের লোক, আমরা সব খবরই পাই। যা সব স্টোরি ছাপা হচ্ছে গত একমাস ধরে, তাতে অটোমেটিক সেল ফল করবে। তা ছাড়া, আরও অনেক কিছুই ঘটবে খুব শিগগির। যা সব ইনফর্মেশন পাচ্ছি—

রৌণক হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল, তাই নাকি! কিরকম?

দেবাশিস মজুমদার হঠাৎ গলাটা নামালেন, বুঝলেন, পুলিশ-অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল আমার অনেকদিনের বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। আমাদের এতই বন্ধুত্ব ছিল যে ক্লাসের অন্য ছেলেরা আমাদের দেবস্কোয়ার বলত। তা সেদিন দেবাদ্রির সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ওই তো এই কেসটার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। সে বলছিল, ফ্যান্টাস্টিক সব ক্লু পেয়েছে নাকি ইনভেস্টিগেট্ করতে গিয়ে। আপনাদের রাইভ্যাল কোম্পানি, প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের চেয়ারম্যান সায়ন চৌধুরীর সেকেন্ড ম্যারেজটাই ওদের তদন্তে অনেক সুবিধে করে দিয়েছে। অনেক জটিল ব্যাপার, যা আগে ওরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, এখন তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

রৌণক প্রায় হামড়ে পড়ল, সায়ন চৌধুরী ফেঁসে যাবে মনে হচ্ছে?

দেবাশিস হাসলেন, অত ডিটেল্সে আমাকে বলল না। পুলিশের লোক তো, কিন্তু বলল, নারীঘটিত ব্যাপার, খুব মিস্টেরিয়াস। সেদিন নাকি সায়ন চৌধুরীর সেকেন্ড ওয়াইফকে ইন্টারোগেট করতে গিয়েছিল। একদম একা। ভদ্রমহিলা নাকি খুবই ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টারের। দেবাদ্রির সঙ্গে নিজেই নাকি এই মার্ডারের ব্যাপার নিয়ে অনেক অ্যানালিসিস করেছে। অনেক মতামতও দিয়েছে। অথচ দেবাদ্রি বলছিল, এই ভদ্রমহিলা কেসের অন্যতম সাসপেক্ট্।

—খুব ইন্টারেস্টিং তো।

—আরও ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে। আপনি শুনেছেন, মিসেস চৌধুরীই এখন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর?

রৌণক চমকে উঠল কথাটা শুনে, বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দেবাশিস তাঁর গলা আরও খাদে নামালেন, এতে ওদের অফিসের অনেকেই ক্ষুব্ধ। সেদিন ওদের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী তো বলেই ফেললেন, কোম্পানির যেটুকু গুডউইল ছিল, তাও এবার শেষ হয়ে যাবে।

—স্ট্রেঞ্জ!

—এ খবরে আপনাদের তো উল্লসিত হওয়ার কথা, মিঃ মুখার্জি, প্যারাডাইস ডুবলে তো লাইম ইন্ডিয়ার কপাল ফিরে যাবে। এখন যেমন ওরা বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে তখন তো আপনাকেই এমন ঢালাও বিজ্ঞাপন দিয়ে যেতে হবে। আপনার বাজেট দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

কিছুদিন ধরে ব্যাপারটা রৌণককে একেবারে না ভাবাচ্ছে তা নয়। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের বিজনেস ওঠানামার সঙ্গে তাদের কোম্পানির ভাগ্য নিঃসন্দেহে জড়িত। গত তিনবছর ধরে তাদের সেল অস্বাভাবিক রকম পড়ে যাওয়ায় তাদের সমস্ত ডিপার্টমেন্টের বাজেট কমিয়ে ফেলতে হয়েছে। বিজ্ঞাপন নিয়ে গত ছ'সাত বছর যাবৎ সে যে রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এখন তাতেও ভাটা পড়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্যারাডাইসের সেল ফল্ করলেও তাদের বিক্রির কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। দুই কোম্পানিরই যে দুরবস্থা চলছে, তার সুযোগ নিয়ে বাজারে কায়েম হয়ে বসছে বোম্বের কোম্পানিগুলো। এই মুহূর্তে তাদের দরকার আরও আরও বিজ্ঞাপন। কয়েকদিন আগে, চেয়ারম্যানের মিটিং এর পরিপ্রেক্ষিতে সে কয়েকটা নতুন পরিকল্পনা দিয়েছে এম. ডি-র কাছে। শুধু খবরের কাগজেই নয়, টি. ভি-তেও যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার। টি. ভি-ই এ কালের বেস্ট মিডিয়া। বিশেষ করে বাংলা বা হিন্দি সিনেমার আগে লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার পাওয়া যায়। একবার বিজ্ঞাপন দিলেই পৌঁছনো যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে। আরও ভালো হয়, যদি কোনও একটা ভালো সিরিয়ালের স্পনসর হওয়া যায়। মাস তিন-চার ধরে চলবে এমন কোনও ভালো সিরিয়াল স্পনসর করতে পারলে কম খরচে অনেক বেশি পাব্লিসিটি হয়। বঙ্কিম কিংবা শরৎচন্দ্রের বই হলে সবচেয়ে সুবিধে। এই দু'জনই এখনও বেস্ট মিডিয়া-ক্যাচার। এ বছর সে যা বাজেট করে দিয়েছে, যদি সব টাকাটা পাওয়া যায়, তাহলে—

আবার নিজের ভাবনার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল রৌণক। তবে রাহুল রায় যেমন বলেছিল সেদিন, অ্যাট দ্য কস্ট অব্ প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্, সেরকম পারস্পরিক বিদ্বেষের বীজ পোঁতাটা তার অভিপ্রেত নয়। দুটো প্যারালাল কোম্পানির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকতে পারে বা থাকা উচিত। সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে জিতলে জেতার একটা আলাদা আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ঈর্ষা যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে আসে—

আসলে লাইম ইন্ডিয়ার এখন যা অবস্থা, তাতে সুস্থ প্রতিযোগিতা চললে যে তারা জিততে পারবে না তা জেনে গেছে কোম্পানির চেয়ারম্যান থেকে সেল্‌স্ রিপ্রেজেন্টেটিভ পর্যন্ত সব্বাই। তাই প্যারাডাইসের এই দুর্ঘটনায় সবাইকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। সবচেয়ে উৎফুল্ল হয়েছেন রাহুল রায়। মাত্র কালই তিনি রৌণকের চেম্বারে এসে বলে গেছেন, এর

পরও যদি লাইম ইন্ডিয়া না দাঁড়াতে পারে, তা হলে শুধু প্রোডাকশন ম্যানেজারকে দোষী করলে চলবে না। এই ভাইটাল টাইমে সেল্‌স্‌ ম্যানেজারের ভূমিকাই প্রধান হওয়া উচিত। সেল্‌স্‌ উইং যদি দোকানে দোকানে গিয়ে ঠিকমতো ক্যাম্পেন করতে পারে—

কয়েকদিন ধরে তীব্র সংকটের মধ্যে ডুবে আছেন রাহুল রায়। চেয়ারম্যান তাঁকে বসিয়ে রেখেছেন প্রায় একটা ত্রিফলা বর্শার নীচে। যে কোনও দিন তিনমাসের স্যালারি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতে পারেন, ইওর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকয়ার্ড ইন আওয়ার কোম্পানি। সেই আতঙ্কে রাহুল রায় এখন চরম ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছেন।

আর রৌণক নিজেও কি খুব স্বস্তিতে আছে! তাকেও যদি কোনও দিন এভাবে—

দুশ্চিন্তার পাহাড় টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে রৌণক হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, আপনি এই পত্রিকায় কতদিন বিজ্ঞাপনে কাজ করছেন, মিঃ মজুমদার?

—তা প্রায় বছর তিনেক।

—মাত্র! রৌণক বেশ আশ্চর্য হয়, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি তো বেশ সিনিয়র পোস্টে চলে গেছেন। আপনার আন্ডারেই তো একঝাঁক তরুণী কাজ করছে। সেদিনও চম্পা রায় বলে একটা মেয়ে এসেছিল আমার কাছে। কদমফুলের মতো ফাঁপানো চুল। তার আগে একজন আসত। খুব সুন্দরী বিদিশা চ্যাটার্জি না কি যেন নাম। বিয়ে হয়ে আমেরিকায় চলে গেল। কয়েক দিন আগে আরও একটি যুবতী এসেছিল আপনাদের অফিস থেকে, তপতী—

—আসলে মিঃ মুখার্জি, প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে ওপরে ওঠা-না-ওঠা সবই নির্ভর করে পারফরমেন্সের উপর, সে তো আপনি ভালো করেই জানেন। আমাদের পত্রিকার ম্যানেজমেন্ট হল গিয়ে ইন্ডিয়ার অন্যতম টপ ম্যানেজমেন্ট। আমাদের ম্যানেজমেন্ট এইসব এক্সিকিউটিভ র‍্যাঙ্কের অফিসারদের বাছাই করেন অনেক বেছেবুছে, অনেক ভেবেচিন্তে, আগের কোম্পানিতে থাকার সময় আমার যোগ্যতা দেখেই ডেকে এনেছিলেন এঁরা—

—এর আগে কোন কোম্পানিতে ছিলেন আপনি?

—তিনবছর আগে ছিলাম অন্য একটা নতুন ফোর্টনাইটলি 'দিনক্ষণ'এ। খুব ইন্টেলেকচুয়াল পত্রিকা, দেখে থাকবেন নিশ্চয়ই। এই পত্রিকাতেই আমার বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের প্রথম হাতে-খড়ি হয়। পত্রিকাটি এমন চমৎকার সব আর্টিকেল নিয়ে বেরুতে আরম্ভ করল, ছাপাও এমন ঝকঝকে যে পড়ার পর আমি নিজেই তার প্রেমে পড়ে গেলাম। যে সমস্ত কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেয়, তাদের দরজায় গিয়ে হানা দিতে শুরু করলাম। পত্রিকাটি সম্পর্কে তাদের বোঝাতে শুরু করলাম, বললাম, এতদিন পরে বাংলায় একটা ভালো পাক্ষিক বেরিয়েছে। ওই পত্রিকাটিকে আপনাদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত। তা বেশ সাড়াও মিলল। তারপর, কে যেন আমাকে বলল, বিজ্ঞাপন পেতে হলে তোমাকে বোম্বে যেতে হবে। সমস্ত বড়-বড় কোম্পানির হেড-অফিস বোম্বে। শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। তার আগে আমি কখনও বোম্বে যাইনি। তবু বুকে একরাশ কাঁপ নিয়ে একদিন পাড়ি দিলাম বোম্বের উদ্দেশে, হাতে শুধু একটা ব্রিফকেস — তাতে দু-সেট জামা-প্যান্ট, আর 'দিনক্ষণ' এর কয়েকটি সংখ্যা। কিন্তু বম্বে পৌঁছে বুঝলাম, কাজটা কি ভীষণ কঠিন। হিন্দি-বেল্টে গিয়ে একটা বাংলা পত্রিকা, একেবারে নতুন, তার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা অনুভব

করতে পারলাম প্রতিমুহূর্তে। দাঁতের মাজনের কোম্পানি, শেভিং ক্রিমের কোম্পানি, সাবান-কোম্পানি, রেফ্রিজারেটর কোম্পানি, টি. ভি. — সবাই মিলে সেখানে একটা দুর্ভেদ্য পাঁচিল তৈরি করে রেখেছে।

আমি অবশ্য হতোদ্যম হইনি। খুঁজতে লাগলাম, এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে কোথায় বড়-বড় পোস্টে বাঙালি আছে। এক বাঙালি ছাড়া সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ আর কোথায় পাওয়া যাবে। একমাত্র বাঙালিরাই তো সাহিত্যপ্রেমিক হয়। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম সেভিং ক্রিম কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার মিঃ সেনকে, এক সাবান কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তীকে, এক টুথপেস্ট কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বক্সীকে। এঁদের কারো সঙ্গেই বিজ্ঞাপন বিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। সে কোম্পানিতে বিজ্ঞাপন দেখছেন হয় তো একজন দুঁদে মারাঠি, কিংবা পোড়-খাওয়া পাঞ্জাবি, কিংবা জাঁদরেল সাউথ ইন্ডিয়ান। তারা এই নতুন বাংলা পাক্ষিকের নামই শোনেনি। তাদের কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়ার বাসনাও নেই সেখানে। সুতরাং ভেবে দেখলাম তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করে কোনও লাভ নেই। আমি তাই বেছে-বেছে এইসব কোম্পানির কি-পজিশনে থাকা বাঙালিদের গিয়ে ধরলাম। পত্রিকার কপি দেখিয়ে বললাম, এই পত্রিকাটি বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক, একে আপনাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আপনারা তো বিজ্ঞাপনের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। টি. ভি.তে দিল্লি নেটওয়ার্কে মাত্র কুড়ি সেকেন্ডে দু-আড়াই লাখ টাকা বেরিয়ে যায় আপনাদের। আর আমাদের একটা কালার ফুলপেজ মাত্র পনের হাজার টাকা। এ টাকা আপনাদের কোম্পানির কাছে নস্যি।

এভাবে ঘুরে ঘুরে পাঁচটা কালার, সাতটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ে কলকাতা ফিরলাম। আরম্ভ হিসেবে খুব একটা খারাপ নয়। তারপর ক্রমশ প্রতিমাসেই ভালো টাকার বিজ্ঞাপন পেতে শুরু করলাম। আর আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন, যেসব বাঙালিরা এইসব কোম্পানির কি-পজিশনে আছেন, তাঁরা বহুদিন বিজনেসের মধ্যে জীবন-মন সমর্পণ করে বিজনেস মাইন্ডেড হয়ে গেলেও মনের এক গোপন কোণে বাংলা সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রতি একটা অনুরাগ জমা করে রেখেছেন। এমনকি দু-একজনের বাড়িতে গিয়েও দেখেছি তাদের স্ত্রী ছেলে-মেয়ে বাংলার বাইরে থেকে থেকে আরও বাংলা-মনস্ক হয়ে পড়েছে। নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে, পুজো সংখ্যা কিনে এনে আঁতিপাতি পড়ে।

—চমৎকার, রৌণক উচ্ছ্বসিত হল, আপনি যে একজন এ লাইনের কৃতী মানুষ তাতে সন্দেহ নেই।

—তারপর আমার পারফরমেন্স দেখে আমার বর্তমান কোম্পানি এই চাকরিটা অফার করেছে। এখানে চাকরি করাটা অবশ্য আগের চেয়ে অনেক সহজ। এদের মস্ত গুডউইল আছে বাজারে। শুধু টেলিফোন করলেই অনেক বিজ্ঞাপন চলে আসে।

—হুঁ, আমরা যারা মানুষের ডেইলি নিড্‌স্-এর প্রোডাক্ট তৈরি করি, তারাও জানি, আপনাদের কাগজে বিজ্ঞাপন না দিলে আমাদের সেল বাড়বে না।

—তাহলে, এবার পুজোয় আমাদের শারদীয়ায় আপনাদের কালার অ্যাড্ যাচ্ছে তো? সুযোগ বুঝে দেবাশিস মজুমদার তাঁর কাজের কথায় আসেন, গতবার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পেয়েছিলাম, এবারে কালার চাইই চাই।

রৌণক হাসল, দেখা যাক, যদি কোম্পানির বাজেটে কুলোতে পারি। আমাদেরও তো ইচ্ছে করে কালার বিজ্ঞাপন দিতে। তাতে কোম্পানির ইজ্জত বাড়ে তো—

—কুলোবে কুলোবে, দেবাশিস মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন, মনে হচ্ছে লাইম ইন্ডিয়ার ভাগ্য ফিরছে। অন্তত দেবাদ্রি যা বলল আমাকে।

নিজের ভেতর একা মগ্ন হয়ে সব কিছু ভাবছিল রৌণক, সেই মুহূর্তে দেবাশিস মজুমদার হঠাৎ বললেন, বুঝলেন মিঃ মুখার্জি, দেবাদ্রি সেদিন আরও একটা খবর শোনাল। তদন্তের সময় নাকি জানা গেছে, ঐন্দ্রিলা বিয়ের আগে এক কবির প্রেমে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি, কিন্তু বিয়ের পরেও নাকি তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ঐন্দ্রিলার।

রৌণক চমকে উঠল যেন, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, কে বলল যোগাযোগ ছিল?

—দেবাদ্রিই বলল, তারা অনুমান করছে। সেই ব্যর্থ প্রেমিককে ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তো সে-ই—

রৌণক স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে, ঝাপসা হয়ে উঠল তার দৃষ্টি, যেন একপশলা মেঘ আড়াল করে দাঁড়াল তার চোখের সামনে। শরীর জুড়ে ঘনিয়ে আসা প্রবল অস্বস্তি কাটাতে সে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল মুহূর্তে, বলল, নতুন যে ফোর্টনাইটলিটা বেরিয়েছে বললেন, কেমন চলছে পত্রিকাটা?

দেবাশিস মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে মগ্ন হয়ে গেলেন তাঁর নিজের জগতে, দারুণ চলছে। সার্কুলেশন শিগগির এক লাখে পৌঁছবে শুনতে পাচ্ছি।

দেবাশিস প্রায় এক ঘণ্টা নানা কথা বললেন। তারপর বললেন, আজ চলি। তিনি চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে যেতে না যেতেই হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল তার টেবিলে, কানে রিসিভার লাগাতেই শুনল, হ্যালো, মিতুন মুখার্জি বলছি—

—আরে, আপনি এসে ফিরে গেলেন কেন? একটু বসতে পারতেন তো।

—প্রায় পৌনে একঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। তারপর ভাবলাম, টেলিফোনেই তো হতে পারে সাক্ষাৎকারটা। আমার মাত্র তিনটি প্রশ্ন আছে আপনার কাছে।

—টেলিফোনে কি হবে? রৌণক তার সামনে রাখা কোম্পানির টার্ন-ওভার, সেল-ফিগার ইত্যাদিতে চোখ রাখল, হুঁ বলুন, কি জানতে চান! ভাল করে লিখবেন কিন্তু—

—আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্য নামে কাউকে চিনতেন, মিঃ মুখার্জি? ধরুন, আজ থেকে দু-তিনবছর আগে—

রৌণক ভীষণ চমকে উঠল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ফ্যাসফেসে গলায় শুধু বলতে পারল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

—যা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দিন।

—হুঁ, অস্ফুট গলায় রৌণক বলল, চিনতাম একসময়।

—আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিয়ের পরও তার সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, অথচ সায়ন চৌধুরী তা জানতেন না কেন?

রৌণক চুপ করে রইল। তার শরীরের ভেতর তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সাংবাদিকদের নজর তার ওপর পড়ল কী করে? কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে বলল, সে অনেক কথা। সব এই মুহূর্তে বলা যাবে না।

—আমার তৃতীয় প্রশ্ন, পাঁচই এপ্রিল সন্ধে সাতটার পর আপনি ঐন্দ্রিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন? আপনি নিশ্চয় মনে করতে পারেন সেদিন রাতেই ঐন্দ্রিলা খুন হয়।

মাথায় বজ্রপাত হবার মতোই চমকে উঠল রৌণক। তার হাতের টেলিফোন ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আপনি কী করে জানলেন? তৎক্ষণাৎ ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠের হাসির আওয়াজ শুনল রৌণক, একটু পরে ভেসে এল, ঠিক আছে, পরে একসময় এর উত্তর জেনে নেব আপনার কাছ থেকে। আপনি যে ব্লু-ওয়ান্ডারে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ আজই পেয়েছি, আপনার চেম্বারে গিয়েই।

ওপাশে টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ। রিসিভার হাতে নিয়ে রৌণক কিছুক্ষণ হতভম্ব। বিমূঢ় হয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ কি খেয়াল হতে তার টেবিলের ডেস্ক-ক্যালেন্ডারটির পৃষ্ঠা উল্টে দেখল, পাঁচই এপ্রিলের পৃষ্ঠাটি কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। কী লেখা ছিল পৃষ্ঠাটিতে তা এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না। তার অনুপস্থিতিতে সাংবাদিকটি এমন একটি মোক্ষম অস্ত্র নিয়ে গেল ভাবতেই গায়ে যেন জ্বর এসে গেল তার। মনে হল. সে এক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি। কী করে এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে তা বুঝে উঠতে পারল না।

প্রবল আচ্ছন্নতার ভেতর শুধু মনে পড়ল, কয়েকদিন ধরেই একটি বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে কাগজে, তাতে লেখা, 'আপনার বয়স যদি হঠাৎ পাঁচ, দশ বা পনেরো বছর কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আপনি কী করবেন?' ব্যস, আর কিছু নেই। প্রথমদিন বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল ছোট্ট করে, তার পরদিন বেরুল একটু বড় করে, পরদিন আরও একটু বড় আকারে — পনেরো সেন্টিমিটার বাই তিন কলাম। আজ বেরিয়েছে একেবারে কোয়ার্টার পেজ জুড়ে।

বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়তেই রৌণকের মনে হল, অন্তত বছর পাঁচেক বয়সও যদি কমে যেত তার, তাহলে এমন অক্টোপাসের মুখোমুখি হতে হত না। সে বড় সুখের সময় ছিল।

প্রায় সারাটা রাত না ঘুমিয়ে ল্যাবরেটরিরুমে কাজ করেছে সায়ন। যে নতুন গায়ে-মাখা সাবানটি সে এবার মার্কেটে ছাড়তে চলেছে, তাতে ওতপ্রোত হয়ে থাকবে এমন একটি চমৎকার ফ্লেভার, যা শুধু এ রাজ্যে নয়, অল ইন্ডিয়া মার্কেটেও সাড়া জাগাবে বলে তার বিশ্বাস। তারই জন্য তার এত ব্যস্ততা, এত পরিশ্রম — কখনও গভীর রাত পর্যন্ত, কোনও দিন বা সারারাত। সকালে চায়ের আসরে বসে গার্গীকে বলল, আজ আমি সোজা ফ্যাক্টরিতে যাব, তুমি অফিসটা একাই সামলিয়ো। ফ্যাক্টরি হয়ে অফিস ফিরতে আমার বেলা তিনটে-টিনটে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যে গার্গী তার অফিসের কাজকর্ম এত দ্রুত পিকআপ করে নিয়েছে যে

তা দেখে সায়ন খুবই অবাক, উৎফুল্লও। এই অল্প সময়ের মধ্যে অফিসের সব ব্যাপারেই একটা নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে গার্গীর। চমৎকার সব সাজেশনও দিচ্ছে একের পর এক। তা ছাড়াও তার চালচলনে, কথাবার্তায়, চাউনিতে সামান্য কম্যান্ডের ছোঁয়াও দেখতে পাচ্ছে সায়ন, যে কম্যান্ডটুকু না থাকলে এত বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজ সামলানো সম্ভব নয়। এতদিন গার্গীকে ঠিক এ ভাবে চেনেনি সায়ন। ঐন্দ্রিলা ছিল শান্ত, নরমস্বভাবের, মৃদুবাক। পাশাপাশি গার্গীর তুখোড় ব্যক্তিত্ব নজর কাড়ে সহজেই।

বিশেষ করে গার্গীর একটা বড় গুণ, সে অফিসের সর্বস্তরের কর্মীর সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছে এক আশ্চর্য দক্ষতায়। যে কোনও স্তরের কর্মীর সঙ্গে দেখা হলেই তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে নড করছে, অর্থাৎ ইঙ্গিতে বলা, কি, কেমন চলছে। তাতে সবার সঙ্গে গড়ে উঠেছে এক হার্দ্য সম্পর্ক। সেদিন অ্যাকাউন্টস সেকশনের কে একজন যেন সায়নের ঘরে এসে খুব প্রশংসাও করছিল ম্যাডামের। ম্যাডাম তার টেবিলে গিয়ে নিজে হাতে অ্যাকাউন্টসের কাজকর্ম শিখেছেন।

গার্গীকে সে কথা বলতেই সে হাসল, আসলে আমি অফিসের ভেতর ঘুরে ঘুরে নজর রাখছি, আবার কেউ স্যাবোটেজ করার উদ্যোগ নিচ্ছে কি না। সেদিন কালীজীবনবাবুর টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি, একজন বাইরের লোক দাঁড়িয়ে। লোকটা নাকি প্রায়ই আসে। পরে কালীজীবনবাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, ওর নাম লোটন। খুব ভাল ছেলে। ওঁদেরই পাড়ায় থাকে। যে রাতে মেসিন বার্স্ট করেছিল, সেদিন নাকি ওকেই সঙ্গে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে টেলিফোন করতে গিয়েছিলেন। অথচ লোটন নাকি লাইম ইন্ডিয়ায় চাকরি করে।

সায়ন আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি! লোকটা কালীজীবনবাবুর কাছে আসে কেন?

—সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাতে উনি বললেন, লোটন খুব বিশ্বাসী ছেলে। লাইম ইন্ডিয়ার অনেক খবরাখবর তাঁর কাছে এনে দেয়! লাইম ইন্ডিয়া যে হুইস্পারিং ক্যাম্পেন শুরু করেছে প্যারাডাইসের বিরুদ্ধে, সে খবর লোটনই এনে দিয়েছিল।

—মাই গুডনেস! সায়ন বিস্মিত হল।

গার্গী চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আমি কালীজীবনবাবুকে মৃদু ধমক দিয়েছি। বলেছি, উল্টোটাও তো হতে পারে। লোটন হয়তো প্যারাডাইসের খবরও নিয়ে যাচ্ছে লাইম ইন্ডিয়ায়। তাতে কালীজীবনবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, না ম্যাডাম, তা হতে পারে না। লোটন খুবই বোকাসোকা ছেলে। তবু আমি কালীজীবনবাবুকে বলে দিয়েছি, আপাতত লোটন যেন এ অফিসে না আসে।

—ফাইন! সায়ন চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, কিন্তু ব্যাপারটা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগছে আমার, তুমি এ-দফতরে ও-দফতরে চরকির মতো ঘোরো বলেই লোটনকে তোমার নজরে পড়েছে। আমি তা জানতেই পারিনি এতদিন। কেমন মনে হল লোটনকে?

সেই মুহূর্তে পাশের ফ্ল্যাট থেকে একটা পপসঙের সুর ভেসে আসতেই সায়নের মুখখানা শক্ত হয়ে গেল সহসা। গার্গীও অবাক হল। এই সাতসকালেই কি না রবার্ট এসে পড়েছে চন্দ্রাদেবীর কাছে! লোকটা আজকাল যেন একটু বেশিই আসছে, অসময়েও আসছে। কি এত দরকার থাকে তার এ বাড়িতে কে জানে। কদিন ধরে গার্গীর এও নজরে পড়ছে, কে যন ওদের ফ্ল্যাট থেকে ক্রমাগত নজরদারি করছে তাকে, বড় ভীষণভাবে লক্ষ্য করছে

একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ।

ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে আটটার মধ্যেই ফ্যাক্টরির দিকে বেরিয়ে গেল সায়ন। তার গাড়ি সে নিজেই ড্রাইভ করে যায়। গার্গীর জন্য অন্য একটি গাড়ি আসে সাড়ে নটায়। এই অল্প সময়ের মধ্যে গার্গী নিজে খেয়ে সায়নের জন্য লাঞ্চ নিয়ে যাবে অফিসে। অতএব নির্বিঘ্নমনে দ্রুত ফ্যাক্টরিতে পৌঁছেই একটা মিটিং সেরে নিল প্রোডাকশন ম্যানেজার আর ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে।

আজকাল ফ্যাক্টরিতেও জোর কর্মতৎপরতা। সবাই বুঝতে পারছে এই নতুন প্রোডাক্টটির সাফল্য-ব্যর্থতার উপর অনেকখানি নির্ভর করছে কোম্পানির অস্তিত্ব। সায়ন সবাইকে বলে দিয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাজারে নতুন প্রোডাক্ট পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ এর একটি তথ্যও যেন বাইরে লিক-আউট না হয়ে যায়। কেন এই গোপনীয়তা, তা কাউকে বলেনি, তবু সবাই মোটামুটি আঁচ করে নিয়েছে ব্যাপারটা। কোম্পানির যে সংকট চলছে, তার আঁচ যেন নতুন প্রোডাক্টের গায়ে না লাগে। এমনকি মধুমন্তী রায়মজুমদারকেও বলে দেওয়া হয়েছে, প্রোডাক্ট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কোনও অ্যাড যেন না দেওয়া হয় কাগজে।

এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও গার্গী একদিন সায়নকে বলেছে, সে প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্তকে বিশ্বাস করছে না। তার চালচলন, মতিগতি ভাল ঠেকছে না তার কাছে। সায়ন অবশ্য বলেছে, প্রোডাকশনের ব্যাপারে এটুকু বিশ্বাস রাখতেই হবে তার উপর। আর সেই জন্যেই কৌশিক দত্তকে ইদানীং বেশ গুড হিউমারে রেখেছে। নানান জটিল ব্যাপার নিয়ে আলোচনাও করছে তার সঙ্গে, যাতে কৌশিক দত্তর ধারণা হয়, সে কোম্পানির যথেষ্ট আস্থাভাজন অফিসার।

ফ্যাক্টরি সেরে সায়ন অফিসে ফিরে এল তিনটের একটু আগেই। ফিরে এসে দেখল, অফিসেও দারুণ তৎপরতা। হঠাৎ যেন কাজের জোয়ার এসেছে। গার্গী তার নিজের চেম্বারে নেই, বসে আছে কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রের সামনে। খুব গভীরভাবে আলোচনা করছে তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা, যাতে একই দিনে সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া যায় তাদের নতুন প্রোডাক্ট। এই সাবানটি বাজারে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত গাত্রদাহ শুরু হয়ে যাবে লাইম ইন্ডিয়ার ম্যানেজমেন্টের। তারা হয়তো আবারও আজেবাজে অ্যাড দিয়ে এই প্রোডাক্টটিরও গুডউইল নষ্ট করার চেষ্টা করবে। তাদের দাঁত ও নখ বাড়িয়ে দেওয়ার আগেই বাজারে ধরিয়ে দিতে হবে নতুন সাবানটি। সায়নের ধারণা, একবার প্রোডাক্ট বাজারে ধরে গেলে তার বাজার নষ্ট করে দেওয়া একটু কঠিন। করলেও সময় লাগবে। তার মধ্যে হু-হু করে সেল বাড়িয়ে নিতে হবে। আর তার জন্যেই প্রোডাকশন এবং মার্কেটিং — দু ক্ষেত্রেই তাকে এগোতে হচ্ছে টায়েটায়ে অঙ্ক কষে।

আগে একবার প্রবল ধাক্কা খেয়েছে বলেই এবারে এমন কড়া সতর্কতা। মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রোডাকশনে হঠাৎ যেভাবে মার খেয়ে গেল তারা, তা আগে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। ইতিমধ্যে বোম্বের মার্কেট থেকে এ ধরনেরই একটা ডিটারজেন্ট পাউডার এসে দারুণ রমরমা ব্যবসা করছে কলকাতায়। সায়ন নিশ্চিত, তার মগজ থেকে যে ফর্মুলাটা বেরিয়েছে, তা দিয়ে তৈরি ডিটারজেন্ট পাউডার বেরুলে বোম্বের প্রোডাক্টকেও তারা হারিয়ে দিতে পারত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায়ন ভাবল, অতএব নতুন গায়ে-মাখা সাবানটিই এখন তাদের কোম্পানির ট্রাম্পকার্ড। রোজবেরি, ড্রিমবাথের পাশাপাশি তাদের নতুন সাবান...

না, নতুন সাবানটির নাম সে এখনও প্রকাশ করেনি কারও কাছে। একমাত্র গার্গীর সঙ্গেই কাল রাতে শোবার আগে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেছে প্রোডাক্টটি নিয়ে। তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু তা নিয়েও।

এতসব ভাবতে ভাবতে লাঞ্চ-আওয়ারের পর তার কাজে মন দেবে বলে সবে প্রস্তুত হয়েছে সায়ন, ঠিক সে সময় হঠাৎ গার্গীর প্রবেশ, স্যার, আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি আলোচনা ছিল—

সায়ন বড় করে হাসল। গার্গী মাঝেমধ্যে এ ভাবেই তাকে চেম্বারে একা পেলে রসিকতার সুরে কথা বলে। সেও গম্ভীরভাবে বলল, বলুন এম. ডি সাহেব।

—আমার মনে হয়, এই স্টেটে যখন আমাদের প্রোডাক্টের সেল নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে, তখন একইসঙ্গে বাইরের স্টেটগুলোতেও আমরা প্রোডাক্ট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

—রাইট ইউ আর, সায়ন অ্যাপ্রুভ করার ভঙ্গিতে বলল, কথাটা আমিও ভাবছিলাম কদিন ধরে। অন্তত প্রথম দফায় বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র — এ রকম কয়েকটা স্টেটে যদি সেলস ক্যাম্পেন করি—

—আমি কমার্শিয়াল ম্যানেজারের সঙ্গে সেই আলোচনাই করে এলাম এক্ষুনি। মিঃ মিত্রও রাজি হলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, তিনি নিজে অন্তত দুটো স্টেট ঘুরবেন। এক্সটেনসিভলি—

—বাহ্, সায়ন চমৎকৃত হল। গার্গী এর মধ্যে অনেক ডিসিশন নিজেই নিচ্ছে, সায়নের সঙ্গে পরামর্শের অপেক্ষা না করেই, যাতে পরিকল্পনাটা রূপায়িত হতে পারে যত দ্রুত সম্ভব। হেসে বলল, তা হলে চলো, বাকি স্টেটগুলো তুমি আর আমি মিলে ঘুরে আসি কয়েকদিন। একটু বেড়ানোও হবে—

গার্গী হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, দুজনেই! কিন্তু একবার বেরুলে তো সাত-দশদিনের আগে কলকাতা ফেরা যাবে না। এ মুহূর্তে অফিস ছেড়ে দুজনেরই চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? একেই তো স্যাবোটেজের আশঙ্কায় ঘুম হচ্ছে না আমাদের।

—তা হলে কী বলছ? আমি একাই ঘুরে আসব?

—হ্যাঁ, একাই তো যাওয়া উচিত, বলেই গার্গী সহসা কুঁকড়ে গেল, সে ক্ষেত্রে একা আমিই বা থাকব কোথায়?

—ঠিকই, আসন্ন সমস্যার কথা উপলব্ধি করে সায়নও থমকে গেল মুহূর্তে। মাসদেড়েক আগে শেষবারের মতো যখন ট্যুরে বেরিয়েছিল বিলাসপুরে, ঐন্দ্রিলা একাই ছিল বাড়িতে। সেই ট্যুর থেকে ফেরার মুহূর্তেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তার সর্বনাশের পালা, যার রেশ তার জীবন থেকে এখনও কাটেনি, সে জানে কাটবেও না আর কোনও দিন, এ কলঙ্কদাগ একবার গায়ে লাগলে তা লেগে থাকে বাকি জীবন। সে এও জানে, এখন কলকাতার তাবৎ মানুষ তাদের শরৎ বোস রোডের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আঙুল তুলে দেখায়, এই দ্যাখো, এই সেই বাড়ি, যেখানে ঐন্দ্রিলা নামে এক ভারি সুন্দরী বউ—

গার্গীর কথার উত্তরে অন্যমনস্কের মতো সায়ন ঘাড় নাড়ল, ঠিকই তো, কোথায় থাকবে

তুমি, একা-একা।

গার্গী তার চেম্বারে ফিরে যাওয়ার একটু পরেই সায়নের চেম্বারে এসে ঢুকলেন মধুমন্তী রায় মজুমদার। মধুমন্তী আজকাল প্রায়ই টুকটাক কাজ নিয়ে তার কাছে আসেন, একটু প্রগলভও হয়ে ওঠেন কখনও-সখনও। হঠাৎ করেই যেন বেশ বদলে গিয়েছেন মধুমন্তী। কদিন আগেও যিনি ছিলেন বিষণ্ণতার প্রতীক, মুখের হাসিটি ছিল ম্লান, এখন হঠাৎ তাঁর চলনে বলনে হাসিতে এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে প্রিন্টেড রঙিন সিল্ক শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউজ গায়ে, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। তার সামনে বসে মিষ্টি করে হেসে বললেন, স্যার আপনি কিন্তু এখনও নতুন প্রোডাক্টের নাম বলেননি আমাকে। নাম না জানলে অ্যাডের কপি লেখা যাচ্ছে না। অ্যাড-এজেন্সি থেকে রোজই লোক আসছে—

সায়ন হাসে, দেব দেব। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা একটু সিক্রেট রাখছি। সমস্ত প্রোডাক্ট আগে মার্কেটে পৌঁছে যাক, তারপর বড় করে বিজ্ঞাপন বেরুবে কাগজে। হই-হই করে।

—স্যার, আমাদের নতুন এম. ডি. কাল আমার চেম্বারে এসেছিলেন। অনেক খোঁজখবর নিলেন বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। কয়েকদিন আগেও আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন, অ্যানুয়াল বাজেট কত, কোন সিজনে কত টাকার অ্যাড কাগজে দেওয়া হয়, কোন প্রোডাক্টকে আমরা বেশি হাইলাইট করি ইত্যাদি।

—তাই নাকি? সায়ন যেন ব্যাপারটা জানতই না এমন মুখভঙ্গি করল। আসলে কাল রাতে গার্গীই তাকে মধুমন্তী সম্পর্কে সতর্ক হতে বলেছে। হঠাৎই নাকি গার্গী কাল ঢুকে পড়েছিল মধুমন্তীর চেম্বারে। ঢুকে একটু হতচকিতই হয়ে পড়েছিল, কারণ সে মুহূর্তে মধুমন্তীর সামনে বসে ছিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত, খুব নিচু গলায় কথা বলছিলেন দুজনে, হঠাৎ গার্গীকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। আরও আশ্চর্য এই যে, দুজনে তখন বেশ মৌজ করে সিগারেট খাচ্ছিল। সায়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, মধুমন্তীও! গার্গী উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম। আমাকে দেখেই অবশ্য সিগারেট নিভিয়ে ফেলেছিল ওরা। একটু থতমতও খেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু গার্গীর মুখে যে কথাটা শুনে সত্যিই অবাক হয়েছিল সায়ন, তা হল পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যালের তদন্তের হদিস পেয়ে। ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর তার ঘরে নাকি একটি আধপোড়া সিগারেট পাওয়া গিয়েছিল অ্যাশট্রের ভিতর, লেডিজ সিগারেট। ঐন্দ্রিলা কখনও শখ করেও সিগারেট খায়নি সংবাদটি জানানোয় দেবাদ্রি সান্যালের অনুমান, তা হলে হত্যাকারীদের কেউ একজন মহিলা ছিলেন এবং সিগারেট খেয়েছিলেন তিনিই। সেই মহিলা কি তা হলে—

কৌশিক দত্তের সঙ্গে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন মধুমন্তী, এ খবর জেনে ভুরুতে কোঁচ পড়েছিল সায়নেরও। পরক্ষণেই গার্গী তার সহজাত ক্ষমতায় অদ্ভুতভাবে বিশ্লেষণ করেছিল মধুমন্তীর ইদানীংকার চালচলন সম্পর্কে। মধুমন্তী সম্পর্কে সে দিন সন্দেহ প্রকাশ করেছিল দেবাদ্রি সান্যালও। গার্গীও কড়া নজর রেখেছে তার ওপর। সে খবর নিয়ে জেনেছে মধুমন্তীর সম্ভবত একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কৌশিক দত্তের সঙ্গে। আজকাল প্রায়ই নাকি

দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। হয়তো তাইই মধুমন্তীকে ঘিরে গার্গীর এ হেন সন্দেহ। সে দিন দেবাদ্রি সান্যাল গার্গীকে বলেছিলেন, পাঁচই এপ্রিল মধুমন্তী তাঁর এক পুরুষবন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন আউটিঙে। রাতে ফেরার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত আর ফিরতে পারেননি। অতএব মধুমন্তীর পক্ষে সে রাতে ঐন্দ্রিলার কাছে পৌঁছনোটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। হয়তো ঐন্দ্রিলা চিনত প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারকে। তার সঙ্গে সেই পুরুষ বন্ধু অর্থাৎ কৌশিক দত্তের থাকাটাও হয়তো সম্ভব। যে কৌশিক দত্তের চালচলনও ইদানীং সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে, ফ্যাক্টরি কিংবা অফিসে স্যাবোটেজের পেছনে তার হাত আছে বলে ভাবছে সায়ন, তার পক্ষে মধুমন্তীর সহযোগিতায় ঐন্দ্রিলাকে—

এমন ভাবনার মধ্যেই মধুমন্তী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, স্যার, আবার নাকি ট্যুরে বেরুচ্ছেন?

কৌশিক-মধুমন্তীর ভাবনায় এমনই ডুবেছিল সায়ন যে, মধুমন্তী তার সামনে বসে আছে খেয়ালই ছিল না। সম্বিত ফিরতে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

—এ বারও নাকি একা যাচ্ছেন?

সায়ন চমকে উঠল হঠাৎ। কেনই বা এ কথা জানতে চাইছে মধুমন্তী, বুঝতে পারল না। কি এক অজানা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল যেন।

—স্যার, বলছিলাম ম্যাডামকেও সঙ্গে নিয়ে যান। একা থাকতে হয়তো ওঁর অসুবিধে হতে পারে।

আবারও বিস্মিত হয়ে মধুমন্তীর কথার অর্থ বুঝতে চাইল সায়ন। মধুমন্তী কি চাইছে, গার্গী তার সঙ্গে ট্যুরে যাক! ফাঁকা হয়ে যাক অফিসটা! তা হলে তাদের পক্ষে আবারও একটা স্যাবোটেজ করতে সুবিধে হবে! হেসে বলল, ঠিক আছে, ভেবে দেখি।

কাল আরও একটা খবর পেয়েছে সায়ন। লাইম ইন্ডিয়ার রাহুল রায়কে বরখাস্ত করেছেন ওদের চেয়ারম্যান। একেবারে অতর্কিতেই চিঠিটা ধরানো হয়েছে তাকে। তার জায়গায় কৌশিক দত্ত নাকি জয়েন করতে চায়। তাইই কি যাওয়ার আগে কৌশিক দত্ত একটা চরম আঘাত দিয়ে যাবে বলে ভেবে রেখেছে! তাইই কি গার্গীকে নিয়ে যেতে বলছে মধুমন্তী।

ভাবতে ভাবতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সায়ন, হঠাৎ চমক ভাঙল মধুমন্তীরই কথায়, স্যার, আজকাল খুব অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড হয়ে পড়ছেন—

সায়ন সম্বিত ফিরে পেয়ে মধুমন্তীর দিকে তাকায়। লিপস্টিক-রঞ্জিত লাল ঠোঁটের ভেতর সাদা ধবধবে দাঁতের সারি বার করে হাসছে মধুমন্তী। আজকের হাসির ধরনই যেন একটু আলাদা। সে হাসিতে সায়নের মতো অবিচল পুরুষের মনেও বোধহয় চাঞ্চল্য জাগায়। থিতু হতে সে বলল, আসলে খুব টেনশনে আছি, বুঝলেন। এমনিতেই টার্নওভার ফল করেছে। তার ওপর বহু টাকা ইনভেস্ট করে নতুন প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়া হচ্ছে, এটাতেও লস খেলে কোম্পানি মাজা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়বে। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই থাকবে না।

—এ সব নিয়ে আপনি এত কিছু ভাববেন না, স্যার, মধুমন্তী আবার চমৎকার হাসিতে তার শরীরে ঝঙ্কার তুলল, এ বার অ্যাডের যা স্কিমিং হয়েছে, তাতে দেখবেন, হু-হু করে বাজার ধরে নিয়েছে প্যারাডাইসের নতুন প্রোডাক্ট।

—ঠিক আছে, কাল-পরশু একবার দেখাবেন তো স্কিমটা। অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে এ বারের সাফল্য।

পরদিন সকাল-সকাল ফ্যাক্টরিতে যেতেই ভারি চমৎকৃত সায়ন। একটা উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল তার শরীরে। সারা ফ্যাক্টরির হাওয়ায় তখন উড়ে বেড়াচ্ছে জুঁইফুলের গন্ধ। কারখানার লেবার থেকে ওয়ার্কস ম্যানেজার সবাই ওতপ্রোত হয়ে ডুবে আছে জুঁইয়ের চমৎকার সুবাসে। তার কয়েক রাত্রির জাগরণের ফলে এই নতুন ফর্মুলাটি আবিষ্কৃত হয়েছে। তারই জের হিসেবে জুঁইফুলের গন্ধমাখা এই নতুন প্রোডাক্ট।

গন্ধটা নাকে শুঁকতে শুঁকতে বেশ কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে রইল সায়ন নিজেই। তা হলে তার ফর্মুলা ঠিক ঠিক রূপায়িত হয়েছে ফ্যাক্টরিতে। দু-একদিনের মধ্যেই নতুন প্যাকে মুড়ে ঝকঝকে চেহারায় বেরিয়ে আসবে তাদের কোম্পানির নতুন সাবান।

ওয়ার্কস ম্যানেজারকে একটা মস্ত থ্যাঙ্কস জানিয়ে অফিসের দিকে ফিরে চলল সে। প্রোডাকশন ম্যানেজার আজ আসেননি এখানে। অবশ্য তাঁর না আসার কারণ সায়ন নিজেই। দিনদুয়েক আগে গার্গী সতর্ক করে দিয়েছে সায়নকে, প্রোডাক্ট ফাইনাল হয়ে যেদিন বেরুবে সেদিন কৌশিক দত্তকে কোনও একটা কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতে। সে ভাবেই কাল কৌশিক দত্তকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে নর্থ বেঙ্গলে। দিন চারেকের ট্যুর দিয়ে বলেছে, আমার নিজেরই নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার দরকার ছিল মিঃ দত্ত, কিন্তু এই মুহূর্তে যেতে পারছি না। আপনি আমার হয়ে কাজটা মিটিয়ে আসুন। ফ্যাক্টরির দিকটা আমি ওয়ার্কস ম্যানেজারকে দিয়ে চালিয়ে নেব।

অফিসে এসেও জুঁইফুলের গন্ধের ব্যাপারটা কারও কাছে ভাঙল না সে। বলবে, আরও দু-একদিন পরে। অবশ্য সে জানে, ফ্যাক্টরির কোনও এমপ্লয়ি নিশ্চয় চাউর করে দেবে কাল অথবা পরশু। তবু যতক্ষণ পারা যায়—

পরদিন সকালে চায়ে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ কাগজে একটা বিজ্ঞাপনের দিকে নজর পড়তে বেশ চমকে উঠল সায়ন। গত কয়েকদিন ধরেই ক্রমাগত একটা বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছিল কাগজে : আপনার বয়স যদি হঠাৎ পাঁচ, দশ কিংবা পনেরো বছর কমিয়ে দেওয়া যায় তা হলে আপনি কী করবেন?

সায়ন বুঝতে পারেনি কারা দিচ্ছে বিজ্ঞাপনটা। বিজ্ঞাপনের নীচে কোনও কোম্পানির নাম ছাপা হচ্ছিল না। আজ দেখল, সেই একই বিজ্ঞাপন, শুধু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও কয়েকটি লাইন : যদি আপনার ত্বক আরও মোলায়েম আরও মসৃণ হয়, যদি আপনার স্নানের পর সারাদিন ধরে গায়ে ফুরফুর করে জুঁইফুলের গন্ধ...

বিজ্ঞাপনটা পড়ে ভুরু দুটোয় অনেকক্ষণ কোঁচ পড়ে রইল সায়নের। কারা প্রতিদিন এই অ্যাডটা দিচ্ছে তা এখনও বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয়নি। অ্যাড-এজেন্সিও নতুন। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে তার, হয়তো কোনও সাবানের বিজ্ঞাপনই এটা।

ভাবনাটা তার মগজে চক্কর দিতেই হঠাৎ প্রবল একটা ধাক্কা খেল সে। হু-হু করে রক্তচাপ বেড়ে গেল যেন। তা হলে কি অন্য কোনও কোম্পানি প্যারাডাইসের আগেই তৈরি করে ফেলল জুঁইফুলের গন্ধভরা সাবান! তাইই যদি হয়, তবে তো ভীষণ সর্বনাশ হয়ে যাবে তাদের কোম্পানির। তা হলে তার এতদিনকার ল্যাবরেটরিতে না-ঘুম পরিশ্রম, তার আবিষ্কৃত ফর্মুলা সবই ব্যর্থ, নিষ্ফল। এত্ত টাকা সে ইনভেস্ট করেছে এবার—

তবে কি তার ফর্মুলা কোনও ভাবে পাচার হয়ে গেছে অন্য কারও কাছে। হয়তো লাইম

ইন্ডিয়ারই কেউ গোপনে জেনে গেছে তার পরিশ্রমের ফল।

সহসা শরীরের ভেতর কি এক কাঁপুনি শুরু হল সায়নের। গার্গীর কাছে সে তো বড় মুখ করে বলেছিল, দেখো, এ বার যা একখানা প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়ছি—

চা খেতে খেতে হঠাৎ আড়চোখে একবার গার্গীর দিকে তাকাল সে। গার্গী একমনে তাদের কোম্পানির লস অ্যান্ড প্রফিটের ব্যালান্স-শিটটা দেখছে। কালই নাকি চিফ অ্যাকাউন্টস্ অফিসারকে বলে সে তিন বছরের ব্যালান্স-শিট আনিয়ে নিয়েছে। সায়ন একবার ভাবল, বিষয়টি নিয়ে গার্গীর সঙ্গে আলোচনা করবে কি না। কিন্তু তাতে নিশ্চিত শক পাবে গার্গী।

খুবই অন্যমনস্কভাবে সেদিন ফ্যাক্টরি ঘুরে দুপুরবেলা অফিস পৌঁছেই মধুমন্তীকে ডেকে পাঠাল সায়ন, অ্যাটাচি খুলে সেদিনকার খবরের কাগজটা বার করে মেলে ধরল মধুমন্তীর সামনে, দেখুন তো মিসেস রায় মজুমদার, এটা কাদের বিজ্ঞাপন। যে অ্যাড-এজেন্সির নাম দেওয়া আছে বিজ্ঞাপনের নীচে ছোট্ট করে, সে এজেন্সি কাদের আপনি নিশ্চয় জানেন। এটা তো লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপনও নয়!

মধুমন্তী হঠাৎ মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল সায়নের দিকে তাকিয়ে। তার হাসির রকম দেখে হঠাৎ খুবই রাগ হয়ে গেল সায়নের। ভদ্রমহিলা কয়েকদিন ধরে যেন অতিরিক্ত প্রগলভতা দেখাচ্ছেন তার ঘরে এসে। আজও একটা থ্রি কোয়ার্টার ব্লাউজ পরে এসেছেন। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। কথায় কথায় শুধু হেসে উঠছেন।

হাসতে হাসতেই বললেন মধুমন্তী, স্যার, আপনি কিছু জানেন না?

সায়ন আশ্চর্য হয়ে বলল, না—

—স্যার এটা তো আমাদেরই নতুন প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন। জুঁইফুলের গন্ধভরা যে নতুন সাবান তৈরি হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরিতে, তারই।

—সে কি, সাতদিন ধরে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, অথচ আমিই জানলাম না। তা ছাড়া, সাবানে যে জুঁইফুলের গন্ধ মেশানো হচ্ছে, সেটা তো মাত্র কালই ফ্যাক্টরিতে জানাজানি হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা আমি স্ট্রিক্টলি কনফিডেন্সিয়াল রেখেছিলাম—। আপনি কখন সে খবর জোগাড় করে কাগজে অ্যাড দিলেন?

—স্যার, আর কেউ না জানলেও আমাদের এম.ডি তো জানেন। তিনিই তো সাতদিন ধরে এই বিজ্ঞাপন বেরুবে এমন প্ল্যানিং করেছেন। এমনকি এ বারের বিজ্ঞাপনের কপিও তাঁর নিজের হাতে করা। এই যে, আপনার বয়স যদি হঠাৎ—

—স্ট্রেঞ্জ, সায়নের চোখের পলক পড়ছে না। গার্গী তা হলে ব্যাপারটা তার কাছেও চেপে গিয়েছে! তার অগোচরে মধুমন্তীকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়েছে ! তাইই মধুমন্তী এ কদিন ধরে খুব এনজয় করছে ব্যাপারটা!

মধুমন্তী আবার বললেন আরও আছে স্যার। কাল এই বিজ্ঞাপনটাই আবার রিপিট হবে। আমাদের কোম্পানির নাম না দিয়েই। কেবল পরশু বেরোবে এর সঙ্গে আর এক লাইন : মসৃণ ত্বকের জন্য নতুন সাবান : জেসমিন ফ্লেভার সোপ। এই দেখুন স্যার, লে-আউট।

সায়ন থতমত খেয়ে গেল, নতুন সাবানের নামও তো সে কারও কাছে প্রকাশ করেনি। একমাত্র গার্গীর কাছে ছাড়া। অথচ সেই সাবানের নাম দিয়ে বিজ্ঞাপনের লে-আউট পর্যন্ত

তৈরি হয়ে গিয়েছে!

—স্যার এ বারের বিজ্ঞাপনের ক্যাপসন কিন্তু দারুণ হয়েছে। কারা বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছে কেউ জানে না, অথচ সর্বত্র এক মজার আলোচনা হচ্ছে। যদি বয়স সত্যিই কমে যায় তা হলে কে কী করবে। এমনকি আমাদের অফিসের এক টাইপিস্ট বলছে, যদি বয়সটা কমে যেত, তা হলে সে আর একবার পি.এস.সি-তে কমপিট করে ক্লার্ক হওয়ার চেষ্টা করত, যাতে আর টাইপ না করতে হয় তাকে। আবার একজন বলছে, বয়স কমে গেলে সে ফুটবলার হওয়ার চেষ্টা করত। এমনকি অ্যাকাউন্টস সেকশনের বয়স্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট হরিগোপালবাবু বলছেন, বছর পনেরো বয়স কমে গেলে আমি অন্য কোনও একটা মেয়েকে বিয়ে করতাম। আমার এই বউটা একদম বাজে, বলতে বলতে হেসে উঠল মধুমন্তী, অথচ কেউ কিন্তু জানে না এটা আমাদের কোম্পানিরই বিজ্ঞাপন। সিক্রেসি বজায় রাখার জন্য আমরা অ্যাড-এজেন্সি পর্যন্ত বদলে ফেলেছি এবার।

শুনতে শুনতে অবাক হল সায়ন। মুগ্ধ, উল্লসিতও হল। গার্গী তা হলে সবার অগোচরে এমন অদ্ভুত সব প্ল্যানিং করেছে! সায়নের সঙ্গে কোনও রকম পরামর্শ না করেই। সারপ্রাইজিং তো!

সেদিন বিকেলের দিকে তার চেম্বারে একলাটি বসে আছে, হঠাৎই তার কাছে একজন অচেনা লোক একটা চিঠি দিয়ে গেল। সিল করা ব্রাউন রঙের খাম। সায়ন চিঠিটা খুলতেই বেশ আশ্চর্য, স্তম্ভিতও। কৌশিক দত্তের রেজিগনেশন লেটার। তাতে লেখা, আপনার কোম্পানিতে কাজ করে কোনও দিনই জব স্যাটিসফেকশন পাইনি। কোম্পানির সব প্রোডাক্টেরই এ বি সি থেকে জেড পর্যন্ত আপনার নিজের হাতে তৈরি। প্রোডাকশন ম্যানেজারের কোনও রোলই নেই তার মধ্যে। শুধু অন্যের ফর্মুলা ইমপ্লিমেন্ট করতে কারই বা পছন্দ হয় বা ভাল লাগে। নিজের সৃষ্টির রূপায়ণও তো দেখতে ইচ্ছে হয়। তাইই—

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে রইল সায়ন। এ রকম একটা আশঙ্কা সে একেবারে না করেনি তা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল অভাবিত। হঠাৎ কৌশিক দত্ত চলে গেলে খুবই অসুবিধে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিঙের চূড়ান্ত রহস্যটুকু সায়নের হাতে থাকলেও, কৌশিক দত্ত এই কোম্পানির অনেক কিছুই জানে, অনেক ফর্মুলা, গোপন তথ্য। এ হেন সংকটময় মুহূর্তে তার চলে যাওয়ার পেছনে কি কোনও উদ্দেশ্য আছে?

সকালে অভ্যাসমতো ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে হঠাৎ খাটের তলায় এক দুরূহ কোণ থেকে একটুকরো পাথর উঠে এল গার্গীর হাতে। বেগুনি রঙের একখণ্ড স্ফটিক, স্বচ্ছ ও ঝকঝকে, হাতের তেলোয় রেখে উঠে দাঁড়াতেই সকালের চিকন রোদ লেগে ঝলমল করে উঠল। প্রাপ্তিটি চমৎকার, কিন্তু গার্গী ভেবেই পেল না এহেন একটি স্ফটিকখণ্ড কেনই বা

পড়ে ছিল খাটের নীচে, কার এটা, সবার নজর এড়িয়ে কতদিন ধরে পড়ে আছে। জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেই অবশ্য মনে হল, কোনও আংটিতে সেট করে আঙুলে পরলে ভারি সুন্দর দেখাবে।

তাহলে কি রুক্কা অর্থাৎ ঐন্দ্রিলার কোনও আংটি থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল কখনও, আর খুঁজে পায়নি! না কি সায়নের? ভাবতে ভাবতে সহসা তার স্মৃতিতে ঝলক দিয়ে উঠল, ঠিক এই রঙের পাথর সেট-করা দুল সে কারও কানে দেখেছে গত দু-তিনদিনের মধ্যে। কিন্তু কার কানে তা মনে পড়ল না এই মুহূর্তে। আংটি নয়, কানের দুলেই ভাল মানাবে স্ফটিকখণ্ডটি। এরকম মনে হতেই পরক্ষণে ভাবল, ঐন্দ্রিলার যে এরকম কোনও পাথর-বসানো দুল ছিল না সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত। ঐন্দ্রিলার সমস্ত শাড়ি, গয়নাগাটি, যা যা আছে তার, তা গার্গী মোটামুটি সবই জানে। ঐন্দ্রিলাই দেখিয়েছে বা শুনিয়েছে কতবার। নতুন কোনও গয়না তৈরি করালে গার্গীকেই আগে ডেকে দেখাত, এই দ্যাখ, মিতুন —

কিন্তু পাথরটা যদি ঐন্দ্রিলার না হয়ে থাকে, তা হলে কার! অন্য কারও হয়ে থাকলে তা এ ফ্ল্যাটের খাটের নীচে পড়ে রইল কী করে! তবে কি কারও কানের দুল থেকে ছিটকে পড়ে গেছে এটা? তাহলে কেনই বা খোঁজেনি কেউ? নাকি খুঁজেও পায়নি? অথবা খোঁজার সময়ই পায়নি?

শেষ বাক্যটি মাথায় চল্লকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিশ্বরূপ দর্শন হল গার্গীর। পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল তাকে বলেছিলেন, কোনও মহিলা জড়িত আছেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে, তার প্রমাণ হিসেবে অ্যাশট্রের ভেতর পাওয়া আধপোড়া লেডিজ সিগারেটের কথা বলেছিলেন সেদিন। এই মুহূর্তে গার্গীরও মনে হল, দেবাদ্রি সান্যালের কথাই বোধ হয় ঠিক, আর তাইই এই বেগুনিরঙের পাথরটি হত্যাকাণ্ডের অন্যতম ক্লু হিসেবে এতদিন সবার অগোচরে জিরোচ্ছিল খাটের নীচে, ঝুম হয়ে বসে ছিল পেছনের পায়ার কোণ ঘেঁসে। পাথরটি নিশ্চয় ছিটকে পড়েছিল সেই মহিলার কানের দুল থেকে। হয়তো হত্যাকাণ্ডের পূর্বমুহূর্তে ঐন্দ্রিলা, যত নরমসরম মেয়েই সে হোক না কেন, কিছু প্রতিরোধ নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেছিল বা অন্তত করতে চেষ্টা করেছিল, হয়তো সে সময়েই ধস্তাধস্তিতে বা কোনও কারণে কানের দুল থেকে এই মধুর বিচ্যুতিটুকু বিশ্বস্ত প্রমাণ হিসেবে ধরা দিয়েছে গার্গীর কাছে। উল্লসিত হল, কিছুটা স্বস্তিও যেন।

কিন্তু বেগুনিরঙের স্বচ্ছ ছকোনা এই স্ফটিক খণ্ডটি তাহলে কার!

খুবই অনামনস্কভাবে হঠাৎ কুড়িয়ে-পাওয়া পাথরটি কাগজের মোড়কে যত্ন করে ভরে আলমারির এক গোপন আস্তানায় রেখে দিল সে। পরে সুবিধেমতো সময়ে কাজে লাগানো যাবে। আপাতত সকালের এই ব্যস্তসমস্ত মুহূর্তে তার সামনে আরও দু লক্ষ কাজ।

ঐন্দ্রিলা কাজের লোক রাখেনি বলে গার্গীও প্রথমে বলেছিল, থাক, আমারও দরকার নেই। তখন অবশ্য তার ঘাড়ে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের মতো একটা ভারী কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব চাপেনি। এখন বুঝতে পারছে ঘরসংসারের হাজারো ঝামেলা চুকিয়ে সাড়ে নটার মধ্যে অফিসে বেরুনো কী দুঃসাধ্য কাজ। আজ অবশ্য বেরুবে দশটায়, প্রথমে ফ্যাক্টরিতে যাবে। তবু ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে কিচেনে ঢুকে পড়ল ত্রস্তপায়ে। কিচেন থেকে পাশের ফ্ল্যাটের অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যায়। প্রায়ই চোখে পড়ে

একজোড়া চোখ কী গভীর সন্ধিৎসায় সর্বদা অনুসরণ করছে তাকে। সে দৃশ্যে কখনও গা ছমছম করে ওঠে তার। কখনও মনে হয় ওই চোখজোড়ার রহস্য আবিষ্কার করতে পারলেই হয়তো ধরা পড়ে যাবে ঐন্দ্রিলার হত্যাকারী। কিন্তু কে অমনভাবে সর্বক্ষণ নজর রাখছে তার ওপর! চন্দ্রাদেবী? হিমন, না কি রবার্ট ও'নীল? না কি অন্য কেউ?

রবার্ট ও'নীল ছাড়াও আরও বহু মানুষের আনাগোনা সে দেখতে পায় পাশের ফ্ল্যাটে। চন্দ্রাদেবীর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাই বেশি। বান্ধবীও আসেন কেউ-কেউ। সর্বক্ষণ গমগম করছে ঘর। কখনও রবার্ট সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কোনও রূপসী তরুণীকে। চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, জরুরি পরামর্শও সেরে, কখনও চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবোতে ডুবোতে হা হা করে হেসে উঠে, চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে আবার ফিরে যান তাঁর নীল মারুতিতে চড়ে। কয়েকদিন আগে গার্গীদের ফ্ল্যাটে খবর এসেছিল, একজন জাঁদরেল ল ইয়ার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন রবার্ট, সায়নকে একবার যেতে হবে ওঁদের ফ্ল্যাটে। সায়ন অবশ্য গিয়েওছিল। কী কথা হয়েছিল তা আর শোনা হয়নি গার্গীর। সায়নও বলেনি।

রাঁধতে রাঁধতে হঠাৎ গার্গীর চোখও আজকাল প্রায়ই অনুসরণ করে পাশের ফ্ল্যাটের কার্যকলাপ। কালও সে দেখেছিল, দুটো চোখ একটা জাফরির ভেতর দিয়ে নজর রাখছে তার ওপর। সে তৎক্ষণাৎ রান্না ফেলে দ্রুত এসে দাঁড়িয়েছিল ব্যালকনিতে। চোখজোড়া অমনি সরে গিয়েছিল, যেন তার তাড়া খেয়ে লুকিয়েছিল নিজেকে। কয়েকদিন ধরে খুবই রহস্যময় লাগছে ব্যাপারটা। একবার ভেবেছিল, সে নিজেই চলে যাবে পাশের ফ্ল্যাটে। গিয়ে দেখবে, আসল ব্যাপারটা কী। কিন্তু পরে নিবৃত্ত করেছিল তার এই উপচে ওঠা কৌতূহল। এখনও সময় হয়নি, আরও পরে, তার এই অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করবে। আরও একটু গড়াতে দিতে হবে ব্যাপারটা।

আজ কিন্তু সেই চোখ দুটো আর দেখা যাচ্ছে না. হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, সে যেমন অনুসরণ করছে গার্গীকে, গার্গীও তাকে অনুসরণ করে চলেছে, অলক্ষ্যে, বড় তীব্রভাবে।

তবে সুখের কথা, কয়েকদিন যাবৎ পুলিশের নজরদারি থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে তারা। সাংবাদিকদের হাত থেকেও। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে তাদের বিয়েটাই আপাতত জল ঢেলে দিয়েছে পুলিশ, সাংবাদিক ও আপামর জনগণের অপার কৌতূহলের আঁচে। পুলিস হয়তো ব্যস্ত তাদের চার্জশিট তৈরি করতে। সাংবাদিকরাও তাদের নিস্তরঙ্গ বিবাহিত জীবনে আর কোনও উত্তেজনার আগুন আবিষ্কার করতে না পেবে ছোটাছুটি করছে অন্য সংবাদেব পেছনে। অতএব আপাতত তাদের সামনে কিছুটা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন, যদিও অফিস নিয়ে, বেশ একটা টেনশন রয়েই গেছে। সে তো প্রফেসন্যাল হ্যাজার্ডস, থাকবেই।

সায়ন আগেই বেরিয়ে যাচ্ছে আজকাল। গার্গী একটু পরে। আজও সে তৈরি হয়ে দরজায় লক করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল তরতর করে, হঠাৎ মুখোমুখি হল চন্দ্রাদেবীর। লন পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে দ্রুত পদক্ষেপে আসছিলেন চন্দ্রাদেবী। পেছনে রবার্ট ও'নীল। এর আগেও চন্দ্রাদেবীর মুখোমুখি এভাবে হয়নি তা নয়, তবে আজ চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে তাকাতেই গার্গী কেমন যেন চমকে উঠল। কেমন হিংস্র, খরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন চন্দ্রাদেবী। সে তীব্র চাউনি এমনই প্রখর যেন পারলে তাকে ভস্ম করে দেবেন। বেশ ঝলমলে একটা সিল্কের শাড়ি পরেছেন, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, এই বয়সেও চন্দ্রা প্রায়

তরুণীর সাজ পছন্দ করেন,কিন্তু চাউনিতে, চলনে বলনে, ভঙ্গিমায় এক ভয়ঙ্কর জাঁহাবাজ মহিলা, তাঁকে দেখে গার্গীর বুকের ভেতর একধরনের ভীরু কাঁপন। ঐন্দ্রিলার কাছেও সে শুনেছিল, তার দিকেও এভাবে বিষদৃষ্টিতে তাকাতেন মহিলা। ঐন্দ্রিলা বলত, বুঝলি, এক সংসারে থাকলে কী যে হাল হত আমার!

এক সংসারে না থেকেও ঐন্দ্রিলার হাল যে কী হয়েছে তা তো দেখতেই পেয়েছে সবাই। দীয়াও বিপদ বুঝে পালিয়ে নিস্তার পেয়েছে। তাহলে কি চন্দ্রাদেবীই —

পেছনেই রবার্ট ও'নীল ছিলেন, গার্গীর দিকে নজর পড়তেই একঝলক হাসলেন যেন। হাসিতে একধরনের স্বর্গীয় দীপ্তিই যেন বা। গার্গীও তার মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসি ফুটলই না যেন। শুধু চন্দ্রাদেবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল গরম ছ্যাঁকা লাগল গায়ে। শিরশির করে উঠল তার শরীর।

গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। তার ড্রাইভারের নামটি ভারি অদ্ভুত, ফুটুস। নামের মতোই তার চেহারাটি ছোটখাটো, কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত গড়ন। প্রতিদিন সে টায়েটায়ে সাড়ে নটায় এসে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে হর্ন দেয়। আজ অবশ্য দশটায় আসার কথা ছিল। গার্গীকে দেখে চট করে স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে খুলে ধরল পেছনের দরজা।

গাড়ির ভেতর নিজেকে বিন্যস্ত করতে করতে গার্গীর মাথায় চন্দ্রাদেবী আর রবার্টের ভাবনাই ভিড় করে রইল। দুজনে এই সাতসকালে কোথায় বেরিয়েছিলেন! এই পড়ন্ত বয়সেও দুজনের ভেতর কী করে এতখানি ভাব থাকে!

এমন নানান ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকতে থাকতে সে একসময়ে এসে পৌঁছল ফ্যাক্টরিতে। দেখল, খুবই ব্যস্ত হয়ে ঘোরফেরা করছে সায়ন। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাবানগুলি প্যাকিং হচ্ছে একটা বড় শেডের নীচে। রোজবেরির রং ছিল গোলাপি। নতুন প্রোডাক্ট জেসমিন ফ্লেভারের রং ধবধবে সাদা। জুঁইফুলের মতো রং, জুঁইফুলের মতো গন্ধ। সাদা ডিম্বাকৃতি সাবানের মাঝখানে লেখা : জেসমিন ফ্লেভার। ইচ্ছে করেই এবার প্যারাডাইসের নাম লেখা হয়নি সাবানের গায়ে। তবে মোড়কের উপর এক জায়গায় অন্যরকম লেটারিঙে ছোট্ট করে লেখা আছে : প্যারাডাইস প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড। গার্গীরই প্রস্তাব ছিল এরকম।

সায়ন তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করেছিল তার প্রস্তাব, ইয়েস, অ্যাজ প্রোপোজড্। নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর যেমন ভেবেছেন, তাই হবে।

তারপর হেসেছিল গার্গীর দিকে তাকিয়ে, জেসমিন ফ্লেভারের অনেক কিছুই তো তোমার। বিজ্ঞাপন, প্যাকিং, মার্কেটিং। জেসমিন ফ্লেবার যদি মার্কেট ধরে ফেলে, তা তোমারই কৃতিত্বে।

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেছিল গার্গী, ফর্মুলা বেরোল তোমার মাথা থেকে, আর কৃতিত্ব হবে আমার?

দুজনের ঝগড়া এভাবে চলেছিল কিছুক্ষণ। ঝগড়া, না কি পারস্পরিক কমপ্লিমেন্ট!

আজ ফ্যাক্টরিতে পৌঁছেই চারপাশে বিপুল তৎপরতা দেখে কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে রইল গার্গী। প্যাকিং কমপ্লিট হলে সাবানগুলো ভরা হচ্ছে মোটা পিচবোর্ডের বাক্সে। বাক্স ভর্তি হলে পরক্ষণেই তা চলে যাচ্ছে ট্রাকে লোড হবে বলে।

সায়নের মুখে তখন উপছে পড়চে এক স্বর্গীয় দীপ্তি। বারবার ঘুরে ঘুরে দেখছে বিভি
সেকশনের কর্মকুশলতা। বোধ হয় এরই নাম সৃষ্টির আনন্দ। এক-একটি সোপককে প্র
একটি সন্তানের মতোই। নিজস্ব ফর্মুলায় তৈরি নতুন রঙের নতুন গন্ধের সাবান। মোড়কে
ভরা হয়ে গেলে হেসে উঠছে ঝকমকে চেহারায়। কয়েকদিনের মধ্যেই এই হাজার হাজা
মোড়ক ট্রাকে ট্রাকে ছড়িয়ে পড়বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। অন্য কয়েকটি রাজ্যেও
সেখান থেকে চলে যাবে গৃহস্থের ঘরে। সবাই ঝলমলে চেহারার মোড়কটি হাতে নিয়ে গন্ধ
শুঁকতে শুঁকতে বলবে, বাহ্, দারুণ তো সাবানটা, কী সুন্দর জুঁইফুলের গন্ধ! নতুন বেরো
বুঝি? কেউ বা বাথরুমে ফেনা তুলে গায়ে মাখতে মাখতে ভাববে, যদি আপনার বয়স পাঁচ
দশ কিংবা পনেরো বছর কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে

সায়নের খুশিতে উমসুম মুখের দিকে তাকিয়ে গার্গী দেখল, তার বয়সও যেন এক
ঝটকায় অনেকখানি কমে গেছে. নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে গত কয়েকদিন তার টেনশনের শে
ছিল না। কেবলই ভাবনা, যদি আবার কোনও স্যাবোটেজ হয়! বাধা পড়ে যায় কোনওভাবে

তবু যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছে জেলায় জেলায়, অন্য রাজ্যে, ততক্ষণ চিন্তা একটা থেকেই
যাবে। অবশ্য যে-কোনও ব্যবসায়ে এ ধরনের চিন্তা, টেনশন, আশঙ্কা তো সর্বক্ষণের স
ী। আর চিন্তা থাকে বলেই তো তার সাফল্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যায় এভাবে

প্যাকিঙের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমনি অবস্থায় দুজনে ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে
চলে এল অফিসে। এখন অনেক কাজ গার্গীর। কাল কমর্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রকে
বলে রেখেছিল, একটা মিটিং ডাকবেন তো, মিঃ মিত্র। সব সেলস্ সুপারভাইজারদের নিয়ে
বেলা চারটেয়। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময় তার চেম্বার ভরিয়ে দিলেন রোহিতাশ
মিত্র। সেলস সুপারভাইজারদের নিয়ে বসে গার্গী পরিষ্কার একটা ছক তৈরি করে দিল
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। কাল ভোরে উঠে সবাই একযোগে ছড়িয়ে যাবে জেলায় জেলায়
যোগাযোগ করবে ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে। বড় বড় এজেন্ট, হোলসেলারদের সঙ্গে
ইতিমধ্যে ট্রাকে ট্রাকে ভর্তি হয়ে হাজার হাজার জেসমিন ফ্লেভার পৌঁছে যাবে স্টকি
এজেন্টদের গোডাউনে। দু-তিনটি রাজ্য জুড়ে তুমুলগতিতে চলবে সেলস ক্যাম্পেন।

মিটিং শেষ হতেই অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায় মজুমদার ঢুকলেন একগোছা
পোস্টার, প্যাম্পলেট নিয়ে। ভাল একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্টকে দিয়ে চমৎকার কয়েকটি
ডিজাইন করানো হয়েছে এবার। সেগুলো গার্গীর সামনে মেলে ধরতেই চমৎকৃত হল সে
তাতে বড় করে দু-দুটো জেসমিন ফ্লেভারের ছবি আঁকা, দুধ-সাদা রঙের, পাশেই খোল
মোড়ক, তাতে জুঁইফুলের ছবি। প্যাম্পলেট, পোস্টারগুলো দোকানের দরজায় সেঁটে দেওয়া
হবে। কোথাও বা দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে শক্ত কাগজের উপর ছাপানো
প্যাম্পলেটগুলো। সব মিলিয়ে কদিন শুধু জেসমিন ফ্লেভারের জয়জয়কার। তারপর
কয়েকদিন টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করা, জেসমিন ফ্লেভার বাজারে ক্লিক করল কি করল না
সে এক টানটান অপেক্ষার দিন।

মধুমন্তীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎই প্রবলভাবে চমকে উঠল গার্গী। বুকের ভেতর
ছলাত করে উঠল একঝলক রক্তের ঢেউ। মধুমন্তীর কানেই তো দুলছে বেগুনিরঙের পাথর
বসানো চমৎকার দুটো দুল। সকাল থেকে সে মনেই করতে পারছিল না কার কানে এরকম

দুল দেখেছে। দেখতে দেখতে তার নজরে পড়ল মধুমন্তীর আঙুলেও বেগুনিরঙের পাথর-বসানো আংটি। তার মানে ম্যাচিং করিয়ে তৈরি করেছে এ দুটো। রোজকার মতো আজও বেশ সুন্দর করে সেজে এসেছে মধুমন্তী। সায়নও সেদিন বলছিল, মধুমন্তী আগে এমন সাজত না। আজকাল খুব সাজে পেয়েছে তাকে।

অন্যমনস্কভাবেই গার্গী জিজ্ঞাসা করে বসল, বেশ রং মিলিয়ে দুল আংটি পরেছেন তো, মিসেস রায় মজুমদার। নতুন গড়ালেন নাকি এগুলো?

মধুমন্তী প্রথমটায় বেশ অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ তাদের এম ডি অফিসের কাজের কথা ছেড়ে গয়নার গল্প করতে বসলেন তার সঙ্গে! হেসে উত্তর দিলেন, না, অনেকদিনের। তবে পাথরগুলো বদলে ফেললাম হঠাৎ।

গার্গীর মুখ থেকে তার অজান্তেই বেরিয়ে পড়ল, তাই নাকি। কেন বলুন তো?

বোধ হয় কথাগুলো একটু জোরেই বেরিয়ে এসেছিল গার্গীর মুখ থেকে। আরও বিস্মিত হয়ে মধুমন্তী জবাব দিল, এমনিই। তারপর হেসে ফেলে বলল, পুরনো অনেককিছুই বদলে ফেলছি আস্তে আস্তে। হয়তো আরও বদলাব।

মধুমন্তীর কথাগুলো কেমন হেঁয়ালির মতো লাগল। কেন যেন হঠাৎ দুর্বোধ্য মনে হল তাদের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের চাউনি, হাবভাব, হাসিও। তার দুলে বেগুনিরঙের পাথর, তাও সম্প্রতি বদলেছে, তার সঙ্গে তার সেদিনকার সিগারেট খাওয়ার দৃশ্য — সব মিলিয়ে কীসের যেন একটা সঙ্কেত দিয়ে গেল গার্গীর ভেতর।

সেদিন রৌণক মুখার্জির ইন্টারভিউ নিতে গিয়েও একবার প্রবল ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে। কেন যেন তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সেদিন তাকে বলেছিল, রৌণক মুখার্জির সঙ্গে দেখা হলেই একটা অমোঘ ক্লু হাজির হবে তার সামনে। গার্গী চৌধুরী থেকে হঠাৎ মিতুন মুখার্জি হতে গিয়ে তাই সামান্য বদলে ফেলেছিল তার চেহারা, সাজ। শাড়ির বদলে সালোয়ার কামিজ, সিঁথির ভেতর লুকিয়ে ফেলেছিল সিঁদুরচিহ্নটুকু, হেয়ারস্টাইল বদলে হঠাৎ ববড় করে নিয়েছিল চিরুনির সামান্য কারসাজিতে, তার সঙ্গে চোখে এমন চশমা যার কাচে সামান্য আলো-আঁধারি ভাব, তাতে চোখ দুটো তেমন স্পষ্ট হয় না বাইরে থেকে। এমন অদ্ভুত প্রায়-ছদ্মবেশে সেদিন গিয়েছিল রৌণক মুখার্জির সাক্ষাৎকার নিতে। কিন্তু সৌভাগ্যই হোক, অথবা দুর্ভাগ্যই, একঘণ্টা বসেও দেখা পায়নি তাঁর। তবে তাঁর চেম্বারে একা বসে থাকতে থাকতে চকিতে ডেস্ক-ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা উলটে পাঁচই এপ্রিলের দিনটিতে চোখ পড়তেই চমকে উঠেছিল। সেখানে লেখা : টু মিট বুক্কা অ্যাট সেভেন থার্টি। সেদিন বিকেলেই টেলিফোনে তাই প্রায় লিডিং কোশ্চেনের মতো রৌণক মুখার্জিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন গিয়েছিলেন ঐন্দ্রিলার সঙ্গে দেখা করতে? সে জিজ্ঞাসায় এমন আকস্মিকতা ছিল যে, 'না, যাইনি' না বলে কাঁপা গলায় রৌণক বলেছিলেন, আপনি কী করে জানলেন?

সেদিন রিসিভার রেখে দেওয়ার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত গার্গী নিশ্বাস বন্ধ করে ভেবেছিল, তাহলে রৌণক মুখার্জিই! যদি তাই-ই হবে, তবে সেদিন তাঁর সঙ্গে কোনও মহিলা কি ছিলেন? তাহলে কে সেই মহিলা, যিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সহযোগী হয়েছিলেন রৌণকের। তিনি কি সেই মেয়েটিই, যে রৌণকের প্রেমিকা ছিল, পরে স্ত্রী হয়েছে, যাকে ভালবাসত বলেই রৌণক সেসময়ে উপেক্ষা করেছিল ঐন্দ্রিলাকে! কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে

গার্গীর মনে হল, হয়তো সেই মেয়েটি না, মধুমন্তীই সেই মহিলা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির দুই অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের মধ্যে হয়তো এমন কোনও যোগসাজশ আছে, এমন কোনও কার্যকারণও, যার পরিণামে ঐন্দ্রিলাকে —

রৌণক মুখার্জির কথা এখনও ঘুণাক্ষরেও সায়নের কাছে বলেনি গার্গী। সায়ন হয়তো কষ্ট পাবে এমন আশঙ্কা করেই। পরে সময় হলে সব কথা খুলে বলতে হবে। সব প্রমাণ হাতে এসে গেলে। তখন না বলে উপায়ই বা কী।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথেও এইসব কূট ভাবনাগুলো মাথার ভেতর ঘুলিয়ে উঠছিল গার্গীর। হঠাৎ একটা বাস স্টপের কাছে কী যেন দেখতে পেয়ে চমকে উঠে ফুট্রুসকে বলল, একটু দাঁড়াও তো —

গাড়ি ক্যাঁচ করে থেমে গেল বাস স্টপের কাছে। গার্গী মুখ বাড়িয়ে বলল, তুমি এখানে?

খুব অবাক হয়েছে দীয়াও, ম্লান হেসে বলল, একটা দরকারে এসেছিলাম। বাড়ি ফিরব, তাই বাসের জন্য দাঁড়িয়ে —

জায়গাটা ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়। বাড়ি বলতে দীয়া কোন বাড়ি বলছে তা বুঝে উঠতে পারল না গার্গী। বলল, কোনদিকে যাবে তুমি?

— যাদবপুর।

— ঠিক আছে, উঠে এসো। তোমার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

দীয়া সজোরে ঘাড় নাড়ল, না, না। বাস এসে যাবে এক্ষুনি —

গার্গী হাসল, না হয় ওদের বাড়ির ওপর তোমার রাগ আছে, তাই বলে আমার ওপরও কি তোমার রাগ?

দীয়ার আর না করার কোনও উপায় রইল না। গার্গী দরজা খুলে দিতেই এসে বসল তার পাশে।

— এখানে কোথায়?

ইতস্তত করে দীয়া বলল, একটা চাকরির সন্ধানে আছি। একজন বলেছিল দেখা করতে।

— তাই!

দেশপ্রিয় পার্ক পার হয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরল ওরা। ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে কিছুক্ষণ হু হু করে যেতেই যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড। তৎক্ষণাৎ দীয়া বলল, এখানেই নামব।

— কেন, এখানে কেন? বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। দীয়ার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও গার্গী তার গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সেন্ট্রাল রোডে। দীয়া বোধহয় কিছুতেই চাইছিল না গার্গী তার বাড়িতে যাক। কিন্তু গার্গীর ভারি কৌতূহল হচ্ছিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসে কেমন আছে দীয়া। সে অবশ্য খুব একটা সুখে নেই তা তার বিষণ্ণ চোখমুখ দেখেই বোঝা যায়।

সেন্ট্রাল রোড থেকে অনেকটা ভেতরে দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকে দীয়া। মনে হল, একাই। বাইরের আধখানা ঘরে একটা লম্বা সোফা রাখার পর সেন্টার টেবিল সেট করার জায়গাই নেই। তবু ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। একদিকের দেওয়ালে পুরুলিয়া থেকে আনা ছো-নাচের মুখোশ। অন্যদিকের দেওয়ালে একটা পেইন্টিং, বেশ বড় আর চমৎকার।

— বোসো, আমি আসছি, বলে পর্দা সরিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল দীয়া। এক মুহূর্ত পর্দা সরে যেতেই গার্গী দেখল, ভেতরের ঘরটা বেশ বড়ই, একটা ডাবল-বেডেড খাট।

খাটের উপর দামি বেডকভার। পর্দার সঙ্গে রং মিলিয়ে ঘরটা বেশ ঝকঝকেও। গার্গী তারিফ করল, দীয়ার বেশ রুচিজ্ঞান আছে। কিন্তু —, চারপাশে একটু নজর চালাতেই গার্গীর হঠাৎ মনে হল, দীয়ার এখানে আর কেউ যেন আসে। সম্ভবত একজন পুরুষই। সোফার পাশে ছোট্ট একটা টুল। তার ওপর একটা অ্যাসট্রে। তারভেতরে সিগারেটের ছাই, টুকরো সিগারেটও। অদ্ভুত কাণ্ড তো! কে আসে দীয়ার বাড়িতে? ডাবল-বেডেড খাট কেন?

একটু পরেই একটা ঢিলেঢালা ম্যাক্সি পরে দীয়া এ ঘরে ঢুকতেই যে কৌতূহলটা অনেকক্ষণ ধরে গার্গীর মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, সেটাই বলে ফেলল শেষপর্যন্ত, ঠিক কী হয়েছিল বলো তো ও বাড়িতে? হঠাৎ চলে আসতে হল কেন তোমাকে? একটা ব্যাপার অবশ্য বুঝতে পারছি, এরকম জাঁদরেল শাশুড়ি থাকলে সে বাড়িতে থাকা খুবই মুশকিল। তবু শাশুড়িই তো সব নয়—

হঠাৎ দীয়ার মুখের চেহারা বদলে গেল, চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল, বলল, উফ, ওরা কী ডেঞ্জারাস, তুমি জান না।

গার্গী লক্ষ করছিল দীয়ার পরিবর্তন, সে তো শাশুড়ি সম্পর্কে না হয় বলা যায়, কিন্তু হিমন, তোমার হাজব্যান্ড?

দীয়া যেন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, না, সে কথা বলা যাবে না —

গার্গী অবাক হয়েঁ বলল, কী বলা যাবে না?

— হি ইজ —

দীয়া থেমে যেতে গার্গী আরও বিস্মিত হয়, বলল, দেখে একটু মর্বিড মনে হয় ওকে। কিংবা একটু ইমম্যাচিওরড।

— শুধু তাই?

— বুঝলে দীয়া, কারও মা যদি ছোট থেকে ছেলের উপর বেশি ডমিনেট করে, তাহলে এরকমটা হয়। এ ক্ষেত্রে তোমার উচিত ছিল প্রব্লেমটাকে অন্যভাবে ট্যাকল করা —

দীয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, হবে না, হবে না, হবে না, কোনওভাবেই কিছু করা যাবে না। হি ইজ — হি ইজ ইমপোটেন্ট। কথাটা এমন অতর্কিতে বলল দীয়া যে, দারুণ একটা শক খেল গার্গী। এতটা সে ভাবেনি হিমনকে দেখে। হিমনের চেহারা সায়নের মতোই লম্বাচওড়া, ওয়েল-বিল্ট। শুধু তফাত এই যে, সায়ন প্রচণ্ড স্মার্ট, কথাবার্তায় তুখোড়। প্রবল পার্সোনালিটির জন্য তার উপস্থিতিটাই কেমন পৌরুষময়। পাশাপাশি হিমন চুপচাপ, শান্ত, জড়ভরতের মতো ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে। ভাবতে ভাবতে আরও দু-একটা কথা বলে হঠাৎ উঠে পড়ল গার্গী, ঠিক আছে, আজ চলি।

বাড়ির গেটে পৌঁছে গাড়িটা ছেড়ে দিল। ফুটুসকে বলল, কাল বেলা দশটায় এসো —

আজকের ঘটনাটা তার ভুরুতে একটা কোঁচ ফেলেছিল। গেট খুলে সেরকম অন্যমনস্কভাবেই ঢুকতে যাচ্ছিল হনহন করে। গেটের মুখে দেখল, যথারীতি নীল মারুতিটা দাঁড়িয়ে। তার মানে রবার্ট ও নীল এসেছেন রোজকার মতোই। সেদিন কয়েক মুহূর্ত কথা বলে মনে হয়েছিল লোকটা খারাপ নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে মনে পড়ে, লোকটা চন্দ্রাদেবীর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে, তার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে, তখনই রবার্ট ও নীল সম্পর্কে একটা বিরক্তি এসে ভিড় করে মনের মধ্যে। কেমন একটা ইরিটেশন হয়।

গেট খুলে সিঁড়ির মুখে ঢুকতে না ঢুকতে হঠাৎই দুম করে লোডশেডিং। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে কলকাতার নিকষ অন্ধকার। অনেকক্ষণ আগেই সন্ধে পেরিয়ে গেছে। তাতে ওঠার সিঁড়িটাও ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না, আস্তে করে একবার ডাকল, মোহন, মোহন। কিন্তু সময়মতো মোহনও কাছাকাছি নেই। বাধ্য হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। পার্স হাতড়ে বার করল দরজার চাবিটা। দরজা খুলে সবে ভেতরে ঢুকেছে, হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে সজোরে জাপটে ধরল তাকে। এমন জোরে চেপে ধরেছে যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

চারপাশে মিশ অন্ধকার, কিচ্ছুটি দেখা যাচ্ছে না কোনও দিকে, কেউ যেন ভুশোকালি ঢেলে দিয়েছে দুই চোখে। এ হেন পরিস্থিতিতে হঠাৎ পেছন থেকে কেউ এসে তাকে জড়িয়ে ধরতেই হৃৎপিণ্ড থেমে গেল গার্গীর। প্রবল আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না এতটুকু, কেননা লোকটার এক হাত চেপে ধরেছে তার মুখ, অন্য হাতে শরীরটা বেড় দিয়ে ধরেছে, তাতে ঘাড়ের ওপর গরম নিঃশ্বাস পড়ছে তার। গার্গী এক ঝটকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইল লোকটাকে, কিন্তু প্রথম দফায় পারল না। বরং লোকটার মুখ থেকে কী যেন একটা গন্ধ ভেসে আসতেই তার শরীরের ভেতর বমি পাক দিয়ে উঠল।

ঝটকা খেয়ে লোকটা আরও জোরে চেপে ধরতে চাইল তাকে, তার ঠোঁট দুটো নেমে এসেছে গার্গীর ঘাড়ের কাছে, আর সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, তার হাতের ব্যাগটা ধরে টানাটানি করছে লোকটা।

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, কী চায় লোকটা। তার ব্যাগটা! তার ব্যাগটাই নিতে চাইছে, নাকি মেরেই ফেলবে বলে জড়িয়ে ধরেছে এমন দুর্দান্তভাবে, অথবা কোনও পাশবিক ইচ্ছেয় —

হঠাৎ গার্গী তার কনুই দিয়ে প্রবল একটা গোঁত্তা মারল লোকটার পাঁজরের নীচে। তাতে কোঁক করে একটা বিশ্রী শব্দ বেরুল তার মুখ থেকে। পরক্ষণেই গার্গী পা দিয়ে আর এক ধাক্কা। ক্যারাটের নিখুঁত কায়দায় মুহূর্তে কাবু করে ফেলল লোকটাকে। প্রায় ছিটকে পড়তে পড়তে কোনও ক্রমে লোকটা সামলে নিল নিজেকে, তারপর দুদ্দাড় শব্দ তুলে নেমে গেল নীচের দিকে। পালিয়ে বাঁচলই যেন বা।

ভয়ে তখনও থর থর করে কাঁপছে গার্গী। তার ঘাড়, গলা, মুখ, পিঠে তখনও জানান দিচ্ছে লোকটার অস্তিত্ব। শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারছিল, তার মুখে ভর্তি দাড়ি গোঁফ, লোকটা তার ঘাড়ের কাছে মুখটা নামিয়ে নিয়ে এসেছিল বলে দাড়ি গোঁফের ঘসা লেগে জ্বালা করছে এখনও।

গার্গী বুঝতে পারছে না, ঠিক কোথায় ওত পেতে বসেছিল লোকটা। সিঁড়ির নীচে, নাকি

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখেই। হঠাৎ লোডশেডিং হল বলেই এমন একটি চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেল তাকে আক্রমণ করার। কিন্তু লোকটা আসলে কে? ঐন্দ্রিলার মতো তাকেও খুন করার জন্য এসেছিল, নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই ছিল তার বাসনা? ব্যাগটা ধরে কেন টানাটানি করছিল তা ভেবেও বিস্ময় যাচ্ছিল না তার। কিন্তু সত্যিই কী দুঃসাহস লোকটার! ভাগ্যিস ক্যারাটের কিছু প্যাঁচপোঁচ জানা ছিল তার। তাই এ যাত্রা বেঁচে গেল মনে হচ্ছে। হঠাৎ সায়নের ওপর মনে মনে ভীষণ রাগ হয়ে গেল তার। এতটা রাত হয়ে গেল তবু এখনও বাড়ি ফেরেনি কেন! ফিরলে তো আর এরকম একটা অঘটন ঘটত না আজ। রোজই কি রাত করে ফিরতে হবে!

দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ফেলল সে। ভেতরে ঢুকে এমার্জেন্সি আলোর সুইচ হাতড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধের মতো, ঠিক সে মুহূর্তেই আলো জ্বলে উঠল দপ্ করে। টিউব উদ্ভাসিত হতেই তার বুকে আবার ফিরে এল সাহস। একবার ভাবল, পলকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেখে আসে লোকটা এখনও সেখানে আছে কি না। পরমুহূর্তে মনে হল, নাঃ, লোকটা যে এখনও থাকবে না তা তো নিশ্চিতই। কোথায় জনারণ্যে মিশে গিয়েছে এতক্ষণে। যা গোঁত্তা খেয়েছে কটা।

কিছুক্ষণ সোফায় বসে দম নেওয়ার পর হঠাৎ কী মনে হতে গার্গী উঠে দাঁড়াল জানালার সামনে। পাশের ফ্ল্যাটের জানালাও খোলা, ভেতরে উমসুম উষ্ণতা ছড়িয়ে জ্বলছে অদ্ভুত নীলচে আলো। সেই স্বপ্ন স্বপ্ন আলোয় দেখতে পেল, মুখে জ্বলন্ত চুরুট নিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন রবার্ট ও নীল। কী যেন বলতে বলতে হাসছেন হা হা করে, আর কাঁধ ঝাঁকাচ্ছেন স্রাগের ভঙ্গিতে। ঘরের এককোণে হাসি হাসি মুখে সোফায় বসে আছেন চন্দ্রাদেবী। চন্দ্রাদেবীর মুখে হাসি, ভাবতেই পারছে না গার্গী। আরও আশ্চর্য চন্দ্রাদেবীর মুখেও সিগারেট। পাশে রঙিন পানীয় ভর্তি গেলাস। কিন্তু কী সিগারেট খাচ্ছেন চন্দ্রাদেবী? উনি কি লেডিজ সিগারেট খান?

পরক্ষণেই রবার্টের মুখে ধূসর দাড়ির জঙ্গল দেখে ভুরুতে কোঁচ ঘনিয়ে এল গার্গীর। লোকটার হাইট, শক্তপোক্ত গড়ন দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল। যে লোকটা তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল, তার মুখ থেকে মৃদু একধরনের গন্ধ বেরুচ্ছিল, সেটা কি রবার্টের হাতেধরা অভিনব চুরুটটির, নাকি পানীয়ের! অথবা অন্য কোনও গন্ধ ছিল সেটা? তা হলে কি রবার্ট ও নীলই —

সেদিন রাতে সায়ন বাড়ি ফেরার পরও সন্ধের সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা মন থেকেঝেড়ে ফেলতে পারছিল না গার্গী। সায়নকে ঘটনাটা বললে সে কীভাবে নেবে, কীই বা হবে তার প্রতিক্রিয়া কে জানে। বরং এখন নয়, সময় হলে সবই বলবে তাকে এমন ভাবতে ভাবতে ঘুমে ও না-ঘুমে অত বড় রাত কাবার করে ফেলল।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে সায়নকে বলল, আমার অফিস যেতে একটু দেরি হবে আজ —

ছুরি-কাঁটা দিয়ে ডবল ডিমের মস্ত ওমলেটটা ম্যানেজ করতে করতে সায়ন বলল, ও.কে। নো প্রবলেম।

সায়নের একটা বড় গুণ এই যে, সে কখনও গার্গীর ব্যাপারে অযথা নাক গলায় না।

একবার জিজ্ঞাসাও করল না. কেন। গার্গী অফিসে কোনও ডিসিশন নিলেও বলে না, উঁহু, এভাবে করলে ভাল হত। কিংবা না, এটা করো। বরং উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বলে ওঠে, বাহ্, দারুণ ভেবেছ তো। আমি তো এভাবে ভাবিনি।

তবে একটু পরেই বলল, তা হলে আমি কিন্তু ভুবনেশ্বর যাওয়ার টিকিট কাটতে দিচ্ছি। তুমি কি তোমার আগের সিদ্ধান্তেই অনড় আছ? আমার সঙ্গে যাচ্ছ না?

— দুজনে একসঙ্গে অফিস ছেড়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? অন্তত এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে?

— কিন্তু তুমি একা থাকতে পারবে ফ্ল্যাটে? ভেবে দ্যাখো।

— একা! গার্গী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল যেন, উঁহু। একা থাকতে পারব না।

কাল সন্ধের ঘটনাটা সায়ন জানে না বলেই জিজ্ঞাসা করতে পারল, সে একা থাকতে পারবে কি না। জানলে নিশ্চয় তার একা থাকার কথা ভাবতই না। কিন্তু গার্গী এখনও আতঙ্কে নীল হয়ে আছে। আর একটু সুযোগ পেলেই হয়তো চৌধুরীবাড়িতে আরও একটি বধূ-হত্যার ঘটনা জানতে পারত লোকে।

গার্গী অস্ফুট কণ্ঠের জবাব শুনে সায়ন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, তা হলে!

'তা হলে' শব্দটা গার্গীর ভেতরেও তখন তুমুল হয়ে তোলপাড় করছে। সত্যিই তো, তা হলে গার্গী থাকবে কোথায়! দাদার বাড়ি থেকে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিল যেদিন, পিত্রালয় শব্দটি তার অভিধান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে তার এমন কোনও বান্ধবীও নেই যার বাড়িতে দু-তিন রাত 'অগত্যা আশ্রয়' প্রার্থনা করতে পারে। আসলে যেদিন থেকে সে সায়নের জীবনের দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে, সায়নের সুখদুঃখের শরিক হয়েছে, তখন থেকে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকি সভ্য জগতের তাবৎ মানুষের কাছেই সে অচ্ছুত, অনাদৃত, অপাঙ্‌ক্তেয়।

সায়ন একটু ভেবে তৎক্ষণাৎ সমাধান করে দিল কূট প্রশ্নটির, যেভাবে কয়েকদিন আগেও মোকাবিলা করেছিল এ হেন সমস্যার, বলল, তাহলে ভরসা সেই আলোদা।

গার্গী তবু খুঁতখুঁত করতে লাগল, আবার সেই আলোদার বাসায়!

— তা ছাড়া আর উপায় কী? দুটো-তিনটে রাত তো মোটে।

সায়ন অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গী এবার ঐন্দ্রিলার আলমারি খুলে বসল। প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হচ্ছিল, অন্যের সম্পত্তি খুলে দেখা মোটেই শোভন না। কিন্তু আজ নারীসুলভ কৌতূহলে নয়, নিতান্তই গোয়েন্দার দৃষ্টিতে সে লকারের ভেতর থেকে বার করল গয়নাগাটির বাক্সটি। কী দারুণ সব গয়না, দেখলে চোখ ঝলসে যায়, কিন্তু গার্গীকে তার তাপ স্পর্শও করল না, সে বরং তন্নতন্ন খুঁজে উদ্ধার করতে চাইল সেই বেগুনি পাথরের রহস্য। কিন্তু হতাশ হতে হল তাকে, রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। এরকম কোনও দুল নেই ঐন্দ্রিলার...।

আলমারির ভেতর থরে থরে সাজানো রয়েছে কয়েকশো শাড়ি-জামাও। যে শাড়িই চোখ পড়ে, প্রত্যেকটিই এক চোখ-জুড়োনো দৃশ্য। এর মধ্যে অনেক শাড়িই গার্গীর চেনা, এক-একটি শাড়িতে ঐন্দ্রিলার এক-একরকম স্মৃতি। সেগুলো ঝলমল করে উঠতেই গার্গীর মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল সেইসব উজ্জ্বল দিন, যখন ঐন্দ্রিলাই ছিল ঘটনার মধ্যমণি। অনেকগুলো শাড়ি তখন গার্গী পরেওছে। যখনই গার্গী আসত, ঐন্দ্রিলা তার আলমারি খুলে এক-একটা দামি শাড়ি এগিয়ে দিয়েছে, নে, আজ এটা পর। এ শাড়িটা তো তোর ভারি

পছন্দের।

পুরনো শাড়িগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে গার্গী বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। হঠাৎই একটা শাড়ির আড়াল থেকে ঝপ করে খসে পড়ল একটা ছোট্ট ডায়েরি। খুলে দেখল, তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ঐন্দ্রিলার মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর। কত কিছুই না লেখা তাতে। কত ঘটনা, কত মন্তব্য। আশ্চর্য, ঐন্দ্রিলা ডায়েরিও লিখত নাকি! কিন্তু তার দু-চার পৃষ্ঠায় চোখ বুলোতেই অবাক হয়ে গেল। কী অদ্ভুত! কার সম্পর্কে লেখা রয়েছে ডায়েরিতে? তো কোনও পুরুষ সম্পর্কেই, কিন্তু যা মনে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে, সায়নকে নিয়ে নয়। তা হলে কে সেই পুরুষ, যার সম্পর্কে এত কৌতূহল ঐন্দ্রিলা উপচে দিয়েছে প্রতি পৃষ্ঠায়! সে কি রৌণক, না কি — রবার্ট! এক জায়গায় লেখা, 'জড়িয়ে ধরেছিল পেছন থেকে। মুখময় দাড়ির জঙ্গল।' তা হলে কি রবার্টই!

নিবিষ্ট হয়ে পড়তে পড়তে সহসা শিরশির করে উঠল গার্গীর শরীর। কাল লোডশেডিং-এ যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার, ঐন্দ্রিলারও কি সে রকম কিছু ঘটেছিল! সেই ঘটনার পরিণতিতে অবশেষে একদিন মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাকে!

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠল, এ হে, প্রায় এগারোটা বাজতে চলল যে। ফুট্টুস অনেকক্ষণ আগে এসে হর্ন দিয়েছে গাড়ির। অফিসে যে তার আজ অনেক কাজ।

গার্গী দ্রুত তৈরি হয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে তরতর করে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। কাল রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ চমৎকার রোদ ঝলমলে দিন। আকাশে সাদা মেঘের সামান্য কারিকুরি থাকলে রোদের চেহারা বদলে যায়। এরকম দিনে কাজ করতে ভারি ভাল লাগে তার। সে অফিসে পৌঁছতেই অন্য সবাই ভীষণ অবাক। তাদের ম্যাডামের তো অফিসে পৌঁছতে এত লেট হয় না কোনও দিন।

অফিসে তখন পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পর পর কয়েকদিন মিটিং করে গোটা অফিসটাকেই চনমনে করে তুলেছে গার্গী। সবাইকে বুঝিয়েছে, সামনে ঘোর সংকট। একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই কাজটাকে সাকসেসফুল করে তুলতে না পারলে সমূহ বিপদ। এখন দরকার টিম-ওয়ার্ক। যদি অফিসের সবাই একযোগে কাজ করে, জেসমিন ফ্লেভার বাজার ধরে নেবে নির্ঘাত। তাহলেই প্যারাডাইস প্রোডাক্টস আবার ফিরে পাবে তার হারানো গুডউইল। সেক্ষেত্রে পুজোর মরশুমে বাড়তি হারে বোনাস। আরও সুযোগসুবিধা, আরও ইনসেনটিভ।

সারাদিন পুরোদমে কাজ করে বিকেল পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে এল অফিস ছেড়ে। এর মধ্যে একবারও সায়নের সঙ্গে কথা বলার ফুরসত হয়নি। সায়ন আজ গোটা দিন ব্যস্ত থেকেছে ডিসট্রিবিউশনের তদারকি করতে। সায়নের থিয়োরি হল, চেয়ারম্যান নিজেই যদি কাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে গোটা অফিস কাজে উদ্বুদ্ধ হবেই।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে ঢুকে হঠাৎই তার চোখ আটকে গেল মিন্টো পার্কের সামনে এসে। আরে, দীয়াই তো! কিন্তু দীয়া আজ একা নয়। সঙ্গে আর একজন পুরুষ। পরনে নীলরঙের গেঞ্জি, অফ-হোয়াইট রঙের প্যান্ট। গার্গী তৎক্ষণাৎ বলল, ফুট্টুস, একটু দাঁড়াও তো।

ফুট্টুস একটু এগিয়ে ফুটপাতের ধার ঘেঁসে গাড়ি দাঁড় করাল। গার্গী গাড়ি থেকে নামল

না, পিছনের কাচে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগল ওরা কী করে, কোথায় যায়। সেদিন দীয়ার বাসায় গিয়েই বুঝতে পেরেছিল, অন্য এক জন পুরুষের সঙ্গে তার একটা গোপন সম্পর্ক আছে। ইনিই কি তা হলে সেই পুরুষ!

একটু পরেই পুরুষটি হাত দেখিয়ে দাঁড় করাল একটা ট্যাক্সিকে। দুজনে ট্যাক্সিতে উঠতেই গার্গী বলল, ফুটুস, ট্যাক্সিটাকে ফলো করো তো।

ফুটুস এই অভিনব ডিউটি পেয়ে ভারি রোমাঞ্চিত। ট্যাক্সিটা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড পেরিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে এসে দাঁড়াল একটা রেস্তোরাঁর সামনে। দীয়াদের থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে তাদের পিছু পিছু এসে ফুটুসকে অপেক্ষা করতে বলে গার্গীও ঢুকে পড়ল রেস্তোরাঁয়।

রেস্তেরাঁর ভিতরে খুবই অস্পষ্ট আলো, চারপাশে আলো-আঁধারি পরিবেশে দীয়া আর তার সঙ্গী পুরুষটি একটা কোণের টেবিলে গিয়ে বসে পড়েছে। যথাসম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখে গার্গীও গিয়ে দখল করল তাদের পাশের টেবিলটি। রেস্তোরাঁটিতে সুবিধে এই যে প্রতি দুই টেবিলের মাঝখানে জাফরি ডিজাইনের কাঠের পার্টিশন দাঁড় করানো।

গার্গীর ভেতরে তখন উপছে পড়ছে প্রবল কৌতূহল। সম্পর্কে জা বলেই হয়তো নারীসুলভ সন্ধিৎসায় সে জেনে ফেলতে চাইছে, হিমনের সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ করে দীয়া কোন পুরুষের সঙ্গে গড়ে তুলতে চাইছে তার ভাবী জীবনের চালচিত্র

প্রায় আধঘণ্টায় দু-কাপ কফি নিয়ে ফেলল গার্গী। কফির কাপে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে কান পেতে আছে পাশের টেবিলের কথাবার্তায়। নতুন কোনও কারখানা খোলার কথা বলছে ওরা। হিমন আর চন্দ্রাদেবীর নামও উচ্চারিত হল একবার। আরও আশ্চর্য, একবার গার্গীর নামও। শুনে বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল গার্গীর। সেদিন গার্গী তার বাসায় গিয়েছিল। সেই আলোচনাই কি হচ্ছে তা হলে? গাগী জেনে ফেলেছে দীয়ার কোনও প্রেমিকের অস্তিত্ব, সে কথাই।

হঠাৎ একবাক্স রোমাঞ্চের ভেতর কীভাবে ঢুকে পড়ল তা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল গার্গী। বেশ উত্তেজিতও।

আধঘণ্টাটাক পর সঙ্গী পুরুষটি উঠে গেল প্রথমে। বিল মিটিয়ে সে বেরিয়ে যেতেই দীয়া উঠে দাঁড়াল। ঠিক এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল গার্গী। যেন এখনই সে রেস্তোরাঁয় ঢুকছে এমন মুখ করে দীয়াব সামনে এসে দাঁড়াল, আরে, তুমি এখানে?

দীয়া প্রথমে চমকে উঠেছিল গার্গীকে দেখে। চট করে দরজার দিকে নজর ফেলে দেখে নিল তার সঙ্গী পুরুষটিকে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসি ফোটাল মুখে. কী আর করব, এদিকে এসেছিলাম একটা কাজে। হঠাৎ চায়ের তেষ্টা পেয়ে গেল।

— চা খেয়েছ?

— হ্যাঁ, তা তুমি একা কেন? বর কোথায়?

'বর' শব্দটি কেমন খট করে গার্গীর কানে বাজল। গায়ে না মেখে বলল, আর বলো কেন। তিনি অফিস নিয়ে বেজায় ব্যস্ত।

—সে তো তুমিও শুনছি।

—ওই আর কি, সময় কাটানো। এদিকে মিঃ চৌধুরী আবাব বাইরে ট্যুরে যাচ্ছেন।

—সে কি, কোথায়?

—ভুবনেশ্বর। দু-তিনদিনের জন্য। আমার হয়েছে বিপদ। একা ও-বাড়ি থাকতে ভীষণ ভয় করবে। কিন্তু সে কদিন কোথায় থাকব বুঝে উঠতে পারছি না।

—কবে যাচ্ছেন?

—এই তো, আঠারোই মে।

দীয়ার চোখে শঙ্কা ফুটে ওঠে, হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে ওঠে, খবর্দার ও বাড়িতে একলা থেকো না কিন্তু। থাকলেই অবধারিত বিপদ, বরং — , কিছুক্ষণ থেমে কী যেন ভাবতে ভাবতে দীয়া বলে ফেলে, তবে অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা না হলে আমাকে বোলো। আমি না হয় তোমার সঙ্গে দু-তিন দিন থাকব।

—তাই, কী ভাল হয় তা হলে। তুমি তো ওদের বাড়িতে এখনও যাও মাঝে মাঝে।

—যাই, কিন্তু রাতে থাকি না। তবে তোমার কাছে হলে থাকতে পারি।

ভীষণ নিশ্চিন্ত হয়ে গার্গী স্বস্তির শ্বাস ফেলল, আহ্ বাঁচলাম। কদিন ধরে কী যে টেনশনে ছিলাম একা থাকতে হবে এই ভাবনায়।

দীয়া ঘাড় নেড়ে বলল, ভাবনার কথাই তো। আমি তো ওই জন্যেই পালিয়ে এসেছি ও বাড়ি থেকে, বলতে বলতে গলা নামাল দীয়া, রাতের বেলা যা সব ঘটনা ঘটে না রোজ —

— কী ঘটে? গার্গীর চোখেও ঘনিয়ে আসে শঙ্কা।

— ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে দু-তিনদিন থাকব তো। সব বলব সে-সময়।

দুজনে আরও দুকাপ কফি খেল এতসব কথোপকথনের ফাঁকে। বিল মিটিয়ে বাইরে বেরোতেই গার্গী বলল, বাড়ি যাবে তো, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দীয়া আগের দিনের মতোই আপত্তি করে, না,না। রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে আমার একটা কাজ আছে। সেখানে থেকে অন্য এক জায়গায় যেতে হবে। বাড়ি ফিরতে রাত হবে আমার।

— ঠিক আছে, তাহলে অন্তত রাসবিহারী অ্যাভেনিউ পর্যন্ত পৌঁছে দি।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে একটা দোকানের সামনে নেমে গেল দীয়া। তাকে নামিয়ে দিয়ে আরও কিছুটা এগিয়েই কী মনে হতে গার্গী বলল, দাঁড়াও তো ফুটুস। গাড়িটা থামতেই হাঁটতে হাঁটতে গার্গী ফিরে এল সেই দোকানে যেখানে দীয়াকে নামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে পৌঁছবার আগেই দীয়া কাজ মিটিয়ে বেরিয়ে এসেছে দোকান থেকে। তাকে ধরতে বাস স্টপে ছুটল গার্গী, কিন্তু সেখানেও পেল না, দেখল, এসপ্লানেডগামী একটা বাসে উঠে পড়েছে দীয়া। কথাটা বলা হল না বলে খুব আফসোস হল তার।

ফ্ল্যাটে ফেরার মুখে হঠাৎ কেন যেন মাথার ভেতর একটা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। ভীষণ টেনশান হচ্ছে তার। অস্থির-অস্থির লাগছে ভেতরটায়। সন্ধের পর ফ্ল্যাটে ঢুকতে গেলেই এমন হচ্ছে আজকাল। সেই ভয়ঙ্কর সন্ধের কথা স্মরণ করেই বোধহয়। পাছে ফের লোডশেডিঙের খপ্পরে পড়ে তাই একটা পেন্সিল-টর্চও রেখে দিয়েছে, ব্যাগের ভিতর। কিন্তু টর্চ লাগল না আজ। ঘরে ঢোকার পরও কিন্তু সে অস্থিরতার একচুলও উপশম হল না। আর তা নজরে পড়ল সায়নের, জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে তোমার? শরীর ভালো নেই?

— ঠিকই আছে, গার্গী তার অস্থিরতা গোপন করল।

—জানো তো, দুদিনেই দারুণ অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে আমাদের। কলকাতার প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট দোকানে জেসমিন ফ্লে ভার সাপ্লাই হয়ে গেছে। গোটা দশেক জেলাও কাভার করে ফেলেছি আমরা। মনে হচ্ছে ভালই রেস্পনস্ পাব।

— তাই! গার্গীর চোখ খুশিতে টইটম্বুর হয়ে ওঠে এতক্ষণে, হবে নাই বা কেন? যা একখানা প্রোডাক্ট এবার ছেড়েছ বাজারে —

— কী করে বুঝলে? তুমি তো আর মাখোনি।

— না মাখিনি। তবে আজ একপিস ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ভরে এনেছি। কমার্শিয়াল ম্যানেজারই বললেন, ম্যাডাম, একবার মেখে দেখুন আমাদের সাহেবের তৈরি সাবান। আপনি সার্টিফাই না করলে জেসমিন ফ্লেভার জাতে উঠছে না।

সায়ন হেসে উঠল, তাই নাকি।

— হুঁ। এখন অফিস থেকে ফিরে মনে হচ্ছে, সমস্ত শরীর ঘাম আর ধুলোয় মিশে চটচট করছে। দেখা যাক, জেসমিন ফ্লেভার কোনও উপকারে আসে কি না।

— বাহ্, এই না হলে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ঠিক আছে, ভাল করে সারা শরীর জুঁইফুলের গন্ধে ভরিয়ে এস। আজ সারারাত জুঁইফুলের গন্ধ শুঁকে কাটিয়ে দেব।

গার্গী ভ্রূকুটি করে হাসল, কী ব্যাপার চেয়ারম্যানসাহেব, প্রোডাক্টের ভাল কাটতি হবে ভেবে মনমেজাজ বেশ খুশিয়াল মনে হচ্ছে!

সায়ন হঠাৎ অন্যমনস্ক হল, আসলে এবারের ভেঞ্চার আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। এই স্টেকে না জিততে পারলে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস ফতুর হয়ে যাবে, গার্গী। বহু টাকা ওভারড্রাফট নিয়েছি।

গার্গীও অন্যমনস্ক হল, ঠিকই বলেছ, আমার কাছেও এটা একটা বিরাট স্টেক। এ যুদ্ধে জিততেই হবে।

গার্গীর মনে হল অন্য একটা যুদ্ধের কথা সে ভাবছিল।

পরের দুটো দিন আরও ব্যস্ততায় কাটল ওদের। ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশনের হারও যেমন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনই ডিসট্রিবিউশন পয়েন্টে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৎপরতা। যেন কী এক অলৌকিক স্পর্শে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে গোটা অফিসে।

সেদিন সন্ধের পর অফিস থেকে বেরুবার সময় গার্গী শুনল, অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে সায়ন। তাকে বলেও যেতে পারেনি ব্যস্ততায়। ফুট্টুস তার জন্য অপেক্ষা করছে গাড়ি নিয়ে। কিন্তু গাড়িটা সেদিন দু-তিনশো গজ যেতে না যেতেই হঠাৎ বিগড়ে গেল, কোনও নোটিস না দিয়েই। বহু আয়াসেও তার গাড়িতে হৃদ্‌স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে পারল না ফুট্টুস। প্রায় আধঘণ্টা পরে হতাশ হয়ে বলল, একটা ট্যাক্সি ডেকে দি, ম্যাডাম?

মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল গার্গী। হয়তো সে বাড়ি পৌঁছবার আগেই ফিরে আসবে সায়ন। তাকে দেখতে না পেলে বসে থাকবে ভারী বিষণ্ণ, মনমরা হয়ে। ঠিক ঠিক সময়ে কফির কাপ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠাটাও বিচিত্র নয়।

গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সির জন্য কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করল ফুট্টুস। বাধ্য হয়ে গার্গী বলল, তাহলে বাসেই উঠে পড়ি।

— আপনি বাসে ফিরবেন, ম্যাডাম? ফুটুসের চোখে একরাশ বিস্ময়, যেন এমন কথা সে জন্মেও ভাবেনি।

তার হাঁ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই বাসস্টপে পৌঁছে গেল গার্গী। ফুটুসের উৎকণ্ঠা দেখে মনে মনে হাসল, স্বগত কণ্ঠে বলল, বুঝলে ফুটুস, গাড়ি তো চড়ছি মাত্র এই কদিন। এতকাল ট্রামে-বাসে চড়েই বিশ্ব পরিক্রমা করেছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটা স্পেশ্যাল-বাস পেতে তাতে কোনও ক্রমে উঠে পড়ল। আর কী ভাগ্য, ভেতরে ঠেলে ঢুকবার মুখে একটা কাটা-সিট থেকে একজন উঠতেই একেবারে জানালার কাছে বসতে পেল সে। এক মুহূর্তে হু-হু হাওয়ায় তার শরীর থেকে লহমায় মিলিয়ে গেল এতক্ষণের পরিশ্রম আর উৎকণ্ঠা।

সবে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে, হঠাৎ তার নজর আটকে গেল গাড়ির গেটের কাছে। পরবর্তী স্টপেজে নামবার তোড়জোড় করছে আর কেউ নয়, হিমন। আরে, কোথায় নামছে হিমন, পার্ক স্ট্রিটে! কেন পার্ক স্ট্রিটে কেন? তার তো অফিস-ফেরতা বাড়ি ফেরার কথা। না কি —

দেবাদ্রি-সান্যালের কাছেই শুনেছিল গার্গী, হিমন নাকি প্রায়ই এক নাইট-ক্লাবে যায়। সেখানে তার এক বান্ধবী আছে, যে চেন-স্মোকার। কথাটা শুনে সেদিন অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। যে হিমন একটা জড় পদার্থের মতো জীবনযাপন করে, যার প্রতিটি পদক্ষেপই এলোমেলো, ভারসাম্যহীন, মানুষ দেখলেই যে জুবুথুবু হয়ে যায়, তার কিনা এক বান্ধবী আছে নাইট ক্লাবে! তা কি কখনও সম্ভব! যদি সম্ভবই হয় তাহলে হিমনের এই অস্বাভাবিক জীবনযাপন সবটাই কি বানানো, সবই তার অভিনয়! হিমন কি এখন সেই নাইট ক্লাবেই চলেছে!

ভাবনাটা ভিতরে চারিয়ে যেতেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো জানালার হাওয়ার স্নিগ্ধ ঝাপট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ। দুদ্দাড় করে ভিড় ঠেলে নেমে পড়ল হিমনের পিছু পিছু। হিমন অবশ্য আচ্ছন্নের মতো পথ হাঁটছে, গার্গীকে নজরই করল না। হিমন সম্পর্কে কদিন ধরেই তার ভিতরে চাগাড় দিয়ে উঠছে এক অপর্যাপ্ত কৌতূহল। তার সম্পর্কে দীয়া একরকম বলেছে, আর দেবাদ্রি সান্যাল বলেছে ঠিক তার বিপরীত, এ দুইয়ের মধ্যে কোনটা ঠিক।

বেশ অনেকখানি পথ এলোমোলোভাবে হেঁটে হিমন এসে দাঁড়াল একটা মস্ত দোতলা বাড়ির সামনে, যার সামনে ছোট্ট সবুজ লন, লনের দুপাশে কিছু ঝাউ, পাতাবাহার গাছ। লন পেরুলে বাড়ির দরজা, তার সামনে দাঁড়িয়ে দুই মোচ্অলা দারোয়ান। হিমনকে দেখেই সেলাম ঠুকে দরজা খুলে ধরল তারা। হিমন ভেতরে ঢুকতেই কী করবে দিশে না পেয়ে দারুণ ফাঁপরে পড়ল গার্গী। সেও কি ভিতরে ঢুকবে, না ঢুকবে না? তারপর হঠাৎ সাহস করে সেও হাজির হল দরজার সামনে।

ঠিক একইরকমভাবে সেলাম ঠুকে দরোয়ান দুজন দরজা খুলে ধরতেই একরাশ রোমাঞ্চ নিয়ে ভেতরে সেঁধুল গার্গী। ঢুকতেই ধাঁধিয়ে গেল তার চোখ। ভেতরে মস্ত এক রেস্তোরাঁর মতো, অসংখ্য টেবিল, চারপাশে চেয়ার। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে লোকজন। সবার সামনেই পানীয়। গার্গী উত্তেজনায় টং হয়ে কী করবে ভাবতে না ভাবতে

হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল গোটা রেস্তোরাঁ। পরক্ষণেই ভেসে এল অর্কেস্ট্রার দামাল সুর।

অর্কেস্ট্রার চমৎকার মিঠেন সুর কোথা থেকে ভেসে আসছে, কী ভাবে আসছে তা কয়েক মুহূর্ত বুঝে উঠতে পারল না গার্গী। তার চারপাশ তখন গাঢ় অন্ধকারে চুরচুর হয়ে আছে। সে নিজেও লীন হয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। একটা অচেনা রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকে পড়ে কোনও টেবিলে বসে পড়ার আগেই এ ভাবে পট করে আলো নিভে যাওয়া, হঠাৎ একগলা আঁধারের ভেতর রহস্যময় সুরের মূর্ছনা মৃদু থেকে তীব্র, তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা, এ সবই তার কাছে দুর্বোধ্য, একটা অদ্ভুত হেঁয়ালির মতো।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, হঠাৎ একটা নীল আলোর উদ্ভাস হল এক প্রান্তে। সেখানে মনে হল একটা মঞ্চ, তার উপর নীলচে আলো হঠাৎ মিহি হয়ে জ্বলে উঠল বিপুল রহস্য ছড়িয়ে। সেই আবছা আলোয় এতক্ষণে মস্ত হলঘরটার ভেতর সার সার অগুন্তি টেবিল, প্রতি টেবিলের চারপাশে বিছনো চেয়ার, লোকজন, সবই নজরে এল গার্গীর। মঞ্চের ঠিক উলটোদিকে বিশাল কাউন্টার, কাউন্টারে সাজানো রকমারি অসংখ্য বোতল, তার ওপাশে মোটাসোটা একজন গোঁফঅলা লোক। অর্থাৎ এটি একটি বড়সড় বার, যার অভ্যন্তরে গার্গী আপাতত দণ্ডায়মান।

মঞ্চের উপর নীল আলো তখন ক্রমশ জেগে উঠছে ঘুম থেকে। তাতে আরও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে হলঘরের ভেতরকার পটভূমিকা। অজস্র লোক বসে আছে পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে। গেলাস-বোতল-প্লেট-চামচের শব্দ হচ্ছে টুংটাং। বিস্ময় কাটতে-না-কাটতে হঠাৎ সে খেয়াল করল, হলঘরের মাঝখানে বিশাল একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে সে যে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে তা নজরে পড়েছে অনেকের। টেবিলে টেবিলে পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে তারা এতক্ষণ হাঁ করে অপেক্ষা করছিল, কখন মঞ্চে নীল আলোর আবির্ভাব ঘটে। মঞ্চে নীল আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু সে রোমাঞ্চময় আকর্ষণ ছেড়ে তারা এখন তাকিয়ে রয়েছে গার্গীর দিকেই।

ব্যাপারটা দ্রুত অনুধাবন করে সে তৎক্ষণাৎ একটা খালি টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল ধুপ করে। বসে আত্মগোপনই করতে চাইল। ব্যাগ থেকে দ্রুত তার ঘোলাটে-কাচের চশমাটা বার করে পরে নিল চোখে। চোখ ঢাকা পড়লে তা অনেকখানি ছদ্মবেশের কাজ করে। চোখই তো মানুষকে চেনার সবচেয়ে সহজ অস্ত্র।

ছদ্মবেশ ধারণ করল কেননা তার টেবিলের খুব কাছেই অন্য একটা টেবিলে বসে আছে হিমন। নিস্পৃহ, উদাসীন ভঙ্গিতে হলঘরের ভেতর নীল আলো একটু চোখ-সওয়া হতেই একজন ওয়েটার এসে গার্গীর কাছে নিচু হয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলল, ড্রিঙ্কস্, ম্যাডাম?

গার্গী ফাঁপরে পড়ল। হঠাৎই হিমনকে অনুসরণ করতে করতে সে ঢুকে পড়েছে এই অদ্ভুত পরিবেশের ভেতর। কিন্তু একটা বারে ঢুকে কোনও পানীয় না নিয়ে চুপচাপ হিমনের গতিবিধি লক্ষ করবে তা তো হতে পারে না, বাধ্য হয়ে ফিসফিস করে বলল, সফ্‌ট্‌।

ওয়েটার তৎক্ষণাৎ ছুটল কাউন্টারের দিকে।

তখন অর্কেস্ট্রার সুর চড়ায় উঠছিল ক্রমশ। হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠে পরমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। যাকে বলে পিনপতন নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই অ্যামপ্লিফায়ারে মৃদু ভরাট কণ্ঠে শোনা গেল, 'এই চমৎকার সন্ধ্যায় আপনারা এখন উপভোগ করবেন মিস লিজার পপসং।

তৎক্ষণাৎ আবার অর্কেস্ট্রার সুর। সেই সঙ্গে মঞ্চের নীল আলোয় বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে নাচতে ঢুকে পড়ল এক যুবতী। যেমন অভব্য তার পোশাক, তেমনই অশ্লীল তার নাচ। শরীর দুলিয়ে তীব্রকণ্ঠে গাইতে লাগল, 'আই অ্যাম অ্যাভেইলেব্‌ল টু-নাইট...'

গার্গীর টেবিল থেকে মঞ্চ খুব একটা দূরে নয় বলে যুবতীটিকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে সে, তার চুল পুরোপুরি সোনালি, চোখের মণির রং তুঁতবর্ণ, ঠোঁটে রক্তবর্ণ লিপস্টিক, চোখের পাতায় সবুজ আইশ্যাডো। এহেন যুবতীর অশালীন নাচ দেখতে দেখতে শরীরের ভেতরটা প্রবল অস্বস্তিতে ভরে উঠল গার্গীর। একবার ভাবল, চট করে উঠে বেরিয়ে যায় বাইরে, কিন্তু তার আগেই ওয়েটার এসে পানীয়ের সরঞ্জাম ভরে দিল টেবিলে।

অর্থাৎ গার্গীকে এখন এই ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর পরিবেশে আরও দীর্ঘক্ষণ কাটাতে হবে, যতক্ষণ না তার পানীয়ের গেলাস শেষ হয়, যতক্ষণ না তার টেবিলে বিল নিয়ে আসে ওয়েটার। ব্যাপারটা এইমুহূর্তে তার কাছে খুবই কষ্টকর, অসহনীয়। কিন্তু কী-ই বা করার আছে এখন। অতএব হালকা পানীয়ের গেলাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নৃত্যরতা যুবতীর দিকে নয়, তার অদূরে বসে থাকা হিমনের দিকে।

হিমন থম্‌ হয়ে বসে আছে একা। নিরুদ্বিগ্ন, চুপ-চাপ। যেন অপেক্ষা করছে কারও জন্য।

একটু পরেই একটা লোক হিমনের কাছে এসে নিচু হয়ে কিছু যেন বলল ফিসফিস করে। হিমন ঘাড় নাড়তেই সে যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনই চলে গেল তাড়াহুড়ো করে। একমুহূর্তে মনে হল গার্গীর, লোকটা সেদিন তার অফিসে দেখা সেই লোটন নয় তো! কিন্তু লোটন হঠাৎ বারে আসবে কেন, এলেও হিমনকে তার চেনার কথা নয়। পরমুহূর্তে মনে হল, সেদিন কালীজীবনবাবু বলেছিলেন, লোটন লাইম ইন্ডিয়ায় চাকরি করে। লাইম ইন্ডিয়ার রৌণক মুখার্জিকে এখন ঘোরতরভাবে সন্দেহ করছে গার্গী, সেদিন সন্ধের পর রৌণক কেন গিয়েছিলেন ঐন্দ্রিলার কাছে, গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ছিলেন কি না ঐন্দ্রিলার কাছে, তিনিই ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর জন্য দায়ী কি না, এ সব ভাবনা বারবার রোল করছে গার্গীর মগজে। রৌণকই তার সন্দেহের তালিকায় এখন প্রথম, কিন্তু তাকে অভিযুক্ত করার আগে নিশ্চিত প্রমাণ চাই তার। সেই রৌণকের সঙ্গে নিশ্চয়ই লোটনের যোগাযোগ আছে। কিন্তু লোটন হঠাৎ হিমনের কাছে কেন! রৌণকের দূত হয়েই কি লোটন এসেছে হিমনের কাছে? নিচু হয়ে সে কী বলল হিমনের কানে কানে? গার্গী যে হিমনকে ফলো করতে করতে ঢুকে পড়েছে এই বারে, সেই সংবাদই কি! তাহলে গার্গীকে কি নজরে রেখেছে ওরা?

প্রথম থেকেই কেন যেন হিমনকে ভারি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে গার্গীর। বাড়িতে

এমন গোবেচারার মতো নিরীহ জীবটি হয়ে থাকে যেন কিছুই জানে না, অথচ সে বারে আসে। ক্যাসিনো খেলে, স্মোকার বান্ধবী আছে — অর্থাৎ তার গোটা জীবনযাপনটাই গাঢ় রহস্যে আবৃত।

একটু পরেই একজন ওয়েটার এসে সেই রহস্যময় হিমনের সামনে পানীয়ের গেলাস ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম রেখে গেল। হিমন সেদিকে তাকিয়ে দেখল নিতান্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। একবার হাইও তুলল হঠাৎ। যেন আজ পানীয়ে তার ইচ্ছে নেই।

সোনালি চুলের মেয়েটা তখন আরও উদ্দাম হয়ে নাচছে। এহেন কুৎসিত দৃশ্যের ভেতর গার্গী তখন আর বসে থাকতে পারছে না। অথচ উঠে যাবে তাও সায় দিচ্ছে না মন, কেননা হিমনকে ফলো করে এতদূর এসেছে, তার স্বরূপ আসলে কী, জানতেই হবে তাকে। নিপাট বোকাসোকা চেহারার অন্তরালে সে কি সত্যিই ভয়ঙ্কর! সেদিন সন্ধের পর লোডশেডিঙের অন্ধকারে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে কি হিমন! হিমন, না রবার্ট, না অন্য কেউ?

যত দিন যাচ্ছে, ততই আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে হিমনকে, তার সোনালি দাড়ি আরও যেন ঘন হয়েছে, চিবুক ছাড়িয়ে নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত। লাল্‌চে ঝাঁকড়া চুল ছুঁয়ে ফেলেছে ঘাড়। চোখের দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক। তেমনই অসহায় চাউনি দিয়ে দেখছে যুবতীর নাচ। মাঝে-মধ্যে সামনে রাখা পানীয়ের গেলাস ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঠিকমতো ধরতেই পারছে না যেন, চুমুকও দিচ্ছে না একবারও।

তাহলে কেনই বা এখানে এসেছে হিমন! বোধহয় প্রায়ই আসে, নাকি রোজই! কিন্তু কী উদ্দেশ্যে, কার সঙ্গে দেখা করতে, তারই সন্ধানে এসে টানটান হয়ে বসে আছে গার্গী। কাছেই একটা টেবিলে একটু কোনাচে হয়ে বসে আছে হিমন, মুখটা ঘোরানো সামনের দিকে, ফলে গার্গীকে দেখে ফেলবে এমন সম্ভাবনা নেই। পেছন ফিরলেও এই আলো-আঁধারি পরিবেশে ঘোলাকাচের চশমা-পরা গার্গীকে চিনতেও পারবে না। এমন সব ভাবনায় লাট খাচ্ছে একা-একা, সেই মুহূর্তে একজন লোক হঠাৎ গার্গীর পাশে এসে একটা খালি চেয়ার দখল করল। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মাঝারি হাইট, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, নিচুগলায় কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, নাম্বার প্লিজ।

হঠাৎ এহেন অভাবনীয় ঘটনায় গার্গী রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠল। অচেনা লোকটি কেমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে, হাসছেও দাঁত মেলে, তার দিকে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইছে নম্বর কত। কিসের নম্বর,জেনে তার কী হবে, গার্গী কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বলে ফেলল, স্যরি।

কী বুঝল লোকটা কে জানে। তার উত্তর শুনে দ্রুত উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। গার্গী পিছন ফিরে তাকিয়েও তার গতিবিধি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হল। লোকটার চাউনি এমনই লোলুপ, ক্রূর ধরনের ছিল যে এবার একটু একটু ভয় চারিয়ে যেতে লাগল গার্গীর ভেতরে। মনে হল, এভাবে হুট করে এহেন উৎকট, জঘন্য পরিবেশে তার ঢুকে পড়াটা মোটেই উচিত হয়নি।

ততক্ষণে আরও অনেক টেবিল থেকে জোড়ায় জোড়ায় চোখ নজর রাখছে তার দিকে। তার মতো একটি আকর্ষণীয় যুবতী একলা বসে আছে, সঙ্গী ছাড়াই, এ দৃশ্য এখানে সবার

কাছেই ভারি লোভনীয়। এ অবস্থায় বেশিক্ষণ বসে থাকা খুবই ঝুঁকির কাজ। কিন্তু উঠতেও পারছে না হিমনের কথা ভেবে। পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি স্যান্যাল বলেছিলেন, হিমন অফিসের পর প্রায়ই 'বেল ক্লাবে' যায়। সেখানে তাকে দেখা যায় এক বান্ধবীর সঙ্গে, ক্যাসিনো খেলে কখনও কখনও। দেবাদ্রির অভিযোগ কতটা সত্যি তা যাচাই করতেই আজ গার্গীর এই অভিযান। কিন্তু এ-ক্লাবটা তো বেল ক্লাব নয়, গার্গী দেখে নিয়েছে ঢোকার আগে। গেটের বাঁদিকে প্রস্তরফলকে লেখা ছিল, 'দি আইডিয়াল নেস্ট।' তার মানে, হিমন একাধিক ক্লাবে যাতায়াত করে! শুধু কি ক্যাসিনো খে াই তার উদ্দেশ্য! নাকি তার বান্ধবীর জন্যে আসে। তাহলে তার বান্ধবীর এখনও দেখা নেই কেন? তারই জন্যে কি হিমন অপেক্ষায় রয়েছে? স্বর্ণকেশী যুবতী তখনও নাচে : নাচতে গেয়ে চলেছে, 'আই অ্যাম অ্যাভেইলেবল টু-নাইট...।' 'গানটা শুনতে শুনতে হঠাৎ গার্গীর মনে হল, পপসঙের এই সুরটি সে কোথায় যেন শুনেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই শুনেছে, কোথায় তা চট করে মনে পড়ল না। যুবতীর দিকে তাকিয়ে দেখল, সোনালি চুল, আর নীলাভ সবুজ চোখের মণির সমন্বয়ে তাকে বিদেশি যুবতী বলে মনে হলেও কোথাও যেন এদেশি ছাপ আছে তার চাউনিতে, মুখমণ্ডলে। হয় তো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হবে মেয়েটি। তার চাউনিতে যতটা না লাস্য, তার চেয়ে কুটিলতা বেশি। মিস লিজা নাম শুনে মনে হয় হয়তো তার নাম এলিজাবেথ বা ওইধরনের কিছু। পার্ক স্ট্রিট এলাকায় এধরনের অ্যাংলো মেয়ের ছড়াছড়ি। অনেকেই নর্তকীর কিংবা গায়িকার ভূমিকা পালন করে এ ধরনের বারে বা রেস্তোরাঁয়।

মেয়েটিকে বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল গার্গী, হঠাৎ কেন যেন মনে হল কোথাও দেখেছে এই ডিম-ছাঁদের মুখখানা। হয়তো এই মেয়েটিই কোনও সাহেব-কোম্পানিতে চাকরি করে দিনের বেলা। গার্গীর চোখে পড়েছে সে সব অফিসের কোথাও, পথেঘাটেও দেখতে পারে। এমন অদ্ভুত সাজপোশাক, চাউনি, সবই চোখে পড়ার মতো।

গার্গী তখন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে গোটা বারটা। কিন্তু দেখার ফুরসত পেল না, কারণ তাকে প্রবলভাবে শঙ্কিত করে হঠাৎ তার দুপাশের চেয়ারে দুই বিকট বলশালী পুরুষ এসে জাঁকিয়ে বসল। দুজনেরই চেহারা প্রকাণ্ড, গায়ে চকরাবকরা জামা, পরনে জিনসের ঢোলা প্যান্ট, একজনের মাথায় আবার ঝাঁকড়া চুল। দুজনে একই সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল তার দিকে, নাম্বার প্লিজ —, কিসের নম্বর জানতে চাইছে, কেনই বা, তা গার্গীর বুদ্ধিতে কিছুতেই সেঁধুল না। দুজন পুরুষ তাকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছে দুদিক থেকে যে গার্গীর মনে হল তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। সে এখন ইচ্ছে করলেই এই বেড়াজাল থেকে উঠে পালাতে পারবে না। দুজনের জ্বলন্ত চাউনি, লোলুপ অঙ্গভঙ্গি দেখে বুকের ভেতর কাঁপ ধরে গেল তার। যেন রণক্ষেত্রে সে ঢুকে পড়েছে অভিমন্যুর মতো, বেরুবার মন্ত্র জানে না, দুই মহারথী এখন তাকে নিয়ে —

অসহায়ভাবে চারপাশে তাকাতে গিয়ে সে আরও দেখল, শুধু এই দুই মহারথীই নয়, আরও বহু মহারথী এখন তার দিকে তাকিয়ে। প্রায় হায়নার মতো চাটছে তাকে। মঞ্চে নৃত্যরতা মিস লিজার যা আকর্ষণ, তার চেয়ে ঢের বেশি মনোযোগ কেড়েছে ঘোলাকাচের চশমা পরে থাকা এই রহস্যময়ী গার্গী চৌধুরী। এখানে তার পরিচিত বলতে একমাত্র হিমন। কিন্তু হিমনের আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা, শূন্য চাউনি দেখে বোঝা যায় সে নিজেই

টালমাটাল। গার্গীর কোনও সাহায্যেই সে আসতে পারবে না।

অর্কেস্ট্রার চড়া সুর তখন তুমুল হয়ে ঝরে পড়ছে বারের ভেতর। মিস লিজার পর্প সংও তখন তীব্র ধ্বনিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে পানরতদের শিরায় শিরায়। 'আই অ্যাম অ্যাভেইলেবল...' এর মাদকতায় দুলছে তাদের টলমল শরীর। গানের কলিগুলো বেশ কয়েকবার শুনতেই হঠাৎ গার্গীর মনে পড়ে গেল, সেদিন সকালে রর্বাট ও'নীলের কণ্ঠেই গুনগুন স্বরে শুনেছিল এই গানটি। হঠাৎ কীভাবে রবার্ট ও'নীলের গান এসে বাসা বাঁধল মিস লিজার কণ্ঠে, তা ভেবে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। এমন তো নয় যে এই গানটি কোনও বিখ্যাত গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠের রেকর্ড আছে, একেবারে নতুন গান, সম্ভবত রর্বাট ও'নীলই এর স্রষ্টা, সে গান কিনা মিস লিজার গলায়!

গার্গীকে নিরুত্তর দেখে যমদূতের মতো দুপাশে বসে থাকা দুজন লোক পরস্পর চোখোচোখি করল, কী যেন ইশারাও করল মনে হল, তারপর একই সঙ্গে ফের ঝুঁকে পড়ল তার দিকে, ইয়োর নাম্বার প্লিজ —

গার্গী আগের মতোই বলল, স্যরি।

ভেবেছিল 'স্যরি' বললেই এবারও উঠে যাবে লোক দুটো। কিন্তু আশ্চর্য তারা উঠল না। বরং পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা এক ওয়েটারকে কর্কশ কণ্ঠে বলল, হুইস্কি —, বলে দুজনেই দুটো সিগারেট ধরাল।

গার্গী প্রমাদ গুনল। বিলের জন্য বসে অপেক্ষা করা আর ঠিক হবে না। উঠে গিয়ে কাউন্টারে টাকা মিটিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে বাইরে। দুপাশে লোক দুটো তখন কাছেই আর একটা টেবিলের দিকে হাত নেড়ে কী সব বলছে, তারাও কটমট করে তাকাচ্ছে গার্গীর দিকে। গার্গী বুঝতে পারছে, সে খুব বড় একটা ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছে আজ। এখন উঠে পালাতে চাইলেও এরা তাকে এখান থেকে বেরোতে দেবে কি না কে জানে। যতই সে ক্যারাটে জানুক, এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই দেওয়া কোনও ক্রমেই তার পক্ষে সম্ভব নয়।

গার্গীর দু পাশে দুজন লোক তখন গার্গীকে নিয়েই যেন আলোচনা শুরু করল নিজেদের মধ্যে। লম্বা, সারা মুখে কাটা-দাগ লোকটার, সে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বলল, মেয়েটা নয়া আমদানি, তাই না গুরু?

এপাশের ধুমসো লোকটা হেসে উঠল খিকখিক করে।

প্রথম লোকটি গার্গীর দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, খাঁচায় তুলে নেব নাকি, গুরু।

গুরু তেমনই বিশ্রীভাবে হেসে বলল, দ্যাখ তো খোল্‌সা করে, নয়া না পুরানা?

প্রথম লোকটি ধন্দে পড়ে বলল, নয়াই মনে হচ্ছে, আগে তো কখনও দেখিনি। কী চুল, কী চোখ। খাপসুরত চেহারা।

শুনতে শুনতে গার্গীর ভেতরে কাঁপ শুরু হয়ে গেল। এ কাদের পাল্লায় পড়ে গেল কে জানে! হিমনকে বাস থেকে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে নামতে দেখে কেন যে তাকে অনুসরণ করার ভূত চাপল তার মাথায়! ফুট্টুসের গাড়িটা খারাপ না হলে এতসব রহস্যের ভেতর তার তো ঢোকার কথাই ছিল না।

একটু পরেই ধুমসো লোকটা উত্তর দিল, মেয়েটাকে আগে দেখেছিস। শুধু ভোল

বদলেছে এই যা।

—তাই নাকি! কোথায় দেখেছি বল তো?

—মেয়েটা বেল ক্লাবে নাচত আগে। তখন এর নাম ছিল মিস বেবি।

প্রথম লোকটি জিভে স্‌স্‌স্‌ শব্দ তুলে বলল, হুর র র র..., তাই বল। চোখ দুটো দেখেই তাই মনে হচ্ছিল, চিনি চিনি চিনি, ওগো বিদেশিনী।

শেষ বাক্যগুলো অদ্ভুত সুর করে গাইল লোকটা। গার্গী একটু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তাহলে তাকে নিয়ে নয়, মিস লিজাকে নিয়েই কথাবার্তা চলছে দুজনের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভুরুতে ভাঁজ পড়ে, এই মেয়েটাই বেল ক্লাবে নাচত আগে? বিশ্রী চেহারার লোক দুটোর বিচিত্র কথোপকথনের ফাঁকে এই অদ্ভুত অথচ জরুরি তথ্যটি জেনে ফেলে যেন ভারি সুবিধে হল গার্গীর। হিমন তখনও বসে আছে ঝুম্ হয়ে। বোধহয় এখনও অপেক্ষা করছে কারও জন্য। তার সেই বান্ধবীর জন্যই হয়তো। কিন্তু কে তার সেই বান্ধবী, যার সম্পর্কে দেবাদ্রি সান্যাল বলেছিলেন, চেন-স্মোকার! সে এই মিস্ লিজাই নাকি, যে আগে মিস বেবি নামে বেল ক্লাবে নাচত, এখন মিস লিজা হয়ে নাচছে এই 'দি আইডিয়াল নেস্ট' এ, তাও কি সম্ভব!

মঞ্চের উপর মিস লিজার গান তখন শেষ হয়ে এসেছে। হলঘরের আলো কমে আসছে ফের। মৃদু হয়ে আসছে অর্কেস্ট্রার সুরও। তাতে চঞ্চল হয়ে উঠল হিমন। সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত কাউন্টারের দিকে গেল। মুহূর্ত দেরি না করে গার্গীও টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল চকিতে। লোক দুজনকে একটুও বুঝতে না দিয়ে বিল মেটাতে সেও কাউন্টারের কাছাকাছি গেল। হিমনের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল আড়াল খুঁজে। হিমন কিন্তু কাউন্টারে গেল না, তার পাশ দিয়ে চলে গেল কিছুটা, সেখানে একটা দরজা। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে টোকা দিতে লাগল কাঁপা-কাঁপা হাতে।

গার্গী তখন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বিল মেটাচ্ছে, আর কালচে-চশমার আড়াল থেকে নজর রাখছে হিমনের দিকে। বুঝতে পারছে না, দরজায় নক করে কাকে ডাকছে হিমন।

একটু পরেই বন্ধ দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে হিমন ঢুকে গেল তার ভেতর।

গার্গীর বিল মেটানো হয়ে গিয়েছিল। কাউন্টারের ম্যানেজারের চোখ ফাঁকি দিয়ে সেও প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সেঁধিয়ে গেল দরজার ওদিকে। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। অন্ধকার ভেদ করে হিমন কোন দেকে গেল তা ঠাহর করে উঠতে পারল না। কিছুক্ষম হিম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একা। চোখে অন্ধকার সয়ে এলে নজরে পড়ল, একটা সরু গলি। সাহস করে গলি বরাবর কিছুটা এগোল। গলির ঠিক শেষ মুখে একটা ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে তার ভেতরে তাকাতেই ভীষণ চমকে উঠল গার্গী। সেই স্বর্ণকেশী যুবতীর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে হিমন। নাচ শেষ করে যুবতী তখন সিগারেট ধরিয়েছে একটা। দেবাদ্রি সান্যাল যেমন বলেছিলেন, সেরকমই মিলে যাচ্ছে ঠিক-ঠিক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, চেন-স্মোকারই মেয়েটা। হিমনকে কিছু যেন বলছে অনুচ্চকণ্ঠে। তারপর কাছেই একটা আলমারি খুলে একটা মোড়ক তুলে দিল হিমনের হাতে।

সেটা হাতে পেতেই হিমন অমনি ঘুরে দাঁড়াল। তাকে দরজার দিকে আসতে দেখেই গার্গী চট করে চলে এল আড়াল খুঁজে নিয়ে। তার ভিতরে তখন উপচে পড়ছে প্রবল

কৌতূহল। যুবতীর সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল হিমনের! কিছু একটা চাইছিল যেন, কী চাইছিল! আলমারির ভেতর থেকে যেটা বার করে দিতেই ভারি খুশি দেখাল হিমনকে। কিন্তু কী এমন মহার্ঘ বস্তু যা হিমনের কাছে খুবই জরুরি! এই স্বর্ণকেশীই কি তাহলে হিমনের বান্ধবী? ভারি অদ্ভুত কাণ্ড তো! যে হিমনের স্ত্রী স্বামীর পঙ্গুত্বের দোহাই দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, ডিভোর্সের নোটিস পাঠায়, তারপর সম্পর্ক স্থাপন করে অন্য পুরুষের সঙ্গে , সেই হিমনই আবাব এহেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বান্ধবী জোটায় কীভাবে তা সত্যিই এক জটিল রহস্য। সমস্ত ব্যাপাবটাই যেন ভারি গোলমেলে হয়ে উঠছে ক্রমশ।

হিমন কিন্তু দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও না। কৌতূহলী গার্গী দরজা দিয়ে উঁকি মারতে গিয়ে দেখল, এবার দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভিতর থেকে, তার মানে ওরা দুজনেই এখন ঘবেব মধ্যে। কী করছে ওরা এখন তা আর না ভেবে গার্গী এবার ফিরে আসতে চাইল অন্য দরজা দিয়ে। সেই মুহূর্তে অন্ধকারে কে যেন তাকে ধাক্কা মারল। গার্গী সপাটে পড়ে যেতে যেতেও কোনও ক্রমে সামলে নিল। নিশ্চয় কেউ তাকে অনুসরণ করে এসেছে তার পিছু পিছু। ভীষণ ভয় পেয়ে প্রায় দুদ্দাড় করে যে দরজা দিয়ে এই গলির অন্ধকারে ঢুকেছিল সেই দরজার দিকে ছুটে গেল। দরজাটা খোলা পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। দরজা পেরোতেই হলঘর। মঞ্চে ততক্ষণে আবার নীল আলোর বিচ্ছুরণ শুরু হয়েছে' নাচ শুরু করেছে অন্য একটি মেয়ে। সঙ্গে সেরকম বিশ্রী গান। কোনও ক্রমে টেবিলগুলো পার হতে গিয়ে দেখল, অনেকগুলো চোখ তাকে অনুসরণ করছে। কেউ কেউ যেন উঠে দাঁড়ালও তাকে দেখে। গার্গী তখন হুড়মুড় করে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে মনে হল, বেশ কয়েকজন লোক বড বড় পা ফেলে ধাওয়া করেছে তার পিছনে। হলঘর পেরোতেই ওপাশে সেই লন। কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটা। দুপাশে গাছগুলো ঝুপসি দেখাচ্ছে। ঘাসে পা দিতেই হঠাৎ একটা বড় ইটের টুকরো তার শরীরের কাছ ঘেঁসে তীব্রবেগে গিয়ে পড়ল লনের মাঝখানে। গার্গী কেঁপে উঠল ফের। তৎক্ষণাৎ তার গতি আবও বাড়িয়ে দিল। পেছনে তখনও কেউ কেউ আসছে দ্রুত পায়ে। লন পেরিয়ে গেট খুলে রাস্তায় নামতেই কিছুটা আলোর হদিস পেল। পেছনে তাকিয়ে দেখল, তিন-চাব জন লোক ধাওয়া করেছে তার পিছু পিছু. রাত অনেকটা হয়ে গেছে। পথে লোকজন, গাড়ি ঘোড়া থাকলেও সংখ্যায় কম। পরিবেশটাই কেমন গা ছমছমে। তিন-চারজন লোক তার মতো একজন একলা যুবতীকে হঠাৎ কিড্ন্যাপ করে নিয়ে যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয় এই অঞ্চলে।

কোনও কিছু না পেয়ে সামনেই একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তাকেই ডাক দিল গার্গী। এদিককাব ট্যাক্সিঅলারা ভাল হয় না, তবু ট্যাক্সিটা থামতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তাতে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, লোকগুলোও উঠছে সেখানে দাঁড় করানো একটা অ্যাম্বাসাডারে। তারা উঠে বসতেই অ্যাম্বাসাডারটা বিদ্যুৎবেগে রওনা দিল তার ট্যাক্সির পিছু পিছু। গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, লোকগুলো কী করতে চায়। সে ক্রমাগত টাক্সিওয়ালাকে একবার বাঁয়ের গলি একবাব ডাইনের গলিতে ঢুকতে নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগল রুদ্ধশ্বাস হয়ে। মধ্য কলকাতার এই অঞ্চলে এত রাস্তা আছে, এত তার লেন-বাইলেন যে অনেকক্ষণ লড়াই চালানো যায় এ-পথ ও-পথ ঘুরে। ট্যাক্সিওয়ালাও অবাক

হয়ে ছিল, তারপর বাংলায় বলল, কোনও বিপদে পড়েছেন নাকি, মাইজি?

গার্গী তখনও উত্তেজনায়, ভয়ে, আতঙ্কে হাঁপাচ্ছে। কোনও ক্রমে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

— আপনার ভয় নেই, মাইজি, বলে ট্যাক্সিওয়ালা নানান অলিগলি পার হয়ে কিছুক্ষণ পর সিধে ঢুকে পড়ল ল্যান্সডাউন ওরফে শরৎ বসু রোডে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে তখন গার্গী বুঝতে চাইছে সমস্ত ব্যাপরাটা। তাহলে একটা বিরাট চক্র কাজ করছে এত সব ঘটনার পেছনে। কারা তারা? হিমনই বা এদের সঙ্গে জুটল কী করে?

রুদ্ধশ্বাসে ট্যাক্সি থেকে নেমে, ট্যাক্সিঅলাকে ভাড়ার দ্বিগুণ বকশিশ দিয়ে একছুটে ব্লু-ওয়ান্ডারের গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল গার্গী। ঘড়িতে তখন প্রায় রাত এগারটার মতো। এত রাতে একা কখনও বাড়ি ফেরেনি সে। নিশ্চয়ই সায়ন তার জন্য উৎকণ্ঠিত, উদগ্রীব হয়ে ঘরময় পায়চারি করছে বহুক্ষণ ধরে। অফিস থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল গার্গী ভেবে হয়তো তোলপাড় করছে চারদিক। কী জানি থানা-পুলিশও করে ফেলল কি না এতক্ষণে।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সে আরও তাজ্জব। ঘর তালাবন্ধ, অর্থাৎ সায়নও ফেরেনি। ফেরেনি, নাকি ফিরে গার্গীকে না দেখে গার্গীর খোঁজ করতে চুঁড়ে বেড়াচ্ছে সারা কলকাতা!

একেই তো সারা সন্ধে এক বিচিত্র রোমাঞ্চ, রহস্য আর আতঙ্কে ওতপ্রোত হয়ে কাটিয়ে এখনও নীল হয়ে আছে, তার জের কাটেনি, রেলগাড়ি চলছে গোটা হৃৎপিণ্ড জুড়ে, তার ওপর সায়ন ঘরে নেই দেখে আরও এক উৎকণ্ঠা ঘিরে ধরল তার শরীর। দ্রুত অফিসে ফোন করে জানল সেখানে নেই। ফ্যাক্টরিতে ডায়াল ঘুরিয়েও হদিস পাওয়া গেল না। সম্ভাব্য আর কোন গন্তব্যে যোগাযোগ করলে তাকে পাওয়া যাবে বুঝে উঠতে না পেরে একে প্রবল হতাশায় সহসা ঝুম্ হয়ে গেল।

তা হলে এখন সে কী করবে!

নিজের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল হঠাৎ। শুধুমাত্র তার এক অ্যাডভেঞ্চারের জন্যই, হঠকারিতাই বলা যায়, সায়নের এমন হয়রানি। এত রাত পর্যন্ত গার্গী না ফেরায় কী জানি কোথায় খুঁজছে, কত না ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে বেচারিকে। নাকি —

নাকি সায়ন নিজেই কোনও সমস্যার মধ্যে পড়েছে!

এহেন নানান দুর্ভাবনায় হিম হয়ে যেতে যেতে গার্গী একসময় দেখল, ঘড়ির কাঁটা আরও একঘণ্টা অতিক্রম করেছে। কলকাতা এখন মধ্যরাতের মুখোমুখি। শ্লথ হয়ে আসছে কলকাতার জীবনযাপন, কমে আসছে গাড়ি-চলাচলের পরিমাণ। কলকাতা ঢলে পড়ছে

ঘুমের দিকে। একা এত বড় একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে থাকতে থাকতে গার্গীর হঠাৎ মনে হল কারও যেন নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে। কারও যেন ফিসফিস আওয়াজ। হঠাৎ প্রবল হর্ন বাজিয়ে একটি ভারী ট্রাক গাঁক গাঁক করে শরৎ বসু রোড কাঁপিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে বুকের ভেতর কাঁপ ধরিয়ে দিয়ে গেল। কেন যেন ভীষণ একটা অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল তার ভেতর। মধ্যরাত্রে বিপুল একাকিত্বের ত্রাস হঠাৎ তাড়া করে এল তাকে। ভয়ঙ্করভাবে

সেই মুহূর্তে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতে গার্গী লাফ দিয়ে ছুটে গেল ধরতে। নিশ্চয়ই সায়নের ফোন।

রিসিভার তুলতেই কিন্তু হতাশ হল, ম্যাডাম, কালীজীবন বলছি ; হঠাৎ খুব একট বিপদ হয়েছে —

— বিপদ! গার্গী চমকে উঠল। কেঁপেও উঠল ভীষণ।

— আমাদের একটা ট্রাক সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট করেছে, বালি ব্রিজ পেরিয়ে আরও তিন কিলোমিটার দূরে, অন্য একটা ট্রাকের সঙ্গে।

— কখন হয়েছে অ্যাকসিডেন্টটা!

— সন্ধের দিকে। খবর পেয়েই আমাদের সাহেব চলে গেলেন ঘটনাস্থলে। যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেলেন খবরটা আপনাকে দিতে। কিন্তু সন্ধে থেকে আপনাকে অনেকবার রিং করেও পাইনি। ফোন বেজেই যাচ্ছিল।

গার্গীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল প্রায়, কোনও ক্রমে বলল, এনি মিসহ্যাপ?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম। ড্রাইভার সিরিয়াসলি ইনজিওরড্। অন্য ট্রাকটা অ্যাক্সিডেন্ট করেই পালিয়ে গেছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। এখনও ধরা পড়েনি। এদিকে মালবোঝাই ট্রাক খাদে বহুক্ষণ কাত হয়ে পড়ে থাকায় বেশিরভাগ মালই লুট হয়ে গেছে।

গার্গীর হাত ঠকঠক করে কাঁপছিল। রিসিভার ধরেই রাখতে পারছিল না যেন। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?

— ফ্যাক্টরি থেকে, ম্যাডাম। সাহেব বলেছেন, ওঁর ফিরতে দেরি হবে।

রিসিভার যথাস্থানে রেখে বহুক্ষণ নিজের ভেতর তোলপাড় হল গার্গী। নিশ্চয়ই এ নিছক দুর্ঘটনা নয়। অফিসে ও ফ্যাক্টরিতে তারা নজরদারি বাড়িয়ে দেওয়ায় সেখানে অন্তর্ঘাত সম্ভব হয়নি বলে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের দাঁত আর নখ এখন বাড়িয়ে দিয়েছে রাস্তায়। গার্গীর ওপর পর-পর আক্রমণ তো চলেইছে, এখন নানানভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্যারাডাইসকে যে কোনও ভাবেই হোক শেষ করে দিতে। কিন্তু অত সহজে গার্গী ছাড়বে না তাদের, যে বা যারা এই ষড়যন্ত্র সংঘটিত করে চলেছে, শাস্তি তাদের পেতে হবেই।

কিন্তু সায়ন হঠাৎ নিজেই বা কেন ছুটে গেল ঘটনাস্থলে। তার এখন পায়ে পায়ে বিপদ তাবৎ পৃথিবী এখন তাকে ধ্বংস করতে ছুটে আসছে চক্ষু রক্তবর্ণ করে। তারা তো এরকম দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চাইবেই সায়ন ছুটে আসুক সেখনে। তাহলে তার উপরও আক্রমণ চালাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

ভাবতে ভাবতে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল গার্গী। নিজের অজান্তেই ফাঁদে পা দিয়েছে সায়ন। একটু আগেই গার্গী বুঝে এসেছে কী ভয়ঙ্কর জাল বিছানো রয়েছে তাদের

চারদিকে। কী নৃশংস তাদের চাউনি, তবু সে এখনও বুঝতে পারছে না, হিমন কেন রোজ ওই বারে যায়, তার ওই অদ্ভুত বান্ধবীটিই বা কে — । সেই বিদেশিনী যার মাথায় সোনালি চুল, চোখের পাতায় সবুজ আইশ্যাডো, দুটি মণি কপার সালফেটের মতো নীলাভ সবুজ। সেখানে ভীষণদর্শন সব উটকো লোক গার্গীকে বাগে পেয়েছিল আজ। জীবন মুঠোয় নিয়ে ফিরে গার্গী এখনও দুঃস্বপ্ন দেখছে সেইসব দৃশ্যের। এর মধ্যে সায়ন হঠাৎ আরও কোন বিপদের মধ্যে পা দিয়ে ফেলল!

আর কিছু ভাবতে পারল না সে। তার কাছে এখন কোনও বাহনও নেই যে সায়নের খোঁজে ছুটে যাবে। সায়ন বিপদে পড়লে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করবে তা এই মুহূর্তে দুঃসাধ্য। কিছুই করার নেই তার একমাত্র দুশ্চিন্তায় ক্ষয় হওয়া ছাড়া।

সেই সময় হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে প্রথমে চমকে উঠল, পরমুহূর্তে স্বস্তির শ্বাস ফেলে ছুটল দরজার দিকে। 'নিশ্চয়ই সায়ন এসেছে' এই ভেবে দুদ্দাড় করে ছিটকিনি খুলতে গিয়েও একলহমা থমকে গেল, আই-হোলে চোখ দিতেই ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরটা। কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত।

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রবার্ট ও'নীল।

এত রাতে আবার রবার্ট ও'নীল কেন এসেছেন তাদের ফ্ল্যাটে!

ঠকঠক শব্দের রাশ বুকে নিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল গার্গী। সে দরজা খুলবে না আজ, কিছুতেই খুলবে না। নিশ্চয়ই সায়ন ঘরে নেই খবর নিয়েই এসেছেন রবার্ট। তাহলে নিশ্চয়ই কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে এর মধ্যে। কী উদ্দেশ্য তা এখনও তার কাছে স্পষ্ট নয়, তবু —

বাইরে দাঁড়িয়ে আরও একবার কলিং বেলে হাত ছোঁয়ালেন রবার্ট। হয়তো ভাবছেন, নিশ্চয়ই দরজা খুলে যাবে এরপর। গার্গী নিশ্চয়ই আগের দিনের মতোই হাসিতে, উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। রবার্টের চেনা আরও অনেক নারীর মতো তারও মুখে ছড়িয়ে পড়বে এক স্বর্গীয় দ্যুতি।

কিন্তু না, দ্বিতীয়বারের ধ্বনিতেও দরজা খুলল না আজ।

একটু পরেই দরজার এপাশে স্তব্ধ, আতঙ্কিত গার্গী শুনতে পেল, সিঁড়ি দিয়ে ভারী জুতোর নেমে যাওয়ার শব্দ। সে শব্দের রেশ গার্গী অনুসরণ করল গেট অবধি। গেটের কাছে নীল মারুতিটা যে দাঁড়িয়ে ছিল তা এতক্ষণে খেয়ালে এল তার।

গার্গীর বুক থেকে একটা পাষাণভারও যেন নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল বড় করে, চোখ বুজল একলহমা, কিন্তু বিষণ্ণও হয়ে রইল কেন যেন। রবার্ট মানুষটাকে সেদিন রাতে এক বিচিত্র, প্রাণময় পুরুষ বলে মনে হয়েছিল তার। তাকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে হঠাৎ খুব কষ্ট হল আজ। হয়তো মানুষটা সত্যিই ভাল। সে শুধু শুধু সন্দেহ করছে তাকে।

কিন্তু সন্দেহ হওয়ার কারণও তো রয়েছে। তার গলায় পপসং হঠাৎ কীভাবে গিয়ে ভর করল 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর এক বিদেশিনী নর্তকীর কণ্ঠে!

একই সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেল গার্গীর ভাবনায়। এদিকে হয়ে আসছে রাত। নিশুতি হয়ে আসছে গোটা কলকাতা। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে

হঠাৎ ঐন্দ্রিলার কথা মনে পড়ে গেল তার। এখনও ঘরে একলা হলেই ঐন্দ্রিলার একটা নিঃশব্দ উপস্থিতি বড় বেশি টের পায় যেন। পাশের ঘরে খসখস্ শব্দ হলেই মনে হয়, ঐন্দ্রিলা পা টিপে টিপে হাঁটছে। খুবই নরম-সরম ছিল ঐন্দ্রিলা। তার হাঁটাচলা, তাকানো, উপস্থিতি সবখানেই এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য। তার কথা বলাও ছিল মৃদু, সায়ন বলত মনোসিলেবিক। সেরকমই মৃদু কণ্ঠস্বর যেন কোথাও ধ্বনিত হল এই গাঢ় নিশুতির ভেতর, কী রে,

মিতুন —

পরক্ষণেই টেলিফোনের আবারও পিঁক পিঁক পিঁক। গার্গী দৌড়ে চলে গেল রিসিভার তুলতে। এবার নিশ্চয়ই সায়নের, এমন ভেবে কানে লাগাতেই এক ধরনের ঘড়ঘড় কণ্ঠস্বরে হাত-পা হিম হয়ে গেল তার।

— সাপের লেজে পা দিচ্ছেন, ম্যাডাম। যে পর্যন্ত এগিয়েছেন, ওখানেই থামুন। নইলে আপনাকেও ঐন্দ্রিলা চৌধুরীর মতো একতাল পোড়া মাংস হয়ে শুয়ে থাকতে হবে ঘরের মেঝেয়।

রিসিভারটা ঝপাং করে খসে পড়ল গার্গীর হাত থেকে। পরিষ্কার শাসানি। ঘড়ঘড়ে পুরুষ কণ্ঠ স্পষ্ট ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করতে চাইল তাকে। গার্গী যে অনুসন্ধানের কাজে এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা, ফলে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে রহস্য, এই ভুতুড়ে-কণ্ঠ তাই-ই বোধহয় মনে করিয়ে দিল তাকে। কিন্তু গার্গী তবুও ধন্দে আছে সে সত্যিই কতটুকু এগিয়েছে। সে একবার রৌণক মুখার্জির পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছে, একবার 'দি আইডিয়াল নেস্ট' হিমনের পিছু পিছু, কখনও দৃষ্টি রাখছে তাদের পাশের ফ্ল্যাটে চোখজোড়ার দিকে। কখনও নজরদারি করছে তার অফিসের প্রতিটি সেকশনে। এর মধ্যে প্রকৃত রহস্যের চাবিকাঠি কোথায়? কীভাবেই বা সে উদঘাটিত করবে ঐন্দ্রিলার হত্যারহস্য! ঠিকঠাক প্রমাণ না পেলে শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করেই কি হত্যাকারীকে শনাক্ত করা যায়!

মধ্যরাত পর্যন্ত এহেন হাজারো ভাবনায়, দুর্ভাবনা ও আশঙ্কায় টালমাটাল হয়ে রইল। উত্তেজনায়, ভয়ে তার শরীরে খিদে পর্যন্ত নেই। সায়ন একরাশ বিপদের মধ্যে কোথায় সেই জি টি রোডে নাস্তানাবুদ হচ্ছে, তার কী হচ্ছে কিছুই ভেবে থই পাচ্ছে না, খিদে পায়ই বা কী করে!

'ম্যাডাম, সাপের লেজে পা দিয়েছেন' শব্দবন্ধটি তাকে এখনও ঘোর চিন্তায় রেখেছে। এই ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বর কি সেই স্বর যা ছয়ই এপ্রিল ভোররাতে ঘুম ভাঙিয়েছিল থানার অফিসারদের, ঐন্দ্রিলার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল জল্লাদের মতো! সেই কণ্ঠস্বর কি আজ গার্গীর মৃত্যুদণ্ডও ঘোষণা করল পরম নিরাসক্ত ভঙ্গিতে!

গার্গী একমুহূর্ত ভাবল, ফোন করে পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালকে সব কিছু ইন-টো-টো জানাবে কি না। জি টি রোডে অ্যাসিডেন্টের খবর, সায়নের ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া, বারে গিয়ে গার্গীর বিপদে পড়া, টেলিফোনের হুমকি — সব।

পরক্ষণেই অবশ্য থমকে গেল। সায়নের জন্য আরও একটু অপেক্ষা করবে। তারপর না হয় —

পরবর্তী কলিং বেল যখন বেজে উঠল, ঘড়িতে তখন রাত দুটো। এবার আই-হোলে

চোখ রাখতেই লাফিয়ে উঠল, হ্যাঁ, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে সায়নই। দরজা খুলতেই পরিশ্রমে টেনশনে, পর্যাপ্ত ক্লান্তিতে....চুরমুর হওয়া সায়ন প্রায় টলতে টলতে ঘরে ঢুকল

তার চেহারা দেখে গার্গীও টাল খেয়ে গেল যেন।

ঘরে পা দিয়েই প্রথম যে কথাটা সায়নের মুখে উচ্চারিত হল, একটা বড় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলাম না, গার্গী।

গার্গী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, ড্রাইভার? সায়ন মাথা নাড়ল, কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম ওখানকার হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে। কিন্তু ইনটারনাল হেমারেজ। তা ছাড়া লাংসও ড্যামেজড হয়ে গিয়েছিল স্টিয়ারিং বসে গিয়ে। একটা পা-ও অ্যামপুট করতে হত —

গার্গী আর ভাবতে পারল না। যে বীভৎস দৃশ্য সে দেখেনি, তা শুধু কল্পনা করে যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল তার মুখ। কী সাংঘাতিক, কী ভয়ঙ্কর!

—বুঝলে, একটা আফসোস রয়ে গেল। লোকটার নাম বিবেনচাঁদ। মাত্র গত সপ্তাহে এসেছিল ছুটি চাইতে। এক বছর হয়ে গেল দেশে যায়নি, বালবাচ্চা দ্যাখেনি। বলেছিলাম, আর কটা দিন অপেক্ষা করতে। মাল ডেসপ্যাচ হয়ে গেলেই —

বলতে বলতে সায়ন থামল। কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে আসছে তার। একটু পরে আবার বলল, আজ বিকেলে যখন ট্রাক লোড হচ্ছিল, লোকটা কী উৎসাহে পিঠ চাপড়ে শক্তি জোগাচ্ছিল লোডারদের। তখনও ভাবতে পারেনি আজই তার শেষ দিন।

সে রাতে অনেকক্ষণ দু-চোখের পাতা এক করতে পারল না গার্গী। সায়নের কষ্টটা অনুভব করতে পারছিল। সেও যে সায়নের মতো এই মধ্যরাত পর্যন্ত আর এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছে তা একবারও জানতে দিল না সায়নকে। এর মধ্যে ভোর রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি। যখন ঘুম ভাঙল, বেলা হয়ে গেছে অনেকটা। ধড়মড় করে উঠে দেখল, ভোরের দিকে কখন যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তা অগোচরে থেকে গিয়েছিল তাদের। বাতাসে সামান্য আর্দ্রতা। মেঘও আছে আকাশে, ফলে রোদের আভাসমাত্র নেই। দ্রুত বিছানা থেকে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়ল চা করতে।

চায়ের টেবিলে বসে দুজনে অনেকক্ষণ কালকের দুর্ঘটনার কথাই নাড়াচাড়া করল বিষণ্ণ গলায়। এক সময় সায়ন বলল, কৌশিক দত্ত চলে যাওয়ার পর প্রোডাকশন ম্যানেজারের পোস্টটা ভেকেন্টই রয়ে গেল।

গার্গী চোখ তুলল। সায়ন কী বলতে চায় বোধহয় তাইই অনুমান করার চেষ্টা করল

—তুমি বোধহয় শুনেছ, রাহুল রায় হ্যাজ বিন স্যাক্ড্‌। লাইম ইন্ডিয়াতে আর নেই।

গার্গী মাত্র গতকালই পেয়েছিল খবরটা। লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শেষ পর্যন্ত তাঁর কোম্পানির টলমল অবস্থা সামাল দিতে বরখাস্ত করেছেন প্রোডাকশন ম্যানেজারকে। সে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আস্তে করে ঘাড় নাড়ল, শুনেছি।

—রাহুল রায় প্যারাডাইসে জয়েন করতে চায়।

গার্গী এতক্ষণে বিস্ময় প্রকাশ করল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ভাবছি, নিয়ে নেব কি না। তেমন ভাল কাউকে যখন হাতের কাছে পাচ্ছি না —

গার্গীর ভুরুতে কোঁচ পড়ল, নিজেই এসেছিল নাকি?

—না। কালীজীবনবাবুই কাল আমার কাছে এসে বললেন।

—কালীজীবনবাবু! গার্গীর কাপ থেকে কিছু চা চলকে পড়ল যেন। একটু ভেবে নিয়ে বলল, রাহুল রায় সম্পর্কে সব খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে?

—তা ঠিক নিইনি। কিন্তু লাইম ইন্ডিয়ায় বহুদিন ধরে আছে। ওর সম্পর্কে একমাত্র অভিযোগ হল, ভাল প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কোনও নতুন ফর্মুলা বার করতে পারেনি বলেই চলে যেতে হল ওকে। সে প্রব্লেম তো আমার কোম্পানিতে নেই। শুধু ফ্যাক্টরি সামাল দিতে পারলেই হবে।

গার্গী তবু একমত হতে পারল না, আস্তে করে বলল, এখনই কোনও ডিসিশন নিতে হবে না। আরও কয়েকদিন যাক।

সায়ন অবাক হয়ে তাকাল গার্গীর দিকে, কী বুঝল কে জানে, তারপর মৃদু হেসে বলল, ঠিক আছে, এম. ডি. যখন চাইছেন না, তাহলে থাক।

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, সায়ন তার এই সিদ্ধান্তে অখুশি হয়েছে কি না। বলল, প্রোডাকশন ম্যানেজার না থাকায় তোমার উপর খুব চাপ বেড়ে গেছে, তাই না?

—সে আমি ঠিক সামলে নেব। কিন্তু কাল অফিসে কানে এল, হয়তো মধুমন্তী রায় মজুমদারও চাকরি ছেড়ে দেবে।

—তাই নাকি? গার্গী এবার সত্যিই আশ্চর্য হল, কেন?

—ঠিক অনুমান করতে পারছি না। তবে কৌশিক দত্তের রেজিগনেশনের সঙ্গে হয়তো মধুমন্তীর চাকরি ছাড়ার কোনও সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। এর আগে কঙ্কা রায় চলে গেছে, তারপর পি. এম। এখন যদি অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারও যায়, খুব সমস্যা হবে।

খুব অবাক হয়ে গার্গী ভাবতে বসল, কাল দুপুরেও মধুমন্তীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে পরবর্তী বিজ্ঞাপনের লে-আউট নিয়ে, কই, তখন তো একটুও বুঝতে পারেনি। হেসে বলল, ঠিক আছে, দেখা যাক কী করা যায়।

সেদিন একটু দেরিতে অফিসে পৌঁছে গার্গী দেখল, সারা অফিসে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা। সেকশনে সেকশনে গুঞ্জন, ফিসফাস চলছেই। কোথাও কোথাও তর্কবিতর্ক চলছে মৃদু স্বরে। এও খবর পেল, ফ্যাক্টরিতে উত্তেজনা আরও বেশি। কালকের ট্রাক দুর্ঘটনায় অল্পবিস্তর সবাই-ই বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, কেউ বা আতঙ্কিতও। পরপর এত সব দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের প্যারাডাইস যে বেশ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাতে কারওরই সন্দেহ নেই। যে ড্রাইভারটি মারা গিয়েছে তার পরিবারের কথা ভেবে অনেকেই বিষণ্ণ হয়ে আছে।

এক সময় মধুমন্তী রায় মজুমদার গার্গীর চেম্বারে ঢুকল হাতে একরাশ নতুন লে-আউট নিয়ে। জেসমিন ক্রেডারের ওপর রঙিন সব অ্যাড তৈরি করা হয়েছে। কোনওটা কুড়ি সে. মি. বাই চার কলম। কোনওটা তার দ্বিগুণ সাইজের। সংবাদপত্রের সাপ্লিমেন্টের পাতায় নীচের দিকে যাবে। কোনওটা বা সাপ্তাহিকে কিংবা পাক্ষিকে। জোর ক্যাম্পেন চলবে কয়েক সপ্তাহ।

কথা বলতে বলতে গার্গী মধুমন্তীর কানের দিকে তাকাল। আজ আর বেগুনি পাথর নেই মধুমন্তীর দুলে। পরিবর্তে সবুজ পাথর। যাকে বলে এমারেল্ড গ্রিন। কিন্তু সবুজ রংটা

আজ হঠাৎ কেন যেন চোখে লাগছে তার। মধুমন্তী আঙুলে যে আংটিটা পরেছে তাতেও সবুজ পাথর বসানো। মধুমন্তী যে খুবই শৌখিন তা তার পোশাক-আসাক, সাজগোজ, অলঙ্কার দেখলেই অনুমিত হয়। হয়তো আগেও এমনই সাজতেন, মাঝখানে বোধহয় ডিভোর্সের কারণেই বিষণ্ণ দেখাত তাঁকে। এখন আবার ফিরে এসেছে সাজ।

গার্গী লে-আউটগুলো দেখতে দেখতে তার ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করছিল মধুমন্তীর সঙ্গে। মধুমন্তী যে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে তা কিন্তু একবারের জন্যও তার কথাবার্তা শুনে আঁচ করা গেল না। তার মানে মধুমন্তী খুবই চাপা। তার ভেতরে যে আঁচ আছে তার উত্তাপ চেপে রাখতে পারে খুব সহজে। এ ধরনের মেয়ে কিন্তু খুব সহজ হয় না।

বিকেলের দিকে ফ্যাক্টরি থেকে একটা বিপজ্জনক খবর এল, ট্রাক ড্রাইভাররা কেউই মাল লোড করতে চাইছে না। একযোগে বেঁকে বসেছে সবাই। তারা বলছে, প্যারাডাইসের কপালে এখন শনি লেগেছে। কোন ট্রাক কখন অ্যাকসিডেন্টের কবলে পড়বে তা কেউ জানেনা। এমনকি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি যে ট্রাকগুলো পাঠিয়েছিল, তারাও প্যারাডাইসের মাল নিয়ে রাস্তায় বেরোবে না বলেছে।

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, ড্রাইভাররা হঠাৎ একযোগে খেপে উঠল কেন। অ্যাকসিডেন্টের উপর তো কারও হাত নেই। তা হলে কি কেউ বা কারা খেপিয়ে তুলছে ড্রাইভারদের? স্যাবোটেজ! ষড়যন্ত্র! এবার খোলাখুলি আক্রমণ করছে যাতে আর মাল ডেসপ্যাচ না হতে পারে!

সায়নের চেম্বারে গিয়ে দেখল, সংবাদ পেয়েই সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ফ্যাক্টরিতে। অনেক রাত পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেল তাতে জানা গেছে কোনও সুরাহা হয়নি। কোনও ট্রাকই আর প্যারাডাইসের মাল নিয়ে ডিউটিতে বেরোবে না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছে।

তার মানে প্রোডাক্ট আর পৌঁছবে না মার্কেটে! তাহলে তো প্যারাডাইসের সামনে সমূহ বিপদ!

গভীর রাতে হতাশ, বিষণ্ণ মুখে ফিরে এসে সায়ন জানাল, সারাদিন তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ, কোনও ট্রাক-ড্রাইভারই আর প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের সাবান বহন করবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। তাদের এই জোট বেঁধে মাল বইতে অস্বীকার করা — এটা অন্তর্ঘাত, উদ্দেশ্যমূলক, নাকি স্বতঃপ্রণোদিত, তা না-সায়ন না-গার্গী কেউই বুঝে উঠতে পারল না। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করেও কীভাবে এই কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করা যায় তার কোনও উপায়ও খুঁজে পেল না ওরা। শুধু মনে হল, তাদের এত উদ্যোগ, পরিশ্রম, সবই হার মানছে কোনও প্রবল শক্তির কাছে।

প্রায় মাঝরাতের দিকে, যখন তাদের কারও চোখেই ঘুম নেই, হঠাৎ পাশের ফ্ল্যাট থেকে চন্দ্রাদেবীর চিৎকার শোনা গেল। সেই জাঁহাবাজি গলার তুমুল দাপানি নয়, ক্রুদ্ধ, অথচ উৎকণ্ঠা মেশানো। গার্গী বিছানা থেকে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ঘটনাটা। রবার্ট ও'নীল অন্যদিনকার মতো ফিরে যাননি আজ। অনুচ্চকণ্ঠে এটা-ওটা বলে তিনি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন চন্দ্রাদেবীকে, তবু তাঁর উচ্চকিত স্বর, কথাবার্তার ধরন শুনে মনে হল, এমন কোনও ঘটনা, যা ব্লু-ওয়ান্ডারের জীবনযাত্রার পক্ষে অস্বাভাবিক শুধু নয়, অসম্ভব কোনও কিছু।

জিজ্ঞাসু চোখে গার্গী তাকাল সায়নের দিকে, কী ব্যাপার বলো তো?

সায়ন ঠোঁট ওল্টাল, কী আবার! নিশ্চয় রবার্ট আবার নতুন কোনও রূপসী বান্ধবী জুটিয়েছেন, অতএব পুরনো বান্ধবী পুনরায় ঈর্ষায় জরজর। মাঝরাতে হই-রই কাণ্ড করে নতুন অ্যাফেয়ারাটিতে ব্রেক কষতে চাইছেন!

—সত্যিই আশ্চর্য এই জুটি। দম্পতি না হয়েও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাম্পত্যকলহ চালিয়ে গেলেন।

—কিন্তু ও সব ভাবনা এখন থাক। ট্রাক-ড্রাইভারদের গাড়ি চালাতে রাজি না করাতে পারলে নতুন প্রোডাক্ট সব জমে যাবে স্টোরে। সেক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশনও বন্ধ করে দিতে হবে কাল থেকে।

গার্গী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল তার অভ্যাসমতো, ঠিক আছে, তাহলে কাল আমিই না হয় একবার চেষ্টা করব মেটাতে। অফিসে না গিয়ে ফ্যাক্টরিতেই যাব প্রথমে।

সায়ন অবাক হল, তারপর স্বস্তির শ্বাস ফেলে একটু হাসল, দেখা যাক। চেয়ারম্যান যে কাজে ব্যার্থ হল, সে কাজ ম্যানেজিং ডিরেক্টর পারেন কি না।

সায়ন স্বস্তির শ্বাস ফেলল মানে দায়িত্বটি চেপে বসল গার্গীর কাঁধে। সেও হেসে বলল, শুধু সাবানের ফর্মুলা বার করেই প্যারাডাইসের নিস্তার নেই, এত সব অন্তর্ঘাত, দুর্ঘটনা থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যাবে তারও ফর্মুলা বার করতে হবে এবার।

বাকি রাতটুকু কীভাবে ট্রান্সপোর্টের এহেন ঝামেলা মেটানো যাবে তাই-ই শুধু ভাবল না গার্গী, মনঃসংযোগ করল পাশের ফ্ল্যাটের ঘটনাবলিতেও। চন্দ্রাদেবীর কণ্ঠস্বর শুনে দাম্পত্য-কলহই মনে হয়নি তার। নিশ্চয় পিছনে আছে এমন কোনও অভাবিত ঘটনা যা চন্দ্রাদেবীকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। কী সেই উৎকণ্ঠা, কেনই বা, এমন প্রশ্নে কৌতূহলী হয়ে কাক-ভোরে উঠেই প্রথমে মোহনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে, বলো তো মোহন? সারারাত এত চেঁচামেচি হয়েছে ও-ফ্ল্যাটে!

মোহন খুবই চাপা ধরনের লোক। বিশেষ করে পাশের ফ্ল্যাটেরই সে বেশি আজ্ঞাবহ বলে গার্গীদের কাছে চট করে কিছু প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু গার্গী সুকৌশলে গত কয়েকদিনে বেশ পটিয়ে নিয়েছে মোহনকে। মোহন এখন অনেক কথাই অবসর সময়ে গার্গীকে বলে। আজ অবশ্য সে নিজেই খুব শঙ্কিত, গার্গীকে জানাল, হিমন কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি।

গার্গী সামান্য চমকে উঠল। হিমন একেবারেই বাড়ি ফেরেনি এমন ঘটনা নাকি কখনওই ঘটেনি এর আগে। তার বাড়ি না ফেরার সম্ভাব্য কারণ কী কী হতে পারে, কোনও গূঢ়

রহস্য এর ভেতর থাকতে পারে কি না তা খতিয়ে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সেদিনের খবরের কাগজে প্রকাশিত ছোট্ট একটি সংবাদের দিকে চোখ পড়ল তার। এবং বলা বাহুল্য স্তম্ভিত হল।

পার্ক স্ট্রিটের একটি বারে আগের দিন সন্ধেয় প্রবল গোলমাল হয়েছে। সামান্য কথা-কাটাকাটি থেকে বচসা, তারপর সংঘর্ষ, সংঘর্ষের কারণে খুন হয়েছে একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী। বচসার কারণ যতদূর জানা গেছে একজন নর্তকীকে কেন্দ্র করেই।

ঘটনার এই পর্যন্ত পড়ে তেমন বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কারণ এসব বারে সন্ধের পর এ ধরনের ঝগড়া, মারামারি, এমনকি খুনোখুনিও তেমন নতুন কিছু নয়। গার্গীকে যা চমকে দিল, তা হল বারটির নাম। 'দি আইডিয়াল নেস্ট।'

সংবাদটি হয়তো সায়নের চোখেও পড়েছে, কিন্তু সে 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নয়, ফলে ঘটনাটি তাকে বিচলিত করেনি বিন্দুমাত্র। কিন্তু গার্গী তো এই বার-কাম-রেস্তোরাঁটিকে হাড়ে-হাড়ে চিনে এসেছে সেদিন। তৎক্ষণাৎ ভীষণ একটা টেনশন আক্রান্ত করল গার্গীকে। হিমন নিশ্চয়ই তার অভ্যাসমতো কাল সন্ধেয় গিয়েছিল 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ। সংঘর্ষের সময় হয়তো উপস্থিতও ছিল সেখানে। তারপর তার এহেন আকস্মিক অন্তর্ধান রীতিমতো আশঙ্কার কথা। সঙ্গে সঙ্গে যে দুটি প্রশ্ন গার্গীর মগজে চক্কর দিয়ে উঠল, তা হল যারা অবাঙালি ব্যবসায়ীকে খুন করেছে, তারাই হিমনকে গুম করে ফেলেছে কি না, অথবা দুই, হিমন নিজেই এই খুনের সঙ্গে জড়িত, খুনের পরই সে গা-ঢাকা দিয়েছে কোথাও।

দুটো ভাবনাই প্রবলভাবে আলোড়িত করল গার্গী কে। এ বাড়ির বাকি কেউই হিমনের অন্তর্ধানের আসল কারণ ধারণাই করতে পারছে না। পারেনি বলেই এখনও তেমন শোরগোল ওঠেনি। নইলে ঐন্দ্রিলা-হত্যা রহস্যের মতো এ ঘটনাটাও প্রতিবেশী, পুলিশ ও সাংবাদিকদের চমকে দেওয়ারই মতো।

সেদিন সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে গার্গীর মনে হল, ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং তার এই মুহূর্তে একবার 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ যাওয়া দরকার। পরশু রাতে জায়গাটিকে ভারি রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। বিশেষ করে হিমনের চালচলন, তার গতিবিধি সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা হয়ে ওঠেনি। সংবাদের নর্তকী বলতে কি তার সেদিনকার দেখা সেই স্বর্ণকেশী মিস লিজাই! নাকি 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর আরও এমন বহু নর্তকী আছে, তাদের কাউকে কেন্দ্র করেই সংঘর্ষ ঘটেছে গতকাল সন্ধেয়! হিমনই বা কোথায় গেল। হিমন বেঁচে আছে তো! না থাকাটাও অস্বাভাবিক নয় এই কারণে যে, অমন একটি বীভৎস পরিবেশে সে রোজ যায়, সেখানে তার কিছু অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে, অতএব তার চরিত্রগত দিকটি ভারি রহস্যে মোড়া, এ ধরনের জায়গায় যে-কোনও মুহূর্তে যা কিছু ঘটাই সম্ভব। অবৈধ যে-কোনও ব্যাপারই মানুষকে অকারণ জটিলতায় নিয়ে যায় শেষপর্যন্ত। যার পরিণতিতে এহেন খেসারত।

'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ যাওয়ার ভাবনাটা খুবই ভাবিত করল গার্গীকে। দিনের বেলায় তো নয়ই, সন্ধের পর ছদ্মবেশে যাওয়াও বোধহয় খুবই ঝুঁকির কাজ হবে। বিশেষ করে একা কোনও মহিলার পক্ষে ওরকম জঘন্য পটভূমিকায় পা দেওয়া মানেই হাজারো বিপদ

ডেকে আনা। কিন্তু কেন যেন গার্গীর কেবলই মনে হচ্ছে এই ছোট্ট অথচ নৃশংস ঘটনাটি থেকে রহস্যের কোনও হালহদিস উন্মোচিত হলেও হতে পারে। অতএব—

অতএব আরও একবার আজ সন্ধেয় সে এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় রত হবে। অতএব—

সম্ভাব্য যে বিপদই তার সামনে আসুক না কেন, আবারও সাপের লেজে পা দিতে হবে সব জেনেশুনেই।

কিন্তু তার আগে আপাতত তাকে যেতে হবে ফ্যাক্টরিতে। ট্রাক-ড্রাইভারদের নারাজ হওয়ার অন্তরালে কার হাত কাজ করছে তাও খুঁজে বার করা জরুরি। যে অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে পরশু প্যারাডাইসের একটি ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, যার পরিণতিতে মারা গেল বিষেনচাঁদ নামে ড্রাইভারটি, লুট হয়ে গেল এক ট্রাক জেসমিন ফ্লেভার, সম্ভবত সেই একই বিরুদ্ধ শক্তি সুচতুরভাবে কাজ করে চলেছে ট্রাক-ধর্মঘটের পিছনেও। সেই শক্তির সঙ্গে টক্কর দিতে না পারলেই তো ডাহা হেরে ভূত হয়ে যাবে গার্গীরা।

সায়ন খুবই বিষণ্ণ হয়ে ছিল। সে খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে। আসলে মেধাবী, উদ্যমী পুরুষ ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে তার উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে, নতুন উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই তাদের পছন্দ, কিন্তু বিপক্ষশক্তির সঙ্গে লড়াই দিতে হলেই ঘাবড়ে যায়, পিছু হটে আসতে চায় তৎক্ষণাৎ। গার্গী বোধহয় ঠিক তার বিপরীত, তার মেধা তেমন নেই যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে চমকে দিতে পারে পৃথিবীকে, কিন্তু প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে পিছপা হয় না। যে ভয়ঙ্কর শক্তিই এতসব রহস্যের অন্তরালে থাকুক না কেন, যত শাসানিই দিক না কেন, একটা কিছু এসপার-ওসপার করতেই হবে এবার।

খুবই চিন্তামগ্ন হয়ে ফ্যাক্টরিতে বেরুবার মুখে সায়ন হঠাৎ বলল, একজন প্রোডাকশন ম্যানেজার থাকলে হয়তো ফ্যাক্টরির এই সব ঝুট-ঝামেলা সামাল দিতে পারত।

গার্গী সায়নের দিকে তাকাল একবার, গম্ভীর মুখে বলল, তুমি কি রাহুল রায়কে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে কি না তাইই বলতে চাইছ?

সায়ন ইতস্তত করল, কিন্তু কিছু বলল না।

—রাহুল রায়েব ব্যাপারটা আপাতত মুলতুবিই থাক। আর একটু খোঁজখবর নিই। অত তাড়াহুড়োর কী আছে?

সায়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে থাক।

সেদিন ফ্যাকটরিতে পৌঁছে আরও এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মুখোমুখি হল তাবা। কাল গভীররাতে কে যেন ফোন করেছিল ফ্যাক্টরিতে। ফোন ধরেছিল নাইটগার্ড এতওয়ারি। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে সেই পুরুষ বলেছে, ফ্যাক্টরির ভেতর ভীষণ শক্তিশালী একটা বোমা রেখে দেওয়া হয়েছে , যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণে উড়ে যাবে গোটা ফ্যাক্টরি। এতওয়ারি ভয় পেয়ে সে রাতেই খবর দেয় ওয়ার্কস ম্যানেজার বরুণ নন্দীকে। তৎক্ষণাৎ বরুণ নন্দী কয়েকজন লেবার নিয়ে এসে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে ফ্যাক্টরির সর্বত্র। কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কোনও প্যাকেট বা বস্তা পাওয়া যায়নি। ঘটনাটা তারা রাতেই চেয়ারম্যানকে জানায়নি এই ভেবে যে, ফোনটা যেহেতু নিতান্তই ভুতুড়ে, শুধু শুধু তাঁকে এই রাতদুপুরে বিরক্ত করার দরকার নেই।

কিন্তু এখন সে কথা শুনে সায়ন বিরক্তই হল যেন। বলল, তবু ব্যাপারটা জানানো উচিত ছিল। সত্যিই যদি কোনও মিস্‌হ্যাপ হত আগের বারের মতো! বিশেষ করে পরপর এত সব দুর্ঘটনা যখন ঘটেই চলেছে। একটা ক্যাজুয়ালটি মানে কোম্পনির ওপর ভীষণ চাপ বেড়ে যায়।

সায়নের কথায় অবশ্য সত্যতা আছে। যে-কোনও দুর্ঘটনা আবারও ঘটতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। ট্রাক-ড্রাইভারদের নিয়ে যা জট পাকিয়েছে তা ছাড়াতে গিয়ে কাল সারাদিন হিমশিম খেয়েছে সায়ন, তবু সফল হয়নি। আজও সবাই জোট পাকিয়ে রয়েছে। সকাল থেকে একটি ট্রাকও ছাড়েনি ফ্যাক্টরির গেট থেকে। কাল থেকে মাল লোডই হয়নি তো!

গার্গী বহুক্ষণ ধরে ভেবে চলেছিল, কীভাবে এই ঝামেলার ফয়সালা করা যায়। ফ্যাক্টরির কোনও অফিসারকে না ডেকে সে একাই বসল সমস্ত ট্রাক-ড্রাইভারকে নিয়ে। দীর্ঘ সময় ধরে তাদের কথা মন দিয়ে শুনল। অন্তত ঘণ্টাদেড়েক। যার মনে যত শঙ্কা, ভীতি জমা হয়েছিল সব মন উজাড় করে বলতে দিল একে-একে। আশঙ্কা ও ভয়ের সঙ্গে কিছু অভিযোগ, কিছু দাবিদাওয়ার কথাও শুনল ধৈর্য ধরে। এ সব ক্ষেত্রে 'পেশেন্ট হিয়ারিং' একটা মস্ত ওষুধ। যখন সব কথা নিঃশেষ করে বলা হয়ে যাবে, মনের ক্ষোভও কমে যায় অনেকখানি, সমাধানের ক্ষেত্রেও অমনই প্রস্তুত হয়ে যায়। দাবিদাওয়ার কথাই প্রথমে মেনে নিল গার্গী, অভিযোগের প্রতিকারও করবে এমন আশ্বাস দিল। সবশেষে বলল, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ যে ঘোর প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি, তা এভাবে চলতে দিলে হয়তো কোম্পানি বন্ধই হয়ে যাবে এরপর। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। তা রোজ রোজ ঘটে না। বিষেনচাঁদের পরিবারকে শুধু এককালীন ক্ষতিপূরণই দেওয়া হবে তা নয়, তার পরিবারের একজনকে তারা কোম্পানিতে এখনই বহাল করবে।

কিন্তু এততেও যখন কোনও কোনও ড্রাইভার বলল, তারা রাস্তায় বেরুতে ভয় পাচ্ছে, গার্গী দমে না গিয়ে বলল, ঠিক আছে, কাল সকালে মাত্র একটি ট্রিপই হবে। কৃষ্ণনগর যাওয়ার জন্য যে ট্রাকটি গত দুদিন ধরে মাল লোড হয়ে অপেক্ষা করছে, আমি সেই ট্রাকের সামনের সিটে বসে যাব। যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে আমার ওপর দিয়েই হোক।

ড্রাইভাররা পরস্পর চোখাচোখি করল। কোম্পানির মালকান নিজেই ট্রাকের সওয়ারি হতে চাইছেন, সেটা হয় কি না, হওয়া সম্ভব কি না তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

গার্গী পুনর্বার বলল, তাহলে কাল ভোর ছটায় রওনা হব, যাতে সন্ধের আগেই মাল খালাস করে ফিরে আসা যায়? যদি তার পরেও কারও দ্বিধা থাকে, তাহলে পরশু আবার বেরুব অন্যদিকে। কাটোয়া, কিম্বা বনগাঁ, অথবা কাকদ্বীপ।

জীবনলাল নামে এক ড্রাইভার বলল, আমরা একটু ভেবে দেখি।

—ভাবাভাবির তো কিছু নেই, জীবনলাল। তোমাদের সব দাবিদাওয়াই তো মেনে নেওয়া হয়েছে। একমাত্র ভয় ছিল দুর্ঘটনার। আমি সঙ্গে থাকলে কোনও দুর্ঘটনাই ঘটবে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। অতএব কাল ভোর থেকেই ডেসপ্যাচ শুরু হোক। দিনসাতেকের মধ্যে সমস্ত ডেলিভারি করে ফেলতে পারলে একদিন ফ্যাক্টরিতে সবাই মিলে ভোজ হবে।

আরও আধঘণ্টা তুমুল কচকচানির পর সবাইকার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল একসঙ্গে। ঠিক হল, ট্রাকের সঙ্গে মালকানের যাওয়ার দরকার নেই। তবে কাল ভোরে গার্গী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একে-একে সব ট্রাককেই রওনা করিয়ে দেবে ফ্যাক্টরির গেট থেকে। শুধু মালকানের অনুরোধেই তারা কাল পথে ট্রাক নামাবে। কিন্তু যদি আবার কোনও দুর্ঘটনা ঘটে—

গার্গী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তারা বা তাদের পরিবার যে সুযোগ-সুবিধা চাইবে, কোম্পানি তা-ই মঞ্জুর করবে।

আবেগের বশে অনেকটাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলল গার্গী। সায়ন এতক্ষণ ফ্যাক্টরির ভেতর প্রোডাকশনের কাজ দেখতে ব্যস্ত ছিল। তাকে এতক্ষণের সমস্ত আলোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধারাবিবরণীর মতো বলে গেল গার্গী। সায়ন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, যা-হোক অসম্ভবকে সম্ভব যখন করেছ, আশা করা যায় শেষরক্ষা হবে।

অসম্ভবকে সম্ভব করে উঠতে পারলেও ভেতরে-ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিল গার্গী। তার এত মেহনতের পরও যদি কোনও মিস্‌হ্যাপ হয়, কোম্পানির কারও কাছেই সে মুখ দেখাতে পারবে না। প্রবল গোলমালও দেখা দেবে কর্মীদের ভেতর। কর্মীদের তো ধারণাই আছে, মালিকপক্ষ নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় স্বল্প বেতনের শ্রমিকপক্ষকে।

এ ছাড়া আরও একটি বিপজ্জনক কারণে টেনশন চারিয়ে যাচ্ছিল গার্গীর ভেতর। সে ফ্যাক্টরি থেকে অফিস যাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা 'দি আইডয়াল নেস্ট'। জেনেশুনেই সে বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে শুধু এই আশায় যে হয়তো কোনও সত্য উদঘাটিত হতে পারে ওখান থেকে।

অফিসে গিয়ে অবশ্য একটা স্বস্তির সংবাদ পাওয়া গেল। মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরির মেসিনটি রিপেয়ারের জন্য যে পার্টসটি বিদেশ থেকে আসার কথা ছিল, এতদিনে সেটি রওনা দিয়েছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের উদ্দেশে। খবরটি পেয়ে ভারি উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল সায়নকে। গার্গীকে তার চেম্বারে ডেকে বলল, যদি সব ঠিকঠাক চলে, তাহলে দিন পনেরোর মধ্যেই ডিটারজেন্ট পাউডারের উৎপাদনও শুরু করে দিতে পারব। জেসমিন ফ্লেভারের পর আরও একটি নতুন উপহার দেবে পারাডাইস। ভাল দেখে তার একটা নাম ভেবে ফেল দেখি।

আজ সায়নকে বলে একটু আগে-আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল গার্গী। গাড়িতে উঠেই ফুট্টুসকে বলল, পার্ক স্ট্রিট।

পার্ক স্ট্রিটে এসে যে বাড়িটির সামনে ফুট্টুসকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল গার্গী, তার সামনে 'বার' শব্দটি লেখা দেখে বোধহয় বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না ফুট্টুসের। তার মেমসাহেব কিনা বারে ঢুকছে হঠাৎ! তারপর হয়তো ভাবল, বড়লোক বাড়ির কেতা তো এরকমই হবে।

গার্গীর ভেতর তখন এক অন্যরকম কাঁপ। সেদিন যে বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল. আজও হয়তো সেরকমই কোনও ভয়ঙ্করের সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে। হয়তো তার চেয়েও কোনও বড় কিছু। কিন্তু আজ সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। বিপদ কোন দিক থেকে

আসবে জানা থাকলে তার সম্মুখীন হওয়া ঢের সহজতর কাজ। হয়তো হিমন এখানেই কোথাও আছে, আত্মগোপন করে।

গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলে সবুজ ঘাসের লন পার হল গার্গী। ভেতরটা তার কাঁপছে তখন। কাল সন্ধেয় এখানেই খুন হয়ে গেছে একটি। নিশ্চয়ই তার জের আজও থাকবে।

কিন্তু বারের গেটের কাছে পৌঁছে ভারি অবাক হল গার্গী। দরজায় মস্ত একটি তালা ঝোলানো। বাইরে অপেক্ষমান দরোয়ান দুজনকে না দেখে একটু সন্দেহ হচ্ছিল তার। তালা দেখে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হল যে সম্ভবত থানা থেকেই সিল করে দিয়েছে বারটি।

'দি আইডিয়াল নেস্ট' বন্ধ দেখে যেমন হতাশ হল, তেমনই বহুক্ষণ জমে থাকা এক বিপুল টেনশনের হাত থেকেও মুক্তি পেল গার্গী। যে ভয়ঙ্কর অভিযানের পথে পা বাড়িয়েছিল, তাতে প্রবল ঝুঁকি ছিল নিঃসন্দেহে, জীবন সংশয় হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না, এখন মনে হল কাঁধের ওপর থেকে নেমে গেল গোটা মন্দার পর্বত। কিন্তু বিশল্যকরণীর খোঁজ পাওয়া গেল না দেখে এক অদ্ভুত নৈরাশ্যও ঘিরে ধরল তাকে। কালকের খুনের ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে, তা জানতে কৌতূহল উপচে পড়ছিল তার ভেতরে, একবার ক্ষীণ ইচ্ছেও হল কাছেই পার্ক স্ট্রিট থানায় যায়, গিয়ে খোঁজ নেয় ঘটনাটার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করল। থানার অফিসাররা তার এই অনাবশ্যক কৌতূহলকে নিশ্চয় সাদা চোখে দেখবেন না, ভাববেন নিশ্চয় এর ভেতর কোনও গোলমাল আছে, গার্গীই হয়তো সেই আন্ডারওয়ার্ল্ডের মক্ষিরানি।

হিমনের অন্তর্ধান রহস্য একবার পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে আলোচনা করবে কি না এমন ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে গার্গী আরও অবাক। সম্ভবত রবীট ও নীলই খবর দিয়েছিলেন থানায়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেবাদ্রি এসেছিলেন ব্লু-ওয়ান্ডারে হিমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। কথাবার্তা সেরে নেমে আসছেন সিঁড়ি বেয়ে, ঠিক তখনই গার্গী ঢুকছে গেট পেরিয়ে। দেখা হতেই মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, কী খবর, মিঃ সান্যাল? নিশ্চয় হিমনের ব্যাপারেই এসেছিলেন?

মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন দেবাদ্রি। কোনও কথাই বললেন না। সম্ভবত আগের দিন দেবাদ্রির কাছে তার ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের কথা মনে পড়তেই এই রাগ-রাগ মুখ।

—কোনও ট্রেস পাওয়া গেল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর 'না' বলেই দেবাদ্রি উঠতে যাচ্ছিলেন গেটের বাইরে দাঁড় করানো জিপে। গার্গী ধাওয়া করল পিছু, আগের কেসটার চার্জশিট দিতে আর কত দেরি, মিঃ সান্যাল?

কোনও উত্তরই দিলেন না দেবাদ্রি। ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, চলো। ঐন্দ্রিলা-হত্যার কেসের সাসপেক্টদের সঙ্গে বেশি কথা বলা পছন্দ নয় ওঁর।

দেবাদ্রি চলে যেতেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল গার্গী। সন্ধের এত আগে সে আজকাল কোনও দিন ফিরতে পারে না। এখন এই একলা-মুহূর্তগুলি কী ভাবে কাটাবে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, ঐন্দ্রিলার লেখা ডায়েরিটা ভাল করে পড়া হয়নি এখনও। সেদিন কয়েকটি পৃষ্ঠা উলটে-পালটে দেখে মনে হয়েছিল, ঐন্দ্রিলা কোনও একজন পুরুষ সম্পর্কে তার অনেক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিল। কে সেই পুরুষ, সেদিন অল্প সময়ের পাঠে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। ব্যাপারটা ঠিকঠাক পরিষ্কার হলে হয়তো হত্যাকারী কে সে সম্পর্কে

একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। ঐন্দ্রিলার লেখার মধ্যেও যেন বেশ রহস্যময়তা রয়েছে। তা থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ ডায়েরিটা যদি কোনও দিন সায়নের চোখে পড়ে যায় এমন একটা আশঙ্কা তার ছিলই। হয়তো তাইই গোপন করতে চেয়েছে। কিন্তু সায়ন অন্য ধরনের পুরুষ। নিজের কর্মকাণ্ডের পরিধির মধ্যেই ব্যাপৃত থাকতে পছন্দ করে। সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি ঐন্দ্রিলা অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে পারে।

ফ্ল্যাটের চাবি খুলে সবে ভেতরে ঢুকেছে, হঠাৎ দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল, বাড়ির গেট খুলে ভিতরে ঢুকছে দীয়া। দীয়া অবশ্য তরতর করে চলে গেল তাদের ফ্ল্যাটের দিকেই। এতই অন্যমনস্ক আর ব্যস্ত ছিল যে গার্গীদের ফ্ল্যাটের দিকে নজরই দিল না।

গার্গী তার দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে এসেছে, হঠাৎ চমকে উঠল পাশের ফ্ল্যাটে চন্দ্রাদেবীর চিৎকার শুনে। চিৎকার নয়, প্রায় গর্জন। তুমুল চেঁচামেচি করে কী যেন বলছেন, মনে হল, দীয়াকেই। এমন শব্দও পেল গার্গী যাতে মনে হয় হয়তো বা মারছেনই কাউকে। পরক্ষণেই বাইরের সিঁড়ির কাছে হইচই শুনে সে ছুটে গেল দরজার কাছে। দরজা আধভেজা করে যে দৃশ্য দেখল তাতে রক্ত চলকে উঠল তার হৃৎপিণ্ডে।

দীয়াকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছেন চন্দ্রাদেবী। শুধু দরজার বাইরে বার করে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তাকে ঠেলতে ঠেলতে, ধাক্কা দিতে দিতে নামিয়ে নিয়ে এলেন সিঁড়ির নীচে পর্যন্ত। তারপর ঘাড়ে এমন ধাক্কা দিলেন যে দীয়া লনের ওপর পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। চন্দ্রাদেবীকে তখন দেখাচ্ছে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতো, যেন রক্ত ঠিকরে বেরুচ্ছে তাঁর গনগনে দুই চোখ দিয়ে। চিৎকার করে বলছেন, বেরো, বেরো এ বাড়ি থেকে, ইউ আর আ উইচ। তোকে আমি, তোকে আমি মেরেই ফেলব আজ। বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন দ্রুত। সিঁড়ির উপরে বিব্রত, বিভ্রান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রবার্ট ও'নীল। তাঁকে দেখেই বললেন, পিস্তলটা বার করো তো। কোথায় রেখেছ সেটা? আই উইল শুট হার, বলতে বলতে তীরের বেগে ঢুকে গেলেন ঘরের ভেতর।

দীয়া স্তম্ভিত হয়ে পড়ে ছিল লনের ঘাসে। চন্দ্রাদেবী পিস্তল খুঁজছেন শুনে সে ভয়ার্ত মুখে উঠে দাঁড়াল ঘাসের উপর। তারপর দুদ্দাড় করে গেট খুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল প্রাণের ভয়ে।
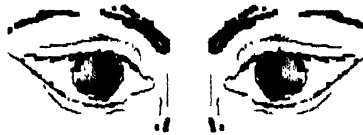
রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের উপর লেক-মার্কেটের সামনের রাস্তায় তাঁর লম্বা-চওড়া শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেবাদ্রি সান্যাল। চোখে কালো গগল্‌স, পরনে পুলিশি ইউনিফর্ম, হাতে একটি ওয়াকিটকি। ওয়াকিটকিটা মুখের কাছে তুলে ধরে যথাসম্ভব মোলায়েম স্বরে কথা বলছিলেন, দ্য রোড ইজ নাউ ক্লিয়ার, স্যার। ওভার।

ওয়াকিটকিতে এরপর কিছু হিজ্‌বিজ্‌বিজ্ শব্দ। দেবাদ্রি কী বুঝলেন কে জানে, একটু

পরেই আবার বললেন, নাথিং সিরিয়াস, স্যার। মাইল্ড লাঠিচার্জ। নান্ উন্ডেড, স্যার। ওভার।

আবার কিছুক্ষণ হিজবিজবিজ হিজবিজবিজ। ট্রানজিস্টার খারাপ হয়ে গেলে যেরকম অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে সংবাদ-পাঠ শুনতে পাওয়া যায়, ওয়াকিটকির ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে ঠিক তেমনই কিছু শব্দ। কিছুক্ষণ এ হেন দুর্বোধ্য সংলাপ শোনার পর দেবাদ্রি ঘাড় নাড়লেন, অ্যান্ডারস্টুড, স্যার। রাইট, স্যার। ও-কে, স্যার। রজার।

আর কোনও শব্দ ভেসে না আসায় দেবাদ্রি এবার ওয়াকিটকি বন্ধ করে প্রায় ফাঁকা হয়ে আসা রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের দিকে তাকালেন। একটু আগেই তাঁর বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন ক্রাউড সামলাতে। এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত। এটা কলকাতার অন্যতম পশ-এলাকা। কলকাতার এককালের বনেদি মানুষদের বাস। সে বনেদিয়ানা এখনও অটুট রাস্তার দুপাশের বাড়িঘরগুলোর চেহারায়, এখানকার মানুষদের পোশাকে-আসাকে, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায়। এরকমই হাজারখানেক মানুষ আজ রবিবারের সকালে চেয়ার-বেঞ্চি পেতে বসে রোড-ব্লকেড করেছিলেন। কোনও বস্তি এলাকার রোড-ব্লকেড একেবারে ভিন্ন মেরুর সমস্যা। এসব এলাকায় কেউ আহত-টাহত হলে হেডলাইন হয়ে যাবে সংবাদপত্রে। ক্যাজুয়ালটি হলে তো কথাই নেই। সুখের কথা তার কিছুই হয়নি। সামান্য একটু ঝাড়পিট করতে হয়েছে এই যা।

নিশ্চিন্ত, আত্মতৃপ্ত দেবাদ্রি এবার এগোতে লাগলেন একটু দূরে দাঁড়ানো তাঁর ঝকঝকে জিপটার দিকে। পাশাপাশি আরও কয়েকখানা পুলিশের জিপ। দু-তিনটে জাল-ঢাকা বড় ধরনের কালো গাড়িও। অবরোধের জায়গায় এখন কিছু পুলিশ-অফিসার আর কনস্টেবল ছাড়া আর কেউ নেই। দূরে অবশ্য উঁকিঝুঁকি মারছে কিছু কৌতূহলী দর্শক। দেবাদ্রি ইঙ্গিত করতেই রাস্তার দুদিকে বহুক্ষণ অপেক্ষারত বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, টু-হুইলার হু-হু শব্দ তুলে চলতে আরম্ভ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আর বোঝার উপায় রইল না একটু আগেই এখানে বহুক্ষণ ধরে পথ-অবরোধ হয়েছিল।

কিছুটা রিল্যাক্সড্ হতেই এবার ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালেন দেবাদ্রি। বেশ মৌজ করে ধোঁয়া ছেড়ে জিপে উঠতে যাবেন এমন সময় পাশে ঘ্যাঁচ্ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা চকোলেট রঙের মারুতি, হ্যালো, মিঃ সান্যাল—

নারীকণ্ঠ শুনে দেবাদ্রি আশ্চর্য হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে মারুতি পার্ক করে নেমে এসেছে গার্গী, কী ব্যাপার, পুলিশে পুলিশে একেবারে ছয়লাপ করে ফেলেছেন দেখছি।

গগল্স্টা খুলে নিয়ে দেবাদ্রি তাকালেন গার্গীর দিকে। যথারীতি একটু শক্ত হয়ে গেল মুখখানা।

গার্গী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, আমাদের সেই কেসটায় চার্জশিট কি দেওয়া হয়ে গেছে, মিঃ সান্যাল?

দেবাদ্রি কিছুটা অবাক হলেন, একটু বিরক্তও। কেসের সাসপেক্ট [illegible] চার্জশিটের জন্য তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে, এটা তাঁর কাছে ভারি অভিনব। নিস্পৃহভঙ্গিতে বললেন, না। এখনও ইনভেস্টিগেশন চলছে।

খুবই বিস্মিত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে গার্গী [illegible] এখনও চলছে! ফেলুদা, কাকাবাবু কিংবা কর্নেল হলে এতদিনে কিন্তু আসামিদের হাতকে[illegible] [illegible]য়ে হাজতে ঢোকাত—

দেবাদ্রি গম্ভীর হয়ে বললেন, ওসব গল্প-উপন্যাসেই মানায়। বাস্তবের তদন্ত খুবই কঠিন। তা—, বলে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন একটু, ওইসব বাচ্চাদের লেখাগুলো আপনি পড়েন নাকি?

—না পড়ার কী আছে। আসলে ভেতরে-ভেতরে সব মানুষই এক-একটি বাচ্চাই। বাচ্চাদের বই দেখলেই তো আমার পড়তে ভীষণ লোভ লাগে। সেই ছেলেবেলাটা আবার ফিরে পাওয়া যায় যেন। কেন, আপনি কখনও এসব বই পড়েননি?

—হ্যাঁ, একেবারে পড়িনি তা নয়, দেবাদ্রি এবার আমতা-আমতা করলেন, তবে আমরা অন্য কারণে পড়ে দেখি। শখের গোয়েন্দারা কীভাবে কেসগুলো সমাধান করে—

গার্গী গম্ভীর হল হঠাৎ, হ্যাঁ পড়াই উচিত। পড়ে ইনভেস্টিগেশনের কায়দাগুলো শেখা দরকার। আপনার চার্জশিটে নিশ্চয়ই যথারীতি সায়ন আর গার্গী চৌধুরীকে হাতকড়া পরানোর কথাই লেখা থাকছে। তা কবে হাতকড়া পরাচ্ছেন আমাদের?

খোঁচা খেয়ে দেবাদ্রির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। মহিলার সাহস একটু বেশিই। পুলিশের সঙ্গে টক্কর দিতে একটুও পিছপা হয় না। হঠাৎ মুখ বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও তো ইনভেস্টিগেট করবেন বলেছিলেন, তার কী হল?

গার্গী অনায়াসে বলল, অনেকটা এগিয়েছি। কে হত্যাকারী তা অনুমান করতে পারছি, কিন্তু সব প্রমাণ এখনও হাতে এসে পৌঁছয়নি। আর কয়েকদিন লাগবে বড়জোর। তারপরই আপনার হাতে সমর্পণ করব খুনিদের।

দেবাদ্রি হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন, ব্যঙ্গের হাসিই, তাই নাকি। ভারি ইন্টারেস্টিং। তা হলে তো আমাদের চাকরিবাকরি সব ছেড়ে দিতে হবে। তা কোথায় ঘুমিয়ে আছেন তাঁরা?

—আমার-আপনার চোখের সামনেই। তবে তারা সায়ন কিংবা গার্গী নয় কিন্তু। আপনি বোধহয় এখনও এই দুজনকেই হত্যাকারী বলে কেস সাজিয়ে চলেছেন?

—অবশ্যই। কারণ, আরও নতুন নতুন প্রমাণ প্রতিদিন আমাদের তদন্তে ধরা পড়ছে। এমনকি আজ সকালেও এমন ঘটনা ঘটেছে যা অবশ্যই সায়ন চৌধুরীর বিরুদ্ধে যাবে।

গার্গী একটু হতচকিত হয়ে পড়ল যেন, আজ সকালে? কী ঘটনা!

—সে সব যথাসময়ে জানতে পারবেন। গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল দেবাদ্রির দিকে, যে ঘটনাই ঘটে থাকুক, পুলিশ ইচ্ছে করলে সায়ন চৌধুরীর বিরুদ্ধে কেস সাজিয়ে নিতে পারে। কেস সাজাতে তো আপনাদের জুড়ি নেই। যেভাবে আলো বোসের নাম জড়িয়েছেন আপনারা সায়ন চৌধুরীর বিরুদ্ধে—

দেবাদ্রি মুখ পাথরের মতো করলেন, কী বলতে চান আপনি?

—আপনারা কি আলো বোসের সন্ধান পেয়েছেন, মিঃ সান্যাল?

—না, পাইনি। অবশ্য তারপর আর চেষ্টাও করিনি। সায়ন চৌধুরীর জীবনে আপনি এসে যাওয়ার পর আলো বোসের চ্যাপ্টার যখন শেষ, তখন আর পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ।

—তবু আলো বোসের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা আপনার দরকার। করবেন নাকি আলাপ?

দেবাদ্রি বিস্মিত হয়ে বললেন, চেনেন নাকি তাঁকে? চলুন তো আলাপ করে আসি—

—এখনই! গার্গী সামান্য বিপদে পড়ে গেল। সকালে উঠেই ফ্যাক্টরি থেকে হঠাৎ একটা জরুরি ফোন আসায় তড়িঘড়ি ফুট্টুসের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে সায়ন। গার্গী অতএব

মারুতিটা নিয়ে বেরিয়েছে কিছু মার্কেটিং করতে। মার্কেটিং সেরে ফেরার পথে কোনও হোটেল থেকে নিয়ে নেবে দুপুরের খাবার। কাল রাতে কথায় কথায় সাযন হঠাৎ বলেছিল, রবিবার দুপুরে একটা অন্য রকম লাঞ্চ খেলে কেমন হয়! গার্গী তখনই ভেবেছিল হোটেলের খাবারের কথা। কিন্তু এখন দেবাদ্রির সঙ্গে গেলে তো তছনছ হয়ে যাবে তার আজকের রোজনামচা।

হাতের ঘড়িতে নজর রেখে দেখল বেলা প্রায় দশটার মতো। সল্টলেকে যাতায়াত, আলোদার সঙ্গে আলাপ, কথোপকথন ইত্যাদি সেরে বেলা দেড়টা-দুটোর মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে — এমন একটা ভাবনা ছকে নিল মনে মনে। মার্কেটিং, না হয় অন্যদিন হবে। শুধু হোটেলের খাবারটাই। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল, চলুন—

দেবাদ্রি হাসল হঠাৎ, ফাইন। তা হলে উঠে পড়ুন আমার জিপে।

—পুলিশের জিপে! উঁহু, গার্গীর অহমিকায় হঠাৎ ঘা লাগল যেন, সে যেদিন হাতকড়া পরাতে আসবেন, সেদিনই উঠব। এখন নয়। আপনি বরং আমার গাড়িতেই আসুন। আমার গাড়ি চালানোর হাত খুব একটা খাবাপ নয়।

ঐন্দ্রিলা-মার্ডার কেসের একজন সন্দেহভাজন গার্গী, তার গাড়িতে উঠবেন কি উঠবেন না এমন একটা ভাবনায় কিছুক্ষণ আন্দোলিত হলেন দেবাদ্রি। একটু ইতস্তত করে তাঁর জিপের ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশ দিলেন নিচুগলায়। তারপর ফিরে এসে পট করে উঠে পড়লেন গার্গীর পাশে। দরজা বন্ধ করতেই গার্গী হু-হু করে চালিয়ে দিল মারুতি। তারপর শব্দ করে হেসে উঠে বলল, আপনার তরফেও অবশ্য এ গাড়িতে উঠতে আপত্তি থাকারই কথা। হঠাৎ কোনও একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে হয়তো তদন্তকারী অফিসারকে মেরে দিতে পারি—

দেবাদ্রি এতক্ষণে হাসলেন, সাইকোলজিস্টদের যা থিয়োরি, তাতে বোধহয় আপনি সেটা পারবেন না।

—তাই! বলতে বলতে গাড়িতে আরও স্পিড তুলে দিল গার্গী। গড়িয়াহাট মোড় পেরিয়ে উঠে এল বিজন সেতুর উপরে। তারপর কসবা পেরিয়ে ধরে ফেলল ব্যস্তসমস্ত ইস্টার্ন বাইপাস। এই রাস্তাটা আজ রবিবারেও প্রচণ্ড যানবহুল। অনেকেই সপরিবারে আউটিঙে চলেছেন। কেউ কেউ ন্যাশনাল হাইওয়ে থার্টিফোর বরাবর চলে যাবেন বহু দূর। কেউ বা যশোর রোড কিংবা টাকি রোড ধরবে। কেউ সামনেই সল্টলেক যাবেন কোনও আত্মীয় বাড়িতে।

দেবাদ্রি বেশ অবাক হয়ে গার্গীর ড্রাইভিং দেখছিলেন। প্রায় আশির ওপরে স্পিডোমিটারের কাঁটা দুলছে। অথচ কী নিখুঁতভাবে একর পর এক গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলেছে। সুযোগ পেলে ওভারটেকও করছে চকিতে হর্ন বাজিয়ে।

সল্টলেকে দ্রুত ঢুকে পড়ে অনেক আইল্যান্ডস অনেক জলের ট্যাঙ্ক, পাখির খাঁচা, অনেকএ-বি-সি-ডি-ই পার হয়ে একটা একতলা ছোট্ট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গার্গী। দেবাদ্রির দিকে তাকিয়ে হাসল, আসুন—

গার্গী চৌধুরীর সঙ্গে হঠাৎ এমন আচমকা বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে বেশ সংশয়ে ছিলেন দেবাদ্রি। শুধু রাজি হয়ে গেলেন এই ভেবে যে, আরও ভাল করে স্টাডি করার দরকার এই

সাহসী, বুদ্ধিমতী অথচ রহস্যময়ী মহিলাটিকে। এর আগে দুচারদিন ইন্টারোগেট করেছেন বাড়ি গিয়ে। কিন্তু এভাবে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটালে কথা বলাবলির মধ্যে হঠাৎ আচমকা বেরিয়ে পড়তে পারে কোনও অজানা অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

অবশ্য গাড়ি চালানোর সময়গোটা রাস্তাটাই প্রায় চুপচাপ ছিলেন মহিলা। দেবাদ্রিও অবশ্য নিঃশব্দে স্ট্রাটেজি ঠিক করে নিচ্ছিলেন, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলবেন আলো বোসের সঙ্গে। নিশ্চয় পাঁচই এপ্রিল ভোরে বাড়িতে না ফিরে কেন ছয়ই এপ্রিল শেষ রাতে পৌঁছেছিলেন সায়ন, তার একটা জুতসই অ্যালিবাই তৈরি করে ফেলেছেন এতদিনে।

ভাবতে ভাবতে দেবাদ্রি গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। ওদিকে গার্গী কলিং বেল বার দুই বাজিয়ে অপেক্ষা করছে গম্ভীর মুখে। বেল শুনে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরনে একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এসে গেট খুলে দিলেন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথায় সামনের দিকে মস্ত টাক। গার্গীকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আরে তুমি? সায়ন কোথায়।

পরক্ষণে দেবাদ্রির দিকে নজর পড়তেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। মুখে কথাই সরল না আর। দেবাদ্রিকে দেখিয়ে কাঁচুমাচু মুখে গার্গী বলল, আলোদা, আই অ্যাম আন্ডার অ্যারেস্ট। তাতে আরও ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রলোক, বিস্মিত হয়ে বললেন, সেকি!

দেবাদ্রি তখনও বুঝে উঠতে পারেননি আসল ব্যাপারটা। আজ সকাল থেকেই খুবই হালকা মেজাজে আছে গার্গী। দেবাদ্রির সঙ্গেও জোক করেছে কিছুক্ষণ। এখন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার বলল, শুধু আমাকেই নয়, আলোদা, ইনি পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল, আপনাকেও অ্যারেস্ট করতে এসেছেন।

ইউনিফর্ম পরলে দেবাদ্রিকে রীতিমতো একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের মতো দেখায়। তাঁর দিকে তাকিয়ে আলোদা তখন রীতিমতো শঙ্কিত, বিভ্রান্ত। গার্গীর কাঁচুমাচু মুখ দেখে আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন।

ততক্ষণে জিপের হর্ন, কলিং বেলের শব্দ, হাঁক-ডাক, কথাবার্তা শুনে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন সুচন্দনী। ব্যাপারস্যাপার দেখে তাঁরও মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

পরিস্থিতি ঘোরালো দেখে গার্গী হেসে উঠল হঠাৎ, মিঃ সান্যাল, ইনিই হলেন মিঃ আলোকময় বোস ওরফে আলো বোস। আপনার চার্জশিটের বয়ান অনুযায়ী মিস আলো বোস নন। আর তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আলোদার একমাত্র সহধর্মিণী সুচন্দনী বউদি।

দেবাদ্রি বিস্মিত, স্তম্ভিত, তখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না ঘটনাটা। আলোদার দিকে তাকিয়ে আছেন দারুণ সংশয়ের চোখে। তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ। তাকে অমন এক বাক্স সন্দেহের মধ্যে পুরে, অন্যদিকে আলোদাকে প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে গার্গী আবার এগিয়ে গেল সুচন্দনীর কাছে, হাঁ করে দেখছেন কি বউদি, শিগগির চা করুন। দুপুর রোদ্দুরে গলা শুকিয়ে ডা-ডা করছে। চা পেতে দেরি হলে হয়তো আপনিও অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন।

অতঃপর দেবাদ্রি দিকে ফিরে বলল, আসুন মিঃ সান্যাল, বাইরে দাঁড়িয়ে তো আর ইন্টারোগেট করা যাবে না। ভেতরে আসতে হবে।

সম্বিত ভেঙে আলোদাও যেন তৎপর হলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন, আসুন। কী আশ্চর্য,

এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি আপনাদের!

কোনও কথা বলার ফুরসত না পেয়ে, হয়তো বা ভয়েই আধখানা হয়ে সুচন্দনী ততক্ষণে সেঁধিয়ে গেছেন রান্নাঘরে। দেবাদ্রি ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে আলো বোসকে সংশয়ের গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি সেই আলো বোস যিনি সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে বিলাসপুর গিয়েছিলেন?

আলোদা একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিক তাই।

দেবাদ্রির বিস্ময় তখনও কাটেনি, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন। হয়তো তাঁর এতদিন ধরে তৈরি চার্জশিটের বয়ান হঠাৎ একটা ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পুলিশি-রীতিতে চলে এলেন মূল প্রশ্নে, যদি তা-ই হয়, তা হলে বলুন তো, সায়ন চৌধুরী তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন, আপনারা বিলাসপুর থেকে কলকাতা ফিরেছেন ছয় এপ্রিল ভোর রাতে। অর্থাৎ ঐন্দ্রিলা হত্যার অব্যবহিত পরেই। অথচ ট্রেনের টিকিট অনুযায়ী আপনারা বিলাসপুর থেকে ট্রেনে চেপেছিলেন চৌঠা এপ্রিল বিকালে, তাতে কলকাতা পৌঁছনোর কথা পাঁচ তারিখ সকালের দিকে। এই যে, গোটা একটা দিন, প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা সময় উনি হাপিস করে ফেলতে চাইছেন জীবন থেকে, এবং সেই সময়টুকু এই কেসের মেরিটের পক্ষে অত্যন্ত ভাইট্যাল, সেটা কী করে সম্ভব হল?

আলো বোস এতক্ষণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন যেন, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বুঝলেন, মিঃ সান্যাল, এরই নাম নিয়তি। যদি ট্রেনের টিকিট অনুযায়ী কলকাতায় পৌঁছতাম, তা হলে এত বড় দুর্ঘটনাটা নিশ্চয় ঘটত না। অথচ এই একদিন দেরির জন্য মূলত আমিই দায়ী। বলতে পারেন, ঐন্দ্রিলার মৃত্যু হয়েছে আমার কারণেই। সারা জীবনেও বোধহয় আমার এই অপরাধের কোনও প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

জিজ্ঞাসু চোখে দেবাদ্রি তাকালেন, কী রকম?

এরপর আলো বোস যে কাহিনী একটুএকটু করে শোনালেন, তা যেমনই অদ্ভুত, তেমনই দুর্ভাগ্যের, আর তা ঘটতে পারে একমাত্র নিয়তির টানেই। সুচন্দনীর চায়ের সঙ্গে দেবাদ্রি শুনতে লাগলেন কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলে।

পাঁচই এপ্রিল বোম্বে মেল ভায়া নাগপুর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার কথা সকাল আটটায়, কিন্তু চার তারিখে বিলাসপুরে ওঠার সময় থেকেই প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা লেট ছিল ট্রেন। ট্রেন চলতে চলতে ক্রমশ লেট বাড়তে থাকল। খড়গপুরে যখন এসে পৌঁছল, তখনই বেলা দশটা। সেখানে কোনও কারণে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বোম্বে মেল। আধঘণ্টাটাক পরে শোনা গেল সামনেই মাদপুর স্টেশনে রেল-লাইন অবরোধ। দু-আড়াই হাজার মব্ ঘেরাও করে রয়েছে সেখানে। ঘণ্টা তিনেক খড়গপুরে ঠায় বসে থাকার পরও ট্রেন ছাড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ খবর এল, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে মবের উপর, তাতে আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। বিকেলের আগে ট্রেন ছাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সায়ন বলেছিল, চলুন আলোদা, বাসেই চলে যাই কলকাতায়। ট্রেন থেকে নেমেও কিন্তু কোনও সুরাহা হল না, কারণ অবরোধ তখন ছড়িয়ে পড়েছে বোম্বে রোডে। বাধ্য হয়ে আলো বোস তখন বলেছিলেন, খড়গপুরে তাঁর এক বন্ধু আছে, তার ওখানে দুপুরটা কাটানো যাক। বন্ধুর একটা মারুতি আছে। যদি অবরোধ উঠে যায়, তবে বিকেলে মারুতিতে কলকাতা ফেরা

যাবে। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখা দিল আর এক বিপত্তি। বিপত্তিই, কেননা সেখানে গিয়ে ফেঁসে গেলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কার্যক্রমের মধ্যে। বন্ধুর বাড়ির কাছাকছি একটা আদিবাসী গাঁ আছে। সেদিন একটা পরব ছিল তাদের। দুপুরে বন্ধুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পর বন্ধুই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, অবরোধ যখন এখনও ওঠেনি, তখন চলো, সবাই মিলে পরব দেখে আসি। পরবের দিনে ভারি জাঁকজমক উৎসব হয় ওদের। দুপুরে তীর-ধনুক নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার পর সন্ধে থেকে সারা রাত নাচগান। সায়নরা সেখানে পৌঁছতে এতই খুশি হয়ে উঠেছিল আদিবাসীরা যে রীতি অনুযায়ী তাদের শুধু অতিথি হিসেবে বরণই করে নিল তা-ই নয়, উৎসবের অন্যতম বিচারক করে দিল দুজনকেই। সায়ন অবশ্য ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল ঐন্দ্রিলার কথা ভেবে। অবরোধ উঠে গিয়েছিল বিকেলেই, কিন্তু উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে ছাড়া পেতে বেশ রাত হয়ে গেল। যাই হোক, তবু মারুতিটা ঠিকঠাক চললে হয়তো রাত এগারোটার মধ্যেই পৌঁছে যেতেন ওঁরা। কিন্তু নিয়তি বাদ সাধল ফের। কোলাঘাট পেরোবার বেশ কিছুটা পরেই ঘড় ঘড় শব্দ করে বিগড়ে গেল গাড়িটা। অনেকক্ষণ ঘাম ঝরিয়েও ছোকরা ড্রাইভার তার গাড়ির রোগ ধরতে পারল না। সেই গাড়ি তিনজনে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসা হল হাইওয়ের ধারেই একটা রিপেয়ারিং শপে। বাগনানের একটু আগেই দোকানটা। মিস্ত্রিরা পরীক্ষা করে বলল, ইঞ্জিনেই গোলমাল, মেরামত করতে দেরি হবে।

এত সব ঝামেলার পর গাড়ি যখন কলকাতা পৌঁছল, তখনই প্রায় শেষ রাত, ড্রাইভারও ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাকে আবার সল্টলেক পর্যন্ত যেতে হবে এই ভেবে আলো বোস হাওড়া থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে নিলেন। সায়ন যখন মারুতিতে করে পৌঁছেছিল শরৎ বসু রোডের বাড়িতে, তখন ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। তাকে নামিয়ে দিয়েই মারুতি ফের রওনা দিয়েছিল খড়গপুরের দিকে। তার পরের ঘটনা সবই তো জানেন দেবাদ্রি সান্যাল।

আলো বোসের কাহিনী শেষ হয়নি তখনও। তিনি ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার পর মুখোমুখি হলেন আর এক বিপদের। সুচন্দনী ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন স্বামীর জন্য। গুজরাত থেকে তার আগের দিনই টেলিগ্রাম এসে পৌঁছেছে, সুচন্দনীর বাড়িতে ভীষণ বিপদ। সায়নদের বিপদের কথা জানতেই পারেননি আলোদা। তার আগেই সুচন্দনীকে নিয়ে সেদিনই রওনা দিয়েছিলেন আমেদাবাদের পথে।

—আপনি সমস্ত তথ্যগুলো মিলিয়ে নিতে পারেন, মিঃ মান্যাল। পাঁচ তারিখে মাদপুর স্টেশন এবং বোম্বে রোড অবরোধ হয়েছিল কি না। সায়ন আর আমি সারাদিন কাটিয়েছিলাম কি না খড়গপুরের আদিবাসী গাঁয়ে। সেদিন মধ্যরাতে বাগনানের রিপেয়ারিং শপে একটা লাল মারুতি রিপেয়ার হয়েছিল কি হয়নি। আমি আর সুচন্দনী ছ তারিখ হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপেছিলাম কি চাপিনি। এতগুলো তথ্য ঠিক ঠিক মিলে যাওয়ার পর আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন সায়নের কলকাতা ফেরার সঠিক তারিখ এবং সময় কী ছিল। প্রমাণ হিসেবে দুটো ডকুমেন্ট আমাদের কাছে আছে। এক, পাঁচই এপ্রিল আদিবাসী গাঁয়ের উৎসবের ছাপানো কার্ড, দুই, বাগনান রিপেয়ারিং শপের মেরামতির বিল। আর এই জন্যেই আমরা সাক্ষী হিসেবে কয়েকজন আদিবাসী এবং রিপেয়ারিং শপের মিস্ত্রিদের নাম আদালতে পেশ করেছি, হয়তো আপনি খেয়াল করে থাকবেন।

দেবাদ্রি সান্যাল ইতিমধ্যে একটি সিগারেট ধরিয়ে ছিলেন। আলো বোসের কাহিনী শুনে তাঁর কপালের ভাঁজ আরও গাঢ় হল। বললেন, সায়ন চৌধুরী এতদিন এ-সব কথা তো আমাদের বলেননি। হঠাৎ কি গল্পটা তৈরি করলেন আপনারা?

আলো বোস একটুও না দমে গিয়ে বললেন, গল্প যদি তৈরিই করব, মিঃ সান্যাল, তা হলে এত সব সাক্ষ্যপ্রমাণ সব কি মিথ্যে বলতে চান? সায়ন এতদিন কথাগুলো ডিটেলসে বলতে পারেনি, তার কারণ ও মনে-মনে খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। লজ্জা এই কারণেই যে, খড়গপুর স্টেশনে সামান্য একটা সিদ্ধান্তের ভুলে তাকে জীবনের সবচেয়ে বড় খেসারতটি দিতে হল।

হাতের ঢাউস ডায়েরিটিতে খসখস করে কিছুক্ষণ নোট করে নিয়ে পট করে উঠে দাঁড়ালেন দেবাদ্রি। চায়ের কাপ তখনও নিঃশেষ হয়নি। গার্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন—

গার্গীও অবশ্য খুব বেশিক্ষণ কাটাতে চাইছিল না। বেলা এখন মধ্যাদুপুর। আজ রোদের তাপ একটু বেশিই। দেবাদ্রির কথা শুনে উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ, আলোদা, মিঃ সান্যালের যা কিছু জানার দরকার নিশ্চয়ই জেনে গেছেন আপনার কথায়। অনেক বেলা হয়ে গেল, এবার উঠতেই হবে আমাদের।

আলো বোস ও সুচন্দনীকে যেমন প্রবলভাবে বিস্মিত করে ঢুকেছিল গার্গীরা তেমনই হঠাৎ অবাক করে বেরিয়ে গেল দ্রুত। ফেরার পথে স্টিয়ারিঙে মোচড় দিতে দিতে গার্গী জিজ্ঞাসা করল, আলোদার গল্পটা কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না আপনার কাছে?

দেবাদ্রি তখনও ভেবে চলেছিলেন ব্যাপারটা। সামান্য হেসে বললেন, গল্পটা এতই আষাঢ়ে যে, বিশ্বাস করা খুবই শক্ত। তবে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ আগে আমার ফাইলে জড়ো হোক, তারপর ভাবা যাবে—

গার্গী এক লহমা তাকিয়ে নিল দেবাদ্রির দিকে, বলল, মিঃ সান্যাল, পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে হুইচ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন্স। আপনাকে এখন এমনই একটা গল্প শোনাই যা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। কিছুকাল আগে বোম্বে শহরে এ সিরিজ অব এক্সপ্লোশন্স হয়েছিল আপনার বোধহয় মনে আছে। সে সময় এক ভদ্রলোক, ধরা যাক তার নাম মিঃ কাপুর বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকেছিলেন কোনও বিশেষ কাজে। কাজ মিটিয়ে তিনি সেখান থেকে বেরুবার দু মিনিটের মধ্যেই সে বাড়িতে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে যায়। মুহূর্তে বেশ কিছু মানুষের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বিস্ফোরণের ফলে। বাড়িটির কাছেই দাঁড়িয়ে মিঃ কাপুর তখন থর থর করে কাঁপছেন। বোমার দুচারটে স্প্লিন্টার তাঁর গায়েও এসে লেগেছিল। এমন অভাবিতভাবে বেঁচে যাওয়ায় তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন মিঃ কাপুর। পরক্ষণেই ভাবলেন, বিস্ফোরণের খবর এক্ষুনি প্রচারিত হবে রেডিও কিংবা টি.ভিতে। তাঁর বাড়ির সবাই জানতেন তিনি আজ এই সময়ে স্টক এক্সচেঞ্জে যাবেন। খবর শুনে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে তারা। তৎক্ষণাৎ কাছাকাছি টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে বাড়িতে জানিয়ে দিলেন তিনি জীবিত এবং ঈশ্বর তাঁকে এক অনিবার্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেছেন। টেলিফোন রেখে মিঃ কাপুর তাঁর পরবর্তী কাজের ব্যাপারে ঢুকে পড়লেন বোম্বে শহরের অন্য একটি কর্মব্যস্ত বিল্ডিঙে। আর কী আশ্চর্য, সে বাড়িতে প্রবেশ

করার পরমুহূর্তে আর একটি বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাঁর শরীরটা।

দেবাদ্রি সামান্য বিস্মিত হলেন হয়তো, কিন্তু দুঁদে পুলিশ-অফিসারের মতো তাঁর প্রত্যয় থেকে একচুল সরে এলেন না। বরং হেসে উঠে বললেন, তা হলে আমিও এরকম দু-একটি গল্প আপনাকে শোনাই মিসেস চৌধুরী। আপনি হয়তো জানেন, হিমন চৌধুরী হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছেন তাঁর বাড়ি থেকে। আমরা তদন্ত করতে শুরু করেছি, হঠাৎ লাইম ইন্ডিয়ার একজন অফিসার আমাকে ফোন করে জানালেন, তার আগের দিন সন্ধেবেলা হিমন চৌধুরীকে তিনি দেখেছেন সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে একই ট্যাক্সিতে যেতে।

গার্গীর হাতের স্টিয়ারিং হঠাৎ টালমাটাল হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ ফুঁসে উঠে প্রতিবাদ করল ইম্পসিবল।

—হ্যাঁ, আরও শুনে রাখুন, আজই ভোরবেলা টেলিফোন এসেছিল থানায়, লাইম ইন্ডিয়ার একজন কর্মচারী, তার নাম লোটন. সে কাল রাতে খুন হয়েছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ফ্যাক্টরির ঠিক পিছনেই। আমাদের অনুমান, এক্ষেত্রেও সায়ন চৌধুরী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। গার্গীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কী বলছেন কী আপনি?
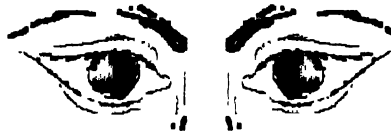
লোটন খুন হয়েছে কাল গভীর রাতে, আর তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ফ্যাক্টরির ঠিক পিছনেই, এই খবরটাই আমুল কাঁপিয়ে দিল গার্গীকে। দেবাদ্রি সান্যালের কথা প্রথমে তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, কিন্তু অন্য কোনও খবরে সন্দেহের অবকাশ যদিও বা থেকে থাকে, একটা টাটকা হত্যার সংবাদ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক গলা উৎকণ্ঠা আর বিস্ময়ের ভেতর গার্গীকে ডুবিয়ে রেখে দেবাদ্রি নেমে গেলেন তাঁর কোয়ার্টারের সামনে। অতঃপর কী করবে গার্গী, কোথায় যাবে, ফ্ল্যাটে ফিরবে, নাকি গাড়ি নিয়ে চলে যাবে ফ্যাক্টরির দিকে, তা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। স্টিয়ারিঙে শ্লথ হয়ে আসছে তার হাত, অ্যাকসিলেটর-ব্রেক-ক্লাচে মন্থর হয়ে আসচে তার পা-দুটো, ভাবনার শক্তিটাই কমে আসছে ক্রমশ। এত বড় খবরটা এতক্ষণ কী অসীম নিরাসক্তিতে চেপেছিলেন দেবাদ্রি! সল্ট লেকে যাওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কম সময় তো নয়। পুলিশ অফিসার বলেই এমন নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সম্ভব। কত খুনই তো হয় কলকাতায়, পুলিশ অফিসারদের কি তাই নিয়ে টেনশনে ভোগা চলে!

কিন্তু গার্গীর কাছে সংবাদটি তো খুবই গুরুতর। এতক্ষণে বুঝতে পারছে কেন সকালে উঠেই ফ্যাক্টরি থেকে দুঃসংবাদটি পেয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল সায়ন। পাছে গার্গী শঙ্কিত হয়ে পড়ে তাই তাকে কিচ্ছুটি বুঝতে দেয়নি। কিন্তু গার্গী তাতে খুবই বিচলিত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধও। সায়নের অবশ্যই উচিত ছিল ঘটনাটা তাকে বলা। সে তো এখন সায়নের সহধর্মিণীই শুধু নয়, তার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরও। এত বড একটি ঘটনা তাকে

কিছুমাত্র না জানিয়েই চলে গেল সায়ন এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। খুনের সংবাদে নিশ্চয়ই খুবই শোরগোল হয়েছে ফ্যাক্টরির আশেপাশে। নেহাত ছুটির দিন বলে ফ্যাক্টরি বন্ধ আজ। কিন্তু আশেপাশের লোকজন নিশ্চয় ছুটে এসে শান্ত পরিস্থিতি ঘুলিয়ে তুলবে অনিবার্য কারণে। একা সায়ন কি সামলাতে পারবে সে ঝোড়ো ঝাপট!

কিন্তু সায়ন তাকে বলল না-ই বা কেন, সে প্রশ্নও তাকে ভাবিয়ে তুলল অবধারিতভাবে। বিশেষ করে দেবাদ্রি সান্যালের শেষ কথাটা সহসা পিন ফুটিয়ে দিল তার হৃৎপিণ্ডের কোনও গোপন অন্তঃপুরে। পুলিশের অনুমান, সায়ন চৌধুরীই—

গার্গী কেঁপে উঠল নিজের অজান্তেই। লোটনের খুন, তার আগে হিমনের অন্তর্ধান, এই দুয়ের সঙ্গেই নাকি সায়ন জড়িত। যেদিন হিমন অন্তর্হিত হয় সেদিন ট্যাক্সিতে হিমনের সঙ্গে নাকি দেখা গেছে সায়নকে। গার্গী যতটুকু স্মরণ করতে পারে, প্রায় সারাদিনই অফিসে ছিল সায়ন, কেবল বিকেলের দিকে কিছুক্ষণের জন্য 'ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি' বলে বেরিয়েছিল। ফিরে এসেছিল ঘণ্টাখানেক পরেই, বলেছিল 'যাওয়া গেল না, গোটা শিয়ালদহ, আমহার্স্ট স্ট্রিট জুড়ে বিশাল জ্যাম।' মারুতিটাই সঙ্গে ছিল তার, ট্যাক্সিতে তাকে দেখতে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নাকি মারুতি কোথাও পার্ক করে রেখে ট্যাক্সিতে হিমনকে নিয়ে—!

কিছুক্ষণের জন্য গার্গী প্রবল এলোমেলো হয়ে গেল নিজের ভেতর। পরক্ষণেই ভীষণ তিরস্কৃত করল নিজেকে। ছি ছি, এ সব কী ভাবছে সে! সায়নকে নিয়ে এ হেন ভাবনা ভাবাই উচিত হয়নি তার। সে যতটা সায়নকে চিনেছে—

আসলে ঐন্দ্রিলা-হত্যারহস্যের জট খুলতে পারছেন না দেখে দেবাদ্রি সান্যাল এখন অনুমানের পর অনুমান করে চলেছেন। তাঁর সেই অনুমানের বিষ কিছুটা এই মাত্র ঢেলে দিয়ে গেলেন গার্গীর ভেতর। যাতে গার্গীও আর খুনের অন্য কোনও কারণ ভাবতে না পারে। তবে সবচেয়ে যা আশ্চর্য লাগছে তার, সায়নের সঙ্গে দেখা গেছে হিমনকে এ খবরটা দেবাদ্রিকে ফোন করে জানিয়েছেন আর কেউ নয়, লাইম ইন্ডিয়ারই একজন অফিসার। অফিসারটি কে তা দেবাদ্রি স্পষ্ট করে বলতে চাননি। না বললেও গার্গী বুঝে নিয়েছে, তিনি নিশ্চয় রৌণক মুখার্জি। হয়তো তিনিই অপরাধী, তাই নিজের অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার জন্যই দেবাদ্রিকে ভুল পথে চালিত করতে চাইছেন। অথচ দেবাদ্রি তা বুঝতেই পারছেন না। পারছেন না বলেই যাবতীয় সন্দেহের তীর ছুড়ে দিচ্ছেন সায়নের দিকেই।

অতএব সায়নকে বাঁচাতে এখন উদ্যোগী হতে হবে গার্গীকেই। গার্গীর স্থির বিশ্বাস, 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর যে ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন তার সঙ্গে হিমনের অন্তর্ধান এবং লোটনের খুন, সবই একই বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত। সেই বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থান করছে একজন নর্তকী। রহস্য উদঘাটন করতে হলে 'দি আইডিয়াল নেস্ট' সম্পর্কে অনেক কিছু খবরাখবর তার এই মুহূর্তে দরকার। 'বার'টি যেহেতু আপাতত বন্ধ, কিছু জানতে হলে পার্ক স্ট্রিট থানায়ই যেতে হবে তাকে, কিন্তু কী পরিচয়েই বা সেখানে যাওয়া যায়!

দেবাদ্রিকে নামিয়ে দেওয়ার পর এতসব এলোপাথাড়ি ভাবনা দ্রুত চক্কর মেরে গেল গার্গীর মগজে। তবু তার যাবতীয় উৎকণ্ঠা এখন সায়নকে ঘিরেই। ব্লু-ওয়ান্ডারে পৌঁছে গাড়ি যথাস্থানে রেখে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখল, তখনও বাড়ি ফেরেনি সায়ন। অথচ ঘড়িতে দুটো বেজে দশ। তৎক্ষণাৎ নানান দুর্ভাবনায় বুকের ভেতরটা ছাঁত করে উঠল তার। নিশ্চয়ই

ফ্যাক্টরিতে গিয়ে সায়ন কোনও বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, দেবাদ্রি সান্যাল এতখানি পথ যাতায়াত করার সময় একবারও ভাঙেননি খবরটা। তাহলে সে সল্টলেক যেতই না আজ, তার চেয়ে ফ্যাক্টরিতে যাওয়াটাই জরুরি ছিল। অন্তত সল্ট লেক থেকে ফেরার পথে দেবাদ্রিকে সঙ্গে নিয়েই একবার ঘুরে আসতে পারত ভি আই পি রোডের ওদিকে তাদের ফ্যাক্টরিতে। ভাবতে ভাবতে দ্রুত দরজা খুলে হোটেল থেকে আনা টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার ডাইনিং টেবিলের ওপর রেখে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল। ফোন তুলতেই ওপাশে সায়নেরই গলা, কিন্তু কী ভীষণ উদ্বিগ্ন তার কণ্ঠস্বর!

ফোনে যা জানাল সায়ন, ফ্যাক্টরিতে সকালে এসেই এক প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিল। ফ্যাক্টরির আশেপাশে যে লোকালয় আছে, সেখান থেকে শ-দেড়েক লোক এসে দাবি করে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টই এই খুনের সঙ্গে জড়িত। কারণ লোটন প্রায়ই প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অফিসে আসত কালীজীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু সেটা পছন্দ করছিলেন না প্যারাডাইসের কর্মকর্তারা। বিশেষ করে নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাকি সে কথা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন কালীজীবনবাবুকে। লোটন তারপর আর কোনও দিনই প্যারাডাইসের অফিসে যায়নি। গতকাল সন্ধের পর সে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বলে, তার খুব বিপদ, এক্ষুনি একবার ফোন করবে তার এক আত্মীয়কে। অন্যদিন কালীজীবনবাবু সঙ্গে থাকেন, কাল তিনি ছিলেন না বলে এতওয়ারি তাকে ফোন করতে দেয়নি। তাতে এতওয়ারির সঙ্গে তার কিছু বচসা হয়। লোটন রেগেমেগে চলে গিয়েছিল তার পর। এর পরে কী হয়েছিল সে খবর এতওয়ারি রাখে না, কিন্তু ভোরে ফ্যাক্টরির পিছনে চেঁচামেচি শুনে সে বেরিয়ে এসে দেখতে পায়, ফ্যাক্টরির বাইরে দেওয়াল ঘেঁসে জংলাঝোপের ভেতর পড়ে আছে লোটনের লাশ। তার গলার নলি কেউ দু-ফাল করে দিয়েছে ক্ষুর বা অমনি কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে।

গার্গীর বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছিল। রিসিভার ধরে রাখা হাতটিও কেঁপে উঠছিল থর থর করে, বুজে আসছিল কণ্ঠস্বর, কেবল বলতে পারল, ব্যস, তাতেই প্রমাণ হয়ে গেল, প্যারাডাইসের কারণেই সে খুন হয়েছে।

—আমি ফ্যাক্টরিতে পৌঁছুতেই হঠাৎ পিলপিল করে চলে এল একদঙ্গল লোক। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘেরাও করে রেখেছিল। অজস্র গালিগালাজ, অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করেছে এতক্ষণ।

—তারপর! এখন চলে গেছে? গার্গীর উৎকণ্ঠিত স্বর।

—হ্যাঁ, থানা থেকে পুলিশ এসে দু-ঘণ্টা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত হয়েছে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেই সঙ্গে লোটনের ভাইকে চাকরিও দিতে হবে ফ্যাক্টরিতে। না হলে আমার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করবে ওরা।

—বাহ! সেই সিদ্ধান্ত তুমি মেনে নিলে?

—এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। যারা ঘেরাও করেছিল যে কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত আমার ওপর। প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিয়েছে এই যা রক্ষা।

গার্গী কাঁপছিল ভীষণভাবে, এ তো রীতিমতো ব্ল্যাকমেলিং। যে ঘটনার জন্য প্যারাডাইস দায়ী নয়, তার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? যাই হোক, তুমি কখন আসছ?

—এখনই বেরোচ্ছি।

রিসিভার রেখে গার্গী একা-একা ফুঁসছিল।

কী আশ্চর্য, তাকেও কিনা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল ঘেরাওকারীরা! সে লোটনকে প্যারাডাইসে আসতে নিষেধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার যথোচিত কারণও ছিল।

সায়ন ফ্ল্যাটে ফিরে এল আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। বিধ্বস্ত, ক্লান্ত সায়নের দিকে তাকাতেই পারছিল না গার্গী। কেবলই মনে হচ্ছে তারই একটা সিদ্ধান্তের জন্যই আজ এত হেনস্তা সায়নের। সে যদি লোটনকে তখন আসতে বারণ না করত, তাহলে হয়তো—

হোটেলে থেকে নিয়ে আসা সুস্বাদু খাবারগুলোও তেমন রুচল না সায়নের মুখে। আঘাতের পর আঘাতে ক্রমশই ভেঙে পড়ছে সে। যতবারই মনে হচ্ছে, হয়তো এই বার ক্রাইসিস কাটিয়ে উঠতে পারবে, ঠিক তার পরক্ষণেই এসে পড়ছে কোনও অন্তর্ঘাত কিংবা দুর্ঘটনার সংবাদ। এত ঝড়-ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে প্যারাডাইসকে সুখের মুখ দেখানো সত্যিই কঠিন ব্যাপার।

খেতে খেতে আবার নতুন খবর শোনাল সায়ন, জানো, কালীজীবনবাবু সময়মতো এসে না পড়লে হয়তো হেকল্‌ড হতে হত আজ। তাঁর সঙ্গে হঠাৎই এসে পড়েছিলেন রাহুল রায়।

—রাহুল রায়! গার্গী বিস্মিত হল।

—ওই যে, লাইম ইন্ডিয়ার যিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন। চাকরি হারিয়ে ভারি বিপদে পড়েছেন ভদ্রলোক। হঠাৎ কী কারণে যেন এসেছিলেন ওদিকে। কালীজীবনবাবু তখন ফ্যাক্টরিতে হইহই শুনে ছুটে আসছিলেন, রাহুল রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল পথে। দুজনে একসঙ্গে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই রক্ষা পেয়ে গেছি। রাহুল রায়ের বেশ এলেম আছে কিন্তু। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে বক্তৃতাটক্তৃতা দিয়ে অতগুলো লোককে বেশ থামিয়ে দিল। আসলে যারা ঝামেলা করছিল, তাদের দু-একজনের সঙ্গে রাহুল রায়ের পরিচয় আছে বলে মনে হল। তাতেই দ্রুত কব্জা করে ফেলল মবকে। তারপর পুলিশ আসার পর নিগোশিয়েসনেও সাহায্য করল খুব।

গার্গী একেবারেই সন্তুষ্ট হল না, কী আর সাহায্য করল? একলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ! সে কি মুখের কথা?

—তিনলক্ষ টাকা চেয়েছিল প্রথমে। অনেক দর কষাকষির পর—

—রাখো তো, গার্গী হঠাৎ রেগে উঠল খুবই, যে লোকটা খুন হয়েছে তার জীবনের দাম তিনলক্ষ টাকা! তুমি তো জান না লোটনের ব্যাকগ্রাউন্ড, তাই ভাবছ খুব জিতে গেছ। বেরুবার আগে আমাকে যদি একবার বলতে ঘটনাটা তাহলে এর কোনও কিছুই ঘটত না। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই উঠত না। তবে এও শুনে রাখো, একপয়সাও দেব না ওদের।

সায়ন আশ্চর্য হল, সে কী! কেন?

—সেটা পরে শুনলেও চলবে। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও।

—কী করতে চাও তুমি?

—লোটনের খুনের দায়ভাগ প্যারাডাইসকে নিতে হবে কেন? লোটনের খুনের কারণ একেবারেই অন্য।

বলতে বলতে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল গার্গী। সায়ন থতমত, হতভম্ব। বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ

সময় পার হয়ে গেল দু-জনের মধ্যে। খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরের বাকি সময়টা বেশ কিছুক্ষণ গার্গী ভাবল একা-একা। কয়েকদিন ধরে চন্দ্রাদেবীর সেই হিংস্র মূর্তি, দীয়ার পলায়ন নিয়ে কেবলই ভাবছিল, তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। ভাবতে ভাবতে সন্ধের আগে হঠাৎ দ্রুত বেশবাস বদলাতে শুরু করল। সায়ন অবাক হয়ে দেখল, সালোয়ার কামিজের সাজে অনেকখানি বয়স কমে গেছে গার্গীর। হেয়ারস্টাইল একেবারে ভিন্ন ধরনের করে চোখে পরে নিল তার প্রিয় ঘোলাকাচের চশমাটা। গার্গী তখন কুড়ি বছরে সদ্য তরুণীতে উত্তীর্ণ এক সাংবাদিক। হাতে একটি ডটপেন আর নোটবই। পরক্ষণেই সায়নকে 'একটু বেরুচ্ছি' বলে বেরিয়ে গেল ফুট্টুসের গাড়ি নিয়ে। ফুট্টুসকে বলল, পার্ক স্ট্রিট থানা—

পার্ক স্ট্রিট থানার কোনও অফিসারের পক্ষে যদিও গার্গী চৌধুরীকে চেনার কথা নয়, তবু গার্গী চেহারাটা সামান্য বদল করে নিল এই ভেবে যে, হয়তো পরে কখনও দেখা হলেও হতে পারে। থানার ভেতর গিয়ে কোনও দ্বিধা না করেই গার্গী তরতর করে ঢুকে গেল পুলিশ ইনস্পেক্টরের ঘরে। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, আমি একটি দৈনিক পত্রিকার তরফ থেকে আসছি। সেদিন 'দি আইডিয়াল নেস্ট' এ যে ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন, সে ব্যাপারে কিছু জানতে চাই। একটা স্টোরি করব।

পুলিশ অফিসাররা একমাত্র সাংবাদিকদেরই যা কিছুটা রেয়াত করে চলেন। আসলে সাংবাদিকরা কখন কাকে ফাঁসিয়ে দেবে তা কেউই আগে থেকে আন্দাজ করতে পারে না। ফলত গার্গী বেশ সদয় ব্যবহারই পেল পুলিশ ইনস্পেক্টর অনিন্দ্য শাসমলের কাছ থেকে। বেশ স্টাউট চেহারাব মাঝবয়সী পুলিশ অফিসার বললেন, এখনও কাউকেই ধরতে পারিনি। যেদিন সন্ধেয় খুন হয়, তার পরেই বারের মালিক বার বন্ধ করে বেপাত্তা। দু-চারজন ওয়েটারকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাতে যতদূর মনে হয়েছে, খদ্দেরে খদ্দেরে মাতাল অবস্থায় ঝগড়া হলে এরকম খুনখারাপি প্রায়ই হয়ে থাকে এ-ধরনের বারে।

গার্গী ইনস্পেক্টরের চোখের দিকে তাকাল, আপনি বোধহয় দেখেছেন, কাগজে বেরিয়েছে, ঝগড়া হয়েছিল একজন নর্তকীকে কেন্দ্র করে। সে ব্যাপারে কিছু ইনভেস্টিগেশন হয়েছে?

—হ্যাঁ, সেদিন দুজন ড্যান্সারের প্রোগ্রাম ছিল, একজন মিস পলি আর একজন মিস লিজা। মিস পলিকে আমরা ইন্টারোগেট করেছি। সে জানিয়েছে খুন হয়েছিল যে-সময়, তার অনেক আগেই প্রোগ্রাম সেরে সে বেরিয়ে গিয়েছিল বার থেকে। খুনের ব্যাপারে কিছুই জানে না।

—ঠিক কটার সময় খুনটা হয়েছিল?

—তদন্তে যা পেয়েছি, রাত দশটার একটু আগে। তার দশ মিনিট আগে মিস লিজার নাচ শেষ হয়েছিল। সম্ভবত সে ড্রেসিংরুমে যাওয়ার পরেই কোনও গোলমাল বেধেছিল বারে।

—এ ব্যাপারে মিস লিজার বক্তব্য কী?

পুলিশ ইনস্পেক্টর হঠাৎ হাসলেন, মিস লিজাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা বারের রেজিস্টার থেকে তার ঠিকানা নিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, ওটা ভুয়ো ঠিকানা। আমরা অবশ্য খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাচ্ছি।

—তাই! গার্গী বোধহয় কিছুটা অবাক হল, ঠিকানাটা একবার আমাকে দেবেন?

—ঠিকানা পেলে কোনও লাভ হবে না আপনার। জায়গাটা খুব খারাপ।

গার্গী হেসে উঠল, সাংবাদিকদের কাছে কোনও জায়গাই খারাপ নয়। বরং খারাপ জায়গা থেকেই ভাল ভাল স্টোরিগুলো উঠে আসে।

পুলিশ ইনস্পেক্টর অনিন্দ্য শাসমল জরিপ করছিলেন গার্গীকে। আজকাল প্রায়ই বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে এরকম অল্পবয়সী তরুণ-তরুণীরা খবরের খোঁজে এসে হাজির হয়। তরুণীদের উৎসাহই যেন বেশি। রাতবিরেতেও কখনও একা, কখনও কোনও সঙ্গী বা সঙ্গিনীসহ ঘুরে বেড়াচ্ছে খাতা আর ডটপেন হাতে। এই তো কিছুদিন আগেই বউবাজারে বিশাল বোমা-বিস্ফোরণের পর রাত দশ-এগারটাতেও দেখেছিলেন পাঁচ-ছজন তরুণ-তরুণী মহা-উৎসাহে ঘোরাঘুরি করছে ধ্বংসস্তূপের আশেপাশে। ভাঙা ইট-পাথরের ভেতর থেকে এক-একটা ডেডবডি বেরুচ্ছে, আর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তার ওপর। হু-হু করে নোট করে নিচ্ছে যারা শনাক্ত করতে আসছে সেই নিকট-আত্মীয় বা আত্মীয়াদের কথা। ঠিক মনে করতে পারলেন না, তাঁর সামনে বসা এই তরুণীটিও সেদিন বউবাজারে ছিল কি না। কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইনস্পেক্টর ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের ঠিকানাটি নোট করিয়ে দিলেন গার্গীর খাতায়। ঠিকানাটা যে ভুয়ো হবে তা মনে মনে আঁচ করেছিল গার্গী। কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে তাকাল পুলিশ ইনস্পেক্টরের দিকে, আচ্ছা, যে ব্যবসায়ী খুন হয়েছিল, তার সম্পর্কে ডিটেল্‌স্‌টা একটু নোট করে নিই।

অনিন্দ্য শাসমল খুবই সহযোগিতা করলেন গার্গীর সঙ্গে। তাঁর কেস-ডায়েরির পৃষ্ঠা খুলে জানালেন, ব্যবসায়ীর নাম কমলাপ্রসাদ জৈন। বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের মতো। বড়বাজারে তাদের মস্ত গদি আছে। রেডিমেড গারমেন্টসের ব্যবসা দু-তিন পুরুষের। তাছাড়াও কী সব নাকি সাপ্লাইয়ের কাজকর্মও আছে।

শেষ কথাটায় জোর দিল গার্গী, কী সাপ্লাই করেন সে ব্যাপারে কোনও খোঁজ নেওয়া হয়েছে?

পুলিশ ইনস্পেক্টর মাথা নাড়লেন, খোঁজ নিয়েছি, বাড়ির লোকজন বলেছে, স্পেয়ার-পার্টস্‌ সাপ্লাই করত বিভিন্ন মোটর রিপেয়ারিং কোম্পানিতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। ইনভেস্টিগেশন চলছে। হয়তো কোনও গোলমেলে ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে।

গার্গী দ্রুত নোট করে নিচ্ছিল তার ছোট্ট খাতাটিতে। লেখা শেষ হতেই পৃষ্ঠাগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিল একবার। নিশ্চিন্ত হতেই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, ইনস্পেক্টরকে একটা মস্ত 'থ্যাঙ্কস', দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমিও বড়বাজারে একবার খোঁজ নিয়ে দেখব। তবু কাল সন্ধের পর আপনাকে একবার টেলিফোন করে জেনে নেব, কোনও হদিস পেলেন কি না।

থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ইনস্পেক্টর অবশ্য বারবার তাকে বলে দিলেন, দেখবেন, আমাকে যেন কোট করবেন না। সাংবাদিকদের খবর দেওয়া হয় লালবাজার থেকেই।

গার্গী হেসে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বেরিয়ে এল বাইরে। মিস লিভার খোঁজ নেওয়াটাই তার দরকার ছিল। ঠিকানা ভুয়ো জেনেও সে ফেরার পথে সোজা চলে এল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে,

লিজার সন্ধানেই। পুলিশ যাকে খুঁজে পায়নি, চেষ্টা করলে হয়তো গার্গী তার খোঁজ জোগাড় করে ফেলতে পারে।

তদন্তের নেশাটা এমন গভীরভাবে চারিয়ে গিয়েছে তার মজ্জায় যে, খেয়ালই হয়নি সন্ধের পর রাত্রির প্রথম প্রহরে এসব এলাকায় একজন যুবতীর পক্ষে ঘোরাফেরা করা বেশ বিপজ্জনক। পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে যে ঠিকানাটি জোগাড় করে এনেছে, খুঁজেপেতে তার হদিস করতে গিয়ে বড় একটা ধাক্কার সম্মুখীন হল। তখন ঠিক বুঝতে পারেনি, কতটা খারাপ জায়গাটা। বুঝতে পেরে পিছিয়ে এল। সিঁড়ির গোড়ায় সিল্কের পাঞ্জাবি পরা একটা লোক তাকে ডাকছিল হাতছানি দিয়ে।

তৎক্ষণাৎ দ্রুত ফিরে এসে উঠে বসল তার গাড়িতে। আজ নয়, কাল সকালে অথবা দুপুরের দিকে আসতে হবে, যখন এ-পাড়ার বাসিন্দারা কিছুটা 'খালি' থাকে। এখন সবাই এত্ত ব্যস্ত—

ফ্রি স্কুল স্টিটের ওপাশেই নিউ মার্কেট। অতএব সকালের বকেয়া মার্কেটিং সেরে ঘরে ফিরতে একটু রাতই করে ফেলল সেদিন। ফিরতেই সায়ন ঠাট্টা করল একটু, কদিন ধরে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে এম-ডি সাহেব!

গার্গী হেসে উঠে বলল, কদিন ধরে সাহেব-সাহেব করে যাচ্ছ। আমি তো সাহেব নই, বিবি।

তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করল সায়ন, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ইস্কাপনের বিবি।

—তবে তোমার কোম্পানির এম ডি হিসেবে কিন্তু ব্যস্ত নই এখন। আপাতত আমি একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। খবরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে ওখানে।

সায়ন একটু গম্ভীর হল, তবে দেখো, কোনও বিপদে পড়ো না কিন্তু। সখের গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ালে পায়ে-পায়ে বিপদও ঘুরে বেড়ায়।

গার্গী এক নজর তাকাল সায়নের দিকে। সায়ন কি তার এই খোঁজাখুঁজি পছন্দ করছে না! সে তো প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে আরও বড় বিপদ থেকে বাঁচাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝুঁকি নিয়ে, তা ছাড়া হত্যা রহস্যও উদঘাটিত করতে হবে তাকে।

পরদিন সকালে অন্য দিনকার চেয়ে একটু আগেই বেরিয়ে পড়ল গার্গী। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এই বাড়িগুলোতে এ-অঞ্চলের নামডাকওলা পতিতারা থাকে। কাল ঠিকানা মিলিয়ে বাড়িটা দেখে গিয়েছিল। ভেতরে ঢুকতে পারেনি। আজ সিঁড়ি বেয়ে সটান উঠে গেল দোতলায়। বাড়িটা বাইরের দিকে পুরনো। পলেস্তারা-খসে-পড়া চেহারা, কিন্তু সিঁড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে বেশ ঝকঝকে, আধুনিক-ডিজাইনের। হঠাৎ গার্গীকে সেখানে দেখে বেশ হই-চই পড়ে গেল 'বাসিন্দা'দের ভেতর। বাসিন্দা মানে অধিকাংশই তরুণী, যারা কলকতায় নিজেদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে পরিচয় দেয় এমন শ্রেণীর। মেমসাহেব-মেমসাহেব চেহারা, বেশির ভাগই স্কার্ট-ব্লাউজ পরে আছে, কেউ-কেউ জিন্‌সের উপর পাতলা শার্ট, অনেকেরই বেশবাস শিথিল, কিন্তু তাতে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।

সাংবাদিক শুনে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল তার চারপাশে। গার্গী জানাল, সে মিস লিজার খোঁজে এখানে এসেছে। সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেই চলে যাবে।

যে পাঁচ-সাতজন যুবতী ভিড় করে আছে, তাদের কারও নাম এলিনা। কারও রিচি, কারও

ডেলা বা বিউটি, কারও বা জুলিয়েন। ডেলা নামের মেয়েটি বলল, কাল পুলিশও এসেছিল লিজাকে খুঁজতে, কিন্তু ওই নামে কোনও মেয়ে এখানে থাকে না।

থাকে না তা তো জানতই গার্গী। তবু যে কৌতূহলে সে এহেন একটি পরিবেশে ঝুঁকি নিয়ে এসেছে তা হল, হঠাৎ লিজা নামের সেই স্বর্ণকেশী নর্তকী কেনই বা এই বাড়িটির ঠিকানা ব্যবহার করেছে 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর নথিপত্রে! নিশ্চয়ই সে এই তল্লাটের অন্য কোথাও—

এলিনা নামের মেয়েটি বেশ জোর দিয়ে জানাল, লিজা নামের কোনও মেয়ে এ অঞ্চলে কোথাও থাকে না। থাকলে তারা কেউ না কেউ জানতই। তবে এও হতে পারে, হয়তো এ পাড়ারই কেউ নাম বদলে হোটেলে গিয়ে নাচে।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই এতক্ষণ কথা বলছিল গার্গী। হঠাৎ অন্য একটি মেয়ে উপর থেকে নেমে এসে গার্গীকে বলল, গ্র্যান্ডমা তোমাকে ডাকছে।

গ্র্যান্ডমা! গার্গী বিস্মিত হল কম নয়। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছোট্ট একটি ঘরে ঢুকে যে অভিজ্ঞতা হল তার, তা যেমনই অদ্ভুত তেমনই রহস্যময়। আলোবাতাসহীন এমন ঘরটিতে ভাঙা চৌকির ওপর বসে আছে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক চেহারার এক বৃদ্ধা, কলকাতার প্রায় বিলুপ্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রজন্মের এক উত্তরাধিকারিণী, সাদা বাংলায় যাকে এই পতিতাকুলের মাসি বলেই মনে হল তার। গতকাল পুলিশ এসে লিজার খোঁজ করেছিল সে খবর বুড়ি জানে। আজ আবার গার্গী সেই একই কারণে এ-বাড়িতে এসেছে শুনে বুড়ি একবার দেখতে চেয়েছে তাকে।

অন্তত বছর আশি বয়স হবে বৃদ্ধার। মুখ তোবড়ানো, চোখ গর্তে বসা, চামড়ায় হাজারো কোঁচ, চুল ধবধবে সাদা, গায়ে ঢোলা ফ্রক, এহেন এক প্রাচীনার কাছে বসতেই গার্গী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। বৃদ্ধা ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, হঠাৎ লিজার খোঁজ করছ কেন তোমরা?

সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে গার্গী জানাল, সে একজন সাংবাদিক। পুলিশ কেন লিজাকে খুঁজছে সে জানে না। হোটেল-ড্যান্সারদের নিয়ে সে একটা স্টোরি করতে চায়। লিজার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর বারে। তাইই—

বৃদ্ধার নাম লিলি মরিসন। গার্গীর কথা শুনে ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, তাহলে আমাকে নিয়েই একটা গল্প লেখো না। কচিবয়সে আমিও নাচতাম হোটেলে।

—তাই? গার্গী চমকে উঠল, কৌতূহলীও হল। সত্যিই যখন সে সাংবাদিকতা করত, এরকম চরিত্র পেলে তৎক্ষণাৎ দিনদুয়েক ঘোরাঘুরি করে একটা দুর্দান্ত ফিচার লিখে ফেলত

এ বৃদ্ধাকে নিয়ে। কিন্তু আজ তার হাতে সময় কম, আপাতত ভূমিকাও অন্য। বুড়ির আত্মকাহিনী, তা যত রোমাঞ্চকরই হোক না কেন, তা শোনার বা লেখার মতো তার মানসিক স্থিরতা এখন নেই।

কিন্তু বৃদ্ধার পরের কথায় সে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। ফোকলা দাঁতের একরাশ হাসি উপহার দিয়ে বলল, জানো, এক বাঙালিবাবু এ বাড়িতে আসে মাঝেমাঝে। আমার মেয়েদের কাছেই। সে কখনও ওপরে এসে আমাকে আদর করে ডাকে মিস লিজা বলে।

—তাই নাকি! গার্গী হুমড়ি খেয়ে পড়ল বৃদ্ধার দিকে, কে তিনি? কী নাম তাঁর?

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়ে। তার নাম কখনও শুধোয়নি তারা। খদ্দেরদের নাম নিয়ে তাদের মাথাব্যথাও নেই। মেয়েরা এক-একজনকে এক-এক নামে ডাকে। এই বাঙালিবাবুর আঙুলে অনেকগুলো আংটি পরা থাকে বলে আংটিবাবু নামেই এ তল্লাটে পরিচিত। তবে দুবছর আগে এই আংটিবাবু বৃদ্ধাকে ভালবেসে একটা ডায়েরি উপহার দিয়েছিল। তাতে তার নাম লেখা থাকলেও থাকতে পারে।

গার্গী আগ্রহ প্রকাশ করতেই খুঁজেপেতে ডায়েরিটা বার করে বুড়ি এগিয়ে দিল গার্গীর দিকে। পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপাল্টে কোথাও উপহারদাতার নাম খুঁজে না পেলেও গার্গী নিথর হয়ে গেল ডায়েরির প্রস্তুতকারকের পরিচয় পেয়ে। ডায়েরিটা লাইম ইন্ডিয়ারই কেউ প্রেজেন্ট করেছে এটা। কে তিনি? হয়তো লোটন হতে পারে। নাকি রৌণক মুখার্জি?

গার্গী কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিল আংটিবাবুর বিবরণ। মাঝারি ধরনের হাইট, রং ময়লার দিকেই, ব্যকব্রাশ করা চুল, গলার স্বর একটু ভারী! লোটনকে একদিন দেখেছে গার্গী। মিলেও যেন মিলছে না তার সঙ্গে। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, রৌণক মুখার্জির সঙ্গে তার একবার দেখা হওয়া দরকার। কতকাল আর লোকটাকে চোখের আড়ালে রেখে গার্গী তদন্ত চালিয়ে যাবে!
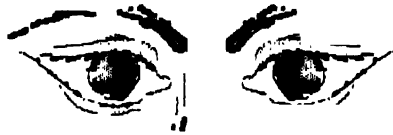
সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পটভূমিকায়, প্রায় আচমকাই রৌণক মুখার্জির সঙ্গে গার্গীর আলাপ হয়ে গেল।

'দি হিড্‌ন্ আর্ট' নামে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা চমকপ্রদ এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের 'রজনীগন্ধা' হলে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে সেখানে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান জানাল সংস্থাটি। বিষয় ঃ রোল অব্ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন মডার্ন সোসাইটি। খুবই পুরনো বিষয়, কিন্তু সায়ন গার্গীকে বলল, দ্যাখো না, কোনও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উপর যদি আলোকপাত করতে পারো—

অনেক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে 'ভারতীয় গণতন্ত্র' নিয়ে বক্তৃতা করে প্রথম হয়েছিল গার্গী। বেশ হইচই পড়ে গিয়েছিল ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে। হঠাৎ এত কাল পরে, সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় সেমিনারে যেতে হবে শুনে সে দ্বিধান্বিত হল। বলল, আসলে তোমাকেই চায় ওরা, আমাকে নয়। কার্ডের ওপর ভুল করে এম.ডি. লিখে ফেলেছে।

সায়ন তবু ঘাড় নাড়ল, উঁহু। ইন্ডাস্ট্রি জগতে প্যারাডাইসের নতুন এম. ডি. এখন একটি বহু আলোচিত নাম। হয়তো মহিলা বলেই ব্যাপারটা এখন নতুন মাত্রা পেয়েছে। বেশ ফাটাফাটি একটা বক্তৃতা করে এসো।

ফাটাফাটি কি না তা গার্গী জানে না। সে কয়েকদিন ধরে খেটেখুটে যে লেখাটি তৈরি করল, তা যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করল সমবেত সুধীমণ্ডলীর। গার্গীর বাচনভঙ্গি চমৎকার,

তার কণ্ঠস্বরও যথেষ্ট মনোযোগ কাড়ার মতো। রচনাটিও সাবলীল ভঙ্গিতে লেখা, দৃষ্টিভঙ্গিও স্বচ্ছ। তার বক্তৃতা শেষ হতেই যাঁকে পরবর্তী বক্তা হিসেবে ডাকা হল, গার্গী স্তম্ভিত হয়ে দেখল, তিনি রৌণক মুখার্জি, লাইম ইন্ডিয়ার অ্যাড্‌ভার্টাইজিং ম্যানেজার, এতক্ষণ তার পাশেই যে সুদর্শন শান্তশিষ্ট ব্যক্তিটি চুপচাপ বসেছিলেন, তিনিই।

গার্গী এতক্ষণ খেয়ালই করেনি রৌণককে। হল ভর্তি শ্রোতা, ডায়াসে বিজ্ঞাপন জগতের কয়েকজন নামীদামি হর্তা-কর্তা, পাশেই লম্বভাবে রাখা কয়েকটি চেয়ার, চেয়ারগুলির সামনে রঙিন চাদর ঢাকা লম্বা টেবিল, তাতে ফুল উপচে-পড়া ফুলদানি। এ চেয়ারগুলো আমন্ত্রিত বক্তাদের জন্যই — যেখানে আজকের সেমিনারের জনা-পাঁচেক বক্তার মধ্যে গার্গী বসেছিল সামান্য দুরু দুরু বুকে। এখন সে নেহাত একজন ছাত্রী নয়, একটা বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অন্তত সমীহ করার মতো কিছু বলতেই হবে তাকে।

পরবর্তী বক্তা হিসেবে মঞ্চে যাওয়ার আগে রৌণক শুধু তাকে বলে গেল, 'দারুণ বলেছেন কিন্তু আপনি।' অভাবিত প্রশংসায় অভিভূত হল গার্গী, ইনিই যে রৌণক মুখার্জি তা এতক্ষণ বুঝতে পারেনি সে। অ্যামপ্লিফায়ারে নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রৌণক ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন মাইকের দিকে। বেশ স্মার্ট, সপ্রতিভ ভঙ্গিতে শুরু করলেন। গার্গী তখন বিস্মিত হয়ে শুনছে রৌণকের বক্তব্য। বিজ্ঞাপন যে শুধু প্রচারই নয়, তা এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম রুচিমান শিল্প- মাধ্যমও, কখনও কখনও তার কাব্যময়তা আধুনিক মানুষের হৃদয়কে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করে যে, রুচি বদলে দেয় সমগ্র মানবসভ্যতারই।

প্রায় কবিতার মতোই রৌণকের ভাষা। গৌরবর্ণ, সৌম্য চেহারার রৌণক, হাইট সাধারণ বাঙালির তুলনায় একটু বেশিই, মাথার চুল কোঁকড়া, এ হেন রৌণকের কাব্যময় নিবেদন শুনতে শুনতে গার্গীর কেবলই মনে হচ্ছিল, ইনিই সেই পুরুষ একদা যার প্রেমে পড়েছিল ঐন্দ্রিলা, নিঃশব্দ প্রেমই, তবু ভালবাসায় ঘাটতি ছিল না একটুও, কিন্তু বিনিময়ে উপেক্ষা ছাড়া কিছুই পায়নি বেচারি। অন্য এক নারীর প্রেমে এতই ওতপ্রোত ছিলেন রৌণক যে, নিঃশব্দে সরে আসতে হয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে। তা অবশ্য হতেই পারে, প্রেমের নিয়মই তাই, কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, বিয়ের পরও ঐন্দ্রিলা একটা সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল রৌণক মুখার্জির সঙ্গে। কী সেই সম্পর্ক, তা গার্গী পুরোপুরি বুঝতে পারেনি এখনও। ঐন্দ্রিলার সেই ডায়েরিটিতে কতটুকুই বা লেখা ছিল, তা এমনই দুর্বোধ্য ও দ্ব্যর্থবোধক যে সেই পুরুষটি রৌণকই কি না তা বোঝা সম্ভব হয়নি গার্গীর পক্ষে।

গার্গী আরও আশ্চর্য হচ্ছিল এই ভেবে যে, রৌণকই এক সময় কবিতা লিখতেন (এখনও লেখেন কি না তা অবশ্য জানে না), ফরাসি ভাষা শেখাতেন ঐন্দ্রিলাকে, তা নিয়ে গোলমাল হওয়ার পর স্বাভাবিক হত, যদি তাঁদের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ না থাকত, অন্তত ঐন্দ্রিলার বিয়ের পর অবশ্যই, কিন্তু তার পরও কেন রৌণক যেতেন ঐন্দ্রিলার কাছে, সেটাই ভারি রহস্যময়। বিশেষ করে যে রাতে ঐন্দ্রিলা খুন হয়, সেদিন সন্ধের পর তার কাছে গিয়েছিলেন এই পুরুষটি, কেন গিয়েছিলেন তা একমাত্র রৌণকই এখন বলতে পারেন।

ভাবতে ভাবতে গার্গী সিদ্ধান্ত নিল, যে করেই হোক, রৌণকের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ঐন্দ্রিলা হত্যা রহস্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে গত কয়েকদিনে হাজারো সমস্যার গভীরে তাকে প্রবেশ করতে হয়েছে। একদিকে চন্দ্রাদেবী-রবার্ট হিমন-

দীয়াকে নিয়ে একরকম জটিলতা, অন্যদিকে প্যারাডাইসের সঙ্গে লাইম ইন্ডিয়ার সম্পর্ক নিয়ে ভিন্নরকম টানাপোড়েন, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে 'দি আইডিয়াল নেস্ট।' এত সব-, গূঢ় রহস্যের ভেতর রৌণকের প্রকৃত ভূমিকা কী, সেটা না জানা পর্যন্ত কে হত্যাকারী তা রহস্যই থেকে যাবে। অতএব এই রৌণক-রহস্য ভেদ করাই তার এখন প্রথম দায়িত্ব।

অতএব বক্তৃতা শেষ করে রৌণক তার পাশে এসে বসতেই গার্গী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল তার বক্তৃতার। শুধু তা-ই নয়, এও বলল, বিজ্ঞাপনের আর্টকে যে এভাবে ভাবা যায় তা গার্গী জানতই না এতদিন। আরও বলল, আপনাদের কোম্পানির বিজ্ঞাপন আমি নিয়মিত ফলো করি। শুনেছি সবই নাকি আপনার মাথা থেকে বেরোয়।

বক্তৃতার সময় কিছুটা নার্ভাস ছিল রৌণক, তাই অ্যামপ্লিফায়ার ছেড়ে সিটে এসে বসতেই একরাশ স্তুতির সম্মুখীন হবে তা ভাবতেই পারেনি, তাও কিনা তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মুখ থেকে! আর শুধু তার বক্তৃতারই নয়, তার বিজ্ঞাপনের প্রশংসাও। রৌণক আপ্লুত হয়ে গেল, আপনি বিজ্ঞাপনগুলো দেখেন নাকি।

—দেখতেই হয়, কারণ দুই কনসার্নের একই তো প্রোডাক্ট। তাকে আর এক কনসার্ন কত আকর্ষণীয়ভাবে বিজ্ঞাপিত করছে, তা দেখাও তো এক অন্য অভিজ্ঞতা।

সেদিন আরও দু-তিনজন বক্তা ছিলেন সেমিনারে। তাঁরা কী বললেন না-বললেন তা গার্গীর মগজে সেঁধুল না। সে তখন নিচু গলায় রৌণকের সঙ্গে তৈরি করে নিচ্ছে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা। সেমিনার শেষ হলে বাইরে বেরিয়ে রৌণক যখন তার গাড়ি খুঁজছে, গার্গী নিজেই প্রস্তাব দিল, নিশ্চয় এই বিকেলবেলা আর অফিসে যাবেন না। তাহলে গাড়িটা ছেড়ে দিন। আপনাকে আমিই পৌঁছে দিই।

ক্রমশ অভিভূত হচ্ছিল রৌণক। বেশ কিছুদিন ধরে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ঘটনাবলি দূর থেকে শুনে যাচ্ছিল তারা, পল্লবিত অনেক কাহিনীও, বিশেষ করে সায়নের জীবনে গার্গীর প্রবেশ ও কয়েকদিন পরেই তার ম্যানেজিং ডিরেক্টব হিসেবে নিয়োগ নানান রসালো গল্পের জোগান দিয়েছিল লাইম ইন্ডিয়ার দফতরে দফতরে। সেই গার্গীর সঙ্গে অভাবিতভাবে যোগাযোগ হওয়ার পর তিনিই লিফট্ দিতে চাইছেন রৌণককে, তা সে ভাবতেই পারছিল না।

সেদিন নিজেই মারুতি চালিয়ে সেমিনারে এসেছিল গার্গী। সামনের সিটে রৌণক বসতেই সেলফের চাবি ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় পৌঁছোতে হবে?

চেতলার রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব রোডে বৌণকের ছোট্ট ফ্ল্যাট। গার্গীকে তা বলতেই সে দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বেরিয়ে এল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে থেকে। দুরন্ত বেগে রেড রোড দিয়ে প্রায় উড়ে যেতে যেতে বলল, বিজ্ঞাপনের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আপনি খুব ভাবেন,তাই না?

—খুবই, সামান্য হাসল বৌণক, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি ওগুলো লক্ষ করেছেন এবং প্রশংসাও করলেন তার।

গার্গী ঠোঁট টিপে হাসল, ভাল যে কোনও কিছুরই প্রশংসা করা উচিত।

—তা হয়তো উচিত। কিন্তু কোনও প্রতিযোগী কনসার্নের এম. ডি. তার. প্রশংসা করছেন

এটা আমাদের দেশে অন্তত ভাবা যায় না। এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে পরস্পরের মধ্যে--

—প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু ঈর্ষা থাকা ভাল নয়, গার্গী হঠাৎ দুম্ করে বলে ফেলল। বলেই একবার রৌণকের মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল।

রৌণকের অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। বরং হেসে বলল, রাইট ইউ আর, ম্যাডাম। আমিও তাই মনে করি। কিন্তু আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যানের বক্তব্যের কত তফাত। তাঁর মুখ দিয়ে কখনওই প্যারাডাইস সম্পর্কে এক পংক্তি প্রশংসাও বেরুবে না। তিনি—

উচ্ছ্বাসের বশে আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রৌণক। মুহূর্তে হেমজ্যোতি সিংহ রায়ের বেঁটেখাটো গোল শরীর আর ক্রুদ্ধ মুখখানা ভেসে উঠতেই তার জিভ জড়িয়ে গেল হঠাৎ।

—হাউ ইজ ইয়োর চেয়ারম্যান? শুনছি তিনি খুব কড়া ধাতের মানুষ?

—খুবই কড়া ধাতের, রৌণক এতক্ষণে বলেই ফেলল, এমনই কড়া যে কখন আমাদের চাকরি আছে কখন নেই তা আমরা কেউই জানি না।

—সেদিন শুনলাম, আপনাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারকে হঠাৎ স্যাক করেছেন চেয়ারম্যান?

— হ্যাঁ। শুধু তাঁকেই নয়, চেয়ারম্যান এখন এমন বিধ্বংসী মূর্তিতে আছেন, যে কোনও অফিসারকে যে-কোনও সময় স্যাক করতে পারেন। এইসব প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করা যে কী ঝকমারি তা যারা কাজ করে তারাই জানে। প্রতিদিন সকালে অফিসে বেরুবার সময় মনে হয়, সন্ধেবেলা চাকরি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব তো! যে-কোনও মুহূর্তেই হয়তো ডিসচার্জ লেটার ধরিয়ে দেওয়া হবে. ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকয়ার্ড ইন দিস কোম্পানি।

রেসকোর্সের পাশ দিয়ে তুমুল বেগে ছুটতে ছুটতে গার্গী বলল,তাহলে তো খুবই টেনশনে কাটাতে হচ্ছে আপনাদের?

—ভীষণ। চেয়ারম্যানের মুখখানা যদি কোনও দিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মনে পড়ে, সেদিন চোখে আর ঘুমই আসে না। ঘুম যদিও বা আসে, সঙ্গে দুঃস্বপ্ন।

গার্গীর হাসিও পাচ্ছিল, কষ্টও হচ্ছিল, তাহলে তো বেশ ভীতিপ্রদ ব্যাপার। মানে, আপনাদের চেয়ারম্যান—

রৌণক হড়হড় করে তার ক্ষোভ উপচে দিল গার্গীর কাছে, বলতে পারেন একেবারে গ্রে-হাউন্ডের মতো। পারলে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলেন। রাহুল রায় স্যাক্‌ড্ হয়ে বেঁচেই গেছেন মনে হচ্ছে।

—আপনিও কি চাকরি চেঞ্জ করার কথা ভাবছেন?

গার্গীর প্রশ্নে এবার বিভ্রান্ত হল রৌণক, চাকরি চাইলেই কি পাওয়া যায় নাকি।

গার্গী ঘাড় ফেরাল রৌণকের দিকে, যদি পাওয়া যায়, তা হলে করবেন!

রৌণক কিছু উত্তর দেবার আগেই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করতে হল গার্গীকে। ততক্ষণে জুলজিক্যাল গার্ডেনের সামনে এসে পৌঁছেছে তারা। বিকেলে চিড়িয়াখানা থেকে পিলপিল করে লোক বেরুচ্ছে, তাতে সামান্য জ্যাম হয়েছে এখানটায়। হঠাৎ কাকে যেন দেখে রৌণক

চেঁচাল, আরে, রায় সাহেব।

হালকা ব্লু-রঙের শার্ট, ডিপ ব্ল্যাক প্যান্ট পরনে একজন অনতিচল্লিশ ব্যক্তির উদ্দেশে হাত বাড়াল রৌণক, কী ব্যাপার, এখানে—

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল গার্গী, আরে, খুব চেনা চেনা মুখ। কোথায় দেখেছে যেন কদিন আগে। লোকটি কিছু বলার আগেই গার্গীর সামনে ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। পেছনের গাড়ি পিঁক পিঁক শব্দ করতেই গার্গী গাড়ি চালাতে শুরু করে রৌণককে জিজ্ঞাসা করল, গাড়ি সাইড করে দাঁড়াব? কথা বলবেন?

রৌণক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত নাড়ল ভদ্রলোককে। তারপর গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, নাহ, কালই দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। নিশ্চয় কোনও কাজে এসেছিলেন এদিকে।

কৌতূহল চাপতে পারল না গার্গী, কে ভদ্রলোক?

—চেনেন না ওঁকে। উনিই তো রাহুল রায়। চাকরি হারিয়ে ভারি বিপদে পড়েছেন।

প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল গার্গী। ইনিই রাহুল রায় নাকি! কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত। কিন্তু নিজেকে যথাসম্ভব উদাসীন রেখে বলল, এখন কী করছেন ভদ্রলোক?

—একটা নতুন ফ্যাক্টরি করতে চাইছেন। তারই চেষ্টা করছেন এখানে-ওখানে ঘুরে।

গার্গী হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করল, ইজ হি অ্যা ফ্যামেলি ম্যান?

রৌণক বিস্মিত হল, হ্যাঁ। ওঁর এক ছেলে, এক মেয়ে।

পরক্ষণেই কী যেন ভেবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল গার্গী, আচ্ছা, আপনি তো জব চেঞ্জ করতে চাইছেন। যদি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস আপনাকে চাকরি অফার করে, তাহলে আপনি কি অ্যাকসেপ্ট করবেন?

—প্যারাডাইসে! রৌণক আচমকা ধাক্কা খেয়ে নড়ে চড়ে বসল যেন। হয়তো সেই মুহূর্তে মারুতির চাকার তলায় একটা পট্‌হোল পড়ায় গাড়িটা লাফিয়ে উঠেছিল বলেও হতে পারে, অথবা প্রস্তাবটা তার কাছে এতই আকস্মিক, তাই-ই। চমক কাটিয়ে বলল, কিন্তু আপনাদের তো অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার আছেন। মধুমন্তী—

—মধুমন্তী চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারে তো।

—মধুমন্তী চাকরি ছেড়ে দেবে? অমন লিউক্রেটিভ স্যালারি ছেড়ে! আপনার মতো ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সায়ন চৌধুরীর মতো চেয়ারম্যানকে ছেড়ে—

—আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন প্যারাডাইস? গার্গী আবার আগের প্রশ্নে ফিরে গেল।

তখনও প্রবল বিস্ময়ে ডুবে আছে রৌণক। গার্গী এমনই আচমকা তাকে প্রস্তাবটি দিয়েছে যে, সামান্যতম সময়ও নেই ভাববার। বলে ফেলল, নিশ্চয়ই। আপনার মতো এম. ডি-র কছে কাজ করতে পারাটা নিঃসন্দেহে এক অন্য অভিজ্ঞতা।

—এতক্ষণ কথা বলে তাই বুঝলেন নাকি। আমাদের কোম্পানিতে প্রথমে কিন্তু অন্য রি-অ্যাকশন হয়েছিল। অনেকেই মহিলা ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে মেনে নেওয়ার বিষয়ে আড়ালে কানাকানি করেছিলেন। আপনার সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না?

রৌণক হাসল, না, আমার সেরকম খুঁতখুঁতানি নেই। আমি যেখানেই কাজ করি, যাঁর কাছেই কাজ করি, আমার যতটুকু মেধা সবটুকুই ঢেলে দিই কাজে, সে ক্ষেত্রে আমার বস্

মহিলা, না পুরুষ, সে ব্যাপারে আমার আলাদা কোনও রি-অ্যাকশন নেই। অন্তত আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তো মোটেই নেই। যদি আজ আপনাকে না চিনতাম, মানে একেবারে অপরিচিত হলে হয়তো আপনার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতাম।

—কীরকম খোঁজখবর নিতেন?

রৌণক ইতস্তত করে বলল আসলে মহিলারা অনেক সময় ডমিনেটিং হন. সেক্ষেত্রে তাঁর অধীনে কাজ করাটা কিছুটা অস্বস্তিকর। তবে আপনি সেরকম নন।

—আমাকে একদিন দেখেই বুঝতে পারলেন, আমি ডমিনেটিং নই?

—মহিলাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই আমি বুঝতে পারি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভেনিউ ক্রশ করে গার্গী তখন এসে পড়েছে আলিপুর ট্রামরাস্তার ক্রসিঙে। আবার একটু জ্যামের মুখোমুখি। গাড়ি থামিয়ে হেসে উঠল গার্গী, বাহ্, তা হলে তো আপনাকে একজন মহিলা-বিশেষজ্ঞ বলা যায়।

রৌণক হঠাৎ ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। কথাটা তার একটু অন্যভাবে বলা উচিত ছিল। অন্তত একজন মহিলার সামনে। হেসে বলল, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি, চাকরির ব্যাপারটা কি সত্যিই বললেন, না জোক করলেন?

গার্গী সামান্য গম্ভীর হল।

রৌণক তৎক্ষণাৎ বলল, না, মানে আমার চাকরির সত্যিই দরকার। লাইম ইন্ডিয়ায় বোধহয় আর বেশি দিন চাকরি করা যাবে না। কোম্পানির অবস্থা টালমাটাল।

তেমনই গম্ভীর হয়ে গার্গী উত্তর দিল, অন্তত চাকরির ব্যাপারে কারও সঙ্গে জোক করতে নেই। চাকরি মানে একজন মানুষের বেঁচে থাকার, রুজিরোজগারের ব্যাপার। মধুমন্তী চাকরিটা ছেড়ে দেবে শিগগির, অন্তত আমার কাছে সেরকমই রিপোর্ট এসেছে। দু-চারদিনের মধ্যেই জানতে পারব মনে হচ্ছে, তাই আপনার ভিউজটা নিয়ে রাখলাম। তবে কোম্পানির অবস্থার কথা যদি বলেন, জেনে রাখুন প্যারাডাইসের অবস্থাও খুব ভাল নয়।

—লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

—আপাতত তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু পর পর এমন ঝড়ঝাপটা আসছে, কতদিন কোম্পানি টিকবে বলা মুশকিল।

রৌণক আশ্চর্য হল যেন, তাই!

—কেন, আপনি কিছু শোনেননি? গার্গী এবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল রৌণকের দিকে।

—হ্যাঁ কিছু কিছু কানে আসে। সেদিন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে জি. টি. রোডের ওপর। এক ট্রাক মাল লুট হয়েছে।

—আর কিছু শোনেননি?

—হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানির একজন সুপারভাইজার খুন হয়েছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ফ্যাক্টরির ঠিক পেছনে। তাই নিয়েও খুব গোলমাল হয়েছে—

জ্যামে আটকে পড়ে তখন গরমে হাঁসফাঁস করছে সবাই। রৌণক পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়-গলা মুছছে। গার্গী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল রৌণকের দিকে, গরমে ঘামছে, নাকি উত্তেজনায়! গার্গীর প্রশ্নগুলো তো তাকেই লক্ষ্য করে।

—এসব নিয়ে আপনাদের কোম্পানিতে কোনও আলোচনা হয় না?

—হয় না আবার। আমাদের কিছু কিছু লোক আছে যারা প্যারাডাইসের বিপদে খুশি হয়। সমৃদ্ধিতে বিমর্ষ হয়।

—আপনার কী মনে হয়? কেন এতসব ঘটছে প্যারাডাইসে? বলে গার্গী তার এক্স-রে আই সেঁধিয়ে দিল রৌণকের মুখের প্রতিক্রিয়া বুঝতে।

রৌণক অবাক হয়ে তাকাল গার্গীর দিকে, বলল, কী আর মনে হবে? কখনও কখনও একরম খারাপ সময় সব কোম্পানিতেই আসে।

—প্যারাডাইসের খারাপ সময় এলে তো লাইম ইন্ডিয়ারই লাভ, তাই না? মাঝখানে শুনলাম লাইম ইন্ডিয়ার তরফ থেকে হুইসপারিং ক্যাম্পেন চলছে প্যারাডাইসের বিরুদ্ধে?

রৌণক গার্গীর দিকে তাকাল, ঠিকই শুনেছেন। আমাদের চেয়ারম্যান তো একদিন মিটিঙেই বললেন, প্যারাডাইস বসে গেলেই লাইম ইন্ডিয়ার লাভ। এ ব্যাপারে আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজার, মানে রাহুল রায়, ওই একটু আগে যাঁকে দেখলেন, চেয়ারম্যানকে খুব তাতিয়েছিলেন সে সময়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আমাকেও তাতাতেন খুব। বলতেন, ক্র্যাশ দেম। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিন প্যারাডাইসের স্বর্গ! আসলে রাহুল রায় তখন চেয়ারম্যানের চক্ষুশূল। আমাদের প্রোডাক্ট তখন প্যারাডাইসের প্রোডাক্টের পাশে মার খাচ্ছে। বিক্রি ডাউন হচ্ছে রোজ। চেয়ারম্যান রোজই ধমকাচ্ছেন রাহুল রায়কে। বলতেন, কী মশাই, আপনিও তো কানাডা, না আমেরিকা কোথা থেকে যেন ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন, তা এ রকম ভুষিমাল বেরোচ্ছে কেন ফ্যাক্টরি থেকে?

—তাই, গার্গী হেসে ফেলল, সেইজন্যেই রাহুল রায়ের চাকরি গেল নাকি!

—একজ্যাক্টলি। সে সময় রাহুল রায় একদিন আমাদের বললেন, ওঃ এর চেয়ে প্যারাডাইসে কাজ করা অনেক আরামের ছিল। চেয়ারম্যান নিজেই সব ফর্মুলা বার করেন। সেখানে শুধু কত প্রোডাকশন করব, সেটা ভাবলেই যথেষ্ট ছিল, কী প্রোডাকশন করব তাতে আমাব মাথাব্যথা থাকত না।

—তাই! গার্গী ভুরু কুঁচকে একলহমা কী যেন ভাবল। তারপর হেসে বলল, সত্যিই এখানে কী প্রোডাকশন করব তা নিয়ে ভাবতে হয় না। কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। প্যারাডাইসের পায়ে পায়ে বিপদ।

রৌণক এতক্ষণে ঘাড় নাড়ল, তাই তো দেখছি। আসলে সায়ন চৌধুরীর সেই মিসহ্যাপটা ঘটে যাওয়ার পর থেকেই বিপদ চলছে তাই না?

গার্গী চকিতে একবার রৌণকের মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠা ভাষাটি পড়ে নিল। মিসহ্যাপ শব্দটি উচ্চাবণ করার সময় তার অভিব্যক্তি কি বদলে গেল! ট্রামলাইন ফাঁকা পেতেই গার্গী হু হু পার হয়ে গেল জাজেস কোর্টের পাশের রাস্তাটা। একটু এগিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিলেই চেতলার পথ। চেতলায় গাড়ি ঢুকতেই রৌণক হঠাৎ বলল, এতদূর যখন এলেনই তখন একবার আসুন না আমার ফ্ল্যাটে?

—আপনার ফ্ল্যাটে! গার্গী একটু অবাক হল, কিন্তু সুযোগটা ছাড়ল না। তার আরও অনেক কথা বাকি আছে রৌণক মুখার্জির সঙ্গে। তা ছাড়া তার বহুদিনের ইচ্ছে, রৌণকের

স্ত্রীর সঙ্গে একবার আলাপিত হওয়ার। সেই প্রেমিকা, যার আকর্ষণে রৌণক উপেক্ষা করেছিলেন ঐন্দ্রিলার মতো অসামান্যা রূপসীকে। তৎক্ষণাৎ সে রাজি হয়ে গেল, চলুন, আপনার স্ত্রীর হাতে এককাপ চা খেয়ে আসি। আপনার স্ত্রী নাকি দারুণ সুন্দরী।

রৌণক অবাক হয়ে বলল, আপনি কী করে জানলেন?

—জেনেছি, গার্গী হাসতে হাসতে বলল, ছেলেদেব টাকা আর মেয়েদের রূপের খবর বাতাসে ওড়ে।

রৌণক খুবই বিস্মিত হচ্ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, এই যে, এই গলিটার মুখেই গাড়ি রাখতে হবে। গলির ভেতর তিনটে বাড়ি পরেই আমার আস্তানা।

গার্গী অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তার মারুতি পার্ক করে নেমে এল রাস্তায়। গাড়ির জানালা বন্ধ করে, লক এঁটে বলল, আরও অনেক কিছুই জেনেছি আপনার সম্পর্কে। যেমন আপনি এককালে কবিতা লিখতেন। ফরাসি ভাষা জানেন। যেমন—

রৌণক বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করল, সে কী! এতসব খবর কোত্থেকে পেলেন?

গার্গী চোখে দুষ্টু দুষ্টু অভিব্যক্তি ফোটাল, কয়েক দিন আগে একজন সাংবাদিক এসেছিল আমার চেম্বারে। নাম বলল, মিতুন মুখার্জি। এসেছিল প্যারাডাইস প্রোডাক্টস সম্পর্কে একটা রাইট-আপ তৈরি করতে। এইসব সাংবাদিকরা ভারি বিচ্ছু হয়। টুকটাক ঘোরাফেরা করে নাড়ির খবর সব টেনে বার করে। সে সময় কথায় কথায় বলল, জানেন, লাইম ইন্ডিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার রৌণক মুখার্জি ঐন্দ্রিলাকে চিনতেন—

রৌণকের আর পা বাড়ানোর ক্ষমতাই রইল না। কিন্তু সে এখনও জানে না, গার্গী আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব প্রশ্ন এরপর জিজ্ঞাসা করবে তাকে।

দোতলা বাড়িটার সিঁড়িতে ওঠার মুখে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে গার্গীর দিকে তাকাল রৌণক, তা হলে মিতুন মুখার্জি আপনার কাছেও গিয়েছিল?

গার্গী হাসল, হ্যাঁ। তারপর দেখি প্যারাডাইসের কথাবার্তা ছেড়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারস্যাপার জানতে চাইচে। আমি যতই এড়িয়ে যেতে চাই, ঘুরেফিরে কেবলই জিজ্ঞাসা করে সায়নের কথা। তারপর হঠাৎ বলল, আপনি কি জানেন ঐন্দ্রিলা ফরাসি ভাষা শিখতে যেতেন রৌণক মুখার্জির কাছে। তাই নিয়ে কত গোলমাল—

রৌণক ততক্ষণে বেল বাজিয়ে ফেলেছে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু শরীরটা যেন আর তার বশে নেই। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার সম্পর্কে আরও কতকিছু জেনে ফেলেছেন তা অনুমান করে উঠতে পারছিল না।

বেল শুনে ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে ঋতবৃতা। অন্যদিনকার মতোই রৌণককে দেখে কলকল করে উঠতে যাচ্ছিল, কী লোক তুমি? রোজ রোজ এত্তো দেরি করে

ফেরো—

কিন্তু বলা হল না, বৌণকের সঙ্গে আর এক অপরিচিতা মহিলাকে দেখে বিব্রত হল। তার পরনের পোশাকটি ঠিক বাইরের লোকের সামনে আসার মতো নয়। সে জিব কেটে ছুটে পালাবার আগেই বৌণক বলে উঠল, ঋতু, ইনি হলেন গার্গী চৌধুরী, প্যারাডাইসের—

গার্গী অবাক হয়ে দেখছিল ভারি কচি-কচি মুখের ঋতবৃতাকে। বেশ মিষ্টি লালিত্যময় চেহারা। ঐন্দ্রিলার সৌন্দর্যের প্রখরতা তার নেই বটে, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে এক কিশোরীসুলভ চটক। ঋতবৃতা কোনও ক্রমে দুহাত জোড় করে তার ম্যাক্সি সামলে ছুটল সিঁড়ি বেয়ে। নিশ্চয় পোশাক বদলানোই তার এখন প্রাথমিক কাজ।

দোতলায় রৌণকের ফ্ল্যাটটি আকারে বেশ বড়ই। যে ঘরটিতে গার্গীকে বসাল, সেই লিভিংরুমটি বাইশ-বাই-চোদ্দ এরকম বিশাল সাইজেব। এককোণে সুদৃশ্য সোফাসেটে গা এলিয়ে দিতে দিতে গার্গী তাকাল রৌণকের দিকে, বেশ বড় ফ্ল্যাট তো!

—হ্যাঁ, ওপাশে একটা বেডরুম আছে। সেটাও বেশ বড়। সামনে যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা ডাইনিং। তাব ওপাশে কিচেন। মডার্ন ফ্ল্যাটগুলোর তুলানায় বেশ বড়ই।

ছিমছাম ঘবখানায় নজব বাখতে রাখতে গার্গী হঠাৎ বলল, ঐন্দ্রিলা কি এখানেই আসত ফবাসি ভাষা শিখতে?

প্রায় বজ্রপাত হওযার মতোই চমকে উঠল রৌণক। চকিতে একবার তার বেডরুমের দিকে তাকাল। ঋতবৃতা নিশ্চয় পোশাক বদলাতে ঢুকেছে ও ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তবু গার্গী চৌধুরী এখনও সেই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন দেখে ভীষণ সন্ত্রস্ত হল। আস্তে করে বলল, মিতুন মুখার্জি এত সব খবর জানল কী করে?

রৌণককে বিব্রত হতে দেখে গার্গী ভীষণ কৌতুক অনুভব করছিল। রৌণককে এখন তোপের মুখে বসিযে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করবে বলেই প্রসঙ্গটা সে তুলেছে আবার। রৌণক নিশ্চযই চাইবে না তাব স্ত্রীব কানে এসব আলোচনা ঢুকুক। গার্গীও চায় না, কিন্তু রৌণককে চাপে বাখতে হলে ঋতবৃতাকে এভাবে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে বেখেই পরের পর তীর ছুড়তে হবে তাকে। একমাত্র এবকম ব্ল্যাকমেলেই তাব পেট থেকে কথা বাব করা সম্ভব। সবলভাবে হেসে বলল, বললাম না, সাংবাদিকরা ডেঞ্জরাস হয়। আমার সম্পর্কেও অনেক কথা জেনেছে। কী করে জানল ভেবে আমিও অবাক হয়ে গেছি। যেমন আপনি অবাক হচ্ছেন। আরও কী বলল জানেন! বলল, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আপনার একটা লাগ্‌ভাগ্‌ ছিল।

রৌণক চমকে উঠে বলল, লাগ্‌ভাগ্‌ মানে?

—শব্দটা আমাব কানেও নতুন লেগেছিল। বলল, তার মানে একটা ভালবাসাবাসির মতো ব্যাপার, অথচ ঠিক বৈধ নয়—

রৌণক প্রতিবাদ করল, যদিও নিচু স্বরে, মিতুন মুখার্জি তা হলে ঠিক বলেনি। ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল শিক্ষক এবং ছাত্রীর। ঐন্দ্রিলা শ্রদ্ধাই করত আমাকে। তাকে ভালবাসা বলে না।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রৌণকের দিকে, আর আপনি?

—আমিও তাকে ছাত্রীব মতোই দেখেছি বরাবর।

জিবে চুকচুক শব্দ কবল গার্গী, এহ্, কী মিথ্যুক দেখেছেন সাংবাদিকগুলো। কিন্তু জানেন

আমাকে বলল, রৌণক মুখার্জি ফরাসি ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন ঐন্দ্রিলাকে। ঐন্দ্রিলার বাবা চিঠির সম্বোধন পড়েই বুঝেছিলেন সেটি প্রেমপত্র। তারপর ঐন্দ্রিলাকে আর ফরাসি ভাষা শিখতে দেননি। ঘটনাটা কি ঠিক, মিঃ মুখার্জি?

রৌণক ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ছিল ক্রমশ। এখন যে কোনও মুহূর্তে ঋতবৃতা বেরিয়ে আসবে ও ঘর থেকে। সন্ত্রস্ত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, এ ঘটনাও ঠিক নয়। যে কাগজের টুকরোটিকে ঐন্দ্রিলার বাবা চিঠি বলে মনে করেছিলেন, আসলে তাতে লেখা ছিল, একটি ফরাসি কবিতা। কবিতাটির নাম ছিল, 'মন আমুর'। বাংলায় যার অর্থ হয়, আমার ভালবাসা। কবিতার শিরোনাম দেখেই উনি ধরে নিয়েছিলেন এটি সম্বোধন। পুরো কবিতাটা বুঝতে পারলে কখনওই সেটি প্রেমপত্র বলে ভাবা যেত না।

—তাই! গার্গী অবাক হল, পরক্ষণেই সে তার পরবর্তী প্রশ্নে চলে গেল, তা হলে মিতুন মুখার্জি বলল কেন, বিয়ের পরেও ঐন্দ্রিলা আপনার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করত! আপনিও নাকি যেতেন তার বাড়ি—

—মিথ্যে কথা, রৌণক এতক্ষণ নিচু খাদে কথা বলছিল, হঠাৎ নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না, মিতুন মুখার্জি ইজ আ ড্যাম লায়ার। আপনাকে সমস্ত আজেবাজে কথা বলেছে। আমি কখনওই ঐন্দ্রিলার বাড়িতে যাইনি। ও-ই কখনও-সখনও ফোন করত আমাকে।

—কেন, ফোন করত কেন? গার্গী রৌণকের অভিব্যক্তি জরিপ করছিল প্রখর দৃষ্টিতে।

—সে অনেক ব্যাপার। কে একজন লোক নাকি প্রায়ই বিরক্ত করত তাকে। কিছুতেই তার হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না।

গার্গী হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আপনি জানেন কে বিরক্ত করত তাকে?

—তা কখনও বলেনি। কিন্তু প্রায়ই বলত, কী করি বলো তো রুনুদা। সময় নেই, অসময় নেই, সায়ন বাড়ি না থাকলেই দরজায় এসে ঘা দেবে।

—কিন্তু লোকটা কে, তা বলেনি?

রৌণক কিছু জবাব দেওয়ার আগেই হঠাৎ ওদিকের ঘর থেকে সামান্য বিব্রত অথচ হাসি হাসি মুখ করে বেরিয়ে এল ঋতবৃতা। গাঢ় ম্যাজেন্টা রঙের একটি শিফন শাড়িতে ওতপ্রোত হয়ে এসে বলল, স্যরি, মিসেস চৌধুরী, মিঃ মুখার্জি আমাকে একবারও জানায়নি যে আপনি সঙ্গে আসবেন।

গার্গী হাসল, মুহূর্তে ঠিক করে নিল, ঋতবৃতাকে আরও কিছুক্ষণ পর্দার আড়ালে রাখা দরকার। বলল, স্যরি হওয়ার কিছু নেই, কারণ আমার এখানে আসাটা একেবারেই আকস্মিক। তবে বেশিক্ষণ বসতে পারব না, তার আগে এক কাপ চা খাওয়াবেন?

—অবশ্যই, ঋতবৃতা মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অবাকও হল কিছুটা, কারণ অতিথি নিজেই উদ্যোগী হয়ে চা খেতে চাইছেন।

রৌণককেও তৎপর হয়ে উঠতে হল, শুধু চা নয় কিন্তু, সেমিনার হল থেকে সোজা এসেছেন উনি—

ঋতবৃতা আর বসে গল্প করার সময় পেল না। চা এবং টায়ের আয়োজন করতে ছুটতে হল কিচেনে। তাতে গার্গী নিশ্চিন্ত হল। অন্তত মিনিট পনেরো-কুড়ির আগে এ চত্বরে ঋতবৃতাকে আর আসতে হচ্ছে না। বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে সেজেগুজে বেশ

চমৎকার দেখাচ্ছে ঋতবৃতাকে। গার্গী বারবার ঐন্দ্রিলার পাশে রাখছিল রৌণকের প্রাক্তন প্রেমিকা ওরফে আপাতত স্ত্রীকে। ঐন্দ্রিলা যদি শান্ত টলটলে দিঘি হয় তো ঋতবৃতা ফাল্গুনের এক ঝলক মিষ্টি হাওয়া।

ঋতবৃতা কিচেনে অদৃশ্য হতেই গার্গী আবার পড়ল রৌণককে নিয়ে, কিন্তু লোকটি কেন বিরক্ত করত ঐন্দ্রিলাকে, তা ও কখনও আপনাকে বলেনি?

রৌণক ঘাড় নাড়ল, না। শুধু বলত, একদিন এসো না, রুনুদা। এলে তোমাকে সব বলব।

—এতবার আপনাকে যেতে বলেছে, তবু কোনও দিন আপনি তার কাছে যাননি।

রৌণক বিব্রত হল, না, আমি ঐন্দ্রিলাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলাম। সে এখন বিবাহিতা। পাছে আমি গেলে তার সাংসারিক জীবনে কোনও অসুবিধা দেখা দেয়, তাই-ই—

গার্গী তাকাল রৌণকের মুখের দিকে, ঐন্দ্রিলা কিন্তু আপনাকে শুধু শ্রদ্ধাই করত তা নয়, সে আপনাকে ভালও বাসত। বলুন, বাসত কি না?

শেষ কথাটায় বেশ জোর দিল গার্গী। তাতে রৌণক সামান্য ইতস্তত করে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ বাসত।

—তবু আপনি তার ডাকে সাড়া দেননি কখনও?

রৌণক এবার দুদিকে মাথা নাড়ল, না।

গার্গী এতক্ষণে একটু কড়া গলায় বলল, এতক্ষণ মিতুন মুখার্জিকে ড্যাম লায়ার বলছিলেন, কিন্তু আপনিও মিথ্যে বলছেন, মিঃ মুখার্জি। আমি জানি আপনি তার কাছে একদিন দুপুরবেলা গিয়েছিলেন।

রৌণক একমুহূর্ত থমকে গেল, পরক্ষণে বলল, সেটা আপনি কী করে জানলেন?

—মিতুন মুখার্জিই আমাকে বলেছে। আপনি হয়তো জানেন না, মিতুন ঐন্দ্রিলার একটি ডায়েরি খুঁজে পেয়েছে, তাতে আপনার বিষয়ে অনেক কথাই লেখা আছে।

রৌণকের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, কী লেখা আছে?

—লেখা আছে, আপনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

রৌণক ভয়ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে রইল গার্গীর মুখের দিকে। এবার যেন প্রতিবাদ করার আর সাহস নেই তার।

— তা হলে ঘটনাটা আর একবার মনে করিয়ে দিই, মিঃ মুখার্জি। তখন ঐন্দ্রিলার বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় এক বছর। সে সময় একদিন সকাল থেকে মেঘ করে আছে গোটা আকাশ। যেরকম মেঘলা হয়ে থাকলে মন খারাপ লাগে মানুষের। ঠিক দুপুরের দিকে হঠাৎ ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। একনাগাড়ে ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি, যেরকম বৃষ্টি হলে আর থামতে চায় না। বহুক্ষণ বৃষ্টি হয়ে চলেছে, সে সময় আপনার অফিসে একটা ফোন এল হঠাৎ। বাড়িতে একা হয়ে গেলে আপনাকে এরকম প্রায়ই ফোন করত ঐন্দ্রিলা। আপনার সঙ্গে ফোনে দুদণ্ড কথা বলতে পারলে কী যে খুশি হয়ে উঠত ও। সেদিন ফোন করে বলল, খুব ভয় করছে রুনুদা, সেই লোকটা একটু আগে এসে একবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেছে। বলেছে, আবার আসবে। আগেও এরকম দু-চারবার আপনাকে ডেকেছে ঐন্দ্রিলা, কিন্তু আপনি কখনও যাননি। সেদিন ঝিরঝির বৃষ্টির দিনে আপনি কিন্তু আর এড়াতে পারেননি তার ডাক। তা

ছাড়া তার কণ্ঠস্বরে হয়তো কিছুটা ভয়ের রেশ ছিল যা শুনে আপনি আর স্থির থাকতে পারেননি। ব্লু-ওয়ান্ডারে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি শুনেছিলেন, সায়ন কোথাও ট্যুরে গিয়েছে দুদিনের জন্য। দুদিনে লোকটা বারবার বিরক্ত করেছে ঐন্দ্রিলাকে। যাই হোক, আপনাকে কাছে পেয়ে সেদিন দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিল ঐন্দ্রিলা। বলেছিল, কী রুনুদা, ঋতুকে পেয়ে আপনি একবারেই ভুলে গেলেন আমাকে! আমি যে এত বছর ধরে আপনাকে ভালবাসলাম তার কোনও মর্যাদাই আমি পাব না! আপনি তখন চুপ করে ছিলেন। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একই সঙ্গে দুজন নারীকে ভালবাসা যায় কি না তাইই ভাবছিলেন হয়তো। কিন্তু সেই একলা নিঃসঙ্গ ঘরে হঠাৎ আপনাকে পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল ঐন্দ্রিলা। এক নিরিবিলি মুহূর্তে সহসা তুমুল হয়ে আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, মুখ তুলে আপনার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, অন্তত একবার তুমি আমার হও, রুনুদা, অন্তত আজ, এই মুহূর্তে। আর কখনও তোমার কাছে কিছু চাইব না। আপনি কিন্তু আর সংযম রোধ করতে পারেননি। সেদিন বৃষ্টির দুপুরে আপনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। কয়েকটি নির্জন মুহূর্ত কেবল ঐন্দ্রিলারই হয়েছিলেন আপনি। আপনি ফিরে যাওয়ার পর ঐন্দ্রিলা তার ডায়েরিতে লিখেছিল,'এক বছর বিয়ের পরও কোনও নারী যে কুমারী থাকতে পারে তা আজই প্রথম জানলাম। আষাঢ়ের এই তৃতীয় দিবসটিই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এরকম দুরন্ত দুপুর হয়তো জীবনে আর কোনও দিনই আসবে না।'

থেমে থেমে, একটু একটু করে, প্রায় ফিসফিস করে গোটা ঘটনাটাই বলে গেল গার্গী। শুনতে শুনতে ক্রমশ নিজের ভেতর গুটিয়ে যাচ্ছিল রৌণক। থর থর করে কাঁপছিল তার গোটা শরীর। প্রতিবাদ তো নয়ই, একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। গার্গী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, এরকম কি মাঝেমাঝেই তার কাছে যেতেন, মিঃ মুখার্জি?

রৌণক প্রায় ভেঙে পড়ল, বিশ্বাস করুন, এরপর আর কোনও দিনই যাইনি।

ওদিকে কিচেন থেকে তখন কড়াইতে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ ভেসে আসছে। যেন রৌণকই ভাজা-ভাজা হচ্ছে গার্গীর চোখের আগুনে। ঋতবৃতা নিশ্চই মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনায় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আছে খুবই। হয়তো একটু পরেই লোভনীয় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আবির্ভূত হবে মঞ্চে. তার আগেই গার্গী সতর্ক দৃষ্টিতে হামলে পড়ল তার সামনে বসা শিকারের উপর, অন্তত আরও একদিন আপনি তার কাছে গিয়েছিলেন, মিঃ মুখার্জি, এ বছর পাঁচই এপ্রিল সন্ধের পর। আর সে রাতেই খুন হয় ঐন্দ্রিলা।

রৌণক ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, বিশ্বাস করুন, সেদিন ঐন্দ্রিলার কাছে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি।

—বলুন তো, ঠিক কটার সময় আপনি গিয়েছিলেন ওদের বাড়িতে।

গলা শুকিয়ে আসছে রৌণকের, বুকের ভেতর হাতুড়ির শব্দ, তার মধ্যে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, রাত আটটার একটু পরেই। দুপুরের দিকে ফোন করে বলেছিল, মিঃ চৌধুরীর ফেরার কথা ছিল আজ সকালে, এখনও ফেরেনি। ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে, রুনুদা। তা ছাড়া সেই লোকটা আবার আসবে রাতের দিকে তুমি থাকলে একটু সাহস হয়।

গার্গীর চোখ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছে, তারপর?

রৌণক মাথা নাড়ল, ব্লু-ওয়ান্ডারের সামনে পৌঁছে গেট খুলে ভেতর ঢুকতে যাব, হঠাৎ

দেখলাম ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটের সিঁড়ি বেয়ে আর একজন লোক উঠে যাচ্ছে দ্রুত।

গার্গীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তারপর?

—আমি থমকে দাঁড়ালাম গেটের কাছে। মনে হল, সায়ন চৌধুরীই ফিরে এসেছেন ট্যুর থেকে। এ সময় আমার পক্ষে ভেতরে যাওয়াটা একেবারে বিস্ফোরণের মতো হবে।

—সায়ন চৌধুরী! এবার গার্গীই কাঁপতে লাগল প্রবলভাবে, কী বলছেন কী, মিঃ মুখার্জি?

—গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম, লোকটি সটান উঠে গিয়ে ঐন্দ্রিলাদের ফ্ল্যাটের বেল বাজাল। একবার, দুবার, তিনবার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বেল বাজাতে বাজাতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল লোকটি। বেশ কয়েকবার বাজাবার পর ঐন্দ্রিলা এসে দরজা খুলে দিল।

—তারপর? গার্গীর বুক এতক্ষণে হাপরের মতো ওঠানামা করেছে। সে যেন শ্বাস নিতেই পারছে না আর।

—ঐন্দ্রিলা প্রথমে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ ঝগড়া করল। লোকটা অনুনয়-বিনয় করছিল বারবার। ভেতর ঢুকতে চাইছিল, কিন্তু ঐন্দ্রিলা বলেছিল চলে যেতে।

—লোকটা চলে গেল?

—না, একটু পরেই ঐন্দ্রিলা তাকে পথ ছেড়ে দিল। লোকটা ভেতরে যেতেই ঐন্দ্রিলা ভেজিয়ে দিল দরজা।

গার্গী এবার তীব্র শব্দে আছড়ে পড়ল রৌণকের উপর, আপনি ঠিক দেখেছেন, সে সায়ন চৌধুরী।

রৌণক গার্গীর দিকে তাকাল, সায়ন চৌধুরীকে আমি কখনও চাক্ষুষ দেখিনি। যেদিন প্রথম ঐন্দ্রিলার কাছে গিয়েছিলাম, ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা সায়ন-ঐন্দ্রিলার একটি ফোটোতে তাকে যেটুকু চিনেছি। কিন্তু সায়নের মুখে তো দাড়ি নেই। ঐন্দ্রিলা সেদিন দরজা খোলার পর ঘরের আলোয় যেটুকু সামান্য দেখতে পেয়েছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, লোকটির মুখময় দাড়ির জঙ্গল।

এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রৌণকের কথা শুনছিল গার্গী, হঠাৎ যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, দাড়ি ছিল, আপনি ঠিক দেখেছেন?

রৌণক ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, ছিল।

গার্গী হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল রৌণকের দিকে, দাড়ির রং আপনার মনে আছে? ধূসর, না সোনালি?

রৌণক একটু হকচকিয়ে গেল, চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ, তারপর হতাশ হয়ে বলল, অত দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া বাইরেটা এত অন্ধকার ছিল—

গার্গী সমস্ত ব্যাপারটা নিজের মনে ভাবল কিছুক্ষণ, একটু পরে বলল, লোকটা আর বেরোয়নি ঘর থেকে?

—আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। ঐন্দ্রিলা দরজাটা পুরো ভেজায়ওনি।

—তা আপনি ঢুকে পড়লেন না কেন ভেতরে? লোকটা কী কারণে এসেছে জানতে ইচ্ছে হল না?

—না, তার কারণ আমার একবার মনে হয়েছিল, লোকটা যদি সায়ন চৌধুরী হন! তিনি নিশ্চয় আমার উপস্থিতি পছন্দ করবেন না। তা ছাড়া যদি কোনও আবাঞ্ছিত ব্যক্তি হত তা হলে ঐন্দ্রিলা কেনই বা তাকে ঘরে ঢুকতে দিল। কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ভাবলাম, এভাবে গেটের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক নয়। আমি চলে এলাম পরক্ষণেই। কিন্তু তখন যদি জানতাম, ঐন্দ্রিলা খুন হবে সে রাতে—

গার্গী আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর সময় দিল না ঋতবৃতা। প্লেটভর্তি খাবার আর গরম চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল ফুরফুর করে, বলল, স্যরি, খুব দেরি করে ফেললাম কিন্তু, নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে আপনার—

একবিন্দু খিদে তো নেইই গার্গীর, বরং তার ভেতরে এক মহাপ্রলয় বয়ে চলেছে তখন। কে ঢুকেছিল সে রাতে ঐন্দ্রিলার ঘরে! সে কি রবার্ট, না হিমন! দাড়ির রং সোনালি, না ধূসর তা বলতে পারলেন না রৌণক। নাকি কালোই! ঐন্দ্রিলার চেনা অন্য কারও কি ও বাড়িতে সে রাতে আসা সম্ভব?

এমন নানা ভাবনার চক্কর খেতে খেতে গার্গী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হল ঋতবৃতার কথা শুনে, প্লেটটা যা সাজিয়েছেন, তা দেখেই কিন্তু খিদে আরও বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে মাঝেমাঝেই আপনার বাড়িতে গেস্ট হতে হবে।

এইটুকু প্রশংসাতেই দারুণ খুশি হল ঋতবৃতা। বলল, এখনও মুখে না দিয়েই সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন!

কাঁটাচামচ দিয়ে অত বড় ভেজিটেবল কাটলেটটি ভাঙতে ভাঙতে গার্গী বলল, কিছু কিছু আহার্য আছে যা মুখে না দিয়েও বলে দেওয়া যায়, সুস্বাদু কি না। বলতে বলতে কাটলেটের খণ্ডটি মুখে ফেলে দ্বিতীয়বার প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল, ঋতবৃতা তার ম্যাজেন্টা রঙের শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে কপালের টিপ, ঠোঁটের লিপস্টিক, এমনকি কানের দুলের পাথরটি পর্যন্ত ম্যাচ করিয়েছে। পাথরের রংটি যেন ডালিমের কোয়াই এক একটি। দেখতে দেখতে কেন যেন সহসা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, আপনার কানের দুলটি তো বেশ। কী দারুণ ম্যাচ করেছে শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে!

খুব খুশি হল ঋতবৃতা। বলল, পছন্দটা কিন্তু আমার নয়, ওর। কবিতা লিখত তো, তাই রঙের ব্যাপারটা বেশ ভালই মিলিয়ে কিনে দেয় সবকিছু।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আরও অনেক রঙের দুল আছে নাকি এরকম ম্যাচ করে পরার জন্য।

ঋতবৃতা ডগোমগো হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আরও দুটো রঙের আছে। একটা সমুদ্র-নীল, অন্যটা হালকা ফিরোজা—

—ইস্, আর বেগুনি নেই? বেগুনি রং আমার ভীষণ পছন্দ, গার্গী হঠাৎ বলে ফেলল।

ঋতবৃতা আশ্চর্য হল, তাই?

—হ্যাঁ, আমার এক জোড়া বেগুনি পাথর সেট করা দুল ছিল। জানেন, তার একটা পাথর হঠাৎ কোথায় যে ছিটকে পড়ে গেল। আর খুঁজে পাচ্ছি না। অম্লানবদনে মিথ্যেটা বলল গার্গী।

ঋতবৃতার ভারী কষ্ট হল শুনে, বলল তা হলে কোনও স্যাকরার দোকান থেকে সেট করে নিন না—

গার্গী আবার বলল, কত খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না।

ঋতবৃতা হঠাৎ রৌণকের দিকে তাকাল, তোমাদের ওই রায়সাহেবের তো পাথর নিয়ে কারবার। পাথর নিয়ে গবেষণা-টবেষণা করছেন। দ্যাখো না, যদি ওঁর কাছে পাওয়া যায়। বেগুনি পাথরও খুঁজছিলেন একবার।

রৌণক তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল, রায়সাহেব তো গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। সে পাথর আর এ পাথর তো এক নয়।

গার্গী উৎসুক হল, কোন রায়সাহেব?

রৌণক হাসল, ওই যে আমাদের এক্স প্রোডাকশন ম্যানেজার। বেচারির এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। চাকরি হারিয়ে এখন আরও বেশি করে গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে পড়েছেন। সেদিন আমাদের বাড়ি এসে বোঝাচ্ছিলেন, কোন্ পাথরের কী উপকার। ওঁর রাহু-শনি সবই নাকি এক বছর ধরে বক্রী।

গার্গী গম্ভীর হল, তাই নাকি? বেচারা!

ঋতবৃতা খিল খিল করে হেসে উঠল প্রায় কিশোরীর মতো। বলল, জানেন, সেদিন রায়সাহেব চলে যেতেই মিঃ মুখার্জি বললেন, দাঁড়াও ঋতু, একটা কবিতা লিখে ফেলি, 'রাহুল রায়ের রাহু' নাম দিয়ে। অনেক দিন পরে একটা আইডিয়া এসেছে—

গার্গীর ঠোঁটে একটুকরো চোরাহাসি ঢেউ খেলে গেল, বলল, তা পাথরে কোনও কাজ হচ্ছে?

রৌণক জবাব দিল, নাহ, এতদিন আমাদের চেয়ারম্যান ওঁকে বলতেন, ধুর মশাই, প্যারাডাইসের চেয়ারম্যান এত এত গবেষণা করে কী দারুণ সব প্রোডাক্ট তৈরি করছে, আর আপনি একটা ফর্মুলা তৈরি করতে পারলেন না? তারপর চাকরি যেতে এখন নিজেই একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করবেন বলে এগিয়েছিলেন, কিন্তু সেই একই সমস্যা তো রয়েই গেছে. ভাল প্রোডাক্ট না হলে কোম্পানি চালাবেন কী করে. তাতে ওঁর বান্ধবীও এখন নাকি দুবেলা ঠুসছেন ওঁকে, বলছেন, ধুস, তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

—বান্ধবী! গার্গী অবাক হল।

ঋতবৃতা হেসে গড়িয়ে পড়ল এবার. বুঝলেন, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। এই বয়সে আবার নতুন করে—

বলতে বলতে ঋতবৃতার হাসির দমক এমনই যে কথা শেষ করতেই পারল না। বাধ্য হয়ে তার কথার শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এল রৌণক, আসলে কী জানেন, ভদ্রলোক চল্লিশ বছরের কাছাকাছি পৌঁছে আবার নতুন করে প্রেমে পড়েছেন। তার পর থেকে একটা থিয়োরি বলে বেড়াচ্ছেন, প্রেম করলে নাকি শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। একদিন আমাকেও বললেন, জানেন, সব মানুষেরই উচিত, চল্লিশে পৌঁছে আর একবার প্রেমে পড়া। তাতে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শরীরের জোর বাড়ে, মনের জোর বাড়ে, আয়ুও নাকি বেড়ে যায়। বলতে বলতে রৌণকও হেসে উঠল হঠাৎ।

গার্গী সামান্য হেসে বলল, সাহেবদের দেশে নাকি একটা কথা প্রচলিত আছে। লাইফ

স্টার্টস অ্যাট ফর্টি। বোধহয় তাইই—

গার্গীর প্লেট ততক্ষণে নিঃশেষ। চায়ে চুমুক দিতে শুরু করেছিল, হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলল, এ হে, এত রাত হয়ে গেল নাকি? আমাকে কিন্তু এখনই উঠতে হবে। যা যত্ন করলেন দুজনে মিলে, পরে একদিন আবার হুট করে চলে আসব—

সেদিন একরাশ চিন্তার মোড়কে ঢুকে ব্লু ওয়ান্ডারে ফিরে এল গার্গী। সিঁড়ি বেয়ে উপরে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখল, ও পাশের ফ্ল্যাট থেকে নেমে আসছে হিমন। হিমন! গার্গী বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, হিমন কখন ফিরে এল তার অন্তর্ধান থেকে!

গার্গীকে দেখে যথারীতি পায়ে পায়ে পিছু হটছিল হিমন কিন্তু গার্গী আজ ছাড়ল না তাকে, হঠাৎ তার দিকে ধাওয়া করল। একেবারে উপরের ধাপে পৌঁছেই সপাটে একখানা থাপ্পড় কষাল হিমনের গালে, আর আশ্চর্য, অত বড় শরীরটা গার্গীর একঘায়েই আছড়ে পড়ল দরজার গায়ে। সে সামলে ওঠার আগেই গার্গী বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কলার চেপে ধরে বলল, যা জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক ঠিক জবাব দাও। একটু এদিক-ওদিক হলেই—

হিমন জড়ানো গলায় হড় হড় করে উত্তর দিতে লাগল তার এক লক্ষ প্রশ্নের।

ঐন্দ্রিলার ডায়েরিটি পড়তে গিয়ে খুবই দ্ব্যর্থবোধক মনে হয়েছিল গার্গীর। পরে নিখুঁত বিশ্লেষণের পর অনুধাবন করেছিল, আসলে দুজন পুরুষের কথা লেখা আছে ডায়েরির পৃষ্ঠায়, তাদের কেউই অবশ্য সায়ন নয়। দুজনের একজনকে ঐন্দ্রিলা চেয়েছিল মনে প্রাণে, আর অপর জন প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিল ঐন্দ্রিলাকে। ঐন্দ্রিলা লিখেছে, 'কাল সন্ধের পর আবার এসেছিল ও, খুব করে চাইছিল, আমি কিন্তু আজও ফিরিয়ে দিয়েছি।' অথবা 'ও যে বারবার আসে, চায়, আমার খুব বিশ্রী লাগে।' কিংবা 'আমি ওকে কতবার ফেরাতে পারি। একজন পুরুষমানুষ, এভাবে কাকুতিমিনতি করে, দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি জানি এটা ভাল নয়।'

বারবার, অনেকবার পড়েও উদ্ধার করতে পারেনি, গার্গী, এই পুরুষটি আসলে কে। সে কি রবার্ট ও-নীল, না কি হিমন, অথবা অন্য কেউ! প্রথম পুরুষটি যদি রৌণক মুখার্জি হয়, তাহলে দ্বিতীয় পুরুষটি কোনজন? কেনই বা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল ঐন্দ্রিলা!

কাল সন্ধের পর দুর্দান্ত সাহসে ভর করে হিমনকে প্রায় গিলোটিনের নীচে দাঁড় করিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়ে জানতে চেয়েছিল, ঐন্দ্রিলার এই অপর পুরুষটি সে-ই কি না। হিমন বিভ্রান্তের মতো ঘাড় নেড়েছে। সে মাঝে-মধ্যে ঐন্দ্রিলার কাছে গিয়ে থাকলেও তার সঙ্গে এমন কোনও অবৈধ সম্পর্ক ছিল না।

আরও অনেক কথাই হিমনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে গার্গী, তার মা চন্দ্রাবতী কিংবা

রবার্ট ও নীল সম্পর্কে অনেক তথ্য, অথবা দীয়া তার সঙ্গে কেনই বা থাকে না, সে কেন 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ প্রায়ই যেত সন্ধের পর, হঠাৎ দীয়াকে ছেড়ে কেন মিস লিজার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার, এমন হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে যেমন জেরবার হয়ে গিয়েছিল হিমন, তেমনই সন্ত্রস্ত।

আর সেই মুহূর্তে গার্গীর মনে হয়েছিল, তাহলে ঠিকই বলেছিল দীয়া, এহেন পুরুষের সঙ্গে বেশিদিন ঘর করা যায় না।

আজ অফিসের চেম্বারে বসে খুবই একটা জরুরি ফাইল খুলে যতবার গার্গী মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিল, ততবারই হিমনের কথাগুলি তোলপাড় করছিল তার ভেতরে। মনে হচ্ছিল, একটি অগ্নিস্তূপের ভেতর সে বাস করছে এতদিন, শুধু পুড়ে ভস্ম হয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা।

ভাবতে ভাবতে ফাইলে দু-লাইন লিখেছে কি লেখেনি, হঠাৎ তার চেম্বারের সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল সায়ন, এম ডি সাহেবা খুব ব্যস্ত আছেন মনে হচ্ছে।

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ল গার্গী, চেয়ারম্যান চেম্বারে ঢুকলে যেরকম দাঁড়াতে হয়, হেসে বলল, আপনি ডেকে পাঠাতে পারতেন, স্যার। কষ্ট করে আমার চেম্বারে আসার দরকার হত না।

টেবিলের ওপাশে একগুচ্ছ চেয়ারের একখানা টেনে নিয়ে বসতে বসতে সায়ন বলল, খুব ভাল খবর আছে, গার্গী। জেসমিন ফ্লেভার হু-হু করে মার্কেট ধরে নিয়েছে। যে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছেই যাই, সর্বত্র জুঁইফুলের গন্ধ। এরপর মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রোডাকশন শুরু হলেই দেখবে, প্যারাডাইস কোথায় উঠে গিয়েছে।

হাসি ছড়িয়ে পড়ল গার্গীর মুখে, সেজন্যেই চেয়ারম্যানসাহেবকে আজ এত রিল্যাক্সড্ মনে হচ্ছে।

—মোটেই রিল্যাক্সড্ নই গার্গী, ভুবনেশ্বরের টিকিট কাটা রয়েছে আজ রাতের ট্রেনে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। ভাবছি, টিকিটটা ক্যানসেল করে দিই।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, কেন?

—ফ্ল্যাটে তোমাকে একলা রেখে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। এতসব বিপদ যখন আসছে চারদিক থেকে—

--উঁহু। গার্গী আশ্বস্ত করে সায়নকে, তুমি নিশ্চিন্তমনে ঘুরে এসো, গার্গী চৌধুরী মোটেই অবলা নারী নয়। সে ক্যারাটে জানে। জুজুৎসুর দু-চারটে প্যাঁচও শিখেছিল কলেজে পড়াকালীন। অতএব চট করে কাবু হয়ে যাওয়ার পাত্রী সে নয়।

খুবই নির্লিপ্তির সঙ্গে গার্গী কথাগুলো সায়নকে শোনালেও আজ সকাল থেকে একটা প্রবল টেনশন তার ভেতর চাবিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বেশ কয়েকদিন আগে ভুবনেশ্বর যাওয়ার টিকিট কেটেছিল সায়ন, অতএব তার যাওয়ার একটা প্রস্তুতি ছিলই কদিন ধরে, কিন্তু সেই যাত্রার দিনক্ষণ যে এত দ্রুত পৌঁছে যাবে, যেন এখন আর বিশ্বাসই হচ্ছে না। তবু তার উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, চাপা ভয় সে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখতে চাইল সায়নের কাছে।

—হুঁ, আর একটা খবর আছে, কৌশিক দত্ত লাইম ইন্ডিয়ায় জয়েন করেছে তো বোধহয়

জানো। আজ মধুমন্তীও আমাকে জানিয়েছে সেও ওখানে যাচ্ছে।

—তাই! খবরটা প্রায় জানাই ছিল গার্গীর, তবু যেন আশ্চর্য হল। কিছু না বলে সে অপেক্ষা করল সায়নের পরবর্তী সংলাপের জন্য।

—রাহুল রায় আমাকে কাল ফোন করেছিল, সে একবার দেখা করতে চায়।

—তাই! গার্গী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সায়নের দিকে, তারপর আস্তে করে বলল, এলে সোজা আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দিয়ো।

—কালীজীবনবাবু খুবই ধরেছেন যাতে ওকে আমাদের কোম্পানিতে নিয়ে নেওয়া হয়।

গার্গী গম্ভীরস্বরে বলল, আগে তো তার সঙ্গে কথা বলি, তারপর ভেবে দেখব নেওয়া যায় কি না।

সায়ন তার চেম্বার থেকে উঠে যাওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রাহুল রায়ের স্লিপ পেল গার্গী। ভেতরে ডেকে পাঠাতেই যিনি প্রবেশ করলেন, সেই মাঝারি উচ্চতার শ্যামবর্ণ লোকটিকে এ কদিনে প্রায় চেনাই হয়ে গেছে তার। রাহুল রায় হাসি-হাসি মুখে চেয়ারে বসেই বললেন, চেয়ারম্যানসাহেবের ঘরে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, এম ডি-ই আপনার ইন্টারভিউ নেবেন।

—ইন্টারভিউ! গার্গী হাসল, লাইম ইন্ডিয়ায় এতদিনের অভিজ্ঞতা আপনার। আপনাকে আর কী ইন্টারভিউ নেব? আসলে কদিন ধরে আপনার সম্পর্কে এত শুনেছি। ভাবলাম মানুষটার সঙ্গে একবার আলাপ করা যাক। এমনকি মিঃ চৌধুরীও কদিন ধরে আপনার প্রশংসা করে চলেছেন।

—তাই? রাহুল রায় একটু শব্দ করে হাসলেন, ইটস ভেরি গুড অব হিম। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অতখানি প্রশংসার যোগ্য আমি নই। যাই হোক, কিন্তু কী শুনেছেন আমার সম্পর্কে!

—শুনেছি, ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের সঙ্গে আপনার খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল, তাদের উপর আপনার যথেষ্ট হোল্ড্, অফিসার হিসেবে আপনি যথেষ্ট নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী, এমনকি সেদিন মিঃ চৌধুরী প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে ঘেরাও হয়ে থাকার সময় আপনি নাকি ভাল বক্তৃতাটক্তৃতা করে ক্ষিপ্ত মব্‌কে কন্ট্রোল করে ফেলেছিলেন—

—থাক, থাক, রাহুল রায় লজ্জিত হয়ে পড়লেন যেন, আপনি আমার সম্পর্কে এত সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললেন যে অস্বস্তি হচ্ছে শুনতে।

গার্গী হেসে বলল, বড় মানুষদের স্বভাবই এই যে, তাঁরা নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করেন না। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান কেন আপনাকে পছন্দ করলেন না।

—সেটা আমার ব্যাড্‌লাক, ম্যাডাম। আমার তৈরি প্রোডাক্ট কোনও দিনই খুশি করতে পারেনি ওঁকে। শেষ পর্যন্ত বুঝলাম ওখানে আর চাকরি করা যাবে না।

— তাইই বুঝি নতুন একটা ফ্যাক্টরি খুলতে চাইছিলেন মিঃ রায়?

রাহুল রায় সামান্য চমকে উঠে বলল, আপনি কী করে জানলেন?

গার্গী হেসে বলল, জেনেছি। জায়গাটা কিন্তু ভালই বেছেছেন। ইস্টার্ন বাই পাসের ওদিকটায় দারুণ ফ্যাক্টরি হবে। তা কত পড়ল জমিটা কিনতে?

রাহুল রায় বেশ আশ্চর্যই হলেন, এতসব খবর কী করে জানলেন, ম্যাডাম?

—জানতে হয়, মিঃ রায়। এত বড় একটা সাবানের ফাক্টরি তৈরি হতে চলেছে, তার খবর বাতাসে অমনি ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া প্যারাডাইসের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি কনসার্নের খবর তো প্যারাডাইসের এম. ডি.র কানে পৌঁছবেই।

রাহুল রায় অবাক হয়ে বললেন, প্রতিদ্বন্দ্বী কনসার্ন! কী বলছেন আপনি ম্যাডাম? প্যারাডাইস এখন কত উঁচুতে পৌঁছে গেছে! লাইম ইন্ডিয়ার মতো পুরনো কনসার্নও তার দাপটে খাবি খাচ্ছে এখন। তার পাশে এই নতুন কোম্পানির কোনও তুলনাই হয় না। তা ছাড়া, ফ্যাক্টরি আর হল না শেষ পর্যন্ত।

আশ্চর্য হয়ে গার্গী বলল কেন?

—সে কাহিনী আর নাই বা শুনলেন, ম্যাডাম।

—সে কী! এতদূর এগিয়ে এখন বলছেন, ফ্যাক্টরি হবে না? লাইসেন্সও নাকি পেয়ে গেছেন?

—আসলে কি জানেন, ম্যাডাম, সায়ন চৌধুরী যে সব প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাচার করেছেন, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পেরে উঠব না বুঝতে পেরেই আইডিয়াটা শেষ পর্যন্ত ড্রপ্ করে দিচ্ছি। বরং প্যারাডাইসের সায়ন চৌধুরীর কাছে কাজ করাই সবচেয়ে নিরাপদ।

—জমিটা কত পড়ল কিনতে?

কিছুটা ইতস্তত করে রাহুল রায় বললেন, তা প্রায় আট লাখের মতো।

—আট লাখ!

গার্গী বিস্মিত হল, তার সঙ্গে এদিক ওদিক করে আরও অন্তত লাখদুয়েক খরচ হয়েছে নিশ্চয়ই? এত টাকা ইনভেস্ট করার পর এখন পিছিয়ে আসতে চাইছেন?

রাহুল রায় ম্লান হাসলেন. কিছু করার নেই, ম্যাডাম। জমিটা বরং বিক্রি করে দেওয়া যাবে। কিন্তু এরপর আরও কয়েক লাখ খরচ করে একটা লুজিং কনসার্ন ফেঁদে বসে মার খাওয়ার কোন মানে হয় না।

গার্গী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাহুল রায়ের দিকে, তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, আপনি নাকি খুবই গ্রহনক্ষত্রে বিশ্বাস করেন, মিঃ রায়?

রাহুল রায় অবাক হলেন. এসব খবর আবার কোত্থেকে জোগাড় করলেন, ম্যাডাম? নিশ্চয় রৌণক মুখার্জি বলেছে?

গার্গী হাসল. আপনি তো অনেকরকম পাথর ধারণ করেছেন দেখছি। একসময় এ-ব্যাপারে আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল। কতরকম পাথর আছে, কার কী গুণ, কখন কোন গ্রহ বক্রী হলে কী পাথর ধারণ করতে হয়, খুব জানতে ইচ্ছে করে আমার।

রাহুল রায় খুবই উৎসাহিত হলেন, আসলে পাথর নয় এগুলো, রত্ন। নবরত্ন সম্পর্কে একটা শ্লোক. আছে—

মণিমাণিক্য বৈদুর্য গোমেদা বজ্রবিদ্রুমৌ।

পদ্মরাগাবে মরকতং নীলশ্চেতি যথাক্রমম্।।

গার্গী সন্ত্রস্ত হয়ে বলল. দাঁড়ান, দাঁড়ান, এতসব শক্ত শক্ত শ্লোক বললে আমার সমস্ত গুলিয়ে যাবে! আমি বরং দেখছি আপনার আঙুলে কোনওটা লাল, কোনওটা নীল, কোনওটা

ভালের চোখের মতো রং কোনওটা—

গার্গীর অজ্ঞতায় খুবই কৌতুক অনুভব করলেন রাহুল রায়। বৈদুর্য,গোমেদ, প্রবাল ইত্যাদি রত্নের রং, গুণাগুণ বোঝাতে শুরু করতেই গার্গী হঠাৎ বলল, কত রঙের কথাই তো বললেন, বেগুনিরঙের রত্ন হয় না?

রাহুল ঘাড় নাড়লেন, না।

—কিন্তু জানেন, আমার কাছে একটা বেগুনিরঙের রত্ন আছে, আমার খুব ইচ্ছে, ওটা দিয়ে একটি আংটি বানব।

রাহুল রায় একটু গম্ভীর হলেন, ওটা বোধহয় রত্ন নয়, পাথর।

—তাই! গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কদিন আগে আপনি একটা বেগুনিরঙের পাথর খুঁজছিলেন কেন?

রাহুল রায় সচকিত হলেন, কে বলল আপনাকে?

—সেদিন রৌণক মুখার্জির বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানেই শুনলাম। ওঁরাই বলছিলেন—

রাহুল রায় হেসে উঠলেন শব্দ করে, ওঁরা নিশ্চয়ই ভুল করেছিলেন, আমি যা খুঁজছিলাম, তা হল একটা ভাল নীলা, বলে তার আঙুলে পরা গাঢ়নীল রঙের পাথরটা দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন, এটা নীলা। নীলা যদি কারও সহ্য হয়ে যায় তাহলে সে রাজা হয়ে যাবে, আর সহ্য না হলে ভিখারি। তার আচমকা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। হয় এসপার, নয় ওসপার।

গার্গী একটু হেসে বলল, তা আপনার সহ্য হল?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে খারাপও কিছু যখন এ পর্যন্ত হয়নি —, বলে রাহুল রায় হাসলেন, এখন আপনি যদি প্যারাডাইসে একটা কাজের সুযোগ করে দেন তাহলে নিশ্চয় ভাল সময় আসবে।

গার্গী আবার তাকাল রাহুল রায়ের চোখের দিকে, সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে তো আলাপ হল। আজ রাতে মিঃ চৌধুরী ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন, দু-তিনদিন পরে ফিরবেন। উনি ফিরে এলেই আমরা একটা ডিসিশন নিয়ে নেব।

রাহুল রায় আশ্চর্য হয়ে বললেন, মিঃ চৌধুরী ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন নাকি? কাল তো অনেকক্ষণ টেলিফোনে কথা হল ওঁর সঙ্গে। কই, কিছু বললেন না তো—

—আসলে ওঁর যাওয়ার ব্যাপারটা অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, ওঁর ভাই হিমন হঠাৎ কয়েকদিন আগে নিরুদ্দেশ হয়। পুলিশ সন্দেহ করেছিল, হয়তো এর পেছনে সায়ন চৌধুরীর কোনও ভূমিকা আছে। পুলিশ ইনস্পেক্টর ফোন করে বলেছিলেন এখন মিঃ চৌধুরী যেন বাইরে না যান, বলে গার্গী থামল একমুহূর্ত, আপনি কি হিমনকে চেনেন? হিমন বা দীয়া, ওদের কাউকে?

রাহুল রায় ঘাড় নাড়লেন। না। তবে খবরের কাগজে ওঁদের নাম দেখেছি। তা, এখন কি পুলিশ পারমিশন দিল?

—হ্যাঁ। কাল রাতে হিমন ফিরে আসায়—

রাহুল রায় যেন চমকে উঠলেন, হিমন চৌধুরী ফিরে এসেছে নাকি?

গার্গী নিখুঁতভাবে লক্ষ করল রাহুল রায়ের চমকানি, তারপর হঠাৎই জিজ্ঞাসা করে বসল,

লোটন যেদিন খুন হয়, তার পরদিন অত সকালে ভি আই পি রোডে কী করে পৌঁছে গেলেন, মিঃ রায়? আপনি তো থাকেন টালিগঞ্জের নেতাজীনগরে—

রাহুল রায় ঠিক এ ধরনের প্রশ্ন আশা করেননি যেন, থমকে গিয়ে বললেন, আসলে লোটনের বাড়ি মাঝেমধ্যে আমি যেতাম। লোটন খুন হয়েছে আগের রাতে তা জানতাম না। হঠাৎ গিয়ে শুনি এরকম একটা দুর্ঘটনা।

—তাই? লোটনের সঙ্গে তাহলে খুবই ইন্টিমেসি ছিল আপনার? না হলে লাইম ইন্ডিয়ার চাকরি চলে যাওয়ার পরও লাইম ইন্ডিয়ার একজন কর্মচারীর বাড়িতে প্রায়ই যেতেন—

রাহুল রায় খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, আসলে তখন তো আমি ফ্যাক্টরিটা শুরু করব বলে ঠিক করেছিলাম। লোটন ওয়াজ আ গুড সুপারভাইজার। ওকে আমার ফ্যাক্টরিতে চাকরি দেব ঠিক করেছিলাম। সেজন্যই ওকে দরকার ছিল আমার।

—তাই? গার্গী এবার হাসল, কিছুটা রিল্যাক্সড্ ভঙ্গিতেই, ঠিক আছে, মিঃ রায়। তাহলে মিঃ চৌধুরী ভুবনেশ্বর থেকে ফিরলেই—

রাহুল রায় চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গী কিছুক্ষণ নিজের মনে হাসল। কিছু উলটোপালটা প্রশ্ন করে বেশ বিপাকে ফেলেছিল রাহুল রায়কে। ইচ্ছে ছিল আরও অনেকক্ষণ খেলানোর, কিন্তু বিকেল হয়ে আসছে, সায়ন বাড়ি ফিরেই আবার বেরিয়ে পড়বে জগন্নাথ এক্সপ্রেস ধরতে। মাত্র দুরাত্রি থাকবে না সায়ন। দুরাত্রি দুদিন। অথচ সেই দুটো রাত্রিই ক্রমশ পাথর হয়ে চেপে বসছে তার বুকে। যত সন্ধে এগিয়ে আসছে, ততই টেনশনে অবশ হয়ে আসছে তার শরীর। তার ভেতরে ভর করছে এক অদ্ভুত দুশ্চিন্তা, ভয়, উৎকণ্ঠা। কেবলই মনে হচ্ছে, যাই, আলোদার বাসাতেই না হয় থেকে যাই দুরাত্রি। নইলে গভীর রাত্রে কেউ হয়তো এসে কলিং বেল বাজাবে তার দরজায়, বলবে, দরজা খোলো—

সাড়ে চারটেয় বাড়ি ফিরে প্রস্তুত হয়ে আবার ছটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা। ঠিক সন্ধে সাতটায় জগন্নাথ এক্সপ্রেস। যাওয়ার সময় নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে গেল সায়ন। স্ট্র্যান্ড রোডের জ্যামজট কাটিয়ে হাওড়া ব্রিজের ওপর খারাপ হয়ে যাওয়া একটি ট্রামের হার্ডল্ পেরিয়ে ঠিক পৌনে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেল স্টেশনে। তখনও সায়ন বারবার বলছিল, তোমাকে একলা রেখে যেতে খুবই টেনশন হচ্ছে, গার্গী। কিন্তু গার্গী প্রতিবারই বলেছে, নো টেনশন প্লিজ। ডেল কার্নেগির উপদেশগুলো মাঝেমধ্যে আউড়ে নিয়ো। দেখবে সব টেনশন কেটে যাবে। তোমাকে ছাড়াই যখন এতকাল বেঁচে-বত্তে, ছিলাম এ যাত্রাও থাকব আশা করি।

প্রায় বীরাঙ্গনার মতো প্রবল সাহস দেখিয়ে সায়নকে ট্রেনে তুলে দিল গার্গী। তীব্র হুইস্‌ল বাজিয়ে প্ল্যাটফর্ম দাপিয়ে জগন্নাথ এক্সপ্রেস ছেড়ে যেতেই সহসা তার বুকের ভেতরটা একদম হালকা হয়ে গেল। এতক্ষণ সায়ন ছিল বলে বুঝতেই পারেনি কী বিপুল ঝুঁকি নিয়েছে সে। এখন শিরশির করে উঠছে তার সারা শরীর। হাঁটুদুটো অল্প-অল্প কাঁপতে শুরু করেছে। তবু জোর করে নিজেকে শক্ত করে তুলতে চাইল। এখনই যদি এতটা নার্ভাস হয়ে পড়ে, তাহলে হাওড়া থেকে শরৎ বসু রোড, এতখানি পথ ড্রাইভ করে ফিরবে কী করে! তারপর সারাটা রাত তো পড়েই আছে।

দ্রুত ড্রাইভ করে হাওড়া ব্রিজ পেরোতে পেরোতে আলো ঝলমল গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখল সে। চমৎকার একরাশ দৃশ্যের দিকে নিজেকে সমর্পণ করে ভেতরে উথলে-দিয়ে ওঠা উত্তেজনা কমাতে চাইল। এক দঙ্গল জাহাজের মাস্তুল, তার ডেক, নৌকোর লণ্ঠন — সবকিছু নজরে পড়তেই সহসা উদাস হয়ে গেল কয়েক লহমা। দৃশ্যগুলো রোজ একইরকম দেখতে লাগে ব্রিজের ওপর থেকে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, প্রতিদিনই তাদের চরিত্রের অদলবদল ঘটে যাচ্ছে। কাল যে-সব নৌকো এখানে ছিল, তাদের অধিকাংশই আজ নেই, এসে পৌঁছেছে অন্য নৌকো, অন্য মাঝি মাল্লারা। যে জাহাজ কাল এখানে ছিল, চলে যাওয়ার মুহূর্ত গুনছিল তার নাবিকেরা, আজ সকালেই হয়তো তারা যাত্রা শুরু করেছে অন্য বন্দরের উদ্দেশে, হয়তো এতক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে স্যান্ডহেডের কাছাকাছি। যারা এখনও নোঙর করে আছে, হয়তো কাল, কিংবা পরশু, তারাও চলে যাবে। এসে পৌঁছবে অন্য জাহাজ, অন্য নাবিক, অন্য খালাসিরা। দৃশ্য প্রতিদিনই এক, কিন্তু চরিত্র বদল হয়ে যাচ্ছে অবিরত, অবিশ্রান্তভাবে।

সব কিছুই বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। বদলে যাচ্ছে কলকাতার অনেককিছুই। বদলে যাচ্ছে গোটা পৃথিবীর ইতিহাস। গার্গী নিজেও কি কম বদলেছে এ'কদিনে! তার ভূমিকা এতদিন ছিল গার্গী মুখার্জির। তার বাড়ির পরিবেশ, পটভূমিও বদলে গেছে। বদলে গেছে তার চাকুরিস্থলের পটভূমিকা। এ গার্গী এখন নিজেকেই চিনতে পারে না ঠিক। আজ রাতেও হয়তো তাকে দেখা দিতে হবে অন্য এক ভূমিকায়! ব্রেবোর্ন রোড পার হয়ে দ্রুত ক্রশ করে গেল বিবাদি বাগের জনবহুল এলাকা। রেড রোড় দিয়ে হু হু করে ছুটে চলল রেসকোর্সের দিকে। বাঁয়ে বাঁক নিয়ে রবীন্দ্রসদন, ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়। পরক্ষণেই ডানদিকে ঢুকে পড়ল শরৎ বসু রোডের প্রশস্ত রাস্তায়।

যতই তার ফ্ল্যাটের দিকে এগুচ্ছে, ততই এক অজানা, অদ্ভুত আশঙ্কা ঘিরে ধরছে তার উৎকণ্ঠিত শরীর। এই তো কদিন আগে ঐন্দ্রিলাও ঠিক এভাবেই একলা একা রাত কাটিয়েছিল তাদের ফ্ল্যাটে। নরম স্বভাবের মেয়েটির জীবনে হঠাৎ কী এমন ঘটেছিল যে তার জীবনটা আহুতি দিতে হল একরাশ হিংস্র দাঁতনখের সামনে!

সেই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ তার ডানপায়ের পাতা শক্ত হয়ে চেপে ধরল ব্রেক। অন্যমনস্কতার ভেতর কখন যে সে এসে পৌঁছেছে ব্লু-ওয়াডাবের সামনে তা খেয়ালই করেনি। এমন সম্বিতহীনতার ভেতর কী একটা রিফ্লেক্স যেন কাজ করে। সেই রিফ্লেক্সই জানান দেয়, তোমার বাড়ির গেট পার হয়ে যাচ্ছে, এক্ষুনি ব্রেকে পা দাও।

গেট খুলে লনে গাড়ি ঢোকানোর মুহূর্তে হঠাৎই তার মনে হল, দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া মানুষ। জায়গাটা সামান্য অন্ধকার। দুজনে গাছের আড়াল খুঁজে নিয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভবত। দৃশ্যটা নজরে পড়তেই বুকের ভেতরে ছাঁত করে উঠল তার।

আজ অবশ্য লোডশেডিং নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও তবু তার শরীরটা শিরশির করছে। ঘড়িতে প্রায় আটটার মতো। ফ্ল্যাটে ঢুকে আলো জ্বালতেই একটু সাহস যেন ভর করে এল মনে। দরজা বন্ধ করার আগে গোটা বাড়িটার একোণ-ওকোণ, খাটের তলা, কিচেন সবই দেখে নিল তন্নতন্ন করে। নিঃসংশয় হতেই দরজা বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ দেখল সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে উঠে আসছে দীয়া।

—আরো দীয়া, তুমি?

দীয়া অবাক হল, বা রে, তোমার সঙ্গে তো রাতে থাকার কথা ছিল আজ।

গার্গীও বিস্মিত হল কম নয়, সে কী! তোমার মনে ছিল সে কথা! কতদিন আগে তো কথা হয়েছিল।

—বা রে, মনে থাকবে না? এ বাড়িতে একলা থাকবে তুমি। আমি তো ভেবেই মরছি রাতে কী না কী হতে পারে হয়তো—

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে গার্গীর। দীয়ার চোখ মুখেও সেই ভয়ত্রস্ততা। কিন্তু কীসের এত ভয় দীয়ার? হিমনের জন্য? চন্দ্রাদেবী কিংবা রবার্ট ও নীলের জন্য? নাকি আরও ভয়াল কিছু অদৃশ্য হয়ে আছে এ বাড়িতে, যা গার্গী এখনও জানে না! যে ভয়ালের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে ঐন্দ্রিলাকে, বাড়ি ছাড়তে হয়েছে দীয়াকে, বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েও যে দীয়া এখনও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে সর্বদা। কিন্তু কে সেই অদৃশ্য ঘাতক। যে-একজোড়া চোখ সবসময় ও-ফ্ল্যাটের জাফরি থেকে অনুসরণ করে চলেছে, সে-ই কি? সেদিন সন্ধের পর লোডশেডিং হতেই যে জড়িয়ে ধরেছিল গার্গীকে সে-ই কি?

গার্গী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন, আঃ, তুমি এসে বাচালে আমাকে। যা ভয় করছিল এতক্ষণ।

দীয়ার গলা হঠাৎ কেমন ফ্যাসফেসে শোনায়, বুঝলে এ বাড়িতে রাত কাটাতে এখনও এত ভয় করে আমার। শুধু তোমার জন্যেই আবার—

সবে পোশাক টোশাক বদলে একটু আটপৌরে হতে যাবে তারা, হঠাৎ টেলিফোনে শুরু হয়ে গেল পিঁকপিঁকাপিপ শব্দ। এরকম সময়ে কে টেলিফোন করতে পারে বুঝে উঠতে পারল না গার্গী, রিসিভার তুলতেই শুনল, ম্যাডাম, আমি এতওয়ারি বলছি—

—কী হয়েছে এতওয়ারি?

অতঃপর রিসিভারের ভেতর দিয়ে যা শুনল গার্গী, তাতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার। ফ্যাক্টরির ভেতরে হঠাৎই বিশাল এক শব্দ হয়েছে। মেশিনের একদিকে জ্বলে উঠেছে আগুন। চারদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়া। এক্ষুনি একবার যেতে হবে গার্গীকে।

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল গার্গীর। সায়ন বাড়িতে নেই, দীয়া সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে, এহেন সময়ে সে এখন বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে কীভাবে যাবে ফ্যাক্টরিতে!

—আগুন কি এখনও জ্বলছে, এতওয়ারি।

—না ম্যাডাম, আগুন নিভে গেছে। শুধু চারদিকে ধোঁয়া।

গার্গীর গায়ে তখন ঘাম ফুটে উঠছে বিন্দু বিন্দু। আগুন নিভে গেলে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। কতখানি ড্যামেজ হয়েছে ফ্যাক্টরিতে সেটা দেখতে যাওয়াই এখন জরুরি। তাদের কোনও প্রোডাকশন ম্যানেজারও নেই যে তাকে ফোন করে যেতে বলবে এক্ষুনি। সায়নের প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও বাহুল রায়কে এখনও প্যারাডাইসে যোগ দিতে দেয়নি সে। সায়ন ফিরে এসে নিশ্চয় তাকেই দোষারোপ করবে।

তাহলে এখন কী করা উচিত তার? সে কি এক্ষুনি ছুটে যাবে ফ্যাক্টরিতে! যাওয়ার পথে তুলে নিয়ে যাবে ওয়ার্কস ম্যানেজার বরুণ নন্দীকে? এত রাতে তারা গিয়ে কিছু কি করতে পারবে?

কিন্তু তাকে তো যেতেই হবে। দীয়াকে এই বাড়িতে একলা রেখে—

আরও একবার ফ্যাক্টরির প্ল্যান্ট বার্স্ট করেছে শুনে গার্গী স্থাণু হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। সাময়িক বিড়ম্বনা কাটিয়ে ক্রমশ একরাশ ক্রোধ ধক ধক করে উঠল তার দু-চোখে। সায়ন ট্যুরে বেরিয়ে গেছে জানতে পেরেই সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি আবার দাঁত নখ নিয়ে হামলা করেছে তাদের ওপর। একা, অসহায় গার্গী এখন কীভাবে মোকাবিলা করবে তাদের সঙ্গে ! তারা নিশ্চয়ই একা নয়। দীয়া ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, কী হয়েছে?

—একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটেছে ফ্যাক্টরিতে। এক্ষুনি যেতে হবে বলছে।

—তাই! দীয়াও ঘাবড়ে গেল, তাহলে এক্ষুনি যাও। ব্যাপারটা যখন এতই সিরিয়াস।

—কিন্তু তোমাকে একা রেখে যাই কী করে? সবে প্রথম দিন এসেছ আমার এখানে, একবার বেরুলে হয়তো ফিরতেই পারলাম না সারারাত।

—তা আর কী করা যাবে। আমার তো একা থাকাই অব্যেস। ওদের ফ্ল্যাটেও বরাবর একা শুয়েছি, এখন যেখানে থাকি, সেখানেও একা, না হয় আজও একা থাকব। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনার সংবাদ শোনার পর তোমার পক্ষে চুপ করে থাকা তো সম্ভব নয়।

—এ বাড়িতে তোমার একা থাকতে ভয় করবে না?

—হয়তো করবে। কিন্তু আপাতত করারও তো কিছু নেই।

—তুমিও আমার সঙ্গে চলো না।

দীয়া ভয়ত্রস্ত চোখে তাকাল, নাহ্, অত ঝামেলার মধ্যে যেতে আমার ভয় করে। ওসব তোমার মতো শক্ত মেয়ের পক্ষেই মানায়। আমি ভীষণ ভিতু।

—তা হলে বলছ, যাব?

—যাও।

ঠিক সেই মুহূর্তে আরও একবার ফোন বেজে উঠল তাদের ঘরে। উদ্‌ভ্রান্ত গার্গী আবারও দ্রুত রিসিভার তুলতেই ওদিকে কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রের গলা। সায়ন ঠিকমতো রওনা হয়ে গেছেন কি না জেনে নিয়ে ম্যাডামের খোঁজখবর নিতে লাগলেন নম্র কণ্ঠস্বরে। চেয়ারম্যানসাহেব বেরুবার আগে তাঁকে ম্যাডামের খোঁজ খবর নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁর ফোন পেতেই হঠাৎ খড়কুটো পেয়ে গেল গার্গী। খড়কুটো নয়, হাতে স্বর্গই যেন বা। তৎক্ষণাৎ বলল, মিঃ মিত্র, ফ্যাক্টরি থেকে একটা খারাপ খবর এসেছে এই মাত্র। আগুন ধরে গিয়েছিল প্ল্যান্টে। এখনও ধোঁয়ায় ভরে আছে ফ্যাক্টরি। আপনি এক্ষুনি একবার ফ্যাক্টরিতে যান। তেমন দরকার হলে আমাকে ফোন করবেন ওখান থেকে।

রোহিতাশ্ব মিত্রও ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন, ব্যস্ত হয়ে বললেন, তাই নাকি! কী ভয়ানক খবর! আমি এখনই যাচ্ছি। আপনি বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না, ম্যাডাম। সমস্ত পরিস্থিতি দেখে শুনে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফোন করব আপনাকে।

এত বড় খবরটা শোনার পরও গার্গী নিজে গেল না, অন্য অফিসারকে স্পটে পাঠাল, দেখে ঠিক যেন সন্তুষ্ট হল না দীয়া। বলল, বরং একবার ঘুরে এলেই পারতে—

গার্গী তাকাল দীয়ার দিকে, দরকার হলে নিশ্চয়ই যাব। মিঃ মিত্রের ফোন পেলেই—

—তা হলে বরং একটু চা করি। আমার যা টেনশন হচ্ছে—

গার্গী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হল, দাঁড়াও, আমিই করছি। চা করতে গিয়ে তবু কিছুটা টেনশন কাটানো যাবে।

দ্রুত দু কাপ চা করে এনে তাতে চুমুক দিয়ে ভেতরের উত্তেজনা কমাতে চাইল। দীয়ার দিকেও তাকাল কয়েবার। এর আগে যে-কবার দেখেছে, কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছে দীয়াকে। আজও তার ঠোঁটে লিপস্টিক, কানে ঝলমল করছে পুঁতি বসানো দুল। নতুন ধরনের কপালে আধখানা চাঁদের মতো টিপ। বেশ সাজগোজের বাহার আছে তার। পরনের শাড়িটিও খুব দামি। এমনকি চোখের পাতায় আইশ্যাডোও।

প্রায় মিনিট পঁয়ত্রিশেক পর ফ্যাক্টরি থেকে ফোন এল রোহিতাশ্ব মিত্রের, হুড়মুড় করে উঠে গিয়ে ফোনটা ধরতেই গার্গী শুনল, কই ম্যাডাম, কোনও দুর্ঘটনাই তো ঘটেনি এখানে! এত্ওয়ারি ঘুমচ্ছিল, ডাকাডাকি করতেই উঠে এসে বলল, সে কোনও ফোন করেনি আপনাকে।

—সে কী! গার্গী স্তম্ভিত হল। প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে বলল, স্যরি, মিঃ মিত্র। তাহলে ভুতুড়ে ফোনই হবে, আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করার জন্য খুবই লজ্জিত হচ্ছি।

—না, না, ম্যাডাম। বরং এ রকম কোনও খবরের জন্য আমাদের তো প্রস্তুত থাকতেই হবে। ও কে, ম্যাডাম। গুড নাইট।

রিসিভার রেখে প্রবল এক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেল গার্গী। কিন্তু সে এখনও বুঝে উঠতে পারছে না, ভুতুড়ে ফোনের কণ্ঠস্বরটি তাহলে কার! গলাটা কি তার চেনা চেনা মনে হল? এত্ওয়ারির গলা নকল করে কে এত রাতে তাকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে যেতে চাইছিল ফ্যাক্টরির দিকে? ফ্যাক্টরিতে গেলে তাকেও কি লোটনের মতো—

কিছু আর ভাবতে পারল না সে। এমনিতেই সায়ন চলে যেতে ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তার ওপর হঠাৎ এ রকম ভয়ঙ্কর ফোন তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলল দ্বিগুণ আতঙ্কে। বুঝতে পারছে না, আজ রাতে তার সামনে আরও কী বীভৎস সময় ঘনিয়ে আসছে।

দীয়াও হাঁপ ছেড়ে বলল, কিন্তু কে এমন মিথ্যে খবরটা দিল বলো তো?

—সেটা তো আমিও ভাবছি। বলতে বলতে উঠে পড়ল গার্গী। তার সামনে এখন অনেক গার্হস্থ্য ঝামেলা। ফ্রিজে যা খাবার আছে, তাতে তার একার পক্ষে যথেষ্ট হলেও দীয়ার হবে না। অতএব এই মুহূর্তে তাকে কিচেনে ঢুকে পরিপাটি করে রাঁধতে হবে অনেক কিছু। তা ছাড়া আছে আরও টুকিটাকি তেত্রিশ রকম গৃহস্থালি।

তার এত সব কাজে ব্যস্ত থাকার সময় দীয়া উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল এ-ঘর ও-ঘর। সায়নের বইয়ের আলমারির সামনেও দাঁড়াল কিছুক্ষণ। কিছুটা সময় কাটাল সায়ন আর ঐন্দ্রিলার ফটোটির সামনে। কী যেন দেখল খুবই গভীর পর্যবেক্ষণে। তারপর হঠাৎ গার্গীকে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ চৌধুরী খুব পড়াশুনো করেন, তাই না?

—হ্যাঁ, করতেই তো হয়।

—আচ্ছা, এই যে এত সব প্রোডাক্ট তৈরি হয় প্যারাডাইসের, সবই ওঁর তৈরি?

গার্গী আবার মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

—এই যে নতুন একটা সাবান বেরুল, সেটাও!

—হ্যাঁ।

দীয়া হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল, আচ্ছা, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, কী ভাবে এ সব মাথা খাটিয়ে বার করেন।

—কেন, রিসার্চ করে।

—কোথায় রিসার্চ করেন?

—ল্যাবরেটরিরুমে।

—তোমাদের ওপাশে একটা ল্যাবরেটরিরুম আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, আছে।

—আচ্ছা, শুনছিলাম, আরও একটা নতুন কী ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন উনি। তাতে দারুণ একটা ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি হবে। মাইক্রোসিস্টেম না কী যেন। সেটা বেরুলে নাকি হই- হই পড়ে যাবে!

গার্গী হেসে ফেলে বলল, তুমি কোথেকে শুনলে? দীয়া ভাববার চেষ্টা করে বলল, শুনেছি কার কাছে যেন। সে রকম ডিটারজেন্ট পাউডার নাকি এখনও এ দেশে তৈরি করতে পারেনি কেউ। বড় বড় কোম্পানিও নাকি ডাউন খেয়ে যাবে!

গার্গী দীয়ার দিকে তাকাল, এত কিছু শুনে ফেলেছ?

দীয়া হঠাৎ বলল, ল্যাবরেটরি ঘরটা একটু দেখব? আমার এ সব খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

গার্গী একটু শক্ত হল, না। মিঃ চৌধুরী আমাকেও ও ঘরে ঢুকতে দেন না। ও ঘরটা ওঁর এক্সক্লাসিভ

—তাই? দীয়া হঠাৎ নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর বলল, রাতের রান্নাটা আমি করব?

গার্গী অবাক হয়ে মাথা নাড়ল, না, না। তুমি দু-একদিনের জন্য এসেছ, তুমি করবে কেন? দ্যাখো না, আমি কীরকম রান্না শিখেছি।

যতক্ষণ গার্গী কিচেন ব্যস্ত রইল, দীয়া কেবলই ঘুর ঘুর করতে লাগল এ-ঘরে ও-ঘরে। কখনও সায়নের আলমারির সামনে, কখনও ব্যালকনিতে, কখনও ল্যাবরেটরি ঘরের সামনেও। কিছুক্ষণ পর-পর ঢুঁ দিতে লাগল কিচেনেও। একবার এসে বলল, দারুণ গন্ধ বেরুচ্ছে কিন্তু, জোর খাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে।

গার্গী হাসল, দ্যাখো খেতে পার কি না—

দীয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তুমিও কখনও ল্যাবরেটরি ঘরে ঢোকনি?

—না।

—ঐন্দ্রিলাও বলত সেও কখনও ও-ঘরে ঢোকেনি। ঢুকতে নাকি মানা আছে?

—হ্যাঁ।

—কেন, কী আছে ও-ঘরে? তোমাদের কখনও জানতে ইচ্ছে হয়নি, কী আছে

ল্যাবরেটরি রুমে! কেনই বা মানা আছে!

গার্গী তাকাল দীয়ার দিকে, গম্ভীর হয়ে বলল, আমি যে জিনিসটা জানি না, বুঝব না, তা নিয়ে অহেতুক কৌতূহল আমার নেই।

দীয়া তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল।

রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে কাজ মিটিয়ে ফ্রি হতে হতে প্রায় পৌনে বারোটার মতো। যত রাত হয়ে আসছে, ততই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে গার্গী। শোয়ার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হতেই দীয়া বলে উঠল, আমাকে পাশের ঘরে বিছানা করে দিয়ো. আমি আবার কারুর সঙ্গে শুতে পারি না।

শেষ কথাটা খট্ করে কানে বাজল গার্গীর। যদিও সে নিজেও এতক্ষণ দ্বিধায় ছিল এ বিষয়ে, যে-বিছানায় সায়ন শোয় সেখানে দীয়ার শোয়ার ব্যবস্থা করতে একটুও সায় ছিল না তার, বরং ভেবেছিল বাইরের ঘরেই বিছানা করে নেবে দুজনের। এখন দীয়ার কথায় অবশ্য কিছুটা আশ্বস্তই হল। কিন্তু পুরোপুরি কি হল!

শোয়ার ঠিক আগে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুর ঘুর করতে করতে দীয়া হঠাৎ বলল, এ ঘরে একটা অ্যাশট্রে থাকত না, সেটা কোথায় গেল?

গার্গী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, অ্যাশট্রে কী হবে?

দীয়া কেমন লাজুক-লাজুক হাসল. মানে, আমার একটা বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে, বলে তার বিছানার পাশে রাখা একটা সিগারেটের প্যাকেট তুলে দেখাল।

গার্গীর বুকের ভেতর একটা রেলগাড়ি দমকা হাওয়ার ঘূর্ণি তুলে তীব্র বেগে ছুটে গেল, ঝম ঝম শব্দে মাথাটা টলেই যাচ্ছিল তার, কোনও ক্রমে সামলে নিয়ে বলল, দাঁড়াও দিচ্ছি—

অ্যাশট্রেটা পরিষ্কার করতে সরিয়ে রেখেছিল, মুছেটুছে দিয়ে এল ও-ঘরে। দীয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল. এ চোখ তার ভারি চেনা। হঠাৎ মনে হল একটা ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আজ। এখন এই রাতের বেলা সে একদম একা। একা, অসহায়।

কিন্তু এখন তো তীর বেরিয়ে গেছে হাত থেকে। ফেরানোর কোনও উপায়ই নেই—

দীয়া ও-ঘরে দুটো দরজার মাঝখানে পর্দা টেনে দিয়ে সিগারেট ধরাল। তার ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে গার্গীর ঘরেও ঢুকে পড়ল কিছুটা। ধোঁয়া নয়, কুণ্ডলি পাকানো সাপই মনে হল গার্গীর।

এ-ঘরে আলো নিভিয়ে তখন এক বিপুল আতঙ্কে ক্রমশ নীল হয়ে যাচ্ছে গার্গী। একটু আগেই ঘুম আসছিল তার চোখে। এখন সে ঘুম উড়ে গিয়ে তার সমস্ত শরীর ভয়ে, ক্ষোভে, ক্রোধে সহসা টান টান। একা জেগে জেগে কেবলই উসিবিসি করতে থাকে বিছানায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই ফ্ল্যাটে শুধু সে আর দীয়া নয়, আরও কেউ অদৃশ্যভাবে বিরাজ করছে কোনও গোপন কুঠুরিতে। রাত্রি গভীর হলেই সে বেরিয়ে আসবে হা হা শব্দে ঘর কাঁপিয়ে।

একটা সিগারেট শেষ হতে আরও একটা সিগারেট ধরাল দীয়া। পর পর দুটো! তার মানে বেশ নেশা আছে ওর। গার্গী আতঙ্কিত হয়ে শুধু দেখছে ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে ভরে যাচ্ছে তার ঘর। সমস্ত ধোঁয়া জমে যেন একটু পরেই জন্ম দেবে এক বিশাল দৈত্যের।

দ্বিতীয় সিগারেটটি শেষ হওয়ার মিনিটখানেক পরে দীয়ার ঘরের লাইটটা নিভে গেল

হঠাৎ। তৎক্ষণাৎ মিশ অন্ধকার তার ভয়াল ডানা বিছিয়ে নেমে এল সমস্ত বাড়িটায়। মুহূর্তে গার্গীর বুকের ভেতর একটা মহিষ চেহারার দাপুটে মোটর সাইকেল একটানা ভট ভট শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল ভয়ঙ্কর গতিতে। তার শরীর জুড়ে তখন এক তীব্র কাঁপ, জ্বালা করছে চোখ দুটো, শুকিয়ে আসছে জিভ, শব্দহীন জেগে জেগে শুধু এক...দুই...তিন করে রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত গুনে যাচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছে এ তার জীবনের দীর্ঘতম রাত। এমন ভয়ঙ্কর রাত, এ হেন দুঃস্বপ্নের রাত তার জীবনে আর কখনও আসেনি।

বাইরে শরৎ বসু রোডে তখনও ভেসে আসছে দু-একটা গাড়ির হুস হুস করে চলে যাওয়ার শব্দ। শোনা যাচ্ছে একলা কোনও মাতালের জড়ানো কণ্ঠস্বরের গান। অনেক দূরে কয়েকজন মানুষের হই-হল্লাও শোনা গেল কিছুক্ষণের জন্য। তার একটু পরেই কয়েকটা কুকুরের তুমুল ঝগড়া।

তার একটু পরে—

হঠাৎ গার্গীর মনে হল, দু ঘরের মাঝখানের পর্দাটা দুলে উঠল যেন। দম বন্ধ করে তার নজর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুহূর্তে। পর্দা সরিয়ে কেউ কি এ ঘরে ঢুকতে চাইছে! দীয়াই কি মুখ বাড়াল ওখানে! গার্গীর হৃৎপিণ্ডের গভীরে সেই দুর্দান্ত মোটর সাইকেলটা চলতে শুরু করল আরও দ্বিগুণ গতিতে। ধড়মড় করে সে উঠে বসতে গিয়েও দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। বালিশের পাশে রাখা তিন ব্যাটারির টর্চটা নিঃশব্দে মুঠো করে ধরল, কিন্তু না, বোধহয় কেউ নয়। অন্ধকারে দৃষ্টি চালিয়ে দেখল, পর্দাটা একবার দুলে উঠেই ফের শান্ত হয়ে গেল। হয়তো তাহলে সবটাই তার মনের ভুল।

এক মুহূর্তের জন্য তার মনে পড়ে গেল ঐন্দ্রিলাকে। মনে হল, ঐন্দ্রিলাই যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা-একা। তার শান্ত অথচ গভীর চোখ দুটো মেলে গার্গীকে বলছে, মিতুন, তুই পালা, নইলে আমারই মতো--

কিন্তু না, গার্গী তো পালাবে না। বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্যই তো সে আজ এই ফাঁদ পেতেছে। অন্য যে কোনও মেয়ের তুলনায় তার শক্তি অনেক বেশি। সে ঐন্দ্রিলার মতো নরমসরম মেয়ে নয়। সুখী রাজকন্যা হতে কখনও চায়ওনি সে। তার সামনে এখন অপেক্ষা করছে এক দুর্দান্ত এলোঝড়।

সহসা গার্গী একেবারে অন্য ভাবে জেগে উঠল। টান টান ছিলার মতো হয়ে উঠল তার শরীর। ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেল সমস্ত নার্ভ। অস্পষ্ট অন্ধকারে বুঝতে পারল, পাশের ঘর থেকে উঠে এসেছে দীয়া। পর্দা সরিয়ে সত্যিই ঢুকে পড়েছে এ ঘরে। খুব ধীরে, নিঃসাড়ে এসে দাঁড়াল গার্গীর বিছানার পাশে। দাঁতে দাঁত চেপে তখন গার্গী পড়ে আছে বিছানায়। চোখ বন্ধ, নিঃশ্বাস স্থির। বুঝতে পারছে, দীয়া ঝুঁকে পড়ে পরখ করছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। তার নিঃশ্বাসের স্পর্শও যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে গার্গীর কানের লতি। তাতে সিগারেটের হালকা মিষ্টি গন্ধ। চোখ বুজে নিঃসাড় গার্গী প্রবলভাবে ছটফট করে উঠল নিজের ভেতর।

একটু পরে, গার্গী ঘুমিয়ে পড়েছে নিঃসন্দেহ হতেই দীয়া গিয়ে দাঁড়াল সায়নের আলমারির কাছে। আলমারির ওপর থেকে চট করে কিছু একটা তুলে নিল। তার ঝন ঝন শব্দ একলহমা শিরিয়ে দিল গার্গীকে।

দীয়া ততক্ষণে চলে গিয়েছে ব্যালকনির দিকে। দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা

ইশারা করল। যেন কাউকে ডাকছে। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল ল্যাবরেটরি রুমের

গার্গী তখন গল গল করে ঘেমেই চলেছে বিছানায়। দীয়া ওপাশে চলে যেতেই সে তড়াক করে উঠে বসল নিঃশব্দে। সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখল, দীয়ার হাতে ল্যাবরেটরি রুমের চাবি। চাবিটি যে সায়নের বইয়ের আলমারির ওপরে থাকে, তা নিশ্চয়ই জানত দীয়া। সেইজন্যেই তখন থেকে সে ঘুর ঘুর করছিল আলমারির সামনে।

চাবি ঘুরিয়ে দীয়া ততক্ষণে খুলে ফেলেছে সায়নের ল্যাবরেটরি রুম।

গার্গী তখন ক্ষোভে, ক্রোধে, দারুণভাবে ফুঁসছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, আর কেউ ঘরের মধ্যে আছে কি না। যে কোনও মুহূর্তেই হয়তো আর একজন বেরিয়ে আসবে তার সামনে।

দীয়া তখন ঢুকে পড়েছে ল্যাবরেটরি রুমের ভেতরে। ঢুকে একবার পেছন ফিরে তাকাল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা গার্গীকে চোখেই পড়ল না তার।

কেউ নেই দেখে আশ্বস্ত গার্গী পট করে সুইচ অন করে দিল। টিউবের আলো ঝকঝক করে উঠতেই গার্গী মুহূর্তে নিজেকে আড়াল করে ফেলল দরজার ওপাশে। তখনও সে বুঝে উঠতে পারছে না তার কী করা উচিত।

দীয়া ল্যাবরেটরি ঘরে ঢুকে খুটখাট শব্দ করছে ক্রমাগত। এটা-ওটা সরাচ্ছে। ড্রয়ারগুলো খুলছে একের পর এক। খুলে ফেলল আলমারিটাও। খসখস করে কী সব টেনে বার করতে লাগল।

বারান্দার পাশে দাঁতে দাঁত চেপে নিঃসাড়ে মুহূর্ত গুনছে গার্গী। রাগে সমস্ত শরীর রি রি করছে তার। যে-ঘরে আজ পর্যন্ত গার্গী নিজেই কোনও কিছু স্পর্শ করেনি, সেখানে দীয়া কিনা তার ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করছে কাগজ-পত্র, রিসার্চের যাবতীয় সরঞ্জাম! কী সাহস ওর! কী ভয়ঙ্কর ওর দুঃসাহস!

গার্গীর একবার মনে হল সেও ঢুকে পড়ে ল্যাবরেটরি রুমে। একঝটকায় কেড়ে নেয় —। পরক্ষণেই নিবৃত্ত করল নিজেকে। ঠিক এই মুহূর্তে নয়, আরও একটু, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার। যে অপরাধী তাকে অপরাধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। দীয়া এখনও একমনে খুঁজে চলেছে ড্রয়ার-আলমারির প্রতিটি কোণ। যাবতীয় কাগজপত্র বার করছে টেনে টেনে।

আগেই আন্দাজ করেছিল গার্গী, এখন পরিষ্কার হয়ে গেল দীয়ার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি কী। আসলে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল দীয়ার। তার অভীষ্ট পূরণ করতে এখন মরিয়া হয়ে সে আরও একবার হানা দিয়েছে সায়নের ল্যাবরেটরি রুমে। বাইরে অপেক্ষা করছে তার সঙ্গী। সে সবার চোখের সামনে বাস করে, অথচ পর্দার আড়ালে থেকে মূল চক্রী হিসেবে ঘটিয়ে গেছে এতসব ঘটনা। গুরুত্বপূর্ণ কাগজগুলোর জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে এই গাঢ় রাত্রির অন্ধকারে। তার হাতে এই কাগজগুলো তুলে দিতে পারলেই দুজনের এতকালের ইচ্ছেটা পূরণ হবে।

নিজেকে শক্ত রেখে গার্গী হঠাৎ দ্রুত ফিরে এল তার ঘরের ভেতর। টেলিফোনের বোতাম টিপল পর পর। কানেকশন পেতেই অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলল মিনিটখানেক। রিসিভার

রেখে খালি ক্যাসেটভরা তার টেপরেকর্ডারটা অন করে চলে এল ল্যাবরেটরিরুমের সামনে। নিশ্বাস বন্ধ করে সেকেন্ড-মিনিট গুনতে থাকল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। হয়তো দশ মিনিট, কিন্তু মনে হল দশ ঘণ্টা। হঠাৎ সম্বিত ফিরতে দেখল, লাইট নিভিয়ে দীয়া বেরিয়ে আসছে ল্যাবরেটরি রুম থেকে। তার হাতে ছাপাছাপি কয়েক তাড়া কাগজ। সেগুলো সাপ্টে তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল ব্যালকনির কাছে, বোধহয় কাউকে খুঁজছে এদিকে ওদিকে।

গার্গী তখন টগবগ করে ফুটছে এক অসম সাহসে। হঠাৎ সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল বারান্দার আলো। আলো জ্বলে উঠতেই দীয়া কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে তাকাল গার্গীর দিকে।

গার্গী দ্রুত গিয়ে টেনে ধরল দীয়াকে, হিসহিস করে বলল, কী করছ?

দীয়ার মুখটা প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, পর-মুহূর্তে জ্বলে উঠল এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। দ্রুত তার হাতের কাগজগুলো ফেলে দিতে চাইল ব্যালকনি থেকে নীচের দিকে। কিন্তু গার্গী তা হতে দিল না। হিড়হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে আসতেই কিছু কাগজ পড়ে গেল নীচে, কিছু পড়ল বারান্দার ওপর, কিছু তার হাতে।

দীয়ার মুখখানা ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। এত দ্রুত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার অভিব্যক্তি যে গার্গী শিউরে উঠল। কিন্তু গার্গীও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। একটা কিছু ঘটবেই আজ রাতে তা তো জানতই সে। দীয়া সাপ্টে ধরে রয়েছে বাকি কাগজের তাড়া। গার্গী তার হাত থেকে সেগুলো কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই দীয়া কাগজগুলো একপাশে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল গার্গীর ওপর।

গার্গী ছিটকে সরে এল ঘরের ভেতর, যেখানে সে অন করে রেখেছে টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেট।

সে সরে আসতেই দীয়া হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিল কোনওক্রমে। ঘরের ভেতর দ্রুত ছুটে এসে গার্গীর ওপর আবার লাফ দিয়ে পড়ে বলল, তাহলে তোরও মরার সাধ হয়েছে!

গার্গী চট করে আবার সরে গেল ওপাশে, গিয়ে দীয়াকে জাপ্টে ধরে ফেলল পেছন থেকে। তার হাতদুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল দু মুঠোয়, আবার হিসহিস করে বলল, আমি কিন্তু ঐন্দ্রিলা নই, অত সহজে আমার হাত থেকে তুমি নিস্তার পাবে না, দীয়া।

দীয়ার গায়েও বেশ জোর। সে তার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। শরীর মুচড়িয়ে চেষ্টা করল হাতদুটো ছাড়িয়ে নিতে। বলল, ছাড় বলছি, তুই আমাকে চিনিস না! তোকেও ঐন্দ্রিলার মতো আজ---

হাত ছাড়াতে অপারগ হয়ে শেষে পা ছুড়তে লাগল দীয়া। সেইমুহূর্তে গার্গী তার হাঁটু দিয়ে মস্ত একখানা গোঁত্তা মারল দীয়ার কোমরের কাছে। দীয়া কোঁক করে উঠল।

গার্গী এবার তার হাতদুটো মুচড়ে দিয়ে বলল, এখন তোমাকে কী করা উচিত, জান? ঠিক যেভাবে ঐন্দ্রিলাকে গলা টিপে মেরে কেরাসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছিলে, ঠিক সেভাবেই মেরে ফেলা।

দীয়া তখন ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। প্রথমবার সে ভুল কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। এবার তাই সায়নের গবেষণার প্রতিটি কাগজ সংগ্রহ করেছে ল্যাবরটরি রুম

থেকে। দ্বিতীয় দফায়ও ব্যর্থ হতে তার দুচোখে ধকধক করে জ্বলে উঠছে এক ঘাতকের চাউনি। সে পুনর্বার শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই তার কোমরে আর একখানা গোঁত্তা মারল গার্গী। গলা থেকে এবার আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়তেই গার্গী বলল, এরকম আর গোটা কয়েক মারলে তোমার কোমর ভেঙে পড়ে যাবে।

দীয়া তবু শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে গার্গীর চুলের রাশ টেনে ধরল হঠাৎ, দ্যাখো না এবার তোমার হাল কী হয়—

গার্গী একমুহূর্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, সামলে নিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, আমি ক্যারাটে শিখেছিলাম, বুঝলে? আপাতত তোমাকে আধঘণ্টার জন্য অজ্ঞান করে রাখছি। তারপর যা করার পুলিশ করবে—

মুহূর্তে সে হাতে অদ্ভুত ভঙ্গি করে দীয়ার ঘাড়ের মোক্ষম জায়গায় সজোরে চপারের মতো বসিয়ে দিল তার ডান হাত। দীয়ার গলা থেকে কোনও শব্দই বেরুল না আর, শুধু তার অত বড় শরীরটা কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়ল মেঝেয়। গার্গী নিচু হয়ে দেখল, দীয়া অচেতন।

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে গার্গী প্রথমে বন্ধ করল টেপরেকর্ডারের সুইচ। পরমুহূর্তে সিঁড়ির কাছে পদশব্দ শুনে আই হোলে চোখ লাগিয়ে দেখল, একটা লোক। এতক্ষণ বোধহয় ব্যালকনির নীচে, লনের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। এখন কলিং বেল টিপে হয়তো ডাকতে চেয়েছিল গার্গীকে নয়, দীয়াকেই। সে বুঝতে পেরেছিল, দীয়া ঝামেলায় পড়েছে।

কিন্তু কলিং বেল টেপা হল না তার। তার আগেই ব্লু-ওয়ান্ডারের বাইরে জিপের শব্দ। গার্গী টেলিফোন করেছিল, তার উত্তরে বিশাল বাহিনী নিয়ে ছুটে এসেছেন পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল।

কিন্তু লোকটি তখন পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। দেবাদ্রি সান্যাল ঢুকে পড়েছেন গেটের ভেতরে। ঢুকেই সপাটে পাকড়ে ফেললেন লোকটিকে।

গার্গী স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, যাক, নাটের গুরুটিকে ধরতে পেরেছেন তাহলে। পর্দার আড়ালে থেকে খুব জ্বালিয়েছে আমাদের।

বিস্মিত দেবাদ্রি তখনও বুঝে উঠতে পারছেন না গোটা ব্যাপারটা। গার্গী তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তাহলে ওপরে আসুন মিঃ সান্যাল, আপনাকে শোনাই কেনই বা খুন হতে হয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে, আর তার পেছনে কী ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিল এরা দুজন। আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন দীয়ার জীবন-যাপনের স্বরূপ জানতে পারলে—
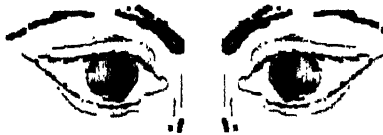
ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে দোতলায় গার্গীদের ফ্ল্যাটে উঠে এলেন, ঘরের ভেতর তখন ঝড়-বিধ্বস্ত অবস্থা। মেঝেয় ছত্রখান হয়ে রয়েছে ঘরের

জিনিসপত্র, ছড়িয়ে রয়েছে সায়নের ল্যাবরেটরি রুমের কাগজ, ভেঙে চুরমার হয়ে রয়েছে একটা কাচের গেলাস, একপাশে পড়ে আছে দীয়ার এলোমেলো সংজ্ঞাহীন দেহ।

গার্গী তখনও শ্বাস নিচ্ছে বড় বড় করে, হাপরের মতো উঠছে নামছে তার বুক, চারদিকে তাকিয়ে সে নিজেও তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিটের ধস্তাধস্তিতে কীভাবে এমন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল ঘরের আসবাবপত্রও। তার মানে রীতিমতো যুঝতে হয়েছে দীয়ার সঙ্গে।

অচেতন দীয়াকে দেখে দেবাদ্রি হতবাক হয়ে গেলেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না, মিসেস চৌধুরী। এ সব কী কাণ্ড!

গার্গীর তখন হাসারও ক্ষমতা নেই, বলল, সব বলছি। তার আগে জল খেয়ে একটু থিতুবিতু হয়ে নিই। যা ঝড় গেল আজ সন্ধে থেকে—

জল খেয়ে মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়ে সহজ হয়ে নিল গার্গী। বলল, তা হলে শুনুন, কীভাবে ঝুঁকিটা নিয়েছিলাম আজ। সায়ন চৌধুরী ভুবনেশ্বর চলে যাওয়ার পর ঠিক সেই পটভূমিই তৈরি হল, যা কিছুদিন আগে সায়ন বিলাসপুর যেতে ঘটেছিল ঐন্দ্রিলার ক্ষেত্রেও। আমারই মতো ঐন্দ্রিলা সেদিন একা ছিল এই ফ্ল্যাটে। শুধু পার্থক্য এই যে, ঐন্দ্রিলা জানত না, তার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে এসে অপহরণ করতে চাইবে তার স্বামীর তিল তিল করে গড়ে তোলা এক কোম্পানির মূল চাবিকাঠি। তাই সে-কাজে বাধা দিতে গিয়ে খোয়াতে হল তার প্রাণ। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলাম, তাই ঠাণ্ডা মাথায়, অনেক হিসেব কষে আজ ফাঁদ পেতেছিলাম দীয়ার জন্যে। প্রবল ঝুঁকি আছে তা জেনেও।

আসলে শৈশব থেকে যে কোনও কাজে ঝুঁকি নেওয়াটাই আমার অভ্যাস। আজকের ঝুঁকিটা কিন্তু মারাত্মক ছিল। হিসেব একটু ভুলচুক হলে আমার প্রাণটাও হারাতে হত বেঘোরে; বলে গার্গী সন্ধে থেকে যা-যা ঘটেছে, তা আনুপূর্বিক বিবৃত করল দেবাদ্রির কাছে। টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেটটি রি-ওয়াইন্ড করে যে ঝড়টুকু বয়ে গেছে তাও একবার শুনিয়ে দিল আগাগোড়া।

দীয়ার সংলাপগুলো শুনতে শুনতে দেবাদ্রি বিড়বিড় করলেন, সত্যিই খুব ঝুঁকি নিয়েছিলেন—

গার্গী এতক্ষণে হাসতে পারল, কিন্তু মিঃ সান্যাল, এর থেকেও বড় ঝুঁকি নিয়েছিলাম সেদিন, যে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ব্লু-ওয়ান্ডারের ফ্ল্যাটে সায়নের স্ত্রী হিসেবে প্রবেশ করব। জানতাম, এই একটি সিদ্ধান্তের ফলে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ, পুলিশ, সাংবাদিক সবারই স্পষ্ট ধারণা হবে, ঐন্দ্রিলা-হত্যার পেছনে তা হলে গার্গীই রয়েছে এক প্রধান ভূমিকায়। যখন সমস্ত পরিপার্শ্ব বলছে, সায়ন চৌধুরীই খুনি, সমাজের প্রতিটি মানুষের আঙুল উদ্যত হয়ে বিঁধতে চাইছে এক সায়ন চৌধুরীকেই, এমনকি তার পরিচিতজনও বিশ্বাস করছে না এই খুনটা অন্য কেউও করতে পারে, সেই মুহূর্তে এহেন একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম কিছুটা আবেগের বশে হলেও তার জন্য চিন্তাভাবনাও কম করিনি।

আসলে ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর অন্য সবাইকার মতো প্রথমে আমারও ধারণা হয়েছিল, সায়ন চৌধুরীই এর জন্য দায়ী। পাশের ফ্ল্যাটের চন্দ্রাদেবী কিংবা হিমন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলেও থাকতে পারেন। কিন্তু সায়নকে খুনি হিসেবে ভাবতে গিয়ে মনে হল

কোথাও যেন লুকিয়ে আছে একটা বড় কিন্তু। যে সায়নকে আমি ক বছর এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি, চিনেছি, জেনেছি, আমিই নিশ্চিন্ত হয়ে ঐন্দ্রিলাকে সমর্পণ করেছি তার হাতে, বিয়ের দু বছরের মধ্যে যে-সায়ন কখনও এক মুহূর্তের জন্যও অবহেলা করেনি ঐন্দ্রিলাকে, তাতে কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি সেই মানুষ এতখানি হিংস্র হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে তার সুন্দরী বউকে। জেল-হাজত থেকে যেদিন সায়ন জামিনে মুক্তি পায়, তার উদ্‌ভ্রান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা দেখে তখনই বেশ খট্‌কা লেগেছিল। সেদিন তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কদিন পরে তার ফ্ল্যাটে খোঁজ নিতে গিয়ে যে বিপর্যস্ত অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করেছিলাম, আমার মন বলেছিল, এই মানুষ কখনও তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে না। সে যদি তার নিজের স্ত্রীকে খুনই করে থাকবে, তা হলে মুক্তি পাওয়ার পর কেউ কি এমনভাবে নিজের উপর অত্যাচার করে দিনের পর দিন! তার জীবনে তখন এক অসীম শূন্যতা, এক পরিপূর্ণ অর্থহীনতা।

সমস্ত ঘটনাগুলো পর-পর কয়েকদিন মনের ভেতর নাড়াচাড়া করে মনে হল, এই ঘটনার মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে কোথাও। আর সে-রহস্যের কিনারা করতে হলে সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে হবে নিজেকে। সেই মুহূর্তে পরিস্থিতিও এমন হয়ে পড়েছিল যে, সায়নকে বিয়ে না করে কোনও উপায়ও ছিল না আমার। অতএব এক প্রচণ্ড দুঃসাহস দেখিয়ে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেললাম সায়নের জীবনের সঙ্গে। সায়নকে পুলিশের চার্জশিট থেকে বাঁচানোর তাগিদে তো বটেই, সমাজের মুখ চাপা দেওয়ার জন্যও নিশ্চয়ই।

বিয়ের পর আরও গভীরভাবে জানতে পারি সায়নকে। আসলে বলতে কি, কোনও পুরুষকে বাইরে থেকে চেনা, আর স্বামী হিসেবে চেনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। যতটা ভাবতাম, দেখলাম, সায়ন তার চেয়েও সংযমী, সুসংবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তার ব্যক্তিত্বও অসাধারণ। কাগজে তাকে জড়িয়ে যে নানারকম নারীঘটিত কেলেঙ্কারির কথা ছাপা হচ্ছিল সেগুলোর সবই যে ভুল, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তা বুঝতেও দেরি হয়নি একবিন্দু।

যে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে শুধু নিজের মেধা, পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফলে তুলে এনেছিল সাফল্যের চূড়ায়, তাতে এত বড় একটা আঘাত এসে পড়ায় সায়ন তখন চূড়ান্ত বিপর্যস্ত। সংবাদপত্র আর পুলিশ-রিপোর্টের কল্যাণে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিল দুর্নামের আড়ালে। একই সঙ্গে তার নিজের, তার পরিবারের, তার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ধুলোয় মিশে যেতে থাকায় সে চূর্ণ, ছিন্নভিন্ন, বিধ্বস্ত। নিঃশেষিত সায়নের পাশে সেই মুহূর্তে আমি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে না দাঁড়ালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না, তার প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে তো নয়ই।

পুলিশ তখন সন্দেহ করে চলেছে একমাত্র সায়ন চৌধুরীকেই, তারপর বিয়েটা হয়ে যেতে আমাকেও।

ঠিক তখনই আমি ঠিক করলাম, পুলিশের এই ভ্রান্ত ধারণা ভাঙাতে হলে তদন্ত করতে হবে তাদের সন্দেহভাজন এই আমাকেই। অন্তত নিজেদের বাঁচার স্বার্থে। মিঃ সান্যাল, আমি কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই, শখের গোয়েন্দা নই, কিন্তু কোনও বিষয়ের গভীরে ঢুকে তাকে তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করা আমার বরাবরের স্বভাব। এ ক্ষেত্রেও সেভাবে এগিয়ে গিয়েছি

ঘটনার উৎস খুঁজতে। প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনার চুলচেরা আলোচনা করে বুঝতে চেয়েছি কীভাবে হয়ে গেল এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি।

মিঃ সান্যাল, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বিষয়টি খুবই জটিল, এক গৃহবধূ তার ফ্ল্যাটের ভেতর গভীর রাতের অন্ধকারে খুন হল যখন সে একা। তাদের ফ্ল্যাটে কেউ তো নেইই, তাদের বাড়ির দরোয়ান মোহন চলে গেছে সন্ধের ঠিক পরেই। পাশের ফ্ল্যাটে হিমন হয়তো ফিরে এসেছে মোহন চলে যাওয়ার পর। চন্দ্রাদেবী আর রবার্ট সন্ধের আগেই গিয়েছিলেন পার্কসার্কাসে এক মিউজিক কনফারেন্সে, যেখানে থাকার কথা ছিল সারা রাত, কিন্তু হঠাৎই ফিরে এসেছিলেন রাত একটায়।

অর্থাৎ সে রাতে ঐন্দ্রিলা খুনের দায় প্রাথমিকভাবে গিয়ে পড়ে হিমন, চন্দ্রাদেবী কিংবা রবার্ট ও নীলের ওপর। ঐন্দ্রিলা আমাকে প্রায়ই বলত, 'জানিস মিতুন, ভদ্রমহিলা ভীষণ ডেঞ্জারাস, বিয়ের পর একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওঁদের ফ্ল্যাটে। কিন্তু সায়ন আমাকে প্রথম দিনই বারণ করে দিয়েছিল ওদের কাছে না যাওয়ার জন্য। আমি না যাওয়ায় ভদ্রমহিলা প্রচণ্ডভাবে খেপে গিয়েছিলেন আমার উপর। তার পর থেকে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতেন যেন পারলে খুনই করে ফেলেন আমাকে।' ঐন্দ্রিলার কথাটা তাই বারবার মনে পড়ত, কারণ চন্দ্রাদেবী আমার দিকেও তাকাতেন ঠিক একই দৃষ্টিতে। তা ছাড়া জাফরির ভেতর দিয়েও ফ্ল্যাটের কেউ না কেউ সারাক্ষণ নজরদারি করত আমাকে, কখনও হিমন, কখনও চন্দ্রাদেবী, কখনও দীয়া এ বাড়িতে এলে সে-ও। এক-একজন এক-এক কারণে বা কৌতূহলে।

মূলত দীয়াই নজরদারি করত বেশি। যখনই সে এ বাড়িতে আসত, লক্ষ্য করত আমার গতিবিধির, তার পাপকর্মটি আমি বুঝে ফেলেছি কি না। তার চাউনি বরাবরই কেমন ভয়ঙ্কর মনে হত এই নজরদারির সময়। হিমনও তাকাত কখনও কখনও। তারও মনে একধরনের আতঙ্ক কাজ করত এই ভেবে যে, আমি জেনে ফেলছি কি না সব। আর চন্দ্রাদেবী দেখতেন এক ধরনের কড়া চোখে, হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুড়ে বসল এই মেয়েটা।

আমার সামনে হত্যাকাণ্ডের তখন একটাই ক্লু, ঐন্দ্রিলার ঘরের অ্যাশট্রের ভিতর একটি আধপোড়া লেডিজ সিগারেট।

এরপর চন্দ্রাদেবীকে একদিন তাঁর ফ্ল্যাটে সিগারেট খেতে দেখে কেমন যেন খটকা লাগল আমার মনে। কিন্তু প্রশ্ন হল, হত্যার পেছনে চন্দ্রাদেবীর মোটিভ কী? ঘরের বউ তাঁর অধীনে নেই শুধু এই কারণেই? তবে দীয়াকে যেদিন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিলেন ঘরের বাইরে, সেদিন তাঁর হিংস্রমূর্তি দেখে চমকে উঠেছিলাম। এ ধরনের শাশুড়ি নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে হয়তো ঘরের বউকে খুনও করতে পারেন। তবে অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। হিমন কিংবা রবার্ট কেউ একজন ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে যাতায়াত করে এটা মনে হয়েছিল ঐন্দ্রিলার ডায়েরি পড়ে। দুই ক্ষেত্রেই দুই ভিন্ন কারণে চন্দ্রাদেবীর ক্রোধ হওয়াটা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে অন্য একজনকে সহযোগী করে চন্দ্রাদেবীর পক্ষে বধূ-হত্যা করাটা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না।

হিমন আমার সন্দেহের তালিকায় প্রথম থেকেই ছিল। অমন শরীর-স্বাস্থ্যের এক পূর্ণবয়স্ক যুবক, কিন্তু তার ভাব-ভঙ্গি কেমন মেয়েলি ধরনের, মায়ের কথায় ওঠে-বসে, তার

বিয়ে-করা বউ তার সঙ্গে থাকতে না পেরে পালিয়ে যায়, দেখে মনে হত এ আবার কী ধরনের পুরুষ! তখন এটাও মনে হয়েছিল, এই ধরনের পুরুষরাই মায়ের কথায় খুনও করতে পারে।

সেই সঙ্গে আমার ভারি রহস্যময় মনে হত ওদের বাড়ির নিত্যসঙ্গী রবার্ট ও'নীলকেও। ও'নীল নিজে বিয়ে করেননি, তাঁর পরিচিতির গণ্ডি ব্যাপক, কলকাতার বিশিষ্ট সব বাড়িতে তাঁর আনাগোনা, বিশেষ করে তাঁর হৃদ্যতা এই সব অভিজাত বাড়ির সুন্দরীদের সঙ্গে। লোকটির এক অসাধারণ ক্ষমতা হল, খুব দ্রুত যে-কোনও বয়সী রমণীকে বশ করে ফেলতে পারেন তাঁর সাহেবি চেহারা, চৌখস কথাবার্তা ও অনায়াস অন্তরঙ্গতায়। এই সময় হত্যাকাণ্ডের আর একটি ক্লু হিসেবে আমার হাতে পড়ে যায় ঐন্দ্রিলার একটি ডায়েরি। তার কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে মনে হয়েছিল, রবার্ট ও'নীলই মাঝেমধ্যে এসে হাজির হতেন ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে। এবং আশ্চর্য, সায়নের অনুপস্থিতিতেই। হয়তো তিনি চেষ্টা করতেন, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে, একটা শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করতে। ডায়েরি পড়ে আরও মনে হয়েছিল, পুরুষটি সম্পর্কে ঐন্দ্রিলারও যথেষ্ট কৌতূহল, এক ধরনের সহানুভূতিও, কিন্তু তার এই অবৈধ ইচ্ছেটাকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছিল সে। লিখেছিল 'আমি জানি এটা ভাল নয়।' এমনকি আমার বিয়ের পরদিনও রবার্ট হঠাৎ রাতের বেলা এসে হাজির হয়েছিলেন আমার কাছে, অনেক চমৎকার সব শব্দবন্ধ উপহার দিয়েছিলেন। তারও কিছুদিন পর একদিন লোডশেডিঙের সুযোগে পেছন থেকে আমাকে যে পুরুষ জড়িয়ে ধরেছিল, তার মুখে দাড়ির জঙ্গল। ঐন্দ্রিলাকেও একদিন এরকমই একজন জড়িয়ে ধরেছিল পেছন থেকে। সব তথ্য-প্রমাণ মিলিয়ে আমার মনে হয়, রবার্ট ও'নীল নিজের কামনা চরিতার্থ করতে পারেননি বলেই ভীষণ খেপে উঠেছিলেন ভেতরে ভেতরে, তারপর চন্দ্রাদেবীর ইন্ধন পেতেই সেদিন রাতে—। পার্কসার্কাস মিউজিক কনফারেন্স থেকে তাদের রাত একটায় বাড়ি ফেরাটাই আমার সন্দেহের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল।

কিন্তু পরে ডায়েরিটি আদ্যোপান্ত পড়ার পর বুঝতে পারি, ঐন্দ্রিলা-উল্লেখিত দ্বিতীয় পুরুষটি রবার্ট ও'নীল নয়, হিমন।

ইতিমধ্যে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসে পর পর দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাগে ঘটে যায়, যা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে ধারণা হয়। যে নতুন মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারটির প্রোডাকশন সবে শুরু হয়েছিল, একদিন রাতে তার প্ল্যান্টটি বার্স্ট হয়ে যায় হঠাৎ। প্ল্যান্টটি ছিল বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি, ফলে তা মেরামত করতে হলে বিদেশ থেকেই স্পেয়ার পার্টস আনতে হবে। সায়ন পরদিনই তার জন্য চিঠি লেখে বিদেশে। আর আশ্চর্য এই যে, সে চিঠিটিও ডেসপ্যাচ হল না এক ভুতুড়ে ফোন আসায়। ডেসপ্যাচের দায়িত্বে ছিল যে ঋষিতা তালুকদার, তাকে ঠিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ফোন করে বাড়ি চলে যেতে বলা হল, আর শুধু তাই নয়, তাকে রাস্তায় এমনভাবে আহত করা হল যাতে সে সাত-দশদিনের মধ্যে আর অফিসে না আসতে পারে।

ঠিক তখনই মনে হল, এ বাড়ির বাইরেও কেউ বা কারা থাকতে পারেন, যাঁরা সায়নের শুভার্থী নন। তাঁরা চাইছেন এই ডিটারজেন্ট পাউডারটি যেন বাজারে না বেরুতে পারে।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সায়ন আমাকে প্রায় হাইজ্যাক করে ধরে নিয়ে গিয়ে যুক্ত করে দিয়েছে তার কোম্পানির সঙ্গে। আমি তখন চেষ্টা করে চলেছি, কী করে তার প্রতিষ্ঠানটির

শরীরে পুনর্বার রক্তসঞ্চার করা যায়। জানতাম, প্রতিষ্ঠান বাঁচলে সায়নও বাঁচবে। সেখানে কাজ করতে গিয়ে মনে হল, গোটা ব্যাপারটা আরও জটিল। হঠাৎ সায়নের জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তার অফিসের লোকজন বিভ্রান্ত। তার মধ্যে কোনও কোনও অফিসার বা স্টাফের ব্যবহার বেশ রহস্যময়। কেবলই মনে হচ্ছে, প্ল্যান্ট বার্স্ট করা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটা ডেসপ্যাচ না হওয়াটা পুরোপুরি স্যাবোটেজ।

এ ব্যাপারে প্রথমেই আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ে প্যারাডাইসের প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্তের উপর, কৌশিক দত্ত অনেকদিন ধরেই প্রোডাকশনের ব্যাপারে কেমন গা-ছাড়া ভাব দেখাচ্ছিলেন। ফ্যাক্টরিতে এত বড় একটা বিস্ফোরণ ঘটার পরও কোনও ভাবান্তর নেই। উপরন্তু শোনা যাচ্ছিল, এখানে চাকরি করে কোনও জব-স্যাটিসফেকশন নেই এই অজুহাতে চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছে। নিজের তৈরি কয়েকটা নতুন ফর্মুলা দিয়ে সাবান তৈরি করার জন্য অনুরোধও জানাচ্ছিলেন সায়নকে। এরই মধ্যে রবার্ট ও নীলের মুখ থেকে জানতে পারলাম, যে রাতে ঐন্দ্রিলা খুন হয়, সে রাতে কেউ ঢুকেছিল সায়নের ল্যাবরেটরি রুমে, সেখানে লণ্ডভণ্ড করেছে তার গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র, কিছু কাগজপত্র খোয়াও গেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লুটি রহস্যের কিনারা করার পক্ষে খুবই প্রয়োজনে লেগেছে পরবর্তী সময়ে।

কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, হয়তো কৌশিক দত্তই চেয়েছিলেন মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারের মূল্যবান ফর্মুলা নষ্ট করে ফেলতে, সে কাজে ব্যর্থ হওয়ায় বার্স্ট করিয়ে দিয়েছেন প্ল্যান্ট।

তাঁর সহযোগী হিসেবে মধুমন্তী রায় মজুমদারের নাম মনে হচ্ছিল বারবার। মধুমন্তীর আচার-আচরণ যেন খুবই রহস্যময়। ডিভোর্সি বলে আগে বরাবর বিষণ্ণ থাকতেন অফিসে, ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর হঠাৎ অতিরিক্ত উচ্ছল হয়ে মেলামেশা করতে শুরু করলেন কৌশিক দত্তের সঙ্গে, এদিকে সায়নের কাছেও অতিরিক্ত প্রগল্‌ভতা দেখাতে শুরু করলেন। সব মিলিয়ে তাঁর পরিবর্তন বেশ চোখে পড়ার মতো।

ঠিক এ সময় খাটের নীচে একটা বেগুনি পাথর খুঁজে পাওয়ায় মধুমন্তীর উপর আমার সন্দেহ তীব্র হয়ে দেখা দিল। প্রথমত, তাঁর সঙ্গে কৌশিক দত্তের ঘনিষ্ঠতা, দ্বিতীয়ত, তাঁর সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস, তৃতীয়ত, তাঁর কানের দুলে বেগুনি রঙের পাথর। কৌশিক দত্ত প্যারাডাইস ছেড়ে লাইম ইন্ডিয়ায় চলে যেতে সে সন্দেহ দৃঢ় হল আরও। একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল, যদি প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ক্ষতি করা যায়, তা হলে সবচেয়ে লাভ লাইম ইন্ডিয়ার।

লাইম ইন্ডিয়া তখন সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে, যাতে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের গুডউইল আর ফিরে না আসে। লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় তখন পাগলের মতো চেষ্টা করছেন, যাতে সায়ন চৌধুরীর জীবনের দুর্ঘটনাকে জড়িয়ে দেওয়া যায় প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের গুডউইলের সঙ্গে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাঁরা সে চেষ্টা করলেন। কাগজের রিপোর্টারদের নানান তথ্য জোগান দিয়ে মিথ্যে গল্পও ছাপালেন অনেক। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফলও হল আংশিকভাবে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের সেল ফল করে গেল হু-হু করে।

সে সময় দুটো সম্ভাবনার কথা মনে হল। এক, হয় কৌশিক দত্তই লাইম ইন্ডিয়ার সঙ্গে যোগসাজশ করে ডোবাতে চাইছেন সায়ন চৌধুরীকে। দুই, লাইম ইন্ডিয়াই চাইছে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস ধ্বংস হয়ে যাক, তা যে-কোনও ভাবেই হোক।

প্রথমে শুরু করলাম, কৌশিক দত্ত আর মধুমন্তী রায় মজুমদারের ওপর নজরদারি। কাজের ছুলছুতোয় তাদের চেম্বারে ঢুকে পড়তে লাগলাম সময়ে-অসময়ে। বুঝতে পারলাম কৌশিক দত্ত এই কোম্পানিতে খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড, আর তার ওপর সহানুভূতির ঢেউ গিয়ে পড়েছে ডিভোর্সি মধুমন্তীর। প্রায়শই এক ঘরে সিগারেট খেতে খেতে দুজনে কী যেন ফিসফিস করে সারাক্ষণ। মধুমন্তী সায়নেরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইছিল বোধহয় এই কারণে যে, সায়ন তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা কতখানি বুঝতে পারছে তা যাচাই করতেই।

আমার তখন দ্বিতীয় ভাবনা, লাইম ইন্ডিয়ার কেউ সায়নের বিরুদ্ধে এত সব চক্রান্ত করে চলেছে কি না। এ কথা ঠিক, কয়েক বছরের মধ্যেই প্যারাডাইস প্রোডাক্টস উঠে গিয়েছিল সাফল্যের চূড়ায়। তার ফলে বহুদিনের পুরনো প্রতিষ্ঠান লাইম ইন্ডিয়ার তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। লাইম ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও যেমন ব্যর্থ হলেন প্যারাডাইসের উন্নতি ঠেকাতে, তেমনই অপারগ হলেন নিজেদের কোম্পানির পতন রোধ করতে। তাতে কোম্পানির চেয়ারম্যান উত্তরোত্তর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে লাগলেন তাঁর অফিসারদের উপর। যে-কোনও অফিসারকে যখন তখন ধরিয়ে দিতে পারেন ডিসচার্জ লেটার। অতএব লাইম ইন্ডিয়ারই কেউ নিশ্চয়ই—

লাইম ইন্ডিয়া সে সময় যে মারাত্মক বিজ্ঞাপনগুলো কাগজে প্রকাশ করে চলেছিল প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের বিরুদ্ধে, সেগুলো হঠাৎ চমক লাগিয়ে দেয় আমাকে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন দফতর দেখাশুনো করেন যে রৌণক মুখার্জি, তিনি একসময় ঐন্দ্রিলাকে ফরাসি ভাষা শেখাতেন, ঐন্দ্রিলা প্রেমেও পড়েছিল তাঁর, এমন কি বিয়ের পরও তাঁর সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ রেখে চলেছিল। ঐন্দ্রিলার ডায়েরিতে লেখা আছে, তিনি ঐন্দ্রিলার কাছে এসেছিলেন এক বর্ষণমুখর দুপুরে। শুধু তাই নয়, ঐন্দ্রিলা তাঁর কাছে সমর্পণ করেছিল নিজেকে। সেই রৌণক মুখার্জি ঘটনাক্রমে এসে হাজির হয়েছিলেন পাঁচই এপ্রিল সন্ধের কিছুটা পর ঐন্দ্রিলার কাছে, তারই ফোন পেয়ে। আষাঢ়ের সেই তৃতীয় দিবসে এক দুরন্ত ভালবাসার পর দুজনের মধ্যে কী টানাপোড়েন হয়েছিল তা জানতে পারিনি, কিন্তু তাদের সেই অবৈধ প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতিতে এহেন কোনও হত্যাকাণ্ড হওয়া সম্ভব কি না, সেটা আমার ভাবনায় ছিল। ঐন্দ্রিলার ডায়েরি পড়ে বুঝতে পারি, সায়নের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় একটুও অসুখী হয়নি সে, বস্তুত সায়নের মতো পুরুষের স্ত্রী হওয়াটা তার কাছে গৌরবের ঘটনাই ছিল, তবু মেয়েরা তাদের জীবনের প্রথম প্রেম বোধহয় সারা জীবন মনে রাখে। সেই ভালবাসার স্মৃতি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় সারাটা জীবন, তবে আরও সে অস্থির হয়ে পড়েছিল রৌণকের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায়। রৌণক যে তাকে ভাল না বেসে ঋতবৃতাকে নিয়ে সুখী হয়েছিল তা ঐন্দ্রিলা তার বিয়ের পরও ভুলতে পারেনি। ডায়েরিটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, হয়তো এমনও হতে পারে রৌণককে বাধ্য হতে হয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে সরিয়ে ফেলতে। হয়তো ঐন্দ্রিলা তার উপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, রৌণক তার পারিবারিক জীবন যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্যই খুন

করে ঐন্দ্রিলাকে। তা ছাড়া, সে রাতে সায়নের অনুপস্থিতিতে একমাত্র রৌণকের পক্ষেই সম্ভব ছিল ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে ঢোকা।

রৌণক ছাড়া লাইম ইন্ডিয়ার আর একজন লোক — তাদের সুপারভাইজার লোটন আমার সন্দেহের তালিকায় হঠাৎ ঢুকে এল যেদিন জানলাম সে প্রায়ই চলে আসে প্যারাডাইসের অফিসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে কালীজীবনবাবুর পাশে। বিশেষ করে যেদিন প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে প্ল্যান্ট বার্স্ট করে, সেদিন লোটন কালীজীবনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রাতে টেলিফোন করতে গিয়েছিল ফ্যাক্টরিতে, তখন মনে হল লোটনের ভূমিকাই এই রহস্যের কিনারার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লু।

কিন্তু পরে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল লোটনের খুন হয়ে যাওয়াটা। মিঃ সান্যাল, আপনি যে বলেছিলেন, এর পেছনে সায়ন চৌধুরীর হাত আছে, সেই বিষয়টি আমার রক্তকে হঠাৎ নীল করে দিয়ে গেল। আমার অজান্তেই সায়নের ওপর দ্বিতীয়বার সন্দেহ পড়ল সেদিন। হঠাৎই মনে হল, কী ব্যাপার, সায়ন এত বড় একটা ঘটনা আমাকে গোপন করে এত ভোরে উঠে ফ্যাক্টরিতে চলে গেল কেন? আর গেলই যদি ফিরে এল দারুণ ঝড়-বিধ্বস্ত অবস্থায়। আরও আশ্চর্য এই যে, যারা ঘেরাও করেছিল, তাদের চাপে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং লোটনের ভাইকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এল। ব্যাপারটা আমাকে অবাক করল এই জন্যে যে, নিরপরাধ লোক পুলিশের উপস্থিতিতে শুধু খুনের মামলায় জড়াবার ভয়ে এতগুলো টাকা দিতে রাজি হয়ে গেল! তা হলে কি লোটনের খুনের ব্যাপারে তার কোনও ভূমিকা আছে! ঠিক এই সময় একদিন সায়ন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, শখের গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে গার্গী। কথাটা কেন যেন ভাল লাগল না আমার। হঠাৎ মনে হল, পর-পর এমন সব প্রমাণ হাতে আসছে, যাতে সন্দেহের তীর ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে সায়নের দিকেই। সায়ন ধরা পড়ে যাবে এই ভয়েই কি আমার এই গোয়েন্দাগিরি পছন্দ করছে না! তারপর আরও ভয় পেয়ে গেলাম সেদিন রৌণক মুখার্জির কথায়। রৌণক পাঁচই এপ্রিল সন্ধের পর ব্লু-ওয়াভারের গেটে এসে দেখেছিলেন, তাঁর ঠিক আগেই একজন পুরুষ উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে, ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটেই গিয়ে বেল বাজালেন, ঐন্দ্রিলা দরজা খুলতেই তার কাছে কিছু একটা অনুনয়-বিনয় করে বলল, কিন্তু ঐন্দ্রিলা ফিরিয়ে দিতে চাইছিল তাকে, আবার একটু পরেই তাকে নিয়ে ঢুকে গেল ফ্ল্যাটের ভেতর। নিশ্চয়ই দেরি করে ফিরেছে বলেই ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল সায়নের। পরে সেই ঝগড়ার পরিণতিতেই—

রৌণক তাঁর মুখে দাড়ি দেখেছিলেন, কিন্তু কী রঙের দাড়ি, সোনালি না ধূসর, সিঁড়ির ওপরটা অন্ধকার ছিল বলে বলতে পারেননি।

সোনালি হলে হিমন, ধূসর হলে রবটি। কিন্তু পরে মনে হল, যদি অন্ধকারে রৌণক ভুল দেখে থাকেন! হয়তো লোকটার মুখে আদৌ দাড়ি ছিল না, অন্ধকারের ছায়া পড়ে ওরকম মনে হয়েছিল তাঁর। তা হলে হয়তো সায়নই—

সত্যি বলতে কি, মিঃ সান্যাল, তারপর কয়েকদিন সায়নের পাশে শুয়েও চোখে ঘুম আসেনি আমার। মনে হল, আপনি যা সন্দেহ করেছেন হয়তো সবটাই ঠিক। আলো বোসের বলা সমস্ত কাহিনীই আসলে বানানো গল্প। হয়তো হিমনের অন্তর্ধান, লোটন-খুন, এমনকি

প্ল্যান্ট বার্স্ট করানো, চিঠি ডেসপ্যাচ না হওয়া, সবই ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেছে সায়ন। হয়তো শেষ মুহূর্তে সে জানতে পেরে গিয়েছিল, রৌণকের সঙ্গে ঐন্দ্রিলার অবৈধ সম্পর্কের কথা। তাই ঈর্ষায়, ক্রোধে অন্ধ হয়ে —

যাই হোক, একদিন ফুট্টুসের গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় একটা স্পেশ্যাল বাস ধরে ফিরছিলাম বাড়ির দিকে, বাসে হিমনকে দেখতে পাওয়াটাই এই রহস্যের জট খোলার প্রথম টার্নিং পয়েন্ট। মনে হল, হিমন গোটা বিষয় জানলেও জানতে পারে। তার পিছু পিছু অনুসরণ করে গিয়ে পৌঁছলাম পার্ক স্ট্রিটের সেই রেস্তোরাঁ 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ। তার ভেতরে ঢুকে আবিষ্কার করলাম পৃথিবীর নবম আশ্চর্য, সেই নর্তকী মিস লিজাকে। কিছুক্ষণ তাকে খুঁটিয়ে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, আরে, এ তো আমাদের দীয়ার মতোই দেখতে, দীয়াই নাচে নাকি এভাবে ছদ্মবেশে, নাম বদলে!

তখনও ভাবতে পারিনি, যে দীয়া ব্লু-ওয়াল্ডারে আসে বিষণ্ণতার প্রতীক হয়ে, সে আসলে ভয়ঙ্কর আন্ডার ওয়ার্ল্ডের একজন মক্ষিরানি। দীয়াকে অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু এভাবে তাকে আবিষ্কার করতেই আমার তদন্তের ধারাই বদলে গেল। জানতে পেরেছিলাম, তার একজন পুরুষসঙ্গী আছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল, দীয়া ও তার পুরুষ,-সহচর কীভাবে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেছিল এতসব, ঘটনা ও দুর্ঘটনার। সেই কাহিনীই এবার বলি—

সায়ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটের বিশাল ড্রইংরুমে বসে গার্গী প্রায় পাকা গোয়েন্দার মতো বলে চলেছিল তার এ কদিনের শিহরন-জাগানো অভিজ্ঞতা। বাইরে কলকাতায় তখন রাত্রির শেষ প্রহর, চারপাশে ঘুরঘুট্টি নিশুতি। ঘরের ভেতর দেবাদ্রি সান্যাল ও তাঁর পুলিশবাহিনী অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছেন গার্গীর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও উপসংহারে পৌঁছনোর পর্যায়গুলি।

—আসলে মিঃ সান্যাল, প্রথম থেকেই হিমনকে আমার কেন যেন সন্দেহ হত, মনে হয়েছিল এই জটিল রহস্যের ভেতর এক জটিলতর চরিত্র। আশৈশব তার মা চন্দ্রাদেবী তার উপর এমনভাবে ডমিনেট করে এসেছেন যে, একেবারেই পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল হিমনের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব। তার উপস্থিতিকে পাত্তা না দিয়ে, তার সঙ্গে সব সময় ধমক দিয়ে কথা বলে, তার উপর সারাক্ষণ আদেশ চাপিয়ে দিয়ে কখনওই তাকে পূর্ণ মানুষ বলে ভাবতে দেওয়া হয়নি। বাইরের মানুষ দেখলেই তাই ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সে। কারও মুখোমুখি হলেই চেষ্টা করে পিছু হঠে পালিয়ে যাওয়ার। তার চাউনি, ব্যবহার, জীবনযাপন সবই কেমন অস্বাভাবিক, অথর্বের মতো। এহেন প্রায়-পঙ্গু যুবকের সঙ্গে দীয়ার বিয়ে হল কী করে সেই প্রশ্নটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল ক্রমশ।

প্রথম দিকে দীয়া সম্পর্কে আমার মনে ছিল এক প্রবল সহানুভূতি। হিমনকে নিয়ে যা

যা বলেছিল ও, সব শোনার পর মনে হয়েছিল সত্যিই দুর্ভাগ্য বেচারির, নইলে এরকম স্মার্ট, সুন্দরী মেয়ের এরকম পঙ্গু স্বামী হয়! একদিন শুনলাম, ডিভোর্সের নোটিস পাঠিয়েছে দীয়া। মনে মনে ভেবেছিলাম, ঠিকই করেছে, না করেই বা উপায় কী তার। কিন্তু তার পরেও লক্ষ করি, এ বাড়িতে সে প্রায়ই আসে, দিনের বেলা অনেকখানি করে সময় কাটায়, কিন্তু রাতে কখনওই থাকে না, বিকেল বা সন্ধের পরই চলে যায়। দীয়া আমাকে বলেছিল, রাতের বেলা এ বাড়িতে থাকা যায় না, তার ভয় করে। কিন্তু আমার মনে তখন একটাই প্রশ্ন, ডিভোর্সের নোটিসই যদি দিয়ে থাকবে, তাহলে এ বাড়িতে তার এত যাওয়া-আসা করার কী দরকার! এ নয় যে হিমনের টানে সে এ বাড়িতে আসে, অন্য কোনও আকর্ষণও তার নেই এখানে, চন্দ্রাদেবীর জন্য আসার কথা তো ভাবাই যায় না। তাহলে!

তখন থেকেই আমার সন্দেহ দীয়ার উপর। এ বাড়িতে দুঃখী দুঃখী মুখ করে থাকে, ওটাই ছিল তার ছদ্মবেশ। অতএব আমিও সহানুভূতি দেখানোর ছুতোয় তার সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করি। গাড়িতে লিফট দেওয়ার ভান করে একদিন প্রায় জোর করেই গেলাম ওর বাড়িতে। দেখলাম, তার জীবন-যাপন একেবারে অন্য ধরনের। তার বাড়িতে অন্য পুরুষের যাওয়া-আসা। তার অ্যাশট্রের ভেতর ছাই, আধপোড়া সিগারেটের টুকরো। তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আসে তার ঘরে। কিন্তু কে আসে। হঠাৎ একলহমা মনে হল, আচ্ছা, দীয়া নিজেও সিগারেট খায় না তো!

সঙ্গে সঙ্গে দীয়া সম্পর্কে আরও তন্ন তন্ন খোঁজ নিতে শুরু করি। তার জীবন-যাপন, যাওয়া-আসা, রাত্রিবাস— এই সব। আর সুযোগও ঘটে গেল আচমকা। মিন্টো পার্কের কাছে তার সঙ্গে একজন পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি একদিন বিকেলে। দুজনে কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ করে একসঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতেই তাদের পিছু পিছু অনুসরণ করে গেলাম বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এক রেস্তোরাঁয়। সেখানে তাদের কথাবার্তার ধরনে, আলোচনার বিষয়বস্তুতে আমি আশ্চর্য, স্তম্ভিত।

ঠিক এর পর হিমনের সঙ্গে বাসে দেখা হতে তাকে অনুসরণ করে পৌঁছে গেলাম 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ। সেটা আসলে একটা নাইট ক্লাবই।

চরম ঝুঁকি নিয়েছিলাম সেদিন, হয়তো খুনই হয়ে যেতে হত সেখানে, নেহাত কপালজোরে বেঁচে ফিরেছিলাম। সেখানেই দেখে ফেললাম মিস লিজাকে। তাহলে দীয়াই রোজ সন্ধের পর এই বারে নাচে। এরকম অশ্লীল ভঙ্গিতে! অনেক রাত পর্যন্ত তাকে কাটাতে হয় এখানে। সেজন্যই রোজ সন্ধের আগেই তাকে বেরিয়ে আসতে হয় ব্লু-ওয়াভার থেকে!

সেদিন সন্ধেয় মিস লিজার গলায় পপসং শুনে আমার আর একদফা চমকে ওঠার পালা। যে পপ-সং রবার্ট ও নীল গেয়ে থাকেন, সে-গান হঠাৎ মিস লিজার গলায় কেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনে ফেললাম, হিমনের সঙ্গে দীয়ার বিবাহের পূর্ব-ইতিহাস। দীয়া তার কৈশোরে পপ সঙের তালিম নিত রবার্ট ও নীলের কাছে। দু-চারটে ফাংশনে পপসং গেয়ে হাততালিও কুড়িয়েছিল তখন। তেমন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিল না দীয়া। কিন্তু হাই সোসাইটিতে তার কিছু বন্ধুবান্ধব থাকায় সে দ্রুত পরিচিত হয়ে উঠতে চাইছিল একজন মডগার্ল হিসেবে।

ঠিক সে সময় চন্দ্রাদেবী রবার্টের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন হিমনের জন্য একটা ভাল পাত্রী

খুঁজে দিতে। হিমনের ব্যাপারে রবার্টেরও ছিল এক অন্য দুর্বলতা। তিনিও চাইছিলেন, হিমনকে সমাজে যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠা দিতে। অতএব দীয়ার কথাই সেই মুহূর্তে মনে পড়ল তাঁর। ব্লু-ওয়ান্ডারের খ্যাতি, চন্দ্রাদেবীর ব্যাপক পরিচিতি, সেই সঙ্গে হিমনের দাদা সায়নের মেধা ও প্রতিষ্ঠা দেখে দীয়া ধারণা করেছিল, হিমনও নিশ্চয় পাত্র হিসেবে তার উপযুক্তই হবে। সব মডগার্লদের মতো দীয়ারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। তার স্বামী হবে সোসাইটির গণ্যমান্য কেউ, তার শ্বশুরকুল হবে অভিজাত, অর্থের কোনও অভাব থাকবে না তাদের। সেই সঙ্গে গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি যাবতীয় স্ট্যাটাস-সহ ঈর্ষণীয় হয়ে উঠবে সমাজের অন্য পরিবারের চোখে। কিন্তু বিয়ের পরই দীয়া বুঝতে পারল, তার জীবনের চরম ভুলটি সংঘটিত হয়ে গেছে সামান্য অনবধানতায়। হিমন ব্যাক্তিত্বহীন, নির্জীব পুরুষ, মায়ের কথায় ওঠে-বসে, নিজস্ব কোনও বক্তব্যও নেই বাড়িতে। এহেন স্বামীর সঙ্গে একদণ্ডও বাস করা যায় না।

ক্রমেই দীয়ার মনে জড়ো হল এক চরম ফ্রাস্ট্রেশন। পাশের ফ্ল্যাটে আর এক বউ ঐন্দ্রিলা পরমাসুন্দরী, তার স্বামী কলকাতার সফলতম যুবকদের অন্যতম, তার ফ্যাক্টরি তখন ফ্লারিশ করছে হু হু করে, তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতায়, কলকাতা থেকে সারা রাজ্যে, রাজ্যের বাইরেও, তার ঘরে ঐন্দ্রিলা বাস করে রাজেন্দ্রাণীর মতো।

সেই ঐন্দ্রিলার পাশে দীয়ার ভূমিকা প্রায় নিতান্ত ভিখারির। সে রিক্ত, নিঃস্ব, কপর্দকহীন। হিমন একটা সংস্থায় চাকরি করে বটে, কিন্তু তার মাইনের সবটাই তুলে দিতে হয় তার মা চন্দ্রাদেবীর হাতে। চন্দ্রাদেবী প্রতিদিন হিসেব করে পথ-খরচা দেন হিমনকে, যাতে হিমন কোনও রকম বাজে খরচ না করতে পারে। ফলে দীয়ার অবস্থা তখন করুণা করার মতো। ইচ্ছেমতো টাকা ওড়ানোর কথা তো দূরের ব্যাপার, হিমনের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেও মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে, টাকা চেয়ে নিয়ে তবে যেতে হয়।

সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে দীয়া প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। তার তখন একটাই ভাবনা, এই পরিবেশ থেকে কী ভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের বাড়িতে ফিরে গেলে সেটা যেমন হাস্যকর হবে তেমনি তার সম্মানের পক্ষে অবমাননাকর। অতএব সে চাকরির সন্ধানে বেরুতে শুরু করল রোজ। আর পেলও, তবে ভদ্রস্থ কোনও চাকরি নয়, 'বেল ক্লাবে' পপ সং-গায়িকার কাজ। নাচও জানত দীয়া, ফলে প্রতিদিন সন্ধের পর জনমনোরঞ্জনের কাজে ব্যস্ত হতে হল তাকে। তার তখন প্রচুর টাকা চাই। আর টাকারও সন্ধান পেল সে, আচমকা। এই সব নাইট-ক্লাবে আন্ডারগ্রাউন্ডের মাফিয়ারা যাতায়াত করে নিয়মিত, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল দীয়ার। টাকার খিদেয় সে জড়িত হয়ে পড়ল ড্রাগ-চোরাচালানিদের সঙ্গেও। তাতে অনেক টাকাও জমিয়ে ফেলল দ্রুত, কিন্তু সোসাইটিতে স্ট্যাটাসের কোনও উন্নতি হল না। সেও ঐন্দ্রিলার মতো কোনও সফল পুরুষের ঘরণী হতে চায়।

এমন একটি মুহূর্তে তার সঙ্গে একদিন 'বেল ক্লাবে' দেখা হয়ে গেল রাহুল রায়ের। টেবিলে তখন ড্রিংকস নিয়ে বসে মিস বেবির নাচ দেখছিল রাহুল রায়, হঠাৎ মনে হল, মেয়েটি তার চেনা। নাচ শেষ হতে দীয়ার সঙ্গে পুনর্মিলন হল রাহুল রায়ের। অনেককাল আগে তারা পরস্পর পরিচিত ছিল, হয়তো কিছুটা ঘনিষ্ঠও, তারপর মাঝে বহুকাল দেখা হয়নি, হঠাৎ আবার দেখা হতে দীয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

রাহুল রায় তখন খুবই ঝামেলার মধ্যে আছে লাইম ইন্ডিয়ায়। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্টস তখন নতুন নতুন সাবান তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে গৃহস্থকে, তার পাশে লাইম ইন্ডিয়ার কোনও প্রোডাক্টই দাঁড়াতে পারছে না। চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় কাজের মানুষ, হি মিনস বিজনেস, রোজই রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন রাহুল রায়কে, বলছেন, কী মশাই, আমেরিকা, কানাডার ডিগ্রি নিয়ে কী সব ভুষিমাল প্রোডাকশন করছেন ফ্যাকটরিতে!

আসলে খবর নিয়ে জেনেছি, রাহুল রায় একজন সায়েন্স গ্রাজুয়েট মাত্র। প্রথম জীবনে চাকরি শুরু করেছিলেন একটি ছোট্ট সাবান-কোম্পানিতে। সেখানে কাজ করতে করতে একদিন সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, লাইম ইন্ডিয়া নামের এক কোম্পানিতে প্রোডাকশন ম্যানেজার চাই। বিজ্ঞাপনটি দেখে ভুরুতে কোঁচ পড়ল রাহুল রায়ের। তিনি ততদিনে এখানে-ওখানে ঘোরঘুরি করে জোগাড় করে ফেলেছেন কয়েকটি জাল সার্টিফিকেট। তার মধ্যে আমেরিকা, কানাডার সার্টিফিকেটও। কলকাতায় বসে এ ধরনের সার্টিফিকেট জোগাড় করাও আজকাল কোনও বিস্ময়কর ঘটনা নয়। কিছু ভুয়ো প্রতিষ্ঠানকে টাকা-পয়সা দিলে তারা সবই এনে দেবে অল্প কমাসের মধ্যেই। এমনই কিছু ভুয়ো সার্টিফিকেটের বিনিময়ে রাহুল রায় জোগাড় করে ফেললেন লাইম ইন্ডিয়ার প্রোডাকশন ম্যানেজারের পদ। লাইম-ইন্ডিয়া তখন তাদের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণকৃষ্ণ বটব্যালের চেষ্টায় কিছু সুনাম অর্জন করেছে। তাদের প্রোডাকশনের বিক্রিও বেশ। কিন্তু রাহুল রায় এসে সেই সুনাম বজায় রাখতে পারলেন না, উপরন্তু নতুন প্রোডাকশনের সেল পড়ে যেতে লাগল দিন দিন।

তার ওপর কলকাতার এক নতুন কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের আকস্মিক উত্থানে রাহুল রায়ের অবস্থা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ল। তখন যে-কোনও মুহূর্তেই চাকরি যাবে তাঁর। চাকরি গেলে তাঁর সংসার একেবারে অকুল পাথারে।

ঠিক এরকম মুহূর্তে বেল ক্লাবে দীয়ার সঙ্গে দেখা হতেই রাহুল রায় খুঁজে পেলেন খড়কুটো। দ্রুত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হল দুজনের মধ্যে। দুজনেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু একজনের চাকরি তখন টলমল, অন্যজনের স্বামী পঙ্গু, অকর্মণ্য, অপদার্থ।

দীয়ারও মনে হল, রাহুল রায়ের মাধ্যমেই সে পূরণ করতে পারবে তার অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে-ই তখন রাহুল রায়কে বোঝাল, তারাও তো সায়ন চৌধুরীর মতো নতুন একটা কোম্পানি খুলতে পারে। রাহুল রায়ও তা-ই চাইল, কিন্তু ব্যবসা শুরু করার প্রথম অন্তরায় ছিল টাকা, দ্বিতীয় বাধা তার তৈরি নিম্নমানের প্রোডাক্ট।

দীয়ার হাতে তখন টাকার অভাব নেই। কিন্তু ভাল প্রোডাক্ট তৈরির কাজে সে আর কীভাবে সাহায্য করবে। অতএব লাইম ইন্ডিয়ায় থাকাকালীন যে সমস্যা ছিল রাহুল রায়ের, নতুন কোম্পানি খুললেও তা দূর হবে না। নিজের মেধার দৌড় কতদূর, তা জানাই ছিল তার। কিন্তু এতদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, অন্যের তৈরি উপযুক্ত ফর্মুলা পেলে ভাল প্রোডাক্ট তৈরি করার এলেম আছে তার। ঠিক সেই সময় সায়ন চৌধুরী তার নিজস্ব ফর্মুলায় নতুন মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। রাহুল রায় জানত এই নতুন ফর্মুলাটির অভিনবত্ব। একবার এই প্রোডাক্ট বাজারে ফেললে,

তা হু হু করে ধরে নেবে অল ইন্ডিয়া মার্কেট। অতএব রাহুল রায় দীয়াকে জানাল, এই ফর্মুলাটি যদি সে জোগাড় করে দিতে পারে, একমাত্র তাহলেই তাদের কোম্পানি দাঁড়িয়ে যাবে রাতারাতি।

দীয়া বলল, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এ ব্যাপারে।

অতএব হিমনের সঙ্গে বনিবনা না হলেও ব্লু-ওয়ান্ডার ত্যাগ করে চলে আসতে পারল না দীয়া। এদিকে বেল ক্লাবের ডিউটিতে তাকে হাজিরা দিতে হয় সন্ধের মধ্যে, সেখানে প্রায়ই এত রাত হয়ে যায় যে, অত রাতে ব্লু-ওয়ান্ডারে ফেরাটা লোকচক্ষে বেমানান। বাধ্য হয়েই তাকে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হল যাদবপুরে। রাহুল রায় প্রায়ই আসে সেখানে হয়তো রাতও কাটায় কখনও কখনও।

দীয়া তখন দিনের বেলায় ব্লু-ওয়ান্ডারে এসে ভাব পাতাতে শুরু করেছে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে। তার দুঃখের কাহিনী শোনায় ইনিয়ে-বিনিয়ে যাতে ঐন্দ্রিলার সহানুভূতি আদায় করতে পারে। তারই মধ্যে চেষ্টা করে, কী করে সায়নের ল্যাবরেটরি রুমে ঢোকা যায়। ভেবেছিল ঐন্দ্রিলার সারল্যের সুযোগ নিয়ে একদিন চুরি করে নিয়ে আসবে সায়নের গবেষণার কাগজপত্র। কিন্তু ঐন্দ্রিলা নিজেও কখনও সায়নের ল্যাবরেটরিতে ঢোকেনি। সায়ন বার বার সাবধান করত, দেখো, কোনও কাগজপত্র যেন খোয়া না যায়, এই ল্যাবরেটরির মধ্যেই রয়েছে প্যারাডাইসের প্রাণ-ভোমরা। ফলে ঐন্দ্রিলা এড়িয়ে যেতে লাগল দীয়ার অনুরোধ তাতে দীয়া প্রাথমিকভাবে ব্যর্থ হল তার ফর্মুলা সংগ্রহের অভিযানে।

ওদিকে লাইম ইন্ডিয়ায় রাহুল রায় যত কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, ততই দীয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করল ফর্মুলার জন্যে। এর মধ্যে বিরাট অঙ্কের টাকা দিয়ে তারা ইস্টার্ন বাইপাসের পাশে কিনে ফেলেছে ফ্যাক্টরি তৈরির জমিও। জমি কেনার ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষা তখন আকাশচুম্বী।

দীয়ার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হওয়াতে সে বাধ্য হয়ে ঠিক করল, যে করেই হোক, ফর্মুলাগুলো নিয়ে আসতে হবে সায়নের ল্যাবরেটরি থেকে। অতএব সে সুযোগ খুঁজতে শুরু করল সায়নের অনুপস্থিতির।

পাঁচই এপ্রিল দুপুরে সে হঠাৎ ব্লু-ওয়ান্ডারে এসে জানতে পারল, সেদিন ভোরে সায়নের ফেরার কথা থাকলেও ফিরতে পারেনি। ঐন্দ্রিলা তখন পর পর দুরাত একলা থেকে একেবারেই অধৈর্য। দীয়ার মনে হল, এই তো সুযোগ, ঐন্দ্রিলাকে জানাল, সায়ন যদি রাতে না ফেরে তাহলে সে ঐন্দ্রিলার কাছে থাকবে। ঐন্দ্রিলা সরল বিশ্বাসে দীয়াকে থাকতে দিয়েছিল তার কাছে। তারপর সেই ঘটনাটিই ঘটেছিল যা গতকাল আমার ঘরেও ঘটেছে মাঝরাতে খুটখাট শব্দ শুনে ঐন্দ্রিলার ঘুম ভেঙে যায়। দীয়া তখন ল্যাবরেটরি রুমের দরজা খুলে ভেতর থেকে টেনে বার করছিল গবেষণার কাগজপত্র। তাতে ঐন্দ্রিলাও বাধা দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। শুধু একটাই পার্থক্য, ঐন্দ্রিলা গার্গী নয়। সে নরম স্বভাবের মেয়ে। বেপরোয়া দীয়ার কাছে সে রাতে কিছুতেই পেরে ওঠেনি, পারা সম্ভবও নয় কারণ সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এরকম ভয়াবহ কোনও অঘটনের জন্য। ফলে কিছু প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর তাকে খুন হতে হয়। দীয়াও অবশ্য ভাবতে পারেনি এতদূর যেতে হবে তাকে। কিন্তু তার এই ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করা ছাড়া উপায়ও

ছিল না তার। গলা টিপে মেরে ফেলার পর সে ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল সহসা। অন্তত ঐন্দ্রিলার গলায় তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রমাণিত হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেয়, ঐন্দ্রিলার মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলবে।

কিন্তু এত ঘটনার মধ্যে আসল উদ্দেশ্যটি সফল হয়নি দীয়ার। ঐন্দ্রিলাকে হত্যার পর তাড়াহুড়োয় যে কাগজগুলো ল্যাবরেটরি রুম থেকে সে বার করে নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো সায়নের গবেষণার কিছু বাতিল লেখাজোখা, তা রাহুল রায়ের কোনও কাজেই লাগেনি। রাহুল রায় সে-রাতেও বাড়ির বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছিল দীয়ার জন্য। আচমকা এহেন বীভৎস ঘটনা ঘটে যেতে সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বিকৃত কণ্ঠস্বরে ফোনে জানিয়ে দেয় থানায়, বলে, সায়ন চৌধুরীই ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করে পালিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সায়ন তার একটু পরেই ট্যুর থেকে ফিরে এসে হাজির হয়েছিল বাড়িতে। তাতে পুলিশের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় তার উপর, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতারও করে।

কিন্তু হত্যাকারী একটি ক্লু রেখে গেল পালিয়ে যাওয়ার আগে। ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় দীয়ার কানের দুল থেকে ছিটকে পড়েছিল একটি বেগুনি রঙের পাথর।

আশ্চর্যের কথা এই যে, সে রাতে ঐন্দ্রিলা একাই ছিল তার ফ্ল্যাটে। তাকে খুন করে পুড়িয়ে হত্যাকারী পালিয়ে গেলে কারও সাধ্য নেই হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ তো নেইই, ক্লুও থাকার কথা নয়, তবু হত্যা এমনই একটি অপরাধ যেখানে কোনও না কোনও প্রমাণ থেকেই যায়। হয়তো তাইই সেই বেগুনি পাথরটিকে কেন্দ্র করে আমাকে শুরু করতে হয় ঐন্দ্রিলা-হত্যার তদন্ত, আর কী অদ্ভুত, তারপর সামনে এসে গেল আরও অনেকগুলো ক্লু।

দীয়াকে দ্বিতীয় দিন যখন আমার গাড়িতে তুলেছিলাম লিফ্‌ট দিতে, বাড়িতে না ফিরে সে নেমে গিয়েছিল রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের একটি দোকানের সামনে। তাকে নামিয়ে দেওয়ার একটু পরেই তার খোঁজে পুনর্বার ফিরে আসি সেখানেই। গাড়িটা একটু দূরে রেখে হেঁটে এলাম দীয়ার সন্ধানে। সেটা একটা স্যাকরার দোকান ছিল বলেই সন্দেহ হয়েছিল সেদিন। দোকানিকে কৌশলে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিয়েছিলাম, তার হারানো বেগুনি পাথরটির মতো একটি পাথর এ-দোকানে ও-দোকানে খুঁজে চলেছে দীয়া। কিন্তু রং মিলছে না। রং মেলে তো কোয়ালিটি মেলে না।

তার আগেই একদিন দীয়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেছিলাম, তার অ্যাশট্রের ভেতর সিগারেটের পোড়া অবশেষ। যদিও তার মধ্যে লেডিস সিগারেট ছিল না, তবু মনে হয়েছিল, যেসব মহিলা সিগারেট খায়, সবসময়েই যে লেডিস সিগারেটই খাবে তা নাও হতে পারে।

দীয়ার উপস্থিতির আর একটি ক্লু হল হিমন। পাঁচই এপ্রিল সন্ধেয় রৌণক মুখার্জি ব্লু-ওয়াভারের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, আর একজন পুরুষ সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে। তিনি চিনতে না পারলেও আমি পরে বুঝতে পেরে যাই, সে হিমন। আগেই বলেছি, সে শৈশব থেকেই মানসিকভাবে কিছুটা পঙ্গু। দীয়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর আরও পঙ্গু হয়ে গেল মানসিক যন্ত্রণায়। দীয়া তখন ব্লু-ওয়াভার থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে, তার জন্য হিমনকে 'ইমপোটেন্ট' প্রতিপন্ন করাটাই তার কাছে ছিল জরুরি। তা ছাড়াও হিমনকে পাকাপাকিভাবে ধ্বংস করে দিতে দীয়া তাকে ধরিয়ে দিল ড্রাগের নেশা। নিজে

ড্রাগ চোরা চালানকারীদের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রতিদিন নিয়ম করে হিমনকে ড্রাগ সরবরাহ করা সবচেয়ে সহজ ছিল তার কাছে। কখনও ব্লু-ওয়ান্ডারে এসে দিয়ে যেত, কখনও হিমন নিজেই চলে যেত দীয়ার নাইট ক্লাবে। হিমনের অস্বাভাবিক চাউনি, তার এলোমেলো হাঁটা, হাতের কাঁপুনি ইত্যাদি দেখে ব্যাপারটা প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। তারপর যখন শুনলাম, নাইট-ক্লাবে তার এক চেন-স্মোকার মড় বান্ধবী আছে, তখন কৌতূহল উপচে পড়ল আরও। ইমপোটেন্ট হিমনের আবার বান্ধবী! তারপর 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ গিয়ে আবিষ্কার করি, মিস লিজা একটা মোড়ক তুলে দিচ্ছে হিমনের হাতে। কিন্তু কী সেই মোড়ক যা হাতে পেতে দারুণ খুশি হয়ে উঠতে পারে হিমন! তখনই বুঝেছিলাম, ড্রাগ।

আসলে হিমনকে অথর্ব করে তোলার ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শুধু এই কারণে যে, সে-রাতে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে দীয়ার উপস্থিতির একমাত্র সাক্ষী ছিল হিমন। হিমনই সে-রাতে দেখেছিল, সে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার পরই দীয়া উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। ঐন্দ্রিলার কাছে থাকবে বলে। অতএব হিমনকে বশীভূত করতে তাকে ড্রাগ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা খুবই দরকার।

ড্রাগে আসক্ত হওয়ার পর থেকে হিমনের সমস্ত সত্তা বিলীন হয়ে গেল ড্রাগের ভেতর। ড্রাগ না পেলে পাগল হয়ে যেত সে। ড্রাগ না নিলে কী নিদারুণ যন্ত্রণা হয় শরীরে তা আরও বেশি করে বোঝানোর জন্যই দীয়া কখনও ইচ্ছে করেই ড্রাগ দেওয়া বন্ধ করে দিত, যাতে দীয়ার ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে হিমন। এভাবে পর-পর দু-তিন দিন ড্রাগ না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে সে শরণাপন্ন হয়েছিল ঐন্দ্রিলার। চন্দ্রাদেবী তাকে টাকা দেবেন না জানত বলেই হিমন বারবার বিরক্ত করত ঐন্দ্রিলাকে। ঐন্দ্রিলা যে তার ডায়েরিতে লিখেছে, 'ও বারবার চাইতে আসে, কিন্তু রোজ রোজ কী করে ফেরাই তাকে, আমি জানি এটা খুব খারাপ', তা আসলে হিমনকে নিয়েই।

শরীর চাইতে যেত না হিমন। তার দরকার ছিল টাকার। ঐন্দ্রিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাকা দিত তাকে। পাঁচই এপ্রিল সন্ধের পর অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সোজা ঐন্দ্রিলার কাছে টাকা চাইতেই গিয়েছিল হিমন। ঐন্দ্রিলাও দেবে না, হিমনও কাকুতি-মিনতি করেছিল তার কাছে। শেষে বাধ্য হয়ে ফ্ল্যাটের ভেতর তাকে নিয়ে যায়। হিমনকে বেরুতে না দেখে নানান সন্দেহে দোলাচল হয়ে অবশেষে গেটের কাছ থেকে ফিরে গিয়েছিলেন রৌণক।

সে-রাতে ঐন্দ্রিলা-হত্যার জন্য দীয়াই যে দায়ী তাও অনুমান করেছিল হিমন। কদিন আগে হিমনকে সিঁড়ির উপর এক থাপ্পড় কষাতেই ড্রাগ-আসক্ত দুর্বল হিমন হুড়হুড় করে সব কথাই বলে দিয়েছে আমাকে। এত সব ঘটনা জানত বলেই বাইরের লোকের সামনে এত আড়ষ্ট হয়ে থাকত সে। হঠাৎ কাউকে সিঁড়িতে দেখলে পিছু হটে পালিয়ে যেত এক প্রবল আতঙ্কে।

ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর আমি ব্লু-ওয়ান্ডারের জীবনে প্রবেশ করতেই দীয়া ভয় পেয়ে গেল হঠাৎ, ভাবল, সব হয়তো জেনে ফেলব আমি। অতএব একদিন সাবধানও করল আমাকে, এ বাড়িতে থেকো না, পালিয়ে যাও, নইলে ওরা তোমাকেও খুন করে ফেলবে।

ইতিমধ্যে পুলিশ বেল-ক্লাবের মিস বেবিকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকায় দীয়া ওখানকার কাজ ছেড়ে নতুন কাজ নেয়, 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ। নাম বদলে, ছদ্মবেশ বদলে সোনালি

লের উইগ পরে হয়ে ওঠে মিস লিজা। হিমনও বেল ক্লাবে না গিয়ে যেতে শুরু করে 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ। ড্রাগ-মাফিয়ার লোকজনও যুক্ত হয়ে যায় এখানে। তারপর একদিন টাকাপয়সার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়ার কারণে খুন হয়ে যায় কমলাপতি জৈন নামে এক ব্যবসায়ী। তখনও রাহুল রায়কে আমি ঠিক চিহ্নিত করতে পারিনি। পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে মিস লিজার ঠিকানা সংগ্রহ করে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে তাকে খুঁজতে গিয়ে খবর পেয়ে যাই এক আংটিবাবুর। তার সঙ্গে লাইম ইন্ডিয়ার একটি ডায়েরি।

লাইম ইন্ডিয়ার কেউ না কেউ যে এই রহস্যকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তা আমার নজরে এসেছিল আরও দুটি কারণে। এক, বিশ্রী সব বিজ্ঞাপন দিয়ে লাইম ইন্ডিয়া ক্ষতি করতে চাইছিল প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের গুডউইল, দুই, লোটন নামে লাইম ইন্ডিয়ার এক সুপারভাইজার এসে ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে থাকত কালীজীবনবাবুর কাছে। দুটো ঘটনাই আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছিল রৌণক মুখার্জির কথা। পরে রৌণক মুখার্জির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বুঝতে পারি, তাঁর মতো সাদাসিধে, নরম স্বভাবের প্রেমিক মানুষের পক্ষে মানুষ খুন করা অসম্ভব। তাঁর কাছেই হদিস পেলাম আংটিবাবুর যিনি গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পছন্দ করেন। পরে রাহুল রায়ের সঙ্গে আলাপ হতে দেখি তাঁর হাতে চার-পাঁচটি রত্নখচিত আংটি।

অতএব রাহুল রায়ের সঙ্গে মিস লিজার যে একটা সম্পর্ক আছে সে-সম্পর্কে সচেতন হই। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের পতিতালয়ে যাওয়া-আসা ছিল তাঁর। এক বৃদ্ধাকে আদর করে মিস লিজা নামে ডাকতেন রাহুল রায়। লোটন তাঁরই লোক। কালীজীবনবাবুর পাড়াতেই বাস করত লোটন। নিতান্ত ভালমানুষ কালীজীবনবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে সে-ই প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে প্ল্যান্ট বার্স্ট করানোর কারিকুরি করেছিল সে রাতে, টেলিফোন করার ছুতোয়। কালীজীবনবাবু তা ধরতেও পারেননি। গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ডেসপ্যাচ না করানো, ঋষিতা তালুকদারকে আহত করা, এমনকি মোটর সাইকেলে ছুটে এসে অফিসের কাছেই আমাকে আহত করার চেষ্টা, সবই লোটন পর-পর করে গিয়েছে রাহুল রায়ের নির্দেশে। রাতের বেলা টেলিফোনে ঘড়ঘড়ে গলায় আমাকে শাসিয়েছিল এই লোটনই। এহেন বশংবদ লোটনকে শেষপর্যন্ত খুন হতে হল রাহুল রায়ের হাতেই, কারণ 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ যে ব্যবসায়ীটি ন হয়েছিল টাকাপয়সা নিয়ে বখরা এদিকে-ওদিকে করায়, তাতে রাহুল রায় আর দীয়ার ঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল লোটন। লোটনই খুন করে ব্যবসায়ীকে, তারপর অতিরিক্ত বখরার চাপ সৃষ্টি করে রাহুল রায়ের উপর। হয়তো শাসিয়েও ছিল, বেশি টাকা না পেলে সব করে দেবে পুলিশের কাছে। অতএব রাহুল রায় তাকে খুন করে রেখে এল প্যারাডাইস াডাক্টসের ফ্যাক্টরির পেছনে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল রাহুল রায়। সরে গেল পথ থেকে। তার দায়ও চাপল সায়ন চৌধুরীর কাঁধে। প্যারাডাইসের ', তার ফলে ট্রাক-ড্রাইভারদের ধর্মঘট, এগুলো রাহুল রায়ের কীর্তি কি না তার াণ পাইনি। হয়তো দুর্ঘটনাটা এমনিই ঘটেছিল, যেমন অনেকসময় ঘটে থাকে।

. ফর্মুলাটা পাওয়ার জন্য রাহুল রায় তখন মরিয়া। লোটনের সাহায্যেই প্যারাডাইসের দুর্ঘটনাও ঘটাল যাতে ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রোডাকশন পিছিয়ে যায়। তারপর ত লাগল প্যারাডাইসে যদি একটা চাকরি পায় সে। প্রথমে সায়নের সঙ্গে

যোগাযোগ করে, পরে কালীজীবনবাবুকে দিয়ে সুপারিশ করে, শেষে নিজে এসে আমা
সঙ্গে দেখা করে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমি তখন তার মধ্যে বিপদের গ
পেয়েছি। মনে হচ্ছিল এখানে ঢুকে কিছু একটা গোলমাল পাকাতে চায় রাহুল রায়।

চাকরি না পাওয়ায় সে আবারও চাপ দিতে লাগল দীয়ার উপর। সেইসঙ্গে অপহর
করতে হল হিমনকে, হিমন হয়তো খুনও হতে পারত, কিন্তু সেটা মুলতুবি রেখে তাবে
রেখে এল এক গোপন আস্তানায়, তাকে আরও বেশি করে ড্রাগ দিয়ে ড্রাগজনিত কারে
মৃত্যু ঘটানোই শ্রেয় মনে করে সেদিন প্রাণে মারেনি হিমনকে। পরে হিমন পালিয়ে আসা
তাকে থাপ্পড় মেরে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লু তার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা হল, এক, দীয়া
তাকে নিয়মিত ড্রাগ জোগায়, দুই, দীয়াই মিস লিজা হয়ে হোটেলে নাচে, যা আমি আগে
অনুমান করেছিলাম, তিন, রাহুল রায়ই তাকে ট্যাক্সিতে করে রেখে এসেছিল এক গোপ
আস্তানায়। পবে রাহুল রায় থানায় ফোন করে জানায়, সায়ন চৌধুরীই ট্যাক্সিতে নিে
গিয়েছে হিমনকে।

হিমনের ড্রাগ-আসক্ত হওয়া বা তার অন্তর্ধানের মূলে যে দীয়া জড়িত তা বোধহয় বুঝতে
পেরেছিলেন চন্দ্রাদেবী। তাইই কদিন আগে দীয়া এ বাড়িতে আসতেই তাকে উন্মত্তের মতে
মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন গেটের বাইরে।

যাই হোক ফর্মুলাগুলো উদ্ধারের শেষ চেষ্টা করল দীয়া কাল রাতে আমার কাছে থাকা
ছুতোয়। ফাঁদটা আমিই পেতেছিলাম। সে এসে প্রথমেই চেষ্টা করল, একটি উড়ো-ফোে
ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনার সংবাদ দিয়ে আমাকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিতে। তাতে ধীরেসুে
সে বার করে নিতে পারত ল্যাবরেটরি রুমের কাগজ। রাহুল রায়ই বাইরে থেকে ফোনট
করেছিল। আমি তার কণ্ঠস্বর বুঝতে না পারায় আর একটু হলেই তাদের ফাঁদে পা দিে
ফেলেছিলাম। ভাগ্যিস রোহিতাশ্ব মিত্র ফোনটা করেছিলেন সেসময়। তার পরের ঘটন
তো শুনলেনই সব, কীভাবে দীয়া—

আসলে মিঃ সান্যাল, দীয়ার অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এতসব ঘটনার জন্য দায়ী। সঃ
ী হিসেবে পেয়েছিল রাহুল রায়ের মতো একজন নিষ্ঠুর দোসর। প্রথমে ঐন্দ্রিলা, পরে গার্গী
সৌভাগ্যে দীয়া ক্রমশ জর্জরিত হয়ে পড়েছিল চরম ঈর্ষায়। সেই ঈর্ষার প্রতিফল
দেখেছিলাম সেদিন মিস লিজার সাজসজ্জার বহরে। তার চোখের পাতায় সবুজ আইশ্যাডো
দেখে হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল 'ওথেলো' নাটকের একটি সংলাপ। ঈর্ষা-জর্জর ওথেলো
উদ্দেশে ইয়াগো সেদিন বলেছিলেন,

ও বিওয়্যার, মাই লর্ড, অফ জেলাসি ;
ইট ইজ দ্য গ্রিন-আইড মনস্টার হুইচ ডাথ
মক
দি মিট ইট ফিড্‌স্ অন...

সেই সবুজ-চোখের দৈত্যই যেন ভর করেছিল ঈর্ষান্বিত মিস লিজা ওরফে দীয়া
শরীরে। সত্যিই **কী ভয়ঙ্কর দীয়ার সবুজ চাউনি।**